রামচন্দ্রের বক্তৃতাবলী।

দ্বিতীয় ভাগ।

দশম হইতে অষ্টাদশ বক্তৃতা।

দ্বিতীয় সংস্করণ

যোগোদ্যান, কাঁকুড়গাছী হইতে সেবকমণ্ডলী

কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

সন ১৩১৬ সাল।

৭৫ রামকৃষ্ণাব্দ।

মূল্য এক টাকা মাত্র।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেব।

সূচীপত্র

বিষয়।

দশম বক্তৃতা—ঈশ্বর সাধন

একাদশ বক্তৃতা—সাধনের স্থান নির্ণয় ... ৫৯

বিষয়। পৃষ্ঠা

বিষয়। পৃষ্ঠা।

ষোড়শ বক্তৃতা—বিশ্বজনীন ধর্ম্ম

সপ্তদশ বক্তৃতা—জমা খরচ ... ৪০৯

অষ্টাদশ বক্তৃতা—শাস্ত্রাদি সম্বন্ধে উপদেশ ৪৫৩

PRINTED BY S. C. CHAKRABARTI AT THE

KALIKA PRESS.

No 17, Nandakumar Chowdhury's 2nd Lane - CALCUTTA.

রামচন্দ্রের বক্তৃতাবলী।

দশম বক্তৃতা।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবকথিত

ঈশ্বর সাধন।

১৩০১—১৮ই পৌষ, ১লা জানুয়ারী, সোমবার

সিটি থিয়েটারে প্রদত্ত।

৫৯ রামকৃষ্ণাব্দ।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ

শ্রীচরণ ভরসা।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবকথিত

ঈশ্বর সাধন।

ব্রাহ্মণাদি সকলের চরণে প্রণাম।

আজ আমি যে প্রস্তাব লইয়া আলোচনা করিতে আসিয়াছি, তাহার ন্যায় আমাদের অত্যাবশ্যকীয় বিষয় আর দ্বিতীয় কিছু আছে কি না, আমি বলিতে পারি না। যিনি যে কোন মতাবলম্বী হউন, যিনি যে কোন ভাবাবলম্বী হউন, যিনি যেরূপ বিশ্বাসী হউন, যিনি যে প্রকার ফলপ্রত্যাশী হউন, সাধনার প্রয়োজন নাই, এমন কোন নরনারীই নাই। অতএব সাধনা কাহাকে কহে, তাহা লইয়া বিচার করা আমার অদ্যকার অভিপ্রায়।

কোন প্রকার উদ্দেশ্য বস্তু প্রাপ্ত হইবার নিমিত্ত যে প্রক্রিয়া বা কার্য্যাবলম্বন করা যায়, তাহাকে সাধন বলে !

সাধারণ নরনারীদিগকে লইয়া পরীক্ষা করিলে প্রত্যেকের উদ্দেশ্য স্বতন্ত্র প্রকার, প্রত্যেকের জীবনের লক্ষ্য স্বতন্ত্র প্রকার, সুতরাং প্রত্যেকের সাধনও স্বতন্ত্র প্রকার বলিয়া দেখা যায়। কেহ সংসারকে ভ্রম জানিয়া সাংসারিক কার্য্যকলাপ ছায়াবাজী জ্ঞানপূর্ব্বক নির্ব্বাণ মুক্তির প্রত্যাশায় অপেক্ষা করিতেছেন ; তদবস্থা লাভের নিমিত্ত তাঁহাকে যে প্রক্রিয়া অবলম্বন করিতে হয় এবং যে সাধনে তাঁহাকে ব্যাপৃত থাকিতে হয়, রূপাদি সাধনাভিলাষী ব্যক্তির সাধনা কখন সেরূপ প্রকার হইতে পারে না।

সিদ্ধাবস্থাপ্রসূত কার্য্যকলাপপ্রার্থী ব্যক্তি যে প্রকার সাধনপথে ভ্রমণ করেন, আত্মনিবেদিত পরম বৈরাগী কখন সে প্রকার সাধন গ্রাহ্য করেন না। ঐশ্বর্য্য কামনার বশবর্ত্তী হইয়া যাঁহারা সাধনা করেন, তাঁহাদের সহিত প্রেমিক ভক্তদিগের কার্য্যকলাপ কস্মিন্‌কালে কোন স্থানে মিলিতে পারে না। এইরূপে প্রত্যেক ব্যক্তির উদ্দেশ্য বস্তু স্থির করিয়া দেখিলে সাধন সম্বন্ধে পৃথক্ পৃথক্ ভাব লক্ষিত হইবে।

এইরূপ ভিন্ন ভিন্ন সাধন প্রণালী প্রচলিত থাকায় আমাদের পরস্পর সর্ব্বদা মতান্তর হইয়া থাকে।

সাধন সম্বন্ধে কোন কথা কাহাকে জিজ্ঞাসা করিলে তিনি নিজের উদ্দেশ্য এবং তদ্‌পক্ষীয় সাধনের উপায় ব্যক্ত করিতে বাধ্য হইয়া থাকেন। তিনি নিজ মত ব্যতীত, নিজের দর্শন এবং অভিজ্ঞতা ব্যতীত, অন্যের উদ্দেশ্য ও সাধন বলিয়া দিবেন কিরূপে? সুতরাং ধর্ম্মজগতে চিরকাল সাধন লইয়া বিবাদ বিসম্বাদ চলিয়া আসিতেছে। এই নিমিত্তই সাম্প্রদায়িক ধর্ম্মের সর্ব্বদা দ্বেষভাব লক্ষিত হয়, এই নিমিত্তই একজন সাধক অপরকে অবজ্ঞা করেন। এই নিমিত্ত সাকার বাদী নিরাকারবাদীর সাধন দেখিলে এবং নিরাকারবাদী সাকারবাদীর কার্য্য দেখিলে পরস্পরের প্রতি পরস্পরের অবজ্ঞার উদ্রেক হইয়া থাকে। সাধনপথের পথিকদিগের এই চিরবিবাদ ভঞ্জন করিবার নিমিত্ত রামকৃষ্ণদেব অবতীর্ণ হইয়া সর্ব্বসাধারণের কল্যাণার্থ যে উপদেশ দিয়া গিয়াছেন, তাহাই আমি প্রচার করিবার উদ্দেশ্যে অদ্য সাধারণের সমীপে উপস্থিত হইয়াছি। এক্ষণে রামকৃষ্ণদেবের যদ্যপি কৃপা হয়, তাহা হইলে তাঁহার উপদেশের মর্ম্ম প্রকাশ করিতে কৃতকার্য্য হইব।

সাধনের তাৎপর্য্য বাহির করিলে কর্ম্ম বুঝায় এবং উদ্দেশ্যানুসারে কর্ম্মের সূত্রপাত হইলেও পাত্রবিশেষের অবস্থার দ্বারা তাহা সম্পাদিত

হইয়া থাকে। যেমন কোন ব্যক্তির দুই মোন চাউলের প্রয়োজন, কিন্তু সে তাহা বহন করিতে অশক্ত। তাহার দুই মোন প্রয়োজন বলিয়া সে দশ সেরের অধিক ভার কখনই সহ্য করিতে পারে না। অথবা সকল ছাত্রেই রায়চাঁদ প্রেমচাঁদ পরীক্ষা দিতে ইচ্ছা করে, কিন্তু তাহা কয়জনের শক্তিতে সংকুলান হয়? এই নিমিত্ত সাধন সম্বন্ধে বিচার করিতে হইলে পাত্র বিচার সর্ব্বাগ্রে কর্ত্তব্য।

সাধন লইয়া আলোচনা করিতে হইলে দেশ, কাল, পাত্র এবং উদ্দেশ্য, এই চারিটী বিষয় বিচার করিলে তবে সাধনের মীমাংসা হইতে পারে। পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, সকলের উদ্দেশ্য এক প্রকার নহে। ধর্ম্মানুষ্ঠান করিতে দেখিলেই যে সকলকে এক শ্রেণীতে নিবদ্ধ করিতে হইবে, তাহা নহে। কেহ সাংসারিক সুখের নিমিত্ত ভগবান্‌কে ডাকেন, কেহ মোকদ্দমা জয়ী হইবার জন্য ভগবান্‌কে ডাকেন, কেহ পুত্রের জন্য ভগবানের শরণাপন্ন হন, কেহ পরজন্মে ইন্দ্রতুল্য অবস্থাপন্ন হইবেন বলিয়া ভগবানের অর্চ্চনা করেন, কেহ মুক্তি লাভের জন্য ভগবানের ভজনা করিয়া থাকেন এবং কেহ ভগবানের সহিত সাক্ষাৎকারের নিমিত্ত তাঁহার সাধনা করিয়া থাকেন। প্রত্যেক ব্যক্তির এই প্রকার কার্য্যকে সাধনা বলা যায় বটে, কিন্তু উদ্দেশ্য বিচার করিলে যে কতদূর ফলের তারতম্য হইবার সম্ভাবনা, তাহা অনায়াসে উপলব্ধি করা যাইতে পারে। যে ব্যক্তি পুত্রের বাসনায় ভগবানের সাধনা করেন, তাঁহার মনোরথ সিদ্ধ হইলে সেই অবস্থার সহিত কি মুক্ত পুরুষের অবস্থার তুলনা হয়? উভয় ব্যক্তি সাধনা করিলেন বটে, উভয় ব্যক্তি এক ঈশ্বরের অর্চ্চনা করিলেন বটে, কিন্তু স্বতন্ত্র উদ্দেশ্য থাকিবার জন্য সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র ফল ফলিয়া থাকে। এই নিমিত্ত ঈশ্বর সাধনা স্থির করিতে হইলে সর্ব্বপ্রথমে উদ্দেশ্য নিরূপণ করা কর্ত্তব্য। কোন্ সাধনা করিব?

সাধনার দ্বারা কি লাভ হইবে? এইরূপে উদ্দেশ্য বাহির করিয়া সাধকের পক্ষে তাহা কতদূর প্রয়োজন এবং নিষ্প্রয়োজন বুঝিয়া সাধনের ব্যবস্থা করিলে মনোরথ সিদ্ধি হইবার পক্ষে প্রত্যবায় ঘটে না। যেমন কেহ কালীঘাটে যাইবেন স্থির করিলেন, তাঁহাকে পথ দেখাইয়া দিলে তিনি কালীঘাটে যাইতে পারেন কিন্তু কোথায় যাইবেন এরূপ উদ্দেশ্য না বুঝিয়া যদ্যপি কেবল কতকগুলি পথের নাম উল্লেখ করা যায়, তাহা হইলে তাঁহার এইরূপ ভ্রমণের কোন ফল না ফলিবারই সম্ভাবনা। অতএব সাধনা নিরূপণ করিতে হইলে উদ্দেশ্য নিরূপণ করা সর্ব্বাগ্রে প্রয়োজন।

উদ্দেশ্য স্থিরীকৃত হইলে পাত্র নির্ব্বাচন করা যাহার পর নাই আবশ্যক। যে ব্যক্তি সাধনাবিশেষে দীক্ষিত হইতেছেন, সে ব্যক্তি তাহা সম্পাদন করিতে কৃতকার্য্য হইবেন কি না? ইচ্ছা হইলেই যদ্যপি তাহা সকলের আয়ত্তে আসিত, তাহা হইলে কাহার কোন বিষয়ের চিন্তা থাকিত না। যোগীর যোগভাবপ্রসূত অলৌকিক ব্যাপার দর্শন করিবার জন্য যোগী হইতে বলিলে যোগী হওয়া যায় না, কেবল বিচারের কথা নহে, তাহা কার্য্যে পরিণত করিতে হইলে সাধনার প্রয়োজন। সে সাধনার সময় স্বতন্ত্র এবং অবস্থা স্বতন্ত্র। বাল্যাবস্থা হইতে অভ্যাস না করিলে তাহা আর আয়ত্ত করা যায় না। মস্তিষ্ক বলবান না থাকিলে ধ্যান ধারণা হইতে পারে না। কামিনীকাঞ্চনে নিমজ্জিত অধোরেতা যোগ সাধনায় প্রবৃত্ত হইলে কি ফল হইবে? অথবা শুষ্ক কাষ্ঠতুল্য হৃদয়বিহীন ব্যক্তি ভক্তির অমৃতলহরী কিরূপে আস্বাদন করিয়া তৃপ্তিলাভ করিবে? এই নিমিত্ত পাত্র বিচার করা সাধনার দ্বিতীয় কর্ত্তব্য।

উদ্দেশ্য এবং পাত্র নিরূপিত হইলেও সময়ের প্রতি দৃষ্টি রাখা

নিতান্ত প্রয়োজন। সকল কার্য্যেই দেখা যায় যে, সময় না হইলে তাহা কখনই সাধিত হইতে পারে না। স্ত্রী পুরুষের দ্বারা সন্তান জন্মিয়া থাকে। এ স্থানে উদ্দেশ্য সন্তান এবং স্ত্রী পুরুষ পাত্র, কিন্তু স্ত্রী পুরুষ উপস্থিত থাকিলেই যে সন্তান জন্মিবে, তাহার কোন অর্থ নাই। স্ত্রী পুরুষের প্রয়োজন এবং তৎসঙ্গে সময়েরও বিশেষ প্রয়োজন। সময় হইলে স্ত্রী পুরুষের দ্বারা সন্তানোৎপাদিত হইয়া থাকাই প্রকৃতির নিয়ম।

স্ত্রী পুরুষের দ্বারা যদিও সন্তান জন্মিয়া থাকে, কিন্তু বালক বালিকারা সে কার্য্যের যোগ্য নহে। যেহেতু সন্তান জন্মাইবার তাহাদের সে সময় নহে। বীজই বৃক্ষে পরিণত হয় এবং তাহা হইতে ফুল ও ফল জন্মিয়া থাকে কিন্তু বীজ ফেলামাত্রেই কেহ ফুল ও ফল প্রত্যাশা করিতে পারে না। কারণ বীজের তখন ফল ফুল প্রদান করিবার সময় হয় নাই। এই নিমিত্ত সাধনার উদ্দেশ্য এবং পাত্র ব্যতীত সময়ের সম্বন্ধ বিচার করা অনিবার্য্য হইয়া থাকে।

উদ্দেশ্য, পাত্র এবং সময় ব্যতীত যে কোন্ স্থানে থাকিয়া সাধন করিতে হয়, অগ্রে তাহার তত্ত্ব নিরূপণ না করিলে কখনই সাধনকার্য্যে কৃতকার্য্য হওয়া যায় না। দেশ বা স্থান দুই ভাবে কার্য্য করিয়া থাকে। দেশের জল বায়ু ইত্যাদি এবং তথাকার নরনারীর ব্যবহার।

জল বায়ু বা স্থানিক ধর্ম্মানুসারে প্রত্যেকে পরিচালিত হইতে বাধ্য হইয়া থাকে। শীতপ্রধান কিম্বা গ্রীষ্মপ্রধান দেশে অবস্থিতি করিলে দেশের ধর্ম্ম অতিক্রম করিয়া কে কার্য্য করিতে পারে? যখন বরফ পতিত হইয়া হিমাচলের চলাচল স্থগিত হইয়া যায়, তখন কোন্ সাধক অনাবৃত স্থানে ধ্যানাবলম্বন পূর্ব্বক উপবেশন করিয়া থাকিতে পারেন? গ্রীষ্মাধিক্য স্থানে উত্তাপের প্রাবল্য বিধায় তথায়ও সাধনাদি দূরে থাকুক, সাধারণ ভাবেও দিন যাপন করা নিতান্ত ক্লেশকর হইয়া উঠে;

তথায় পঞ্চতপার কার্য্যই আয়াসসাধ্য নহে। দেশের জল বায়ুর দ্বারা হয় দেহ সুস্থ থাকে, না হয় ব্যাধির মন্দিরবিশেষে পরিণত হয়। এই সকল কারণে সাধনায় প্রবৃত্ত হইবার সময় দেশের অবস্থার প্রতি দৃষ্টি রাখা অতীব কর্ত্তব্য।

দেশের দ্বিতীয় ভাগকে দেশীয় নরনারীদিগের ব্যবহার বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে। যেরূপ, জল বায়ুর ধর্ম্ম উল্লঙ্ঘন করিবার অধিকার কাহার নাই এবং তাহা হইতে রক্ষা পাইবার নিমিত্ত নানাবিধ উপায় উদ্ভাবন করিতে হয়, সেইরূপ প্রত্যেক দেশের অন্যান্য ধর্ম্ম অলক্ষিতভাবে মনুষ্যাদিগকে অধিকারে রাখিয়া কার্য্য করাইয়া লয়। দেশের এই ধর্ম্মকে গুণ কহে।

গুণ ত্রিবিধ,—সত্ত্ব, রজঃ এবং তমঃ; এই ত্রিগুণে মনুষ্যাদি প্রত্যেক জীব ও পৃথিবীর অন্যান্য যাবতীয় পদার্থ সংগঠিত হইয়াছে। সৃষ্ট পদার্থ ত্রিগুণাত্মক হইলেও গুণের স্বল্পাধিক্য আছে। যে স্থানে রজোগুণের আধিক্য, সে স্থানে বাস করিলে মনোমধ্যে রজোগুণের প্রতিবিম্ব অবশ্যই প্রতিফলিত হইয়া থাকে। তমঃ এবং সত্ত্বগুণ হইতেও তদ্রূপ ভাবের কার্য্য হয়।

সাধন কার্য্যের সহায়তার নিমিত্ত ত্রিগুণের মধ্যে সত্ত্বই শ্রেষ্ঠ এবং তাহার সহিত সম্বন্ধ স্থাপিত না হইলে, ঈশ্বরের সহিত কোন সম্বন্ধই হইতে পারে না। তাহার কারণ এই যে, সত্ত্বের মাধুর্য্যভাব, রজোর ঐশ্বর্য্যভাব এবং তমোর তামসিক ভাব। মাধুর্য্যভাব না আসিলে ভগবানের রাজ্যে প্রবেশ করিবার পথ পাওয়া যায় না। এই নিমিত্ত সাধনায় লিপ্ত হইতে হইলে লোকের প্রকৃতি পর্য্যালোচনা করিয়া দেখা কর্ত্তব্য।

অতএব সাধনা কথাটী যারপরনাই গুরুতর এবং তাহার ব্যবস্থা

করা অতিশয় কঠিন। রামকৃষ্ণদেব এই দুরূহ সাধন বিষয়ে যে প্রকার মীমাংসা করিয়া গিয়াছেন, আমি তাহাই প্রকাশ করিতে সাধ্যমত প্রয়াস পাইতেছি। যদ্যপি তাঁহার আশীর্ব্বাদ থাকে, যদ্যপি তিনি আপনি ভাবের ঘরের দ্বারোদ্ঘাটন করিয়া দেন, তাহা হইলে আপনারা সাধনের ভাব বুঝিতে পারিবেন। নতুবা যে মুখে আসিয়াছেন, সেই মুখে ফিরিয়া যাইতে হইবে।

কথিত হইল যে, উদ্দেশ্য, দেশ, কাল এবং পাত্র বিচার করিয়া ঈশ্বর সাধনা নিরূপণ করিতে হয়। এ প্রকার প্রণালী অবলম্বন করিবার হেতু কি? রামকৃষ্ণদেব বলিয়াছেন যে, মনই সকল কার্য্যের অধিনায়ক; কোন কার্য্য সাধন হওয়া বা না হওয়া মনেরই একমাত্র অধিকার ও সঙ্কল্পের বিষয়। যদিও বুদ্ধি এবং ইন্দ্রিয়াদি ব্যতীত কোন কার্য্য সম্পন্ন হয় না বটে, কিন্তু মনের আগ্রহ থাকিলে ইন্দ্রিয়াদির ভাবান্তর সত্বেও, অনেক সময়ে কার্য্য সাধন করা যায়। যেমন পক্ষাঘাত রোগে হস্ত পদের কার্য্যহীনতা জন্মিলেও মনের ইচ্ছা হইলে সকল স্থানেই অনায়াসে গমনাগমন করা যায়, কিন্তু মনের ইচ্ছা না থাকিলে ইন্দ্রিয়াদি কার্য্যক্ষম থাকিলেও কোন স্থানে গমন করা যায় না।

মন সকল কার্য্যের কর্ত্তা হইলেও অবস্থাক্রমে তাহার সাময়িক পরিবর্ত্তন হয়। যেমন এক ব্যক্তি শান্তভাবে বসিয়া আছেন। তাঁহার মনে সে সময়ে কোন ভাবের কার্য্য নাই। যদ্যপি সে সময়ে তাঁহার সমক্ষে বেশ্যাদি আসিয়া উপস্থিত হয়, তাহাদিগকে দেখিবামাত্র তাঁহার মানসিক বিকার উপস্থিত হইবার সম্পূর্ণ সম্ভাবনা। মানসিক ভাবোদয় হইলেই যে সকল সময়ে তাহা কার্য্যে পরিণত হয়, তাহা নহে; কিন্তু এরূপ অবস্থায় মনের উপরে যে সাময়িক ছায়া পতিত হয়, তাহার সন্দেহ নাই। অথবা মদ্য সেবন করিয়া কাহাকে বিবাদ ও মারামারি

করিতে দেখিলে মনের অবশ্যই অবস্থান্তর হইবে, তাহার আশ্চর্য্য নাই। কিম্বা কোন সাধু আসিয়া তথায় উপস্থিত হইলে তখন তাঁহার মনে ধর্ম্মভাবের অবশ্যই উদ্দীপন হইয়া যাইবে।

কোন কার্য্য সাধন করিতে হইলে কয়েকটী কারণের প্রতি তাহা নির্ভর করিয়া থাকে। যথা, পূর্ব্ববর্ত্তী কারণ, উদ্দীপক কারণ, সমবর্ত্তী কারণ এবং পরবর্ত্তী কারণ। যেমন বৃষ্টির জল কার্য্যবিশেষ। এই দৃষ্টান্তে, জলের পূর্ব্ববর্ত্তী কারণ জলীয় বাষ্প গগনমার্গে উপস্থিত থাকিবে। উদ্দীপক কারণস্বরূপ শৈত্য স্পর্শিত হইলে যে উত্তাপের দ্বারা জলকণা সকল বিস্তীর্ণ ভাবে অবস্থিতি করিয়া থাকে তাহা অপহৃত হইয়া যায়, সুতরাং উহারা সংকোচিত বা ঘনীভূত ভাবে পরিণত হয়। জলীয় বাষ্প জলকণার আকার ধারণ করিবামাত্র যদ্যপি পুনরায় উত্তাপ প্রাপ্ত হয়, তাহা হইলে তাহাদের তৎক্ষণাৎ পূর্ব্বাবস্থা কিম্বা মধ্যবর্ত্তী অবস্থাবিশেষ অবশ্যই উপস্থিত হইবে, অথবা উত্তাপ না জন্মিয়া যদ্যপি ক্রমাগত শৈত্যোৎপত্তি হইবার হেতু জন্মিতে থাকে, তাহা হইলে জলকণা সকল বিন্দু এবং পরিশেষে ধারার আকারে ধরাগামী হইতে বাধ্য হয়। এই কারণকে সমবর্ত্তী কারণ কহা যায়। এই জল যদ্যপি উচ্চস্থানে পতিত হয়, তথায় আধারাভাবে উহা থাকিতে পারে না; নিম্নস্থান পাইলে অর্থাৎ খাৎ পুষ্করণী কিম্বা অন্যান্য জলাশয়ে তাহা সঞ্চিত হইতে পারে। ইহাকে পরবর্ত্তী কারণ বলিয়া উল্লেখ করা হয়। বৃষ্টির জল সম্বন্ধে যে প্রকার বিশেষ কারণচতুষ্টয় প্রদর্শিত হইল, সাধন সম্বন্ধেও ঐ প্রকার কারণ-চতুষ্টয়-বলবত্তী দেখা যায়। এই নিমিত্ত উদ্দেশ্য, দেশ, কাল এবং পাত্র বলিয়া চারিটী কারণ কথিত হইয়াছে। এক্ষণে এই উদ্দেশ্য বা মন পূর্ব্ববর্ত্তী কারণস্বরূপ, কাল উদ্দীপক কারণস্বরূপ, দেশ সমবর্ত্তী কারণস্বরূপ এবং পাত্র পরবর্ত্তী কারণ বলিয়া জ্ঞাত

হওয়া যাইতেছে। জলের দৃষ্টান্তে জলীয় বাষ্পকে পূর্ব্ববর্ত্তী কারণ বলা হইয়াছে। জলীয় বাষ্প না থাকিলে শৈত্য আসিলে কাহার উপরে কার্য্য করিবে? মনে উদ্দেশ্যরূপ পূর্ব্ববর্ত্তী কারণ যদ্যপি উপস্থিত না থাকে, তাহা হইলে উদ্দীপক কারণাদি দ্বারা কোন ফল ফলিতে পারে না। অথবা উদ্দেশ্য থাকিলেও কারণবিশেষের দ্বারা তাহা সাধন করিবার প্রতিবন্ধক কিম্বা সহায়তা হইয়া থাকে। এই নিমিত্ত সাধন সম্বন্ধে এই কারণচতুষ্টয়ের দিকে দৃষ্টি না রাখিলে কখন উদ্দেশ্য চরিতার্থ হইতে পারে না।

কার্য্যবিশেষ সম্পন্ন করিতে হইলে কারণবিশেষের প্রয়োজন, সে পক্ষে কাহার মতভেদ হইতে পারে না। যে যে কারণ দ্বারা যে যে কার্য্য সাধন হইবার কথা,সেই সেই কারণগুলি যাহাতে বিকৃত হইয়া না যায়, এরূপ সতর্কভাবে কার্য্য করা বিধেয়। ঈশ্বর সাধনা সম্বন্ধে সেইজন্য বৈর লক্ষণ যুক্ত কারণদিগের কার্য্য হইতে সতর্ক থাকিতে হয়। এক্ষণে বিচার করিয়া দেখা যাইতেছে যে, সত্ত্ব রজঃ এবং তমোগুণের তাৎপর্য্য কি এবং ইহাদের মধ্যে ঈশ্বর সাধনা সম্বন্ধে কাহার সহায়তায় উদ্দেশ্য চরিতার্থ হইবার সম্ভাবনা। কথিত হইয়াছে যে, তমোর কার্য্য তামস ভাবে পরিপূর্ণ। তামস্ ভাব কাহাকে কহে? তামস্ শব্দে অন্ধকার। যেরূপ রজনীর অন্ধকারে আমাদের পরিচিত এবং অপরিচিত কোন বস্তুই বুঝিতে পারি না, অতি পরিচিত ব্যক্তি নিকটে উপস্থিত থাকিলেও পরিচয় ব্যতীত তাহাকে চিনিতে পারা যায় না, এমন কি আপনাকেও আপনি দেখিতে পায় না। অন্ধকারের ধর্ম্মই এই প্রকার। সেইরূপ তমোগুণের আশ্রয়ে আত্মপর বিচার করিবার শক্তি একেবারে বিদূরিত হইয়া যায়, কে আপনার পর কিছুই জানা যায় না, পরকে আপন বলিয়া ভ্রম জন্মায়, আপনি কে, কেমন, তাহারও কোন আভাস

প্রাপ্ত হইবার উপায় থাকে না। অন্ধকারে কোন বস্তু অনুসন্ধান করিলে কোন মতে অভিপ্রেত পদার্থকে সহসা ধরা যায় না। বরং সতত ভ্রমে নিপতিত হইতে হয়। অনেকে অন্ধকারে পদার্থান্তর ভ্রমে কালসর্পের মুখে হস্তার্পণ করিয়া কালগ্রাসে পতিত হইয়াছে। সেইরূপ তমোগুণ বুদ্ধির ভ্রম জন্মাইয়া প্রতিনিয়ত ভীষণ কালের করগত করিয়া নিশ্চিন্ত হয়।

অভিমান বা অহঙ্কাররূপ অন্ধকারে প্রক্ষিপ্ত করা তমোগুণের কার্য্য। তমোগুণে আমি এমন, আমি তেমন, আমার অমুক, আমার তমুক, আমি মতিমান, আমি ধীমান, আমি গুণবান, আমি সব বুঝি ইত্যাকার আমির অভিনয়—অহঙ্কারের অভিনয়—অন্ধকারের অভিনয় —করিতে সর্ব্বদা নিয়োজিত করিয়া রাখে। তমোগুণে কখন কোন প্রকার পদার্থের প্রকৃত অবস্থা অবগত হইতে দেয় না। অন্ধকারে হীরকখণ্ডও যে প্রকার, প্রস্তরখণ্ডও সেইপ্রকার দেখায়; সুন্দর বস্তুও যেপ্রকার, কুৎসিৎ কদাকারও সেই প্রকার দেখায়। অন্ধকারে গুণের বিচার করা যায় না এবং বর্ণের বিচার চলে না। অন্ধকারে চক্ষু থাকিতে অন্ধ,স্পর্শশক্তি থাকিতে অজ্ঞান; অন্ধকারে বিষামৃতের পার্থক্য বোধ বিলুপ্ত হয় এবং মল মূত্র অবাধে স্পর্শ করা যায়। তমোগুণে মনুষ্যদিগকে আত্মহারা করিয়া রাখে। আমরা যেরূপে আমার আমার বলিয়া, আমি আমি করিয়া ঘুরিয়া বেড়াই, আমরা যেরূপ সর্ব্বদা অভি-মানের পরিচয় দিয়া থাকি, তাহা প্রকৃত তমোগুণের কার্য্য।

অশেষবিধ ক্লেশ পাইবার হেতুকে রজোগুণ কহে অর্থাৎ যে যে কার্য্য দ্বারা আমরা ক্লেশপ্রাপ্ত হইয়া থাকি,তাহাকে রজোগুণ বলা যায়। বিদ্যা দ্বারা হউক, ধনের দ্বারা হউক, কিম্বা আত্মীয়াদির দ্বারাই হউক, যে কোন সূত্রে দুঃখানুভব করা যায়, তাহাকেই রজোগুণপ্রসূত কহিতে

হইবে। পণ্ডিত পাণ্ডিত্যের উত্তেজনায় সকল বিষয়ে কটাক্ষ করিতে উদ্যত হইয়া থাকেন, সুতরাং তাঁহাকে সর্ব্বদা বিবাদ বিসম্বাদে লিপ্ত থাকিয়া ক্লেশ পাইতে হয়। এইরূপ ক্লেশ বা অন্তর্দাহ উৎপত্তির কারণ বিদ্যা সুতরাং বিদ্যাকে রজোগুণ বলা যায়। পণ্ডিতদিগের অতি পাণ্ডিত্যের নানাপ্রকার জনশ্রুতি আছে। একদা কোন পণ্ডিত পক্ষীদিগকে গগনমার্গে উড্ডীয়মান দেখিয়া মনে মনে স্থির করিলেন যে, পক্ষীরা পক্ষ দ্বারা যথেচ্ছা উড়িয়া বেড়ায়, আমরা যদ্যপি পক্ষযুক্ত হইতে পারি, তাহা হইলে কিজন্য পক্ষীর মত না উড়িতে পারিব? এই ভাবিয়া তিনি পৃষ্ঠদেশে দুইখানি কাষ্ঠের পাখা বন্ধন পূর্ব্বক উড়িয়া যাইবার জন্য অতি পুলকে উচ্চস্থান হইতে লম্ফ প্রদান করিলেন। অনতিবিলম্বে তিনি ভূ-পৃষ্ঠে আকর্ষিত হইয়া জলাশয়ে পতিত হইলেন এবং মুখ ও নাসিকা দ্বারা পেট ভরিয়া জলপান করিয়া লইলেন।

আর এক সময়ে জনৈক পণ্ডিত উপবনের ভিতর দিয়া গমন করিতেছিলেন, তথায় তাঁহার এক কৃষকের সহিত সাক্ষাৎ হয়। পণ্ডিতকে দেখিয়া সে কহিল, "মহাশয় এদিক দিয়া যাইবেন না, বাঘের ভয় আছে।" পণ্ডিত নানাবিধ ভাবিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "বাপুরে, বাঘ কি শব্দ? বাঘ বলিয়া এমন কোন শব্দ হইতে পারে না। ব্যাঘ্র শব্দ আভিধানিক বটে; ব্যাঘ্র শব্দের অর্থে বিশেষ প্রকার আঘ্রাণ শক্তি-বিশিষ্ট বস্তুকে বুঝায়, তাহাতে ভয় কি বাপু!" সে পথে গমন করিতে কৃষক পুনঃ পুনঃ নিষেধ করিল, কিন্তু পণ্ডিত মহাশয় কিছুতেই শুনিলেন না। কৃষক বিরক্ত হইয়া পণ্ডিতকে লগুড়াঘাত করিয়া বলিল, "আমি তোমায় কখনই যাইতে দিব না, যদ্যপি এখন কথা না শোন, তাহা হইলে তোমার পা দুইটী ভাঙ্গিয়া দিব।" লগুড়াঘাতে পণ্ডিতের মল বাহির হইয়া পড়িল। এতদ্দৃষ্টে তিনি ভাবিলেন যে, লগুড়াঘাতে

শৌচক্রিয়া হইবার সম্ভাবনা নাই, বোধ হয় উহা হরিতকীজষ্টি, তজ্জন্য বিরেচক ধর্ম্মবিশিষ্ট। তৎপরে বলিলেন, "বাপু! যদিও তোমার প্রহারে আমার অস্থি পর্য্যন্ত দ্বিখণ্ড হইবার উপক্রম হইয়াছে, কিন্তু অনেক দিন কোষ্ঠ পরিষ্কার হয় নাই, তুমি আরও দুই চারিবার প্রহার কর, আমায় আর বিরেচক ব্যবহার করিতে হইবে না।" এপ্রকার ক্লেশ পাইবার হেতু পাণ্ডিত্য, সুতরাং ইহাকে রজোগুণ কহা যায়।

ধনের দ্বারা ক্লেশের সীমা থাকে না। ক্লেশ পাওয়া এবং দেওয়া ধনের দ্বারাই সাধিত হইয়া থাকে। ধনী ধনের পরামর্শে অন্যকে নির্ধনী করিতে প্রয়াস পান। দুর্ব্বলেরা এইরূপে ধনের দ্বারা এক দিকে ক্লেশ পায় এবং ধনীদিগকে চিন্তার জ্বরে আক্রান্ত হইয়া সর্ব্বদা জর্জ্জরী-ভূত হইতে হয়। আজ মোকদ্দমা, কাল প্রজার শাসন, পরশ্ব সরিকী বিবাদ, তৎপরদিন ঋণগ্রস্থ হইয়া সর্ব্বস্ব হস্তান্তর হইয়া যাইলে ভিখারীর অবস্থায় নিপতিত হইতে হয়। তখন তাহার সেই দুঃখের কি অবধি থাকে? ধনের গন্ধে দুঃখ উপস্থিত হওয়া ইতিহাসের নূতন ঘটনা নহে। সর্ব্বদেশে, সর্ব্বসময়ে, সকলেই এই কথা বলিয়া আসিতেছেন। ধনের জন্য তস্করের ভয়, ধনের জন্য শত্রুতা, ধনের জন্য জ্ঞাতি বিরোধ, ধনের জন্য রাজার অস্থির হওয়া, ধনের জন্যই পথের ভিখারী হইতে হয়। এই সহরে কত ধনী ছিলেন, তাঁহারা ধনের গৌরবে না করিয়াছেন কি? সতীর সতীত্ব নাশ, বিষয়ীর বিষয় নাশ, দুর্ব্বলকে পীড়ন, ইত্যাকার নানাবিধ কার্য্য করিয়া পরিণামে তাঁহারা যে অবস্থায় পতিত হইয়াছিলেন এবং অদ্যাপি হইতেছেন, তাহা প্রত্যেকের প্রত্যক্ষ ঘটনা।

কথা হইতে পারে যে, ধনের দ্বারা ইচ্ছামত কার্য্য সাধন করিতে পারিলে, সুখের পারাবার সৃজিত হইয়া থাকে এবং সেই উদ্দেশ্যে আমরা

সকলে কামিনীকাঞ্চনকে বিবিধ বিচিত্র প্রকারে ব্যবহার করিয়া থাকি। যদিও ধনের দ্বারা সাময়িক সুখ লাভ করা যায় এবং রজোগুণের তাহাই আকর্ষণবিশেষ বটে, কিন্তু তাহার সহিত দুঃখের জমাখরচ করিলে সুখের ভাগ নাই বলিয়া সাব্যস্থ করিতে হইবে। ধন থাকিলে সুখ হয় না, বরং পদে পদে দুঃখই পাইতে হয়। পিতা মাতার ধন থাকিলে সন্তানেরা উপার্জ্জন করিতে চাহে না এবং প্রয়োজনমত অর্থ না পাইলে নানাপ্রকার অনর্থপাতের সূত্রপাত ঘটাইয়া থাকে। ধন সত্ত্বেও পিতা মাতা দুঃখিত. সন্তানেরাও দুঃখিত। ধনের জন্য খুন হয়, ধনের জন্য লোক অপমানিত হয়. ধনের জন্য পরস্পর বিরোধ জন্মিয়া থাকে। ধনীর পুত্র ধন পাইলে মনে করেন যে,আমি সুখ ভোগের চূড়ান্ত করিয়া যাইব এবং তজ্জন্য বারঙ্গনা গমন, সুরাদি পান ও বিলাসের সীমা করিতে প্রয়াস পাইয়া থাকেন, কিন্তু তাহার ফল কি প্রকার ফলিয়া থাকে, তাহা কে না অবগত আছেন? উপদংশ ও পারদাদির বিষে তাহাদের শরীর একেবারে জন্মের মত অকর্ম্মণ্য হইয়া পড়ে। সুরার উত্তেজনায় যকৃৎ বিকৃত ও ক্রমে শারীরিক বলাধান স্থগিত হইয়া তাহাদিগকে অকালে শমনকিঙ্করের হস্তগত হইতে হয়। ধনীর বন্ধু নাই, ধনীর আপনার কেহ নাই. ধনীর সকলেই শত্রু, সকলেই গলায় ছুরি দিবার সুযোগ অন্বেষণ করিয়া থাকে।

ভৃত্য হইতে গুরু পর্য্যন্ত কেহই ধনীর মুখের দিকে চাহে না। সকলেই তাহাকে প্রবঞ্চনা করিয়া কিছু আত্মসাৎ করিয়া লইবে, ইহাই তাহাদের একমাত্র সঙ্কল্প ও অভিপ্রায়। ধনীর নিকটে কয়জন উদার-চেতা ভদ্র লোক স্থান পায়? ধনীর মন যোগাইয়া মনের মত জল উচু নিচু এবং হাঁ কে না, না কে হাঁ, না করিতে পারিলে কোন ভদ্রলোকের তথায় থাকিবার সাধ্য নাই। যথায় স্বার্থপর ব্যক্তিদিগের সমাবেশ,

তথায় সুখ কোথায় ? তথায় কি সুখসূর্য্য কখন উদিত হইতে পারে ? সুতরাং ধনী হইয়া সুখী হওয়া যায় না।

ধনের দ্বারা যদ্যপি সদনুষ্ঠান করা যায়, তাহা প্রশংসিত হইলে তদ্দ্বারা সমূহ দুঃখ জন্মিয়া থাকে। যদিও সাক্ষাৎ সম্বন্ধে পরোপকার করিলে সুখোদয় হয় এবং প্রাণে তৃপ্তি আসিয়া থাকে, কিন্তু পরিণাম বিচার করিলে দুঃখের অবধি থাকে না।

কোন ধনী ব্যক্তির অতিথিশালা ছিল। তথায় বর্ণবিচার না করিয়া যে কেহ আসিয়া উপস্থিত হইত, সে ইচ্ছানুসারে ভোজন করিতে পাইত। ধনীর এইরূপ দানশীলতায় সকলেই হৃদয় খুলিয়া প্রশংসা করিত এবং তদ্রূপ কার্য্য করা সকলের কর্ত্তব্য বলিয়া সকলেরই ধারণা হইয়া আসিয়াছিল। একদা জনৈক কসাই একটী গাভী খরিদ করিয়া সেই স্থান দিয়া যাইতেছিল। দুই প্রহর বেলায় ক্ষুধা তৃষ্ণায় কাতর হইয়া সে গাভীটীকে গৃহে লইয়া যাইতে অশক্ত হইয়া পড়িল। যখন কোন মতে গাভীটীকে এক পদ অগ্রসর করিতে পারিল না, তখন মনে ভাবিল যে, আমি নিতান্ত ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছি বলিয়া গরুর সহিত আঁটিয়া উঠিতে পারিতেছি না। ভাল কথা স্মরণ হইল, সম্মুখে অতিথিশালা, যে গমন করে, সেই ভোজন করিতে পায়, অতএব ক্ষুধায় আর অধিক ক্লেশ না পাইয়া অতিথি হইয়া ভোজন করিয়া আসিলে, অনায়াসে গরুটী লইয়া যাইতে পারিব। এই ভাবিয়া সে গরুকে একটী বৃক্ষে বন্ধন পূর্ব্বক অতিথিশালা হইতে উদর পূর্ত্তী করিয়া গাভীটীকে নিজ গৃহে লইয়া যাইয়া হনন করিল। গো হত্যা হইবামাত্র চারি আনা পাপ কসাইয়ের হইল এবং বারো আনা ধনীকে যাইয়া আশ্রয় করিল। কারণ তাহার অর্থ বলে কসাই বল পাইয়া সেই বলে গো হত্যা করিল, সুতরাং ধনীই এই গো হত্যার কারণস্বরূপ হইল। অতএব কি অসৎ

কি সৎ কার্য্যে, ধনের সংশ্রব থাকিলে বিশুদ্ধ সুখ কখন হইতে পারে না। যে বস্তুর দ্বারা দুঃখ জন্মে, তাহাকে রজোগুণ কহা যায়।

সত্ত্ব গুণ সুখ প্রদানের একমাত্র হেতুস্বরূপ। ইহার দ্বারা ছয় প্রকারে সুখী হওয়া যায়। ১ম—প্রসন্নতা, ২য়—সন্তোষ, ৩য়—প্রীতি, ৪র্থ—নিঃসংশয় বা নিশ্চিৎ জ্ঞান, ৫ম—ধৃতি অর্থাৎ ধারণা, ৬ষ্ঠ—স্মৃতি অর্থাৎ অনুভূত বিষয় জ্ঞান। যে ছয় প্রকার লক্ষণ কথিত হইল, তাহা বিচার করিয়া দেখিলে মনের উপরে সত্ত্বগুণের কার্য্য লক্ষিত হইতেছে। যদিও তমো এবং রজো গুণের কার্য্যও মনের দ্বারা সাধিত হয়, কিন্তু তাহাকে প্রকৃত মানসিক কার্য্য বলা যায় না। তমো রজোগুণে ইন্দ্রিয়াদি এবং শারীরিক কার্য্য কলাপ লইয়া মনকে সর্ব্বদা ব্যতিব্যস্ত থাকিতে দেখা যায়। কিন্তু সত্ত্বগুণে সেরূপ নহে। বাহ্যিক শারীরিক স্বচ্ছন্দ হইতে মনের স্বতন্ত্র ভাব হওয়া সত্ত্বগুণের অভিপ্রায়। বাহ্য সম্বন্ধ যে পরিমাণে কমিয়া যায়, মনের শক্তি সেই পরিমাণে বৃদ্ধি পাইয়া থাকে। মনের শক্তি বর্দ্ধিত হইলে উল্লিখিত ষড়গুণ প্রকাশ পাইবার প্রকৃত অবস্থা প্রাপ্ত হয়। সত্ত্বের যে কতিপয় ধর্ম্ম উল্লিখিত হইল, তাহা তমো এবং রজো গুণে প্রকাশিত হইতে পারে না। কারণ তমঃপ্রসূত বস্তুতে ভ্রম এবং নিয়ত অজ্ঞানতা জন্মায় বলিয়া আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ হয় না, সুতরাং সন্তোষাদি ভাব একেবারে আসিতে পারে না।

স্বার্থযুক্ত থাকিলে প্রসন্নতা পাইতে পারে না। যাহার মনে স্বার্থ-পরতা অবিচ্ছেদে বিহার করে, সে মন প্রসন্ন হইবে কি রূপে? ভিখারী ভিক্ষা চাহিলে যিনি ভিক্ষা দেন, অথবা কেহ কোন প্রকার অনুগ্রহের কার্য্যপ্রার্থী হইলে যিনি অনুগ্রহ করেন, তিনি নিশ্চয় স্বার্থহীন ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়া থাকেন। যাঁহার যতদূর স্বার্থহীন ভাব জন্মায়, তাঁহার ততদূর প্রসন্নতা শক্তি বর্দ্ধিত হয়।

মনুষ্যের মনে সন্তোষ নাই বলিলে প্রকৃত কথা বলা হয়। সকল বিষয়েই বিমর্ষভাব, মনের সাধ কিছুতেই পূর্ণ হয় না, যতই অভিপ্রেত বস্তু প্রাপ্ত হয়, ততই তাহার অধিক প্রাপ্তির নিমিত্ত বাসনার সঞ্চার হইয়া সর্ব্বদা অসন্তোষের লক্ষণ প্রকাশ পাইয়া থাকে। সন্তোষ আসিলেই বাসনার হ্রাস হয়।

প্রীতি অর্থাৎ তৃপ্তিলাভ করা। ইহা মনের পূর্ণ ভাবের লক্ষণবিশেষ। যতক্ষণ অসম্পূর্ণ থাকে, মন ততক্ষণ কখনই নিশ্চিন্ত হয় না। যখন মনের আকাঙ্ক্ষা মিটিয়া যায়, তখনই তৃপ্তি আসিয়া উপস্থিত হয়। তৃপ্তি না জন্মিলে মনুষ্যের শান্তি আসিতে পারে না। শান্তিই সকলের মনের একমাত্র অভিলাষ।

তমোগুণের দ্বারা ভ্রম বা সন্দেহরাশি উত্থিত করিয়া দেয়, কিন্তু ভ্রম বিদূরিত হইয়া যখন সকল বিষয়ের নিশ্চিৎ জ্ঞান উপস্থিত হয়, তখন তাহাকে সত্বগুণের কার্য্য কহা যায়। যে পর্য্যন্ত কাহারও নিশ্চিৎ জ্ঞান না জন্মে, সে পর্য্যন্ত তাহার মনের অবস্থা সর্ব্বদা পরিবর্ত্তনশীল থাকে। পরিবর্ত্তনশীল মনের অতি ভীষণ অবস্থা।

নিশ্চিৎ জ্ঞান জন্মিলে মনের তৎসাময়িক অবস্থাকে ধৃতি কহা যায়। ধৃতি অর্থে ধারণা, যখন কোন বিষয়ের তাৎপর্য্য বিশিষ্টরূপে অবগত হওয়া যায়, তখন সেই বিষয় ধারণা হইবার সম্ভাবনা। যে বস্তু মনে একবার ধারণা হইয়া যায়, তাহা আর কখন বিস্মৃতির গর্ভে প্রবেশ করিতে পারে না। মনের এই ভাবকে স্মৃতি কহে।

ঈশ্বর সাধনায় মানসিক কার্য্যেরই প্রয়োজন। মনের শক্তি যত বর্দ্ধিত হয়, ঐশ্বরিক বিষয় ধারণা করিতে ততই সামর্থলাভ করে। ভাব ধারণা করিতে না পারিলে সাধনার দ্বারা কোন ফল ফলিতে পারে না। এই জন্য সত্বগুণাবলম্বন ব্যতীত সাধনার কার্য্য কখন সুসম্পন্ন হইবার নহে।

রজো এবং তমো গুণের যে প্রকার কার্য্য কথিত হইয়াছে, তদ্দ্বারা মানসিক শক্তি বৃদ্ধি না হইয়া উহা একেবারে দুর্ব্বলাবস্থার এক প্রান্তে যাইয়া পতিত হয় এবং নানাবিধ আবর্জ্জনায় পরিপূর্ণ হইয়া থাকে। যেমন কোন স্থান শূন্য থাকিতে পারে না। অন্য কোন বস্তু পাত্রে না রাখিলে বায়ু তাহা অধিকার করিয়া রাখে, সেইরূপ মন শূন্য থাকিতে পারে না। যে স্থানে বাস করা যায়, সেই স্থানের স্থানিক ভাব যাইয়া উহাকে আশ্রয় করে। যদ্যপি তমোগুণপ্রধান দেশে বাস করা যায়, মনে তমোগুণই প্রবেশ করে, রজোগুণ বা সত্ত্বগুণ হইলে তাহারাই মনে অধিকৃত হইয়া থাকে।

বাল্যকাল হইতে এইরূপে স্থানিক কারণে মন গুণবিশেষ কর্ত্তৃক আক্রান্ত হইয়া কালসহকারে নিজ ভাবে সকলকে পরিচালিত করিয়া থাকে এবং যে কেহ সেই সমাজে উপস্থিত হন, তাঁহার মনেও ঐরূপ ভাবের ছায়া পতিত হইয়া ক্রমে ভাবান্তর সংঘটিত করিয়া দেয়। এই জন্য সাধন বিষয়ে মনোনিবেশ করিতে হইলে দেশের ধর্ম্ম লক্ষ্য করা বিধেয়।

গুণত্রয় সম্বন্ধে যাহা সংক্ষেপে কথিত হইল, তাহার দ্বারা স্পষ্ট দেখা যাইতেছে যে, তমো এবং রজোগুণের কার্য্য অতি সহজ এবং সত্ত্বের কার্য্য নিতান্ত কঠিন, কিন্তু প্রকৃত পক্ষে তাহা নহে। তমো এবং রজোগুণপ্রধান দেশে আমাদের বাস এবং সেই অবস্থাপন্ন নর নারী হইতে আমাদের জন্ম, সুতরাং এই গুণদ্বয় স্বভাবসিদ্ধ। দেশ শব্দে স্থান এবং নর নারী বলিয়া যাহা উল্লেখ করিয়াছি, তাহার কারণ এক্ষণে অবগত হওয়া যাইবে। রজো তমোগুণের আশ্রয়ে আমরা বাস করি, এস্থানে সত্ত্বগুণ নিতান্ত বিদেশী। সুতরাং তাহার পথ সহসা প্রকাশ পাওয়া কথনই সহজ নহে।

সংসার সংগঠন করা তমোর কার্য্য, তমোর কার্য্যই ভ্রম, সুতরাং সংসারও ভ্রম। এই ভ্রমে পতিত হইয়া আমরা দিন যাপন করিয়া যাইতেছি। সংসার সংগঠন করিয়া তাহাকেই শান্তিনিকেতন জ্ঞান-পূর্ব্বক তাহার পুষ্টিসাধন করিবার নিমিত্ত রজোগুণের আশ্রয় গ্রহণ করিয়া থাকি। প্রত্যেক দেশের ও প্রত্যেক সমাজের এই অবস্থা। রজোগুণের কার্য্য দুঃখ, তাহাও আমরা বিধিমতে পাইয়া থাকি। কিন্তু অভ্যাস অতি চমৎকার বস্তু। ক্লেশ পাওয়া অভ্যস্ত হইলে তাহা আর স্মরণ থাকে না। ক্লেশ পাওয়া যেন আমাদের জীবনের ব্রতবিশেষ এবং প্রত্যেকের অবশ্য কর্ত্তব্য কর্ম্ম বলিয়া ধারণা হইয়া গিয়াছে, সুতরাং তাহাই স্মরণ হইয়া থাকে। রজো তমোর অধিকৃত নরনারী-দিগের উদ্দেশ্য ক্লেশ ও ভ্রমসঙ্কুল কার্য্যকলাপ এবং তাহারই সাধনায় সকলে ব্যাপৃত থাকিতে বাধ্য হইয়া থাকে। যদ্যপি মনে রজঃ এবং তমোভাব পরিপূর্ণ করিয়া রাখা যায়, তাহা হইলে তথায় সত্ত্ব কোন মতে স্থান পাইতে পারে না। এই নিমিত্ত সাধন শিক্ষা দিবার সময় দেশ বিচার করা বিশেষ কর্ত্তব্য।

সকল পদার্থেরই যেমন স্বতন্ত্র ধর্ম্ম বা গুণ দেখিতে পাওয়া যায়, দেশেরও সেইরূপ গুণ আছে। গৈরিক পরিধান করিলে, বনের বৃক্ষের তলে একাকী বসিয়া থাকিলে যে প্রকার ভাবের উদ্রেক হয়, অট্টালিকায় কামিনীকাঞ্চনবেষ্টিত হইয়া থাকিলে কি সেইরূপ ভাবের কার্য্য হইতে পারে? বৃক্ষের গলিত ফল এবং অঞ্জলি পূরিয়া প্রস্রবণের জলপান করিলে যে ভাব লাভ হয়, পশু হনন করিয়া চর্ব্বচূষ্যলেহ্যপেয় দ্বারা রসনার তৃপ্তিসাধন করিলে কি সেইরূপ ভাব হইতে পারে? শ্যামাম্বরা প্রকৃতির ক্রোড়ে শয়ন করিয়া তাঁহার বাক্যসুধা শ্রবন করিলে যে সুখ হয়, দিগম্বরা প্রকৃতির হৃদয়ে বিশ্রাম লইয়া তাঁহার

বদন বিনিঃসৃত বাণীর দ্বারা কি সেইরূপ সুখোদয় হইবার কথা? কখন নহে। প্রত্যেক পদার্থের স্বতন্ত্র ধর্ম্ম, সেই পদার্থবিশেষের আশ্রয়ে তদ্রূপ ধর্ম্ম লাভ করিতে সকলেই বাধ্য, ইহা প্রকৃতির অপরিবর্ত্তনীয় নিয়ম। শীতে শৈত্য জ্ঞান, গ্রীষ্মে উষ্ণতানুভব না করিয়া কে তাহার বিপরীত ধর্ম্ম অনুভব করিবে? সেইরূপ স্থানিক ধর্ম্ম অতিক্রম করিয়া যাইবার কাহার অধিকার নাই।

ঈশ্বর সাধনার উদ্দেশ্য ঈশ্বর হওয়া উচিত। এই উদ্দেশ্য চরিতার্থ করিতে হইলে যে কার্য্য করা যায়, তাহাকে সাধন বলে। যে কারণ-চতুষ্টয় পূর্ব্বে উল্লেখ করিয়াছি, তাহার প্রতি দৃষ্টি না রাখিলে উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইতে পারে না। ঈশ্বর উদ্দেশ্য হইলেই যে ঈশ্বর লাভ হয়, তাহা নহে। উদ্দীপক কারণ প্রয়োজন। উদ্দীপক কারণ দুইপ্রকার। একভাবে কার্য্য সিদ্ধি হওয়া, আর একভাবে সংশয় রূপ আবর্জ্জনা লাভ করা। যেমন, কাহারও মনে ঈশ্বর দর্শন করিবার নিমিত্ত বাসনা জন্মিয়াছে, এ ব্যক্তির উদ্দেশ্য ঈশ্বর লাভ করা; উহাকে পূর্ব্ববর্ত্তী কারণস্বরূপ কহা যায়। উদ্দীপক কারণস্বরূপ কোন বিশ্বাসীর সহিত সাক্ষাৎ হইলে তাঁহার ভাব পুষ্টিলাভ করিয়া থাকে। কিন্তু এই ব্যক্তি যদ্যপি অবিশ্বাসী হন, তাহা হইলে তাঁহার অবিশ্বাস রূপ অন্ধকার যাইয়া সেই ব্যক্তির উদ্দেশ্যকে আবৃত করিয়া ফেলে। অতএব উদ্দীপক কারণের প্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখিতে হয়। সমবর্ত্তী ও পরবর্ত্তী কারণ দুইটীও উপেক্ষার কথা নহে। বিশ্বাসীর কথায় যদিও উদ্দেশ্য সাধন পক্ষে সহায়তা লাভ হয় এবং সেই মুহূর্ত্তে যদ্যপি পুনরায় অন্যান্য বিশ্বাসীর সহিত সাক্ষাৎ হয়, তাহা হইলে তাঁহার বিশেষ সহায়তা হইয়া থাকে এবং ঐ অবস্থার শেষ পর্য্যন্ত অর্থাৎ যাবৎ প্রকৃত পক্ষে ধারণা না হইয়া যায় সে পর্য্যন্ত কোনপ্রকার ব্যতিক্রম না ঘটে, তাহা হইলে

উদ্দেশ্য সাধন হইবার আর কখন প্রতিবন্ধক জন্মিতে পারে না ; কিন্তু কারণের ভাবান্তর হইলে কার্য্যের রূপান্তর ঘটিবার সম্পূর্ণ সম্ভাবনা। রামকৃষ্ণদেব এইজন্য বলিতেন যে, চারা গাছ পুঁতিলে ছাগল গরুর অত্যাচার হইতে রক্ষা করিবার জন্য উহাকে বেড়া দিয়া রাখিতে হয়। সে সময়ে যদ্যপি ছাগল গরুতে পাতা কিম্বা তরুণ শাখাগুলি খাইয়া ফেলে, তাহা হইলে গাছটী বাড়িতে পারে না। যদ্যপি গাছটীকে কিয়দ্দিন ছাগল গরু হইতে রক্ষা করা যায়, তাহা হইলে উহা বৃক্ষে পরিণত হইতে পারে। সেই সময়ে আর বেড়ার প্রয়োজন থাকে না, তখন আর ছাগল গরুর ভয়ও থাকে না, এমন কি সেই বৃক্ষে হাতীকেও বাধিয়া রাখা যাইতে পারে। সেইরূপ মনের উদ্দেশ্য সাধন করিতে হইলে যাহার দ্বারা তাহা নষ্ট হইবার সম্ভাবনা, তাহা হইতে অতি সাবধানে থাকিতে হইবে।

ঈশ্বর সাধনায় শারীরিক সুখ দুঃখের দিকে দৃষ্টি রাখিলে ঐশ্বরিক ভাব বা উদ্দেশ্য বিচ্ছিন্ন হইয়া যায়, সুতরাং যে কার্য্যের বিপরীত ফল ফলিয়া থাকে। অতএব ঈশ্বর সাধনায় প্রবৃত্ত হইতে হইলে উদ্দেশ্য স্থির করিয়া তবে সাধনার নিমিত্ত সত্ত্বগুণাশ্রয় করা সকলের বিধেয়।

সত্ত্বগুণ অবলম্বন করিয়া সর্ব্বপ্রথমে তাহারই সাধন করিতে হয়। যেহেতু, সকলেই তমো এবং রজোগুণের দ্বারা সৃজিত এবং সংসারে তাহারই ভাবে শরীর এবং মন সংগঠিত হইয়া গিয়াছে। যেমন, পাত্রবিশেষে পদার্থবিশেষ রাখিতে হইলে পূর্ব্বরক্ষিত পদার্থকে ফেলিয়া দিতে হয়, সেইরূপ মনের পূর্ব্ব সংস্কাররূপ তমো এবং রজঃ মিশ্রিত ভাবাদি পরিত্যাগ পূর্ব্বক সাত্ত্বিক ভাব সংস্থাপন করিতে হয়। সাত্ত্বিক ভাব উপার্জ্জন করা সাধনের প্রথম সোপান ; এই অবস্থায় সাধনযুক্ত ব্যক্তিকে প্রবর্ত্তসাধক কহে।

গুণত্রয়ের ধর্ম্ম বিচার কালে কথিত হইয়াছে যে, তমো এবং রজোগুণ দৈহিক ও মানসিক শক্তির হ্রাসতা জন্মাইবার কারণবিশেষ। তমোগুণে প্রকৃত বস্তুকে বিপরীত বুঝায় এবং রজঃ অযথা অশেষবিধ ক্লেশোৎপাদনের নিদানস্বরূপ হইয়া নিতান্ত অকর্ম্মণ্য করিয়া ফেলে। অবিশ্বাসী করা তমোর কার্য্য। যে অবিশ্বাসী, সে সর্ব্বদা অন্ধকারে বাস করে, দেখিবে কি? বুঝিবে কি? তাহার পক্ষে ভাল মন্দ বিচার চলে না। জন্মান্ধের কি কখন বর্ণ জ্ঞান হয়, না তাহার কখন সৌন্দর্য্যের ভেদাভেদ বোধ হইবার সম্ভাবনা? রজোর দ্বারা শরীর ও মন দিন দিন দুর্ব্বল হইয়া পড়ে, সুতরাং মনের ধারণা এবং ইন্দ্রিয়াদির কার্য্যকরী শক্তি না থাকায়, রজোগুণবিশিষ্ট ব্যক্তিরা ঐশ্বরিক সাধন কার্য্য করিতে নিতান্ত অসমর্থ। এই নিমিত্ত পুরাকালে জীবনের প্রথমাবস্থায় ব্রহ্মচর্য্যাশ্রমী হইবার ব্যবস্থা ছিল। ব্রহ্মচর্য্যের উদ্দেশ্য ব্রহ্মবিদ্যা উপার্জ্জন করা। এই অবস্থায় সমুদয় কার্য্য সত্ত্বগুণে পরিপূর্ণ ছিল, রজোতমোর লেশ মাত্র স্পর্শ করিতে পারিত না। তমোরাশির বিনাশের একমাত্র উপায় জ্ঞানালোক। শ্রীগুরুর পাদপদ্মরূপ জ্ঞানসূর্য্য জ্ঞানোদয়ের প্রারম্ভে উদিত হইয়া মানসাকাশে বিরাজ করিতেন, সুতরাং তথায় আর অন্ধকার কখন স্থান পাইত না। জ্ঞানোপার্জ্জনের সময় কামিনীকাঞ্চনের সংশ্রবরূপ রজোগুণ একেবারে প্রবেশ পাইত না, সুতরাং সে সময়ে শরীর এবং মনের অযথা কার্য্য হইয়া দুঃখসাগরে নিমগ্ন হইবার কোন আশঙ্কা ছিল না। কামিনীর দ্বারা মন দুর্ব্বল হয়, একথা বার বার বলা হইয়াছে এবং সেকথা কামিনীসংযুক্ত ব্যক্তি মাত্রেই বিলক্ষণ জানেন। কামিনী কর্ত্তৃক অধোরেতা হইতে হয়, অধোরেতা বা বীর্য্যহীন হইলে ক্রমে মস্তিষ্ক এবং সর্ব্বশরীর হীনবীর্য্য হইয়া আইসে। যদ্যপি মস্তিষ্ক দুর্ব্বল হয়, তাহা হইলে মনের বলও

কমিয়া আইসে, যেহেতু মস্তিকই জ্ঞানের আধার। মস্তিষ্কের কার্য্যকেই মন কহে। মস্তিষ্ক সবল না হইলে কোন বিষয় ধারণা হয় না, ধারণা হওয়া দূরে থাক্, কোন বিষয়ের তাৎপর্য্য বোধ জন্মে না এবং জ্ঞানগর্ভ ভাব একেবারে প্রবেশ করিতে পারে না। মস্তিষ্কের ধারণাশক্তি না জন্মিলে ব্রহ্মজ্ঞান এবং ভগবৎ ভাবাদি ধারণা হইতে পারে না. ঐশ্বরিক জ্ঞান ধারণা না হইলে তাহার সাধন করিবে কে? এই নিমিত্ত মনের ধারণাশক্তি প্রাপ্ত হইবার নিমিত্ত ব্রহ্মচারী গুরুর আশ্রমে বসতি করিতেন।

বীর্য্যহীন এবং অর্থোপার্জ্জন ও তাহার ব্যবহারাদি করিতে হইলে, মস্তিষ্ক দুর্ব্বল হইবার বিশেষ কারণ বলিয়া বর্ণিত হইল বটে, কিন্তু তদ্‌ব্যতীত নানাপ্রকার আনুষঙ্গিক কারণও দেখিতে পাওয়া যায়। ব্রহ্মচারীর পরিচ্ছদ, ভোজন, বাসস্থান এবং সমভিব্যাহারী প্রভৃতি জীবনযাত্রা নির্ব্বাহের ভিন্ন ভিন্ন অবস্থা বিচার করিলে কি বুঝা যায়? কামিনীকাঞ্চনে যেমন মনকে দুর্ব্বল করিয়া থাকে, আনুষঙ্গিক কারণ-গুলিও তেমনি উহাকে স্থানচ্যুত করিয়া দেয়। মন স্বস্থানচ্যুত হইলে স্বকার্য্য ও বিস্মৃত হয়, সুতরাং জ্ঞানরূপ ধারণা হইতে পরিভ্রষ্ট হওয়ায় স্মৃতিশক্তি বিলুপ্ত হইয়া যায়। এই নিমিত্ত বেশভূষা,আহারাদি, বাসস্থান এবং বন্ধু বান্ধব প্রভৃতি রজোগুণের হেতুবিশেষ বলিয়া উল্লিখিত হইয়া থাকে। সত্বগুণ রক্ষা বা উপার্জ্জন করিবার নিমিত্ত ব্রহ্মচারী সামান্য বসন, গুরুগৃহে বাস, হবিষ্যান্ন ভোজন এবং জ্ঞানানুসন্ধায়ীদিগের সহিত আলাপ করিতেন। এইরূপ ভাবে অবস্থিতি করিবার হেতু কি? মূল্যবান পরিচ্ছদ পরিধান করিলে মনে অহঙ্কার জন্মায় এবং পরিচ্ছদের দিকেই মন একেবারে আকৃষ্ট হইয়া থাকে। কাহাকে নিকট দিয়া যাইতে দেখিলে, সে তাহার পরিচ্ছদ দেখিতেছে কি না,

এক মনে তাহা লক্ষ্য করিয়া থাকে। পার্শ্ব দিয়া মলিনবেশে কেহ গমন করিলে আপনি সরিয়া দাড়ায় এবং অবজ্ঞাসূচক বাক্যে তাহাকে সরিয়া যাইতে বলে। পরিচ্ছদের আকর্ষণে মন অভিভূত হয় বলিয়া লোকালয়ে গমন কালে বস্ত্রাদির ব্যবস্থা করিতে হয়। বেশভূষায় মনকে কিরূপভাবে পরিবর্ত্তিত করিয়া ফেলে, তাহার একটী সামান্য দৃষ্টান্ত দিতেছি। যদিও এ দৃষ্টান্ত অন্যস্থানে দেখিতে যাইবার প্রয়োজন হয় না, আমরা আপনারাই তাহার চড়ান্ত দৃষ্টান্ত; তথাপি সে ঘটনাটীর ভিতরে কিঞ্চিৎ রহস্য আছে। একদা কোনস্থানে সখের সঙ্গীত হইতেছিল। একজন গায়ক ক্রমাগত লোকের দিকে অনামিকা অঙ্গুলীটী বার বার দেখাইয়া তান ধরিতেছিল। গায়কের এইরূপ অদ্ভুত ভাব দেখিয়া সকলেই অঙ্গুলীর দিকে দৃষ্টিপাত করিতে বাধ্য হইল। অঙ্গুলীতে অসাধারণ লক্ষণ দেখা যায় নাই, তবে তাহাতে একটী নূতন সিল আংটি ছিল। আমরাও সকলে ঐরূপ ভাবে নব নব বস্ত্রাদি, চেন, অঙ্গুরী, এসেন্স, চুলে টেরি কাটা প্রভৃতি নানা ঢংএ সর্ব্বদা মদগর্ব্বে গর্ব্বিত হইয়া ভ্রমণ করিয়া থাকি। এ অবস্থায় মন অন্য কোন স্থানে থাকে কি না, তাহা আপনাকে আপনি দেখিলেই বুঝা যাইবে। সত্ত্বগুণে মনকে একস্থানে রাখিবার কথা, একভাবে তাহাকে কার্য্য করাইবার অভিপ্রায়, নিজ বাসস্থান হইতে বস্ত্রে, জুতায়, অঙ্গুরীতে বাহির করিয়া দিবার একেবারেই উদ্দেশ্য নহে; এই নিমিত্ত ব্রহ্মচারী সামান্য বসনাদি পরিধান করিতেন।

পরিচ্ছদ অপেক্ষা ভোজনের দ্বারা বিশিষ্টরূপে মানসিক এবং শারীরিক পরিবর্ত্তন সংঘটিত হইয়া থাকে। পরিচ্ছদে মনের সাময়িক পরিবর্ত্তন হয়, কিন্তু ভোজনে তাহা চিরস্থায়ী হইয়া থাকে।

হিংসা, লোভ প্রভৃতি মানসিক বৃত্তিগুলি রজোগুণের দ্বারা নিকৃষ্ট

ভাবে নিয়োজিত হয়; সত্বগুণে সেরূপ করিতে দেয় না। তাহার কারণ এই যে, রজোগুণের আহার মৎস্য, মাংস, মদ ইত্যাদি; সত্বে তাহার বিপরীত। মৎস্য মাংসাদি দ্বারা হিংসা বৃত্তির উত্তেজনা হইয়া থাকে। এই হিংসা বৃত্তি দুই ভাবে জন্মে। যেমন, নিজের অবস্থা উন্নত করিবার উদ্দেশ্যে ধন অপহরণ করা, জীব হিংসা দ্বারা শরীরের বলাধান করাও তদ্রূপ। ব্রহ্ম-শক্তি বক্তৃতায় বলিয়াছিলাম যে, সূর্য্য হইতে বলের উৎপত্তি হইয়া বৃক্ষরাজির দ্বারা জীব জন্তুতে সমাগত হয় এবং তাহাতে সঞ্চিত হইয়া থাকে। জীব জন্তু ভক্ষণ করিলে সেই বল শরীরের মধ্যে সঞ্চারিত হইয়া আমাদিগকে বলিষ্ঠ করে। এইরূপ বল-পূর্ব্বক বলাপহরণ করা হিংসা এবং লোভের কার্য্য, সুতরাং মাংসাদি আহার করিলে হিংসাদি ভাবের উত্তেজনা হইয়া থাকে।

হিংসার দ্বিতীয় ভাব এই যে, যখন কোন জীব জন্তু হনন করা যায়, তখন তাহার মনে প্রতিহিংসা জন্মায়। প্রতিহিংসার বিরাম হইবার পূর্ব্বে তাহার মৃত্যু হয়, সুতরাং সেই ভাব তাহার সর্ব্ব শরীরে পরিব্যাপ্ত হইয়া থাকে। যে কেহ সেই মাংস ভক্ষণ করে, তাহার শরীরে বলসঞ্চারের সহিত প্রতিহিংসাও সঞ্চারিত হয়। যাঁহারা ইচ্ছাপূর্ব্বক পশু হনন করিয়া মাংস ভক্ষণ করেন, তাঁহাদের দেহে হিংসা এবং প্রতি-হিংসা জন্মিয়া থাকে, এবং যাঁহারা বাজার হইতে মাংস ক্রয় করিয়া ভক্ষণ করেন, তাঁহাদের প্রতিহিংসার ভাব লাভ করা অনিবার্য্য। সুরাদিপান করিলে মনের যে কি প্রকার পরিবর্ত্তন সংঘটিত হয়, তাহা আমরা প্রতি পলকে দেখিতেছি। সুরা সেবন দ্বারা মনের কার্য্য বিপর্য্যয় ঘটে, তাহার অবস্থান্তর হয় এবং নরাকারে পিশাচবৎ করিয়া তুলে।

যদ্যপি সুরাদিপান এবং মাংসাদি ভক্ষণ না করিয়া উদ্ভিজ্জাদি ও

অন্যান্য মিষ্টান্ন সামগ্রীর দ্বারা চাতুর্ব্বিধান্ন প্রস্তুত করণ পূর্ব্বক ভোজন করা যায়, তাহাকে বিশুদ্ধ রাজসিক ভোজন কহে। এরূপ ভোজন দ্বারা পাকাশয় অতি পরিপূর্ণ হইয়া থাকে। পাকাশয় অতিশয় পূর্ণ হইলে, শ্বাসক্রিয়া দ্রুতগামী হয় এবং তজ্জনিত মনশ্চাঞ্চল্য ঘটিয়া থাকে। সুতরাং রাজসিক ও তামসিক আহার সাধনপক্ষে এককালে নিষিদ্ধ। এই নিমিত্ত ব্রহ্মচারী এক সন্ধ্যা হবিষ্যান্ন ভোজন করিয়া মনের স্থৈর্য্যবিধান করিতেন।

বাসস্থান সম্বন্ধে অনেক কথা। ব্রহ্মচারী গুরুগৃহে বাস করিতেন। পিতামাতা ভাই ভগ্নী প্রভৃতি পরিজন পরিবেষ্টিত না থাকিয়া গুরুর আবাসে ক্লেশকর অবস্থায় অবস্থিতি করিতেন কেন? পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, সংসার তমঃ এবং রজোগুণের যৌগিক স্থান। তথায় বাস করিলে মনের উপরে তাহাদের ছায়া নিপতিত হইয়া মনকে বিকৃত করিয়া দেয়। যদিও কথাটা প্রথমে আমাদের কর্ণে অতিশয় কটু বলিয়া বোধ হয় যে, পিতা মাতা ভাই ভগ্নী প্রতিবাসীর ভাব সর্ব্বাগ্রে মনের ভিতরে প্রবিষ্ট হইতে না দিয়া মনকে তত্ত্বজ্ঞান লাভ করিবার উপযুক্ত হইতে দেওয়া কর্ত্তব্য। কিন্তু মনের অবস্থা বিচার করিয়া দেখিলে উহাকে সাধনের বিরুদ্ধভাব বলিতে সকলেই বাধ্য হইবে; কারণ একবার এইরূপ সাংসারিক অর্থাৎ রাজসিক ও তামসিকভাব নব মনের ধারণা হইয়া যাইলে সে সংস্কার হইতে তাহাকে আর কখন পরিমুক্ত করা যায় না, সুতরাং সত্ত্ব ভাবাবলম্বন করিতে অনেক সময়ে একেবারেই অশক্ত হইয়া পড়ে। ঈশ্বর সাধনার উদ্দেশ্য বিচার করিলে সাংসারিক ভাব শিক্ষা করা কাহার ইচ্ছা নহে। যেমন প্রভু বলিতেন যে, যদ্যপি কাহাকে পশ্চিম দিকে যাইতে হয়, তাঁহাকে পূর্ব্বদিকের সম্বন্ধ ত্যাগ করিতেই হইবে। যে কয়েক পদ পশ্চিমদিকে অগ্রসর হইবে, সেই পরি-

মাণে তাহার পূর্ব্বদিক পশ্চাৎ পড়িয়া যাইবে। যাঁহার মন হইতে যে পরিমাণে রজঃ তমোভাব বহির্গত হইয়া যাইবে, অথবা প্রবেশ করিতে না পারিবে, তাহার মনে সেই পরিমাণে সত্ত্বগুণ ধারণা করিবার স্থান হইবে। এই নিমিত্ত আর্য্যেরা বাল্যকালে রজঃ তমোভাব হইতে রক্ষা পাইবার নিমিত্ত আচার্য্যাশ্রমে অবস্থিতি করিতেন।

নিঃসঙ্গ হইতে পারিলে কথাই নাই, কিন্তু তাহা ঘটিয়া উঠা বাস্তবিক অসম্ভব। কিন্তু প্রথমাবস্থায় সমভাবালম্বীদিগের সহিত সঙ্গ করিলে অকল্যাণ অপেক্ষা উপকার হইবার সম্ভাবনা। যাঁহারা সত্ত্বগুণের আশ্রয় লইয়াছেন, তাঁহাদের উদ্দেশ্য এক প্রকার, সুতরাং কার্য্যও এক প্রকার হইয়া থাকে। সাংসারিক সঙ্গীদিগের উদ্দেশ্য স্বতন্ত্র প্রকার, সুতরাং কার্য্যও স্বতন্ত্র প্রকার। যাঁহারা সাংসারিক সম্বন্ধে অবস্থিতি করিয়া সত্ত্বগুণ আশ্রয় করিতে চাহেন, তাঁহরা সকলের বিরাগ ভাজন হইয়া থাকেন। সাংসারিক বন্ধুবান্ধবেরা আপনভাবে টানিতে থাকেন, আপনভাবে শিক্ষিত করিতে চাহেন, আপনভাবে জীবন সংগঠন করিতে প্রবৃত্তি জন্মাইবার জন্য প্রাণপণে চেষ্টা করিয়া থাকেন; সাংসারিক বন্ধুদিগের উদ্দেশ্য রজঃ তমোভাব, সত্ত্বগুণকে স্থান দিবেন কেন? তাঁহারা তমোগুণে আত্মহারা হইয়া প্রতি পদে পদে যে ভ্রমে পতিত হইতেছেন, তাহা গুণের ঘোরে তাঁহাদিগকে বুঝিতে দেয় না, দেখিতে দেয় না, সুতরাং তাঁহাদের অগোচরে আত্মছলনা ব্যতীত আর কিছুই হয় না, তজ্জন্য সত্ত্বের মোহনমূরতি সমীপে পতিত হইলেও তাহাকে কদাকার দেখায়। একদিন কোনস্থানে কয়েকজন ডোম সুরাপান করিতেছিল, এমন সময়ে একজন বলিয়া উঠিল যে, "এখানে আর কোন ইতর জাতি নাই, সকলেই ডোম, আইস, আমরা পরস্পর বিচার করিয়া দেখি যে, ডোম জাতি সকল জাতি অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ কি

না? আমার বিশ্বাস এই যে, যত জাতি আছে, সকলই ছোট জাতির অন্তর্গত। তবে বামুন জাতি সম্বন্ধে একটা কথা হইতে পারে। এক্ষণে বামুন জাতি বড় কি ডোম জাতি বড়?" অমনি সকলে মস্তক নাড়িয়া বলিয়া উঠিল, "বেশ ভাই, বেশ্ বলিয়াছিস্। বিচার করিয়া দেখ কে বড়?" অমনি একজন বলিল, "ইহার আবার বিচার কি? বামুন ডোম এই কথা দুইটা তুলনা করিয়া দেখিলেই হয়, যে ডোম বড় কি বামুন বড়। দেখনা বামুন বলিলে কি কথার জোর হয় কিন্তু ডোম বলিলে বামুন কথা ছাপাইয়া উঠে।" ডোমেরা যেমন মদের ঝোঁকে বামুনকে ডোমের নিম্নে স্থির করিল, রাজসিক তামসিক ভাবে যাহারা ডোম হইয়া বসিয়া আছেন, তাঁহাদের চক্ষে কি সত্ত্বগুণ গণনায় স্থান পায়? এই নিমিত্ত ব্রহ্মচর্য্যাবস্থায় এরূপ সঙ্গ দুঃসঙ্গ বলিয়া স্বতন্ত্র ভাবে অবস্থিতি করিবার ব্যবস্থা ছিল।

যাঁহাকে ঈশ্বর সাধন করিতে হইবে, ঈশ্বর লাভ করা যাঁহার উদ্দেশ্য হইবে, তাঁহাকে অবশ্যই সত্ত্বগুণ আশ্রয় করিতে হইবে এবং এই অবস্থা সম্যকরূপে আয়ত্ত হইলে তবে তিনি সাধনার দ্বিতীয় সোপানে আরোহন করিবার অধিকারী হইবেন। তাঁহাকে এই কথা স্মরণ রাখিতে হইবে যে, সত্ত্বগুণের কার্য্য করিতে পারিলেই যে সকল সাধন সমাধা হইয়া যায়, তাহা নহে। হবিষ্যান্ন খাইলে, কিম্বা সংযমী হইলে, অথবা সাংসারিক সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন করিতে পারিলেই যে উদ্দেশ্য সাধন হইয়া যায়, সাধন সমাপন হইয়া আইসে, তাহা নহে। যেমন কাহাকেও নিমন্ত্রন করিয়া বাটীতে আনয়ন করিতে হইলে তাঁহার বসিবার স্থান প্রস্তুত করিতে হয়, তেমনি ভগবান্‌কে লাভ করিতে হইলে তাঁহার বসিবার উপযুক্ত স্থান প্রয়োজন। রজঃ তমোভাবরূপ আবর্জ্জনাবিশিষ্ট মনে কখন ভগবান্ বসিতে পারেন না। যদিও সূর্য্য সমভাবে সকল স্থানে রশ্মি বিকীর্ণ

করেন, কিন্তু মৃত্তিকায় তাঁহার প্রতিবিম্ব দেখা যায় না, প্রস্তরে তাঁহাকে ধরা যায় না, স্বচ্ছ পদার্থের প্রয়োজন হইয়া থাকে। আমরা দেখিতে পাই যে, জলে কর্দ্দম মিশ্রিত থাকিলে তন্মধ্যে সূর্য্য দেখা যায় না, কিন্তু উহা কর্দ্দমবিহীন হইলে বিনা প্রয়াসে সূর্য্য দেখা যায়। রজঃ তমো বিমিশ্রিত মনের অবস্থাও সেই প্রকার।

ঈশ্বর সাধনার নিমিত্ত সত্ত্বগুণাবলম্বন করা বিধেয় বলিয়া কথিত হয় এবং সেই প্রথানুসারে সাধকেরা পরিচালিত হইতে বাধ্য হইয়া থাকেন। যাঁহারা ঈশ্বর দর্শনাভিলাষী, অথবা যাঁহারা নির্ব্বাণাদি মুক্তির প্রার্থী, তাঁহাদিগকে সত্ত্বগুণও অতিক্রম করিয়া যাইতে হয়; রামকৃষ্ণদেব এই অবস্থাকে গুণাতীত বা শুদ্ধসত্ত্ব কহিতেন। তিনি বলিতেন যে, গুণত্রয় তিন সহোদরবিশেষ। তাহারা প্রকৃতির তিন পুত্র। একজন থাকিলে আর একজন আসিলেও আসিতে পারে; এই নিমিত্ত সত্ত্বগুণের অধিকারে অবস্থিতি করিলেও নিস্তার নাই। তিন গুণের হস্ত হইতে বিমুক্ত হইতে না পারিলে বাস্তবিক সাধকেরা অব্যাহতি পায় না। এই নিমিত্ত সত্ত্বগুণী ঋষি মুনির রজঃ তমোভাবের নানাবিধ উপাখ্যান প্রচলিত আছে।

সত্ত্ব, রজঃ এবং তমঃ তিন সহোদর, উহারা মায়াশক্তির গর্ভজাত বলিয়া উল্লিখিত আছে। মায়াশক্তির দ্বারা মায়াতীত বস্তুকে ধরা যায় না; যেমন, দর্শনেন্দ্রিয়ের অতীত পদার্থকে দর্শনশক্তির দ্বারা দর্শন করা যায় না, তাহাকে উপলব্ধি করিতে হইলে উপায়ান্তর অবলম্বন করা বিধেয়। এই নিমিত্ত সত্ত্বগুণের দ্বারা গুণাতীত ঈশ্বর সম্বন্ধে প্রকৃত জ্ঞানলাভ করা যায় না। গুণত্রয়ের কার্য্য সম্বন্ধে প্রভু আমার একটী গল্প বলিতেন।

পূর্ব্বকালে কোন ব্যক্তির বাটীতে তিনটী চোর প্রবেশ করিয়া

যথাসর্ব্বস্ব আত্মসাৎ করে এবং চক্ষু ও হস্তপদাদি বন্ধনপূর্ব্বক তাহাকে অতি দূরবর্ত্তী নিবিড়ারণ্যে লইয়া যায়। তথা হইতে চলিয়া যাইবার সময় একজন বলিল যে, "আর কেন? উহার সর্ব্বস্বান্ত করা হইয়াছে এবং যে অবস্থায় যে স্থানে আনিয়াছি, সে অবস্থায় এবং সে স্থান হইতে আর স্বশরীরে বাসস্থানে ফিরিয়া যাইতে হইবে না, যাহা অবশিষ্ট আছে, তাহা পরিসমাপ্ত করিয়া যাওয়াই আমার বিবেচনায় যুক্তিসিদ্ধ।" এই বলিয়া সে ঐ ব্যক্তির কণ্ঠদেশ সঙ্কাপন করিবার মানসে দক্ষিণ পদ উত্তোলন করিল। দ্বিতীয় ব্যক্তি নিষেধ করিয়া বলিল যে, "ভাই! উহাকে এরূপে প্রাণে মারিলে কি হইবে? আমরা সরিয়া যাইলে যখন বন্য জন্তু আসিয়া জীবদ্দশায় শোণিত পান এবং মাংস ভক্ষণ করিবে,তখন উহার দুর্দ্দশার অবশিষ্টাংশ পরিপূর্ণ হইবে।" তৃতীয় চোর এই সকল কথা শ্রবণ করিয়া বলিল যে, "আমার অভিপ্রায়ে উহাকে আর যন্ত্রণা না দিয়া বরং বন্ধনাদি বিমুক্ত করিয়া দিলে ভাল হয়।" তৃতীয় চোরের কিঞ্চিৎ দয়ার্দ্র হৃদয় ভাবিয়া ঐ ব্যক্তি গড়াইয়া তাহার চরণে আশ্রয় লইয়া কহিল, "মহাশয়! আমি আপনার শরণাগত, আমায় রক্ষা করুন। বিষয় সম্পত্তি যাহা লইয়াছেন, তাহা আমি প্রত্যর্পণ করিতে বলিতেছি না, কিন্তু আমার বন্ধনাদি খুলিয়া দিলে জীবন লাভ করি।" তৃতীয় চোর তৎক্ষণাৎ অনুরোধ রক্ষা করিল। ঐ ব্যক্তি মুক্তিলাভ করিয়া চারিদিকে বৃক্ষরাজির ঘনোপবেশনে গাঢ় অন্ধকারপ্রযুক্ত দিক্‌বিদিক্ নিরাকরণ করিতে না পারিয়া পুনরায় তৃতীয় চোরকে কহিল, "মহাশয়! আপনার কৃপায় আমি চিরবাধিত হইয়াছি, কিন্তু যদ্যপি আমি বিরাগভাজন না হই এবং অন্য প্রকার নূতন দণ্ডার্হ না হই, তাহা হইলে কোন্ পথে যাইলে আমি বাটীতে পৌঁছিতে পারিব, দয়া করিয়া আমায় তাহা দেখাইয়া দিয়া জন্মের মত

দাসত্বে কিনিয়া লউন।" তৃতীয় চোর ভাবিয়া চিন্তিয়া পথ দেখাইতে গেল বটে কিন্তু উহার বাটীর কিয়দ্দূর থাকিতে কহিল, "ঐ তোমার বাড়ী দেখা যাইতেছে, আর আমি তোমার সহিত যাইতে পারিব না।" এই বলিয়া সে প্রস্থান করিল। এই শেষোক্ত চোর সত্ব, দ্বিতীয় রজঃ এবং প্রথম তমঃগুণ। যে স্থানে সত্ব পলায়ন করিল, সেই স্থান হইতে ঐ ব্যক্তির বাটী পর্য্যন্ত পথকে শুদ্ধসত্ব বা গুণাতীত কহে। এই নিমিত্ত সত্বগুণাশ্রয় করা সাধনের উদ্দেশ্য নহে।

সাধন প্রণালী দুই ভাগে বিভক্ত; যথা, সগুণ বা ভক্তি এবং নির্গুণ বা জ্ঞান সাধনা।

সগুণ সাধনায় সাধক গুণযুক্ত হইয়া গুণযুক্ত ভগবানের উপাসনা করেন। ইহা পৌরাণিক এবং তান্ত্রিক মত; নির্গুন সাধনা বৈদান্তিক নিয়মাধীন। এই দুই সাধনাকে পূর্ব্বে অবরোহণ এবং আরোহণ বা সংশ্লেষণ এবং বিশ্লেষণ প্রণালী বলিয়া উক্ত হইয়াছে। নির্গুণ এবং সগুণ সাধনা লইয়া বিশেষ মতভেদ আছে। কিন্তু আরোহণ এবং অবরোহণ প্রণালী মতে কার্য্য করিয়া দেখিলে ভেদ জ্ঞান থাকে না। ভেদজ্ঞান থাকে না বলিলে মহাকারণে তাহা বুঝিতে হইবে, স্থূলের বিষয় নহে। এ বিষয় ব্রহ্মশক্তি ও জ্ঞানভক্তি বক্তৃতাদ্বয়ে বিশেষরূপে কথিত হইয়াছে। সে যাহাহউক, নির্গুণ সাধনায় সত্ব, রজঃ এবং তমঃ আদি গুণত্রয় পরিত্যাগ পূর্ব্বক শুদ্ধসত্বাবস্থায় পতিত হইতে পারিলে উদ্দেশ্য সফল হয়, সগুণ সাধনায় ত্রিবিধ গুণ সহকারে ঈশ্বরের সাধনা সম্পন্ন করা যায়।

সগুণ সাধনা চারি প্রকার; সত্ব-তমঃ, সত্ব-রজঃ, সত্ব-রজঃ-তমঃ এবং সত্ব। সত্ব যোগ না থাকিলে ঈশ্বরের সম্বন্ধ থাকে না। এই নিমিত্ত প্রত্যেক সাধন বিভাগে সত্বের যোগ আছে।

গুণের ধর্ম্মানুসারে সাধনবিশেষেরও কার্য্য বিভিন্ন প্রকার হয়।

সত্ত্বের মাধুর্য্য ভাব, সাত্ত্বিক সাধনায় তাহাই প্রকাশ পায়। রজোগুণের ঐশ্বর্য্য ভাব, সত্ত্ব-রজোয় ঐশ্বর্য্য ভাবযুক্ত সাধন, এবং সত্ত্ব-তমোয় তামসিক ভাবযুক্ত সাধন এবং সত্ত্ব-রজঃ-তমোয় ত্রিগুণেরই কার্য্য দেখা যায়। পাত্র বিচার দ্বারাই সাধন প্রণালী এই প্রকারে বিভক্ত হইয়াছে। যে ব্যক্তি যে গুণপ্রধান, তাহার পক্ষে সে গুণ বিবর্জ্জিত হওয়া সাধ্যাতীত। যেমন পূর্ণ তমোগুণবিশিষ্ট ব্যক্তিকে সত্ত্বগুণে পরিণত করিতে হইলে তাহার নূতন কলেবর হওয়া উচিত, কিন্তু সাধনারম্ভে সে প্রকার অবস্থান্তর হওয়া মনুষ্যসাধ্যাতীত; সুতরাং তাহার অবস্থার সহিত সদ্বযোগ করিয়া সাধনদ্বারা ক্রমে ক্রমে অবস্থার পরিবর্ত্তন করা বিধেয়। এই নিমিত্ত তন্ত্রের পঞ্চমকার সংযুক্ত সাধনার সৃষ্টি হয়। এই সাধনা সত্ত্ব-তমো মিশ্রিত। মৎস্য, মাংস, মুদ্রা, মদ্য এবং মৈথুন, এই পঞ্চ মকার তমোভাবে পরিপূর্ণ। সাংসারিক নরনারীরা এই লইয়াই বিভোর হইয়া আছে এবং এই সাধনায় তাহারা সিদ্ধ। তমোগুণে কামিনীগত প্রাণ। কামিনী সম্ভোগ ভিন্ন জগতে আর দ্বিতীয় কোন বস্তু নাই বলিয়া তাহাদের ধারণা, এই নিমিত্ত কামিনীর গন্ধ পাইলে তমোগুণী ব্যক্তিরা অস্থির হইয়া পড়ে। এরূপ প্রকৃতির মনুষ্যদিগকে, কামিনী ত্যাগ কর বলিলে, তাহারা কি কখন তাহাতে সমর্থ হইতে পারে? যদিও কেহ সাময়িক কৃতকার্য্য হয়, কিন্তু পূর্ব্ববর্ত্তী কারণ তমোগুণ থাকে বলিয়া যে সময়ে কামিনী উদ্দীপক কারণ স্বরূপ হয়, সেই মুহূর্ত্তে তাহার সমুদয় সাধন ভজন বিনষ্ট হইয়া যায়। সময়ে সময়ে সাধকদিগের যে পতনকাহিনী শ্রবণ করা যায়, তাহার হেতু এই। রামকৃষ্ণদেব এইজন্য এ প্রকার ব্যক্তিদিগকে সাধনায় নিযুক্ত করিবার পূর্ব্বে বলিতেন যে, "তুমি দিন কতক আমড়ার অম্বল খাইয়া আইস।" আমড়ার সহিত তিনি কামিনী কাঞ্চনের সাদৃশ্য দেখাইতেন। এইজন্য আমড়া অর্থে কামিনীকাঞ্চন

বুঝিতে হইবে। তাহার কামিনীকাঞ্চন রস বোধ হইলে একদিন সে সাধনক্ষেত্রে রক্ষা পাইলেও পাইতে পারে। কিন্তু যাহাদের তমো-প্রকৃতি এবং তাহার কার্য্য আদৌ হয় নাই, তাহাদের পরিণাম অতি ভয়ানক।

কথিত হইলে যে, তমোপ্রকৃতির গতি প্রকৃতিতে; এই নিমিত্ত ইহাদের নিকটে সম্বন্ধ বিচারও স্থান পায় না। তমোগুণী যেরূপ কামিনী দেখিলে অধৈর্য্য হয়, মাংস মদ পাইলেও সেইরূপ আত্মহারা হইয়া থাকে। অনেকে বার বার মদ মাংস ছাড়িয়া থাকেন, কিন্তু পূর্ব্ব-বর্ত্তী কারণ তমোগুণ বিধায় উহারা উদ্দীপক কারণ স্বরূপ হইলেই, অমনি তাহা কার্য্যে পরিণত হইয়া যায়। এরূপ দৃষ্টান্তের অপ্রতুল নাই। সুতরাং এপ্রকার গুণবিশিষ্ট ব্যক্তিকে সত্বগুণে পরিণত করা কাহার সাধ্য? তমোগুণী ব্যক্তিদিগের কল্যাণের নিমিত্ত তান্ত্রিক পঞ্চ-মকারের সৃষ্টি হইয়াছে। তন্ত্রের মৈথুনাদি সাধনের জন্য যেরূপ ব্যবস্থা আছে, তাহার মর্ম্ম বুঝিলেই সাধনার উদ্দেশ্য বাহির হইয়া আইসে। যাহার যে বিষয়ের স্পৃহা প্রবল থাকে, তাহার চূড়ান্ত আস্বাদন হইলে, সে বিষয়ে অনাস্থা জন্মিতে পারে। এইরূপ অনাস্থা জন্মিবার সময় যদ্যপি সে তদপেক্ষা উত্তম অবলম্বন পায়, তাহা হইলে সে পূর্ব্বভাব পরিত্যাগ করিতে পারে। পঞ্চ-মকারের সাধনার উপাস্য দেবী কালী, ভাব মা। এই সাধনায় শ্রীরাধিকাকে দেওয়া হয় নাই। তাহার তাৎপর্য্য অনায়াসে বুঝা যাইতেছে।

তন্ত্রোপাসনায় যদ্যপি বৃন্দাবনের ভাব প্রদত্ত হইত, তাহা হইলে ইহা বর্ত্তমানকালে যে কতকগুলি গুপ্ত সাধনের সম্প্রদায় জন্মিয়াছে, তাহা-দের ন্যায় বিকৃতভাবে পর্য্যবসিত হইয়া যাইত। তমোগুণী যদিও মাতৃভাব বিকৃত করিতে অগ্র পশ্চাৎ চাহিয়া দেখে না, কিন্তু গর্ভধারিণী

ভাবটী অনেক ক্লেশে রক্ষা হয়, এই জন্য মাতৃভাবে সাধনায় সাধন ভ্রষ্ট না হইবার কথা। কালীর যে প্রকার রূপমাধুরী, তাহা দর্শন করিলে প্রতি পলকে কণ্ঠ শুষ্ক হইয়া আইসে। সর্ব্বদা, ভয়ঙ্করা মূর্ত্তি, লোলরসনা বিঘূর্ণিত নয়নত্রয়, সুতীক্ষ্ণ শাণিত খড়্গ দেখিলেই মনে হয় যেন মা রণ-রঙ্গিণী শিরশ্ছেদন করিবার জন্য প্রস্তুত হইয়া রহিয়াছেন। দোদুল্যমান মুণ্ড ও মুণ্ডমালার দিকে দৃষ্টি পড়িলে তমোগুণী ভয়ে চীৎকার করিয়া বলে, "মা ভয়ঙ্করা! অসিধরা! আমায় রক্ষা কর! মা মুণ্ডমালিকে! আমি তোমার সন্তান।" চরণতলে শিবের দশা দেখিয়া তমোগুণীর আর জ্ঞান থাকে না, তখন মনে হয় যে, মা সোজা মেয়ে নহেন। মুখ বিকৃতির দ্বারা জ্ঞান হরিয়া লন। অসি দ্বারা শিরশ্ছেদন করেন, আবার বক্ষে পদ সঞ্চাপনের দ্বারা পঞ্চত্ব ঘটান। তমোগুণীর মরণের ভয় অধিক, সুতরাং কালীর এইরূপ ভীষণ ভাবোদ্দীপক কালকামিনীর দ্বারা তমো-গুণীর পূর্ব্ববর্ত্তী কামিনীর ভাব বিদূরিত হইয়া যায়, যখন কালকামিনী ভাব মনে প্রবিষ্ট হইয়া ধারণা হইয়া যায়, তখন তমোগুণ কমিয়া আইসে, সুতরাং সত্ত্বগুণ বর্দ্ধিত হইতে থাকে। পঞ্চ-মকারের সাধনা দ্বারা যখন এইরূপ অবস্থায় সাধক উপনীত হন, তখন তাঁহাকে কৌল কহে। কৌলের ভাব সত্ত্বগুণে পরিপূর্ণ। তন্ত্রের এই সাধনাকে বীরাচার কহে। দক্ষিণাচার সাধনে সত্ত্ব রজঃ মিশ্রিত, সুতরাং তাহাতে পঞ্চ-মকারের ঐরূপ ব্যবহার নাই। অতএব সাধনা সাধকদিগের অবস্থানুসারে, উদ্দেশ্যা-নুসারে এবং সময়ানুসারে সংগঠিত হইয়া থাকে।

সত্ত্ব রজঃ ভাবের সাধনা—শক্তিপূজা, যাগ, যজ্ঞ ইত্যাদি। এই সকল সাধনায় অর্দ্ধেক ঐশ্বর্য্য এবং অর্দ্ধেক মাধুর্য্য ভাব। সত্ত্ব রজঃ ভাবের সাধনা সগুণ সাধনার অন্তর্গত। রজোগুণের ঐশ্বর্য্য ভাববশতঃ এইপ্রকার সাধনার কার্য্যে মাধুর্য্য এবং ঐশ্বর্য্য ভাব মিশ্রিত থাকে।

ভগবানের লীলাবলম্বন করা সত্ত্ব-রজঃগুণের অভিপ্রায়। পৌরাণিক ভাববিশেষ লইয়া দিন যাপন করা সত্ত্ব-রজোর কার্য্য। এইরূপ সাধনায় মনের সহিত ভগবৎ সম্বন্ধ অর্দ্ধেক এবং অর্দ্ধেক সাংসারিক ভাবে পূর্ণ থাকে।

সত্ত্বভাবের সাধনায় ভগবান্‌কে সর্ব্বস্ব জ্ঞানপূর্ব্বক মানস সিংহাসনে তাঁহাকে বসাইয়া দেহের অধীশ্বর করিবার নিমিত্ত কার্য্য হইয়া থাকে। এইভাবে অহংজ্ঞান থাকে না। অহংভাবের যাহা প্রকাশ হয়, তাহা দাসভাবে পূর্ণ। সাত্ত্বিক সাধনা পৌরাণিক নিগূঢ় ভাবে সংগঠিত হইয়া থাকে।

সত্ত্বঃ-রজঃ-তমঃ মিশ্রিত সাধন সকল মতের প্রারম্ভে দেখা যায়, ইহার বিশেষ কোন ব্যবস্থা নাই।

যে সাধনচতুষ্টয় কথিত হইল, তাহা ব্যক্তিবিশেষের মানসিক ভাবের নিমিত্ত নির্দ্ধারিত হইয়াছে। মনুষ্য কখন এক গুণ বিশিষ্ট হইতে পারে না, সুতরাং গুণভেদে সাধনাও কখন এক প্রকার হইবার নহে। যে, যে গুণের ব্যক্তি, তাহাকে সেইগুণসম্পন্ন সাধনা দেওয়া উচিত। এই নিমিত্ত দেশ, কাল, পাত্র এবং উদ্দেশ্য, অর্থাৎ গুণ বিচার পূর্ব্বক ঈশ্বর সাধনে নিযুক্ত হইতে হয়।

ঈশ্বর সাধনার ইতিহাস পাঠ করিলে দেখা যায় যে, উপরোক্ত বিচার দ্বারা যুগধর্ম্মের ব্যবস্থা হইয়া আসিতেছে। সত্যকালের সাধনার সহিত পরবর্ত্তী যুগত্রয়ের সাধনার তুলনা হয় না। তাহার কারণ কি? কলিকালে অন্নগত প্রাণ, আহার করিবার সময় উত্তীর্ণ হইয়া যাইলে অসুস্থতা রাখিবার স্থান থাকে না। এ অবস্থায় কি কখন ব্রহ্মচর্য্য সাধন সম্ভবে? রজোতমোভাবে শরীর মন সংগঠিত, তথায় সত্ত্বগুণ কি কখন স্থান পাইতে পারে? কেমন করিয়া একপ্রকার সাধন সত্য এবং

কলিযুগের নির্দ্দিষ্ট হইতে পারে? এই নিমিত্ত, এই পাত্র বিচার দ্বারা আমাদের ধর্ম্ম শাস্ত্র সময়ে সময়ে প্রকটিত হইয়াছে। এই নিমিত্ত যুগ-চতুষ্টয়ের ভিন্ন ভিন্ন যুগধর্ম্ম বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে। এই নিমিত্ত সত্যযুগে ধ্যান, ত্রেতায় যজ্ঞ, দ্বাপরে সেবা এবং কলিতে নাম সাধনার দ্বারা জীবের পরিত্রাণ পাইবার ব্যবস্থা শাস্ত্রে কথিত হইয়াছে।

যুগধর্ম্ম বলিলে যে ধর্ম্ম সর্ব্বসাধারণের নিমিত্ত নির্দ্দিষ্ট হয়, তাহাকে বুঝায়। যুগধর্ম্ম থাকিলে যে অন্য ধর্ম্ম সাধন করা নিষিদ্ধ, এমন কোন কথা নহে, কিন্তু অন্য যুগের সাধন যুগান্তরে সমাধা করা যারপরনাই কঠিন এবং সাধ্যাতীত। আমরা সকলে যদ্যপি ব্রহ্মচর্য্য সাধনা অবলম্বন করিতে যাই, তাহাতে যে কয় জনে কৃতকার্য্য হইব, বলিতে পারি না। কারণ পূর্ব্বে বলা হইয়াছে যে, ব্রহ্মচর্য্যাশ্রমে সত্ত্বগুণী হওয়া চাই; সত্ত্বগুণের পর সাধনা করিলে ঈশ্বর লাভ হইয়া থাকে। সে অবস্থা আমাদের নহে এবং আমরা তাহার যোগ্যও নহি। সে যাহা হউক দেশ, কাল, পাত্র এবং উদ্দেশ্যানুসারে ঈশ্বর সাধনের ব্যবস্থা হইয়া থাকে; সে বিষয়ে সন্দেহ নাই।

কার্য্য কারণ সূত্রে কথিত হইয়াছে যে, কোন কার্য্য করিতে হইলে কারণ চতুষ্টয়ের নিতান্ত প্রয়োজন। যদ্যপি সে কথা সত্য হয়, তাহা হইলে যে যে কারণে ঈশ্বর লাভ হইবার কথা, তাহা পাত্রান্তর কিম্বা দেশান্তর অথবা সময়ান্তর ও উদ্দেশ্যান্তর হইলে কোনরূপে কার্য্য সাধন হইতে পারে না। কথিত হইল যে, সত্ত্বগুণ ব্যতীত ঈশ্বর লাভ হয় না, সুতরাং সত্ত্বগুণের সাধনারই প্রয়োজন। কিন্তু যুগধর্ম্মে সেরূপ গুণের সাধনার কোন প্রসঙ্গ নাই। কলির নামসাধনে গুণের কোন সংশ্রব দেখা যায় না। এই নিমিত্ত সর্ব্ব সাধারণের বিশ্বাস এই যে, কলিকালে সত্ত্বগুণের সাধনার প্রয়োজন নাই। শাস্ত্রেও উল্লিখিত আছে যে,

পরিহাসচ্ছলে নাম উচ্চারণ করিলেও জীবে পরিত্রাণ পাইবে এবং রামকৃষ্ণদেব বলিয়া গিয়াছেন যে, "জান্তে বা অজান্তে, ভ্রান্তে বা অভ্রান্তে, যে কেহ নামোচ্চারণ করিবে, সেই পরিত্রাণ পাইবে।" পরিহাসচ্ছলেই হউক, ভগবানের নাম জানিয়াই হউক কিম্বা না জানিয়াই হউক, অথবা অভ্রান্তে বা ভ্রান্তিযুক্ত হইয়াই হউক, ঈশ্বরেরর নাম যাহার মুখে উচ্চারিত হয়, সেই ব্যক্তিই পরিমুক্তি লাভ করিতে পারে; তাহা হইলে সাধনা সম্বন্ধে একপ্রকার কারণ নির্দ্দিষ্ট হইতেছে না। যদ্যপি বাস্তবিক কলির জীবের পক্ষে সত্বগুণ ব্যবস্থা না হইয়া, কেবল রজোতমোর সাধনার দ্বারা—পরিহাসচ্ছলে—ভগবানের বিমল প্রেমমূর্ত্তি দর্শন করিতে পারা স্থির হয়, তাহা হইলে সাধনতত্বই একেবারে ভুল হইয়া যায় এবং যুগচতুষ্টয়ের মধ্যে কলিযুগই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ যুগ বলিয়া পরিগণিত করিতে হয়। সত্যযুগে, সদা সত্যনিষ্ঠ সত্বগুণযুক্ত সাধকপ্রবরেরা সহস্র সহস্র বর্ষ সাধনা করিয়াও বিফল মনোরথ হইতেন; ত্রেতায়, সাধ্যমত সত্ব গুণাবলম্বনপূর্ব্বক মহা যজ্ঞাদির অনুষ্ঠান করিয়া বাসনা চরিতার্থ করিতেন; দ্বাপরে, বিশুদ্ধ সাত্বিকভাবে সেবা সাধনায় আত্মনিবেদন পূর্ব্বক অবস্থিতি করিয়া কতকাল কাটাইয়া যাইতেন, তথাপি তাঁহাদের অভিলাস পূর্ণ হইত না; কিন্তু কলিকালে সেপ্রকার কোন সাধনাই নাই, কেবল মুখে নাম বলিলেই সর্ব্ব বাসনা সিদ্ধ হইবে, ইহা কি প্রকৃত কথা? না শাস্ত্রের অন্য কোন অভিপ্রায় আছে?

শাস্ত্রেই দেখিতে পাওয়া যায় যে, সত্যযুগে পূর্ণ পুণ্য ভাব ছিল, ত্রেতায় এক চতুর্থাংশ, দ্বাপরে অর্দ্ধেক এবং কলিতে তিন চতুর্থাংশ কমিয়া গিয়াছে; অর্থাৎ সত্যে সত্বগুণ পূর্ণ ছিল; ত্রেতা হইতে সত্বগুণ ক্রমে সিকি, অর্দ্ধেক এবং বার আনা রকম হ্রাস হইয়া কলিকালে সিকি ভাগে পর্য্যবসিত হইয়াছে। এই সিকি ভাগ সত্বগুণাবলম্বন করিতে

পারিলেই কালহিসাবে তাহাকে পূর্ণ বলিতে হইবে। এক্ষণে একদিকে কেবল নাম একদিকে সিকি সত্ত্বগুণের সাধনা দেখা যাইতেছে। ইহাদের সামঞ্জস্য হইবে কিরূপে? সত্ত্বগুণী না হইয়া কেবল নাম করিয়া যাইলেই চলিবে অথবা সত্ত্বগুণের সাধন দ্বারা নামাবলম্বন করা বিধেয়? বর্ত্তমান কালের সাধনায় এই দুইটী বিষয় সর্ব্বাগ্রে মীমাংসা হওয়া উচিত। যেহেতু, অনেকের এই সম্বন্ধে সর্ব্বদা সন্দেহ জন্মিয়া থাকে। অনেকে মনে করেন যে, চুরিই করি, মদই খাই, মিথ্যাকথাই বলি, বেশ্যার অধরামৃত পানই করি, স্ত্রী-পুত্রাদির চিরদাসত্বে জীবন অতিবাহিত করিয়াই যাই, একবার ইষ্ট নাম উচ্চারণ করিলেই যথেষ্ট হইবে। এই সাধনায় কি প্রকৃত পক্ষে ভগবান্ প্রাপ্তি হইবার কথা? তাহা কখন স্বীকার করা যায় না। শ্রীমদ্ভাগবতে নাম সংকীর্ত্তন এবং মহানির্ব্বাণতন্ত্রে তান্ত্রিক সাধনা কলিকালের জন্য নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে বলিয়া প্রকাশ আছে। রাম-কৃষ্ণদেব এই দুই সাধনাকে তমোমুখচৈতন্য কহিতেন। তমোসংযুক্ত সত্ত্বগুণ এই সাধনের নিদান।

যুগধর্ম্মে যখন সত্ত্বগুণ সংযুক্ত রহিয়াছে, তখন কেবল নাম সাধন করিলে কখন কোন ফল ফলিতে পারে না। কারণ রামকৃষ্ণদেব বলিয়াছেন যে, বিষয়ীর হরি বলা বালকের হরিবলার ন্যায়। বেশ্যারা কীর্ত্তন করিবার সময় নামে যেন মাতিয়া উঠে, থিয়েটারে নাম সংকীর্ত্তন হয়, পথে ভিখারীরা হরিনাম করিয়া ভিক্ষা করে, এ সকলকে অবশ্যই নামসংকীর্ত্তন কহিতে হইবে। তবে কি এইরূপে নাম সংকীর্ত্তন করাই শাস্ত্রের অভিপ্রায়? এইরূপ নাম সংকীর্ত্তন করিলেই কি সকলের পরিত্রাণ হইবে? অথবা মৎস্য মাংসাদি দ্বারা উদর পূর্ণ করিয়া, বেশ ভূষায় বিভূষিত হইয়া নানা ছাঁদে কেশ বিন্যাস করিয়া,

মুহুর্মুহু নানা ভাবের ধূম ও সুরাপান করিয়া হরিনাম সংকীর্ত্তন করিলে কি বাস্তবিক কোন ফল ফলিবে? শাস্ত্রে উল্লিখিত আছে যে, যিনি হরিনাম বলেন, যাঁহারা তাহা শ্রবণ করেন এবং যে স্থানে তাহা উচ্চারিত হয়, এই ত্রিলোক পবিত্র হইয়া থাকে; কিন্তু যখন বক্তা হরিনাম বিক্রয় করেন, যাঁহারা সখের জন্য তাহা শ্রবণ করেন এবং যে স্থানে হরিনামের ব্যবসা হয়, তখন এই ত্রিবিধাবস্থায় কখন নামের প্রকৃত ফল ফলিতে পারে না। তাহা হইলে শাস্ত্র ভুল হয়, যুগধর্ম্ম ভুল হয়, এবং কালের সাধনা বিলুপ্ত হইয়া যায়। সাধনা চাই, সাধনা ব্যতীত কখন ভগবান্ লাভ হয় না, হয় নাই, হইবার নহে। কলির নাম সম্বন্ধীয় সাধনা আছে কি না, দেখাইবার জন্য শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র গৌরাঙ্গ রূপে অবতীর্ণ হইয়া নিজে তাহা দেখাইয়া গিয়াছেন। যদ্যপি রজঃ তমোভাবে দিন যাপন করিয়া,অবসর ক্রমে, রহস্যচ্ছলে, অর্থোপার্জ্জনের জন্য, লোকের মন ভুলাইবার নিমিত্ত নাম সংকীর্ত্তন করিলে যথেষ্ঠ হইত, তাহা হইলে তিনি সন্ন্যাসী হইতেন না। যদ্যপি গুরু নিষ্প্রয়োজন হইত, তাহা হইলে তিনি কেশব ভারতীর নিকটে দীক্ষিত হইতেন না; যদ্যপি কেশ বিন্যাস ও মনোহর বসন ভূষণের শোভায় পরিত্রাণ হওয়া যাইত, তাহা হইলে তিনি কেশ মুণ্ডন ও কৌপিন ধারণ করিতেন না। কামিনীর কমনীয় ভুজাশ্রয়ে যদ্যপি ভগবান্ লাভ হইত এবং কলিকালে তাহাই সাধনা হইত, তাহা হইলে তিনি বিষ্ণুপ্রিয়াকে পরিত্যাগ করিয়া যাইতেন না। যদ্যপি আত্মীয় আত্মীয়া কুটুম্বাদির মন তুষ্টি করিলে সাধনার চূড়ান্ত হইত, তাহা হইলে তিনি স্বদেশ পরিত্যাগ করিয়া তীর্থস্থানে বেড়াইতেন না। নাম সংকীর্ত্তন সাধন কিরূপে করিতে হয়, ইহাই প্রচার করিতে, জীব শিক্ষা দিতে, তিনি লীলারূপে মনুষ্যাকারে মানবসমাজে শুভাগমন করিয়াছিলেন।

সাধনের উপায় তিনি নিজে সাধন করিয়া দেখাইয়াছেন যে, উদ্দেশ্যে ভগবান্ রাখিয়া উদ্দীপক কারণস্বরূপ সংসারের বিভীষিকা পর্য্যবেক্ষণ করিয়া অনিত্য জ্ঞান লাভ পূর্ব্বক, সমবর্ত্তী কারণ-রূপ সন্ন্যাস ব্রত লইয়া, পরবর্ত্তী কারণ-রূপ ভক্তসঙ্গে দিন যাপন করিতে হয়। কিন্তু জীব তাহাও ধারণা করিতে পারিল না। রজোতমোভাবে দেহ মন এমনি কলুষিত হইয়া পড়িয়াছিল যে, শ্রীগৌরাঙ্গের সাধনার তাৎপর্য্য. রূপ সনাতনাদি কয়েকজন ব্যতীত সর্ব্বসাধারণে তাহা অনুধাবন করিতে পারে নাই। নিতাইচাঁদ গৌরাঙ্গদেবাদিষ্ট নাম সাধন সাধারণকে প্রদান পূর্ব্বক অসিদ্ধ মন হইয়া যখন প্রভুর সমীপে তাহা নিবেদন করিলেন, তখন মহাপ্রভু বিষাদিত হইয়া কহিলেন, "ভাইরে! তবে উপায় কি? জীবের উদ্ধার করিতে আসিলাম, যদ্যপি কেহ সাধন না লইল, তবে তাহাদের উপায় কি হইবে? আমি ভাবিয়া যে কূল কিনারা পাইতেছি না।" শ্রীগৌরাঙ্গের এই কথা শ্রবণ করিয়া অনেকের মনে হইতে পারে, যিনি ভগবান্, তিনি কি জানিতেন না যে, কি উপায়ে জীবের কল্যাণ হইবার সম্ভাবনা? সর্ব্বশক্তিবান অন্তর্য্যামীর কি এত সংকীর্ণ শক্তি যে, সাধারণ মনুষ্যের ন্যায় কার্য্য বিস্মৃতি এবং কার্য্যের অসম্পূর্ণতার নিমিত্ত অনুশোচনা করিতে হইয়াছিল? ইহার তাৎপর্য্য আছে। মনুষ্যের স্বভাবানুসারে, মনুষ্যের ধারণানুসারে, ভগবান্ কার্য্য করিয়া থাকেন, গৌরাঙ্গদেব সে সময়ে কেন যে ঐপ্রকার কথা বলিয়াছিলেন, তাহা পরে প্রকাশ করিয়াছেন; আমি তাহা যথাস্থানে উল্লেখ করিব।

শ্রীগৌরাঙ্গ নিত্যানন্দদেবের সহিত নানাবিধ কথোপকথনের পর স্থির করিলেন যে, বিনা কৌশলে কোন কার্য্য হইবে না। অতএব কঠোর সন্ন্যাস ভাব সাক্ষাৎ সম্বন্ধে না দেখাইয়া প্রকারান্তরে তাহার

কার্য্য করিতে হইবে। এইরূপ স্থির করিয়া অতঃপর নিত্যানন্দ ঠাকুর প্রচার করিতে লাগিলেন যে, "মাগুর মাছের ঝোল, যুবতী স্ত্রীর কোল, বোল হরি বোল।" মাছের ঝোল, যুবতী স্ত্রীর কোল, এই কথা শ্রবণ করিয়া সকলে ছুটিয়া আসিয়া বলিল, "অবধূত ঠাকুর! এমন সাধন আমরা আবাল বৃদ্ধ বনিতা গ্রহণ করিতে পারি।" আনন্দের আর সীমা রহিল না। সকলে বলিতে লাগিল যে, "নিতাইচাঁদ দরদী বটেন, এঁকেই প্রাণের ব্যথার ব্যথী বলা যায়। আহা! ঠিক্ বলেছেন যে, মাছের ঝোল, শুধু চুন চিঙ্গড়ী নহে, মাগুরমাছ, গায়ে রক্তের জোর হইবে। আর যুবতীস্ত্রীর কোল; স্ত্রী চিরকাল যুবতী থাকিতে পারে না, অতএব ইচ্ছানুসারে যুবতী স্ত্রীতে অর্থাৎ যে কোন কামিনী হউক, গমন করিবার অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়াছেন। এমন ভাবে যদ্যপি দিনযাপন করা যায়, তাহা হইলে হরিনাম না লইয়া আর কি লইব? মাছের ঝোলে পেট ঠাণ্ডা করিয়া, যুবতীর বদন ও বক্ষ দর্শনপূর্ব্বক মনে স্ফূর্ত্তির রঙ্গভূমি হইবে। তখন প্রাণ খুলিয়া কটির কাপড় ফেলিয়া হরিবোল ভিন্ন আর কোন বোল বলিব না।" নিতাইচাঁদ এইরূপে জীবকে কৌশলপূর্ব্বক নাম সাধনা করিতে শিক্ষা দিয়া কি বাস্তবিক ইচ্ছামত যুবতী গমনের দ্বারোদ্ঘাটন করিয়া দিয়াছিলেন? তাহা কখনং নহে।

ইচ্ছামত স্ত্রীগমন করাই কলির ধর্ম্ম। ভগবান্ অবতীর্ণ হইয়া নাম সাধনার ছলে সেই কার্য্যটীর প্রাবল্য দেখাইবার কি অভিপ্রায় ছিল? তাঁহার অভিপ্রায় তিনিই জানেন। কি জন্য কোন্ লীলা করেন, লীলারূপে তিনি আপনি না ব্যক্ত করিলে জীবে তাহা কিরূপে অনুধাবন করিতে পারিবে? রামকৃষ্ণদেব গৌরাঙ্গদেবের এই নাম সাধনার তাৎপর্য্য সম্বন্ধে বলিয়াছেন যে, প্রত্যহ যুবতী আশ্রয় করিয়া

হরিনাম বলিতে গৌরাঙ্গদেব বলেন নাই। এই কথা বলিতে তাঁহার আসিবার কোন প্রয়োজন হয় নাই। শাস্ত্রে নাম সাধনের কথা উল্লেখ ছিল এবং লোকেও কামিনী লইয়া সংসার করিতেছিল, তাঁহার উপরোক্ত কথার ভাবে বরং কামিনীভাব আরও উত্তেজিত হইয়াছে, বলিতে হইবে। যাহা নীতি বিরুদ্ধ, ধর্ম্ম বিরুদ্ধ ভাব, সেইভাব কখন সাধনের উদ্দেশ্য হইতে পারে না। তাঁহার এ কথা বলিবার দুইটী অভিপ্রায় ছিল। যেমন তন্ত্রের পঞ্চ-মকার তমোগুণের সাধন, অবিকল সেইভাব এস্থলেও নির্দ্দিষ্ট করিয়াছিলেন। সাধারণ জীবের উদ্দেশ্য কামিনীকাঞ্চন। কিন্তু শ্রীগৌরাঙ্গের কৌশলে সেই উদ্দেশ্য স্থলে নাম এবং কারণ স্থলে কামিনী ভাব যাইয়া পরিণত হইয়াছিল। কারণ-স্বরূপ কামিনীর সহবাসে সাধনপ্রসূত কার্য্য কখন হরিনাম উদ্দেশ্যের সহিত সামঞ্জস্য হইতে পারে না, সুতরাং সে কার্য্যে তাহাদের তৃপ্তিলাভ না হইয়া বরং যন্ত্রণার উদ্রেক হইবে। তখন তাহারা, কিরূপে আপনেচ্ছায় উদ্দেশ্য চরিতার্থ হইবে, তাহার চেষ্টা করিতে বাধ্য হইবে।

মহাপ্রভুর কথিত যুবতী স্ত্রীর কোল সাধনার উদ্দেশ্য হরিনাম; কিন্তু সাধারণ জীবের উদ্দেশ্য কামিনীকাঞ্চন। এই নিমিত্ত সাধারণ জীবের কামিনী সহবাসে উদ্দেশ্য তৃপ্ত হইয়া যায়, সুতরাং তাহাদের আকাঙ্ক্ষা সেই স্থানে পরিসমাপ্তি হইয়া থাকে। কিন্তু উদ্দেশ্য স্বতন্ত্র এবং তাহার সাধনের কারণ বিপরীত হইলে, তাহার কার্য্যে কখন উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইতে পারে না। ফলে, কার্য্য এবং উদ্দেশ্যের সহিত বিবাদ বিসম্বাদ উপস্থিত হইয়া তাহার মন অশান্তির আলয়স্বরূপ হইয়া দাঁড়ায়। তখন হয় উদ্দেশ্য ছাড়িয়া দিতে হয়, না হয় কারণ ছাড়িয়া দিতে হয়। যেমন, কাহার শরীরে অম্লরোগ আশ্রয় করিলে সাধারণ ভোজ্য বস্তু দ্বারা রোগ বৃদ্ধি হয়। যদ্যপি রোগোন্মুক্ত হওয়া যায়, তাহা

হইলে সাধারণ ভোজ্য বস্তু ত্যাগ করিতে হয় না, কিন্তু কিছুতেই রোগ না কমিলে আহার ছাড়িয়া দিতে হয়; তেমনি এ ক্ষেত্রে হরিনাম লইয়া কামিনী ত্যাগ করা ব্যতীত গত্যন্তর থাকে না। সচরাচর এ প্রকার ঘটনাও যথেষ্ট দেখা যায়। অদ্য একজন একপ্রকার উদ্দেশ্যে সাধন লয়, দুই দিন পরে সে তাহা পরিত্যাগ করিয়া নিশ্চিন্ত হয় এবং কেহ বা সেই উদ্দেশ্য সাধন করিবার নিমিত্ত নানাবিধ কারণ অনুসন্ধান করিয়া তাহা সফল করিয়া লইতে চেষ্টা করে। মহাপ্রভুর উপরোক্ত উপদেশ দ্বারা জীবের মনে উদ্দেশ্যান্তর করিয়া দিবার নিমিত্ত কামিনী কারণ দ্বারা তাহা প্রদান করিয়াছিলেন। যেমন কেহ কুইনাইন সেবন করিতে অস্বীকার করিলে চিকিৎসক রূপার পাতা আবরণপূর্ব্বক উহা বটিকাকারে প্রয়োগ করেন, শ্রীগৌরাঙ্গের মাছের ঝোল এবং যুবতীর কোল তেমনি বুঝিতে হইবে।

দ্বিতীয় তাৎপর্য্য এই যে, নাম সাধনা করিলে নয়নে ধারা বহিবে এবং ভাবাবেশে মৃত্তিকায় লুটাইবে, গৌরাঙ্গদেব তজ্জন্য মাছের ঝোল এবং যুবতী স্ত্রীর কোল বলিয়াছিলেন। এ স্থানে চক্ষুর সহিত মাছের এবং অশ্রুর সহিত ঝোলের তুলনা করা হইয়াছে। কেবল মাছের ঝোল না বলিয়া, মাগুর মাছ বলিবার কি গৌরাঙ্গদেবের কোন উদ্দেশ্য ছিল? অবশ্যই ছিল স্বীকার করিতে হইবে। মাগুর মাছ রোগীর পথ্য। এ স্থলে বিষম বিষয় জ্বরের উপশমকালে, পথ্যের নিমিত্ত মাগুর মাছের ঝোল স্বরূপ নয়নবারি পতিত হইলে, তবে শান্তিলাভের সূচনা হয়। যেমন পথ্য পাইলে শরীর স্নিগ্ধ হয়, অশ্রু বহির্গত হইলে তবে হৃদয়ের ভার কমিয়া দেহ প্রফুল্লিত হইয়া থাকে। রোগী পথ্য প্রাপ্ত হইয়া সুকোমল শয্যায় শয়ন করিলে যেমন শান্তি লাভ করিয়া থাকে, তেমনি নাম সাধন করিতে করিতে অশ্রুপতনান্তে ভাবাবেশে

পৃথিবীর ক্রোড়ে পতিত হইয়া ভক্তপদরজে সর্ব্বাঙ্গ বিলেপন না করিতে পারিলে, কামিনীর ভুজ-ভুজঙ্গের বিষ হইতে পরিত্রাণের আর দ্বিতীয় মহৌষধ নাই। বসুন্ধরা চিরযৌবনা, তাহার বাল্য বৃদ্ধাদি কোন নির্দ্দিষ্ট কাল নাই। এই নিমিত্ত কবিরা তাহাকে চিরযৌবনা বলিয়াও বর্ণনা করেন। নাম সাধনের এইরূপ পরিণাম না হইলে কামিনীর ক্রোড়ে শয়ন করিয়া কি কখন সাধন হইতে পারে? কামিনীকাঞ্চন বিষে শরীর জর্জ্জরীভূত, এই বিষম জ্বরের প্রকোপে সর্ব্বদাই ব্যাকুলিত হইয়া বেড়াইতেছে, শরীর জ্বলিয়া যাইতেছে। এই জ্বালা কি জ্বরবৃদ্ধি দ্বারা নির্ব্বাণ হইতে পারে? কামিনীকাঞ্চনরূপ জ্বরে যদ্যপি কামিনী-কাঞ্চনই ঔষধরূপে প্রয়োগ করা যায়, তাহা হইলে তাহার জীবন কতক্ষণ স্থায়ী হইতে পারে? অহিফেনের বিষে যখন প্রাণ অস্থির হইয়া উঠে, তখন অহিফেন প্রয়োগ করা বিধেয়? না যাহাতে বিষের গর্ব্ব খর্ব্ব হয়, সেইরূপ ব্যবস্থা করা কর্ত্তব্য? অজ্ঞ ব্যক্তিদিগের দ্বারা সেরূপ ঘটনা অসম্ভব নহে। কিন্তু বিজ্ঞ চিকিৎসক কখন তাহা করিতে পারেন না। স্বয়ং ভগবান্ জীবের কল্যাণহেতু নাম সাধনা প্রচার করিতে আসিলেন, তিনি কি কামিনী দংশনপ্রসূত নির্য্যাসরূপ অহিফেনের বিষাক্ত ধর্ম্ম বিলুপ্ত করিতে কামিনীভুজঙ্গিনীর বিষ ব্যবস্থা করিতে পারেন? এ কথা কখনই সম্ভব হইতে পারে না। এই নিমিত্ত রামকৃষ্ণ-দেব বলিয়াছেন যে, শ্রীগৌরাঙ্গ কৌশল করিয়া নাম সাধনার সহজ প্রণালী প্রদর্শন করিয়াছিলেন।

নাম সাধনার ফল সম্বন্ধে প্রভু বলিয়াছেন যে, "যেমন বৃক্ষে পক্ষী বসিয়া থাকিলে করতালির শব্দ করিবামাত্র তাহা উড়িয়া যায়, সেইরূপ মুখে হরি বলিয়া করতালি দিয়া নৃত্য করিলে দেহরূপ বৃক্ষ হইতে পাপরূপ পক্ষী সমূহ পলাইয়া যায়।" নামের সাধন এই প্রকার।

করতালি দিয়া নৃত্য করিবার সময় মন হইতে কামিনীকাঞ্চন ভাব একেবারে অদৃশ্য হইয়া যায়, তখন স্ত্রী, পুত্র, কন্যা, পিতা, মাতা, ভাই, বন্ধু, ধন, ঐশ্বর্য্য, কুটুম্বাদি মনে আসে না,তখন লজ্জা, ঘৃণা, ভয়, মান ও মর্য্যাদা মনে স্থান পায় না, তখন নামের গুণে প্রাণ মাতিয়া উঠে, তখন মন আপনি শ্রীহরির ধ্যানে নিমগ্ন হয় তখন হরিধ্যান, হরি-জ্ঞান, শ্রীহরি বৃন্দাবনবিহারী যেন হৃদয়বৃন্দাবনে ভুবনমোহনবেশে মনকদম্বের মূলে আসিয়া দণ্ডায়মান হন। তখন সেই মোহনমূরলীর রাধা রাধা ধ্বনি প্রাণ ভরিয়া শ্রবণ করিতে করিতে, মহাভাবময়ী শ্রীরাধা বংশীধারীর বামে উপস্থিত হইয়া, মহাভাবে নিপতিত করেন। নাম সাধনার দ্বারা জীবের যেরূপ ফল হয়, তাহা কলির জীবকে শিক্ষা দিবার নিমিত্ত শ্রীগৌরাঙ্গ নাম সাধনা প্রক্রিয়ার সূত্রপাত করিয়া যান, কিন্তু কালের বিক্রম অতিক্রম করিতে সামান্য নরনারী কিরূপে সমর্থ হইবে? বিশেষতঃ প্রভু যে অবস্থায় তাহা সাধন করিতে বলিয়া গিয়া-ছিলেন, তাহা হইতে উদ্দেশ্যচ্যুত হইবার সম্পূর্ণ সম্ভাবনা ছিল। তিনি উদ্দেশ্যে হরির নাম দিয়া কামিনীর সম্বন্ধ রাখিয়াছিলেন, ক্রমে কামিনী যাইয়া উদ্দেশ্য হইয়া দাড়াইল। এইরূপ অবস্থা হইবে জানিয়াও যে জন্য তিনি ঐ প্রকার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন, তাহা বর্ত্তমানকালে প্রকাশ পাইয়াছে।

কামিনীকাঞ্চনের সংসর্গে সুখী হওয়া যায় না, তাহা সত্ত্ব রজোগুণের ধর্ম্মেই উল্লিখিত হইয়াছে। লোকের যে পর্য্যন্ত কামিনীকাঞ্চনের আভ্যন্তরিক রহস্য সম্পূর্ণরূপে অনুধাবন না হয়, সে পর্য্যন্ত তদ্বিষয়ের মীমাংসা হইতে পারে না। কামিনীকাঞ্চনে না ডুবিলে তাহার প্রকৃত অবস্থা বুঝা যায় না এবং ডুবিলেও উঠিবার উপায় থাকে না। কামিনী-কাঞ্চন হ্রদে তাহারা নিমজ্জিত হইলে নানাবিধ উপসর্গরূপ কৃমীকীট

দংশনে যখন প্রতিনিয়ত ক্লেশ পায়, তখন সেই যন্ত্রণা হইতে অব্যাহতি পাইবার কোন উপায় শ্রবণ কিম্বা দর্শন করিলে তাহা অবলম্বন করিতে ইচ্ছা করে। গৌরাঙ্গদেবের সময়ে লোকদিগের অবস্থা যদিও রজো-তমোভাবে রঞ্জিত হইয়াছিল, কিন্তু তখনও স্থানে স্থানে সত্ত্বগুণ মিশ্রিত থাকায় তাঁহার হরিনাম, সকলে নহে—কেহ কেহ, গ্রহণ করিয়াছিলেন। রূপ সনাতনাদি ব্যক্তিদিগের ন্যায় যাঁহারা কামিনীকাঞ্চনের পূর্ণরূপ দর্শন করিয়াছিলেন, তাঁহারা গৌরাঙ্গদেব প্রদত্ত নামাবলম্বন করিতে পারিয়াছিলেন। যাঁহাদের আকাঙ্ক্ষা সংসারেই পূর্ণ হয় নাই, সাংসারিক উন্নতিদ্বারা যাঁহাদের আশা মিটিয়াছে, তাঁহারা হরিনাম লইবেন কেন? এই জন্য তিনি হরিনাম সম্বন্ধ রাখিয়া সাংসারিক ভাবে অবস্থিতি করিতে সকলকে উপদেশ দিয়াছিলেন। সংসারের এমনি কুটিল কার্য্য যে, মহাপ্রভু হরিনাম সাধনার যে অবস্থা আপনি প্রদর্শন করিয়াছিলেন, চারিশত বর্ষের মধ্যে তাহার সম্পূর্ণ পরিবর্ত্তিত ভাব প্রকাশ পাইয়া গেল। এক্ষণে সত্ত্বগুণ আর নাই, এক্ষণে আর সেরূপ নাম সাধনা নাই, এক্ষণে আর হরিনাম উদ্দেশ্য নাই; এক্ষণে কামিনী-কাঞ্চন সর্ব্বস্ব হইয়া দাঁড়াইয়াছে। কামিনীকাঞ্চন ঈশ্বরের স্থান অধি-কার করিয়া রাখিয়াছে, সুতরাং যাহা লইয়া সাধনা, যথায় ঈশ্বরের বসিবার স্থান, তথায় কামিনীকাঞ্চন বিরাজ করিতেছে; সুতরাং সে স্থানে আর হরিনাম প্রবেশ করিবার উপায় নাই।

বর্ত্তমান কালের নরনারীদিগের প্রকৃতপক্ষে এইরূপ অবস্থা দাঁড়া-ইয়াছে। এক্ষণে গৌরাঙ্গদেবের হরিনামের আর স্থান নাই। কামিনী কাঞ্চনভাব মনকে পরিপূর্ণ করিয়া চারিদিকে উথলিয়া পড়িয়া যাই-তেছে অন্য বস্তুর স্থান হইবে কোথায়? এই নিমিত্ত এখনকার দেশ, কাল, পাত্র এবং উদ্দেশ্য লইয়া বিচার করিলে শ্রীগৌরাঙ্গদেবপ্রদর্শিত

হরিনাম সাধনাও কাল ধর্ম্ম হইতে পারে না। সাধন ভিন্ন কোন কার্য্য হয় না, এ কথা আর অধিক বলিবার প্রয়োজন নাই। কারণ, যাঁহারা হরি বা অন্য দেবদেবীর নাম অবলম্বন করিয়া সংসারে অবস্থিতি করিতেছেন, আমি তাঁহাদের জিজ্ঞাসা করিতেছি, তাঁহারা আপনার অন্তঃপুরে গমনপূর্ব্বক মনকে জিজ্ঞাসা করিয়া দেখুন দেখি, যে আনন্দলাভ দূরে থাকুক, তিনি কালভয় হইতে পরিত্রাণ পাইয়াছেন কি না? যিনি নাম সাধনাদ্বারা এই দুইটী ভাব লাভ করিয়াছেন, তিনিই নামের ফল পাইয়াছেন, তাঁহারই প্রকৃত সাধনা হইয়াছে।

কালভয় হইতে পরিত্রাণ এবং হৃদয়ে নিরবচ্ছিন্ন শান্তিই ঈশ্বর সাধনার প্রথম ফল। তাঁহার দর্শনাদি অনেক দূরের কথা। শান্তি ব্যতীত আমরা একমুহূর্ত্ত স্থির হইতে পারি না। সংসারে যতক্ষণ বিভীষিকা উত্থিত না হয়, ততক্ষণ একপ্রকারে কাটিয়া যাইতে পারে, কিন্তু যে সময়ে বিভীষিকা আসিয়া উপস্থিত হয়, তখন আর কে সে বিপদ হইতে উদ্ধার করিতে পারে? যখন প্রাণের পুত্তলিকা বিসর্জ্জন দিতে হয়, যখন স্ত্রীকে দেহ, মন এবং প্রাণ দ্বিখণ্ড করিয়া জন্মের মত বিদায় দিতে হয়, যখন আপনার পরম সাধের দেহকে পরিত্যাগ করিতে হয়, তখন মনের অবস্থা কি প্রকার হয়? পুত্র মরিতেছে, মরিয়া যাক, একথা কে বলিতে পারেন? স্ত্রী-বিয়োগ হইতেছে দেখিয়া কে আনন্দিত হইতে পারেন? যখন আসন্নকাল উপস্থিত হয়, যখন পরিজনেরা হতাশ হইয়া কি করিবে ভাবিয়া কূল কিনারা দেখিতে না পায়, যখন চিকিৎসক দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া হেট মস্তকে চিন্তিত হয়, তখন সেই ব্যক্তির মন কোথায় যাইয়া আশ্রয় লয়? একবার স্ত্রীর মুখের দিকে চাহিয়া মনে করে যে, এই অবলাকে কোথায় কাহার কাছে রাখিয়া চলিলাম! এ কোথায় যাইবে! কে আর আমার মত ভালবাসিবে!

উহার ব্যথায় কে ব্যথিত হইবে! ইত্যাকার ভাবনায় হৃদয়কন্দর পরিপূর্ণ হইয়া অশ্রু বিসর্জ্জন করিতে থাকে। পুত্র কন্যাদির মুখের দিকে চাহিবার শক্তি থাকে না। তাহাদের কথা স্মরণ হইলে একেবারে ব্যাকুল হইয়া উঠে। নিজের পরিণাম চিন্তার কূল কিনারা থাকে না। কোথায় যাইব ? কি হইবে ? কে আশ্রয় দিবে ? এই ভাবিয়া দশদিক অন্ধকার দেখে। তখন কামিনীকাঞ্চন আর শান্তি বিধান করিতে পারে না। তখন সাধন বিহীন শাস্ত্রাদির জ্ঞানও কোন সহায়তা করিতে পারে না। কিন্তু যাহার সাধনা করা আছে, সেই সাধু সেই সময়ে--সেই পরম সময়ে—সাধন লব্ধ বস্তু পরমেশ্বরের অভয়বাণী প্রাণের ভিতরে শ্রবণ করিয়া থাকেন। তিনি সেই নিদান কালে মধুর স্বরে বলেন, "ভয় কি বাবা! ভয় কি মা ? এই যে আমি তোর পরিত্রাতা আছি—এই যে আমি তোর আশ্রয়দাতা আছি—এই যে আমি তোর ভব জলধি পার করিবার কর্ণধার রূপে অপেক্ষা করিতেছি।" তাহার সকল ভাবনা দূর হয়, সকল চিন্তা কাটিয়া যায়। সে স্ত্রীপুত্রাদিকে সে সময়ে বীর দর্পে বলিতে পারে যে, "ছার মৃণ্ময় পুতুলের ভরসা পরিত্যাগপূর্ব্বক নিত্যপুরুষের পদাশ্রয় গ্রহণ কর, ইহপরকালের আশ্রয় পাইবে।" তখন সেই মুমূর্ষু ব্যক্তি কামিনীকাঞ্চনের বন্ধন ছিন্ন করিয়া প্রাণ ভরিয়া অনাথনাথ দীনবন্ধুকে স্মরণ করিতে করিতে দেহ বাস ত্যাগ করিতে পারে।

যাঁহার সাধন নাই, তাঁহার ধারণাও নাই, সুতরাং সে সময়ে তাহা কখন স্মরণ হইতে পারে না। সময়ে স্মরণ হইবে বলিয়া নানাবিষয় আমরা ধারণা করিয়া রাখি, এ প্রকার ধারণা সাধনা ব্যতীত কখন হয় না। ঈশ্বর সাধনা না করিলে তাহা স্মরণ হইতে পারে না। এইজন্য ঈশ্বর সাধনা ব্যতীত ঈশ্বরের বিষয় কখন মনের অধিকারভুক্ত হইতে

পারে না। এই নিমিত্ত গৌরাঙ্গদেব নাম সাধনা দিয়া গিয়াছিলেন।

যে সময়ে শ্রীগৌরাঙ্গদেব নামসাধনার নিমিত্ত মাগুরমাছের ঝোল, যুবতী স্ত্রীর কোল নির্দ্দেশ করিয়াছিলেন, সে সময়ের নরনারী বর্ত্তমান-কালের ন্যায় বিকৃত হন নাই; তজ্জন্য তাঁহারা নাম সাধনা যে ভাবেই হউক গ্রহণ করিয়াছিলেন। কিন্তু বর্ত্তমানকালে সে ভাবেও কেহ নাম লইতে ইচ্ছা করেন না। আমার এ কথা ভুল বলিয়া অনেকের মনে ধারণা হইতে পারে। যেহেতু, সকলে না হউন, অনেকেই ধর্ম্মানুষ্ঠান করেন, অনেকেই পূজা হোম করেন, অনেকেই কালীঘাটে যান, অনেকেই তীর্থাদি ভ্রমণ করেন, অনেকেই ত্রিসন্ধ্যা করেন এবং অনেকেই সাধনাদির প্রক্রিয়াও করিয়া থাকেন। পাড়ায় পাড়ায় হরিসভা, পাড়ায় পাড়ায় ব্রাহ্মসমাজ এবং স্থানে স্থানে ধর্ম্ম প্রচারও হইতেছে। কিন্তু আমি জিজ্ঞাসা করি যে, এই সকল কার্য্যের উদ্দেশ্য কি? এ কথা বলিতেছি না যে, ইহার ষোল আনাই ভুল; কিন্তু মোটের উপর বলা হইতেছে যে, যদ্যপি প্রত্যেকের উদ্দেশ্য বাহির করিয়া দেখা যায়, তাহা হইলে সাধনা যাহাকে বলে, এই সকল কার্য্যের দ্বারা কি তাহা হইতেছে? সাধনা—ডিবেটিং ক্লব নহে, সাধনা—সভাবিশেষের, কার্য্যবিশেষের ন্যায় নহে, সাধনা—পাঁচ বন্ধু বান্ধবের সমাবেশের কার্য্য নহে, সাধনা—সম্পূর্ণ মনের কার্য্য—নির্জ্জনের কার্য্য—একাগ্র মনের কার্য্য। আমরা জানি যে, যখন কোন পুস্তকের সূত্র কিম্বা মর্ম্ম স্মরণ রাখিবার প্রয়োজন হয়, তখন প্রথমে সেই বিষয়ের ধ্যান করিতে হয়; ধ্যান করিলে তবে তাহা মনের ধারণা হইয়া যায়। যখন যে বিষয় এইরূপে ধারণা হয়, তখন তাহা স্মরণ হইয়া থাকে। এইরূপ ধ্যান ধারণা যখন সাধন ব্যতীত হয় না,

তখন ঈশ্বর বিষয় বিনা সাধনে কি কখন কাহার ধারণা হইতে পারে? সাধনা ভিন্ন ঈশ্বর লাভ হয় না, সাধন ব্যতীত ঐশ্বরিক জ্ঞান হয় না, সাধন ব্যতীত কোন কার্য্যই হইবার নহে। যিনি যে প্রকার পাত্র, যিনি যে প্রকার দেশে বাস করেন, যিনি যে প্রকার অবস্থায় আছেন, তিনি সেই প্রকার সাধন করিতে অবশ্যই বাধ্য।

বুঝিলাম সাধন না করিলে সাধ্যবস্তু লাভ হয় না, কিন্তু সাধন করি কখন? যখন দেশ কাল পাত্র এবং উদ্দেশ্য, এই কারণচতুষ্টয় পরস্পর সহায়তা না করিলে সাধন কার্য্য সিদ্ধ হইবে না, তখন আমাদের সে আশা দুরাশা মাত্র। যে শোণিতসূত্রে জন্ম তাহা কামিনীকাঞ্চনভাবে কলুষিত, যে দেশে বাস তাহা কামিনীকাঞ্চনভাবে কলুষিত, যে সময়ে আমরা পতিত হইয়াছি, তাহাও কামিনীকাঞ্চনভাবে কলুষিত, যে উদ্দেশ্যানুসরণ করিতেছি, তাহাও কামিনীকাঞ্চনভাবে কলুষিত। এ অবস্থায় ঈশ্বর সাধনা হইবে কিরূপে? মুষলমানদিগের প্রথম রাজ্যাধিকারের সময় কোন হিন্দুকে মুষলমানেরা বলিয়াছিল যে, "বল্ আল্লা।" তিনি অমনি "জগদম্বা" বলিয়া উঠিলেন; মুষলমানেরা বলিল, যদ্যপি আল্লা না বলিস্, তাহা হইলে তোর মুখে থুৎকার করিয়া দিব। তিনি পুনরায় জগদম্বা বলিয়া কহিলেন, "মহাশয়! আমি কি করিব। আমার ভিতর জগদম্বা পরিপূর্ণ হইয়া এতদুর বিস্তীর্ণ হইয়াছেন যে, সর্ব্ব শরীরের লোম রন্ধ্র দিয়া তিনি বাহির হইয়া আমায় বর্ম্মাবৃতের ন্যায় ঢাকিয়া রাখিয়াছেন, নয়ন দিয়া জগদম্বা বাহির হইয়া সম্মুখে নৃত্য করিতেছেন। যতক্ষণ মুখ বন্ধ করিয়া রাখি, জগদম্বা হৃদয় হইতে মুখের ভিতরে আসিয়া সঞ্চিত হইয়া থাকেন। তোমাদের কথা বলিব বলিয়া যখনই মুখখুলি, অমনি জগদম্বা উহা ভাসাইয়া লইয়া যান। আমার মুখের ভিতরে আর স্থান নাই, জগদম্বায় পরিপূর্ণ হইয়া গিয়াছে।"

তদ্রূপ কামিনীকাঞ্চনে আমাদিগের অন্তর বাহির পরিপূর্ণ হইয়া রহিয়াছে। হরিনামাদি প্রবেশ করিবার স্থান হইতেছে না।

কামিনীকাঞ্চন ঈশ্বরের নামই প্রবেশ করিতে দিতেছে না, আমরা সাধনা করিব কিরূপে? এক্ষণে জিজ্ঞাস্য হইতেছে যে, তবে আমাদের উপায় কি? আমরা কি এইরূপেই জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিয়া যাইব? আমরা কি অর্থকরীবিদ্যা শিখিয়া অর্থোপার্জ্জন পূর্ব্বক স্ত্রী পুত্র লোক লৌকিকতা রক্ষা করিয়া দিনযাপন করিয়া যাইব? সুখ শান্তির কথায় প্রয়োজন নাই, কিন্তু এইরূপ কামিনীকাঞ্চন অর্থাৎ উদর এবং ইন্দ্রিয়াদির পূজা করিয়া যাইলে কি মনুষ্যের কার্য্য করা হইবে? এই প্রশ্ন মনে উদয় হইলে প্রাণ অমনি ঝঙ্কার দিয়া বলিয়া দেয়, রে মূর্খাধম! তুই মনের পরামর্শে কি ভাবিয়াছিস? দেখ্ দেখ্! চক্ষু মেলিয়া দেখ, কুক্কুর শৃগালের দিকে চাহিয়া দেখ্! দেখ্ গর্দ্দভ! গর্দ্দভাদি জন্তু কি দেখ্ দেখ্! গরু! গরুদিগকে দেখ্! তাহারাও পেট ভরিয়া খায়, শারীরিক পুষ্টিলাভ করে এবং ইন্দ্রিয়াদির সুখাস্বাদনপূর্ব্বক বংশ বিস্তার করিয়া বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের পুষ্টিসাধন করিতেছে। পেট ভরিয়া খাইলে মনুষ্যপদবাচ্য হওয়া যায় না, হিরামুক্তা খচিত বস্ত্র পরিধান করিলে, মনুষ্যপদবাচ্য হওয়া যায় না, রূপলাবণ্যের ভার বহন করিলে মনুষ্যপদবাচ্য হওয়া যায় না, পরিবার পোষণ করিলে মনুষ্যপদবাচ্য হওয়া যায় না; মনুষ্য হইতে হইলে, ঐশ্বরিক জ্ঞানের প্রয়োজন; সে জ্ঞানলাভ করিতে হইলে সাধনার প্রয়োজন। যিনি সাধনা করিয়াছেন, তিনিই প্রকৃত মনুষ্য পদে অভিষিক্ত হইয়া মানবজাতির উপরে একচ্ছত্রী সাম্রাজ্য বিস্তার করিতে পারিয়াছেন। এই পৃথিবীতে—এই হিন্দুস্থানে—এই বঙ্গদেশে—এই কলিকাতায়—কত ধনী, কত রূপবান, কত গুণবান, কত কামিনীবিলাষী ব্যক্তি জন্মিয়াছেন, কোথায় তাঁহারা? কিন্তু কো

যুগে ব্যাস, বাল্মিকী, কপিল, কণাদ জন্মিয়াছিলেন, তাঁহাদের নামে অদ্যাপি রাজরাজেশ্বর হইতে কৃষক পর্য্যন্ত অবনত মস্তকে অবস্থিতি করিতেছেন ; তাঁহারা মনুষ্য,—প্রকৃত মনুষ্য—যে হেতু মনুষ্যের কর্ত্তব্য সাধন দ্বারা তাঁহারা মনুষ্যপদবাচ্য হইয়াছিলেন। অতএব মনুষ্য হইতে হইলে ঈশ্বর সাধন করা প্রত্যেকের কর্ত্তব্য।

কিন্তু পুনরায় কথা হইতেছে যে,আমরা যে অবস্থায় পতিত হইয়াছি, সে অবস্থায় সাধন করিব কিরূপে? আমাদের দুরবস্থা ঘটিবে, তাহা ভগবানের নিয়ম, তন্নিমিত্ত গৌরাঙ্গদেব তাহার ব্যবস্থাও বলিয়া গিয়াছিলেন। ভগবান্ সৃষ্টিকর্ত্তা, সৃষ্টির পাতা, সর্ব্ব কার্য্যের বিধাতা তিনি। আমরা যতক্ষণ আমাদের কর্ত্তব্য বুঝিয়া চলিতে পারি, তিনি ততক্ষণ নিশ্চিন্ত হইয়া তাহা দর্শন করেন। আমরা যখন কর্ত্তব্য জ্ঞান বিস্মৃত হইয়া বিপরীত কার্য্য করিতে কৃতসঙ্কল্প হই, তিনি তখন তাহার প্রতিবিধান করিতে বাধ্য হইয়া থাকেন। যেমন রাজ্যে যতদিন শান্তি বিরাজিত থাকে রাজা ততদিন নিশ্চিন্ত থাকেন, কিন্তু দুর্ব্বৃত্তের উত্তেজনা হইলে তাহার প্রতিবিধান করিতে তিনি ব্যবস্থা করেন। সর্ব্বরাজরাজেশ্বর ভগবান্, যখন লীলার বিকৃত ভাব বিশিষ্টরূপে বদ্ধমূল হইবার উপক্রম হয়, তখন নিজে অবতীর্ণ হইয়া দেশ, কাল, পাত্রানুযায়ী সুব্যবস্থা স্থাপনপূর্ব্বক প্রস্থান করেন।

বর্ত্তমান কালের জীব আমরা, সাধনাক্ষম এবং দুর্ব্বল, কামিনীকাঞ্চনের দাসত্বে দাসখত লিখিয়া দিয়া দয়ার পাত্র হইয়া পড়িয়াছি। উপায় নাই, সম্বল নাই, বল নাই, ভরসা নাই, আপনার কেহ নাই ; আমরা দাস—ভৃত্যের কে আছে? বন্দীর কে আছে? অনাথার কে আছে? পতিতের কে আছে? মাতালের কে আছে? লম্পটের কে আছে? বেশ্যার কে আছে? নাস্তিকের কে আছে? কেহ নাই—কেহ নাই—

কেহ নাই। তাহাদের মুখের দিকে চাহিয়া আহা বলিবার কেহ নাই! এ অবস্থায়, এ বিপদে, বিপদবারণ মধুসূদন ভিন্ন আর কে আসিয়া দাঁড়াইবেন? সংসারে সাংসারিক সম্বন্ধে সকলেই আবদ্ধ,নিজ নিজ স্বার্থ লইয়া সকলের সহিত সম্বদ্ধ। যাহার স্বার্থ নাই, সে কথা কহিবে না, সে দুঃখ ভাবিবে না, সে করুণ রোদন শুনিবে না। যাহার স্বার্থ আছে, সে স্বার্থহানির জন্য কেশাকর্ষণ করিবে, সহস্র পাদুকাঘাত করিবে, তাহাকে যমালয়ে পাঠাইয়াও নিশ্চিন্ত হইবে না। এইরূপ আমাদের দুর্গতি দেখিয়া দুর্গতিনিবারক ভগবান্ রামকৃষ্ণরূপে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন।

আমরা কেহ সাধন করিতে পারিব না, কেহ সংসার ছাড়িতে পারিব না, কামিনীকাঞ্চনের হস্ত হইতে অব্যাহতি পাইব না বলিয়া, তিনি নিজে আমাদের হইয়া সাধন করিয়া গিয়াছেন। সাধন বিনা ভগবান্ লাভ হয় না, ইহা ভগবানের বিধান; ভগবানের বিধান কখন খণ্ডন হয় না। কিন্তু দেশ, কাল, পাত্র বিচার করিয়া সাধনার ব্যবস্থা করাও তাঁহার নিয়ম। সেই নিয়মানুযায়ী বর্ত্তমান কালে কার্য্য হইবে বলিয়া কলির জীবের নিমিত্ত আপনি সর্ব্বমতের সাধনা পূর্ব্বক শাস্ত্রের মর্য্যাদা রক্ষা এবং সেই সঙ্গে বকল্‌মা ভার দিবার জন্য নরনারীদিগকে আজ্ঞা করিয়া গিয়াছেন।

আজ সেইদিন উপস্থিত। যেদিন দীননাথ দীনের দুঃখে কাতর হইয়া বাহু প্রসারণপূর্ব্বক করুণাবারি ঢালিয়াছিলেন। আজ সেই ইংরাজী বৎসরের প্রথম দিন, যেদিন রামকৃষ্ণদেব, "সকলের চৈতন্য স্ফূর্ত্তি হউক" বলিয়া আশীর্ব্বাদ করিয়াছিলেন। আজ সেই শুভ দিন, যে দিন প্রভু আমার কল্পতরু হইয়া আপামরকে কৃতার্থ করিয়াছিলেন! কোথায় প্রভু রামকৃষ্ণ! আজ সেই দিন উপস্থিত, আজ সেই আমরা আপনার করুণা ভিক্ষার জন্য ভিখারী হইয়া উপস্থিত হইয়াছি, একবার

সেইরূপ ভাবে উদয় হউন, একবার সেই ভুবনমোহন রূপে প্রকাশিত হউন,একবার সেইরূপে কল্পতরু হইয়া আমাদের সম্মুখে দাড়ান, আমরা প্রাণ ভরিয়া দর্শন করিয়া লই, মনের কথা বলিয়া আক্ষেপ মিটাইয়া লই। ঠাকুর! একবার দেখা দিন! একবার আমাদের সেইরূপে অভয় বাক্য শ্রবণ করান, আমরা নিঃশঙ্কচিত্তে রামকৃষ্ণের বিজয় নিশান উড্ডীয়মান করিয়া চলিয়া যাই। আজ অতি শুভ দিন। আজ বৎ-সরের প্রারম্ভ। আমাদের নব বৎসর না হইলেও অদ্যকার দিনের ন্যায় এমন দিন দীনের ভাগ্যে আপাততঃ কখন ঘটে নাই। এই দিনে—এই ১লা জানুয়ারী তারিখে—ইং ১৮৮৬ সালের ১লা জানুয়ারি দিনে—দীননাথ দীনবন্ধু রামকৃষ্ণদেব কল্পতরু হইয়া সাধনভজনবিহীন প্রত্যেক ব্যক্তিকে কৃপা করিয়াছিলেন এবং সেই দিন দয়াময় দয়া করিয়া আমাদের সকলকে সম্বোধন পূর্ব্বক বলিয়াছিলেন যে, "আর আমি কি বলিব, আমি আশীর্ব্বাদ করি, তোমাদের সকলের চৈতন্য হউক!" তদবধি যে কেহ রামকৃষ্ণ নাম গ্রহণ করিতেছেন, তাঁহারই চৈতন্যোদয় হইতেছে। হে দয়াল প্রভু রামকৃষ্ণ! কোথায় ঠাকুর! আজ সেই ১লা জানুয়ারীর দিন,—আজ আপনার সেই প্রেমভাণ্ড ভঙ্গ করিবার দিন—আজ আমরা সকলে আপনার কৃপাকণার প্রত্যাশায় অপেক্ষা করি-তেছি। একবার দেখা দিন,—একবার সেই ভুবনমোহন রূপে আজ আমাদের সমক্ষে উদয় হইয়া দক্ষিণ বাহু প্রসারণপূর্ব্বক সেই অমৃত বাণি বলুন—আমাদের প্রাণ শীতল হউক! দুর্ব্বল আমরা, দুর্ব্বলের বল আপনি, কোথায় প্রভু! কোথায় দয়াময়! কোথায় অগ-তির গতি পতিতপাবন! আসুন! একবার আসুন! আপনি যেমন দয়া করিয়া আমাদের কৃপা করিয়াছেন, যেমন দয়া করিয়া আমাদের কথা শুনিতেন, কাহার জন্য অনুরোধ করিলে যেমন গ্রাহ্য করিতেন,

আমরা কৃতাঞ্জলিপুটে প্রার্থনা করিতেছি, প্রভু! যেমন করিয়া আমাদের বন্ধন ছেদন করিয়াছেন, যেমন করিয়া আমাদের মোহ-মায়া দূর করিয়াছেন, যেমন করিয়া হৃদয়ে চৈতন্যোদয় করিয়াছেন, যেমন করিয়া কামিনীকাঞ্চনের অন্তর্ভেদ করিয়া দিয়াছেন, যেমন করিয়া আপনার পথে ভ্রমণ করিতে শিখাইয়াছেন, তেমনি করিয়া আজ সকলের হৃদয়ে উদয় হউন! সকলের রাজসিক তামসিক ভাব বিদূরিত করিয়া সত্ত্বগুণের উদ্রেক করিয়া দিন! সকলে আপনাকে আপনি চিনিতে পারুন, সকলে আপনার কর্ত্তব্য বুঝিয়া লউন, এই সংসার স্বর্গপুরী হউক!

আজ অতি আনন্দের দিন—আজ দীন হীনের পরিত্রাণের দিন—যে কেহ দীন আছেন, যে কেহ পরমপদার্থের কাঙ্গাল কাঙ্গালিনী হইয়াছেন, আজ একবার রামকৃষ্ণ বলিয়া দেখুন—রামকৃষ্ণ নামে ইষ্টলাভ হইয়া পরম পুলকে সংসারার্ণব অতিক্রমপূর্ব্বক শান্তিনিকেতনের বিমল ছায়ায় বসিয়া দিনযাপন করিয়া যাইবেন।

গীত।

(১)

চাহি চরণে তোমার।
দেহ বল দুর্ব্বল প্রাণে গুণ বর্ণিবার॥
মায়া ঘোরে ঢাকে আঁখি না দেখি তোমায়,
তোমার কৃপায় তোমায় পায়, নাইত আর উপায়;—
দয়া করি দাও হে দেখা নিবারি মোহ আঁধার॥
কলির জীব সাধন ভজন করিবা কখন,
ভাবি পরকে আপন, সর্ব্বস্বধন কামিনীকাঞ্চন;—
প্রাণ চায় না যেতে, তোমার পথে,
জোর ক'রে নে যাও এবার॥

(২)

ডাকরে জপরে মন প্রাণ ভরে ।
সে ধনে যতনে রাখ হৃদয় মাঝারে ॥
জন্মাবধি ছেলে খেলা, সতত জড়িত জ্বালা,
সাধের সংসার মলা বহিছ ধীরে ;—
পতিত চিন্তিত ভীত বিপদ সাগরে ॥
উপায় ভরসা নাই, বল কার মুখ চাই'
কে দিবে চরণে ঠাঁই, কে দীনে তারে ;-
ডাক সে অনাথনাথে সদা সকাতরে ॥

(৩)

প্রেমময় হরি, জীবে কৃপা করি, ধরাধামে হের এসেছে ।
পাপী তাপী জনে, যে আছে যেখানে, করুণ বচনে ডাকিছে ॥
কল্পতরু হয়ে, দেখরে দাঁড়ায়ে,
ছল ছল আঁখি চায় ।
বাহু প্রসারিত, কে আছ পতিত,
জুড়াও তাপিত কায় ॥
দিন যায় বয়ে, সরল হৃদয়ে,
প্রাণ মন পদে সঁপনা ।
কত দিন আর স'বে দুঃখ ভার,
রামকৃষ্ণ সাধে বল না ॥
(হের) দীন হীন জন, নাহিক সাধন,
কৃপা বারি সবে লভিছে ॥

(৪)

সত্য ত্রেতা আদি দ্বাপর অবধি শুনেছি নিয়ম সার।
বিনা নিরশন, কঠোর সাধন, বিভু দরশন ভার॥
অন্নগত জীবে শক্তি না সম্ভবে,
তাই এলে ভবে ভক্তি শিক্ষা দিবে,
তাও যেবা নারে, নাম দিলে তারে,
উথলে ভকতি স্মরণে তার॥
বিজ্ঞান ব্যাপিত নেহারি মেদিনী,
নাহি চায় কেহ নীরস কাহিনী,
শুনে সেই বাণী, সত্য হৃদে মানি,
শান্তি আনে প্রাণে শ্রবণে যার
বুঝি সে কারণ, পতিতপাবন, তব আগমন ভবে এবার ;—
বলির বন্ধন, কালিয় দমন, নহে দশানন নাশিবার॥
বিজ্ঞান জিনিতে জ্ঞান প্রয়োজন,
তেজহীন নরে না করে ধারণ,
সহজে শিখালে, নামে প্রেম ঢেলে,
গ'লে গেল জ্ঞান বিজ্ঞান আর॥
নতশির জ্ঞান চাহে ও চরণ,
ভক্তি করে ধীরে ও পদ বন্দন,
যুগল মিলন, প্রেম প্রস্রবণ, জ্ঞান ভক্তি একাকার ;—
হের জীব রামকৃষ্ণ পূর্ণ অবতার॥

রামচন্দ্রের বক্তৃতাবলী।

একাদশ বক্তৃতা।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেব কথিত

সাধনের স্থান নির্ণয়।

১৩০০—২৩এ মাঘ, রবিবার—মিনার্ভা থিয়েটারে

প্রদত্ত।

৫৯ রামকৃষ্ণাব্দ।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ
শ্রীচরণ ভরসা।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেব কথিত

সাধনের স্থান নির্ণয়।

ব্রাহ্মণাদি সকলের চরণে প্রণাম।

ঈশ্বর সাধনা সম্বন্ধীয় বক্তৃতাকালীন প্রভুর আজ্ঞায় আমি বলিয়াছি যে, উদ্দেশ্য, দেশ, কাল এবং পাত্র, এই কারণচতুষ্টয়ের সংযোগ হইলে সাধন কার্য্য সম্পূর্ণ হইয়া থাকে।

যদিও আমি সে দিন এই কারণচতুষ্টয় লইয়া সংক্ষেপে আলোচনা করিয়াছি, কিন্তু সাধন বিষয়টী যারপরনাই কঠিন এবং সহজে আমাদের বোধগম্য হইলেও উহা ধারণা করা অতীব আয়াসসাধ্য। তজ্জন্য উক্ত কারণ গুলির মধ্যে অদ্য দেশ অর্থাৎ সাধনের স্থান সম্বন্ধে পুনরায় আন্দোলন করিবার মানসে সাধারণের সমীপে দণ্ডায়মান হইয়াছি, এক্ষণে প্রভুর ইচ্ছা যাহা, তাহাই হইবে। সাধনের স্থান নিরূপণ করা অদ্যকার সঙ্কল্পিত বিষয় বলিয়া কথিত হইল বটে, কিন্তু ফলে কারণচতুষ্টয় লইয়াই আলোচনা করিতে হইবে। কারণ একটীকে ধারণ করিতে যাইলে চারিটীই আসিতে বাধ্য হইয়া থাকে। সে যাহা হউক, রামকৃষ্ণদেব বলিয়া গিয়াছেন যে,

"ধ্যান করিবে মনে, কোণে এবং বনে।"

প্রভু ধ্যান করিতে বলিয়াছেন। কিন্তু আমি গত বক্তৃতায় নাম

সাধনা কলির যুগধর্ম্ম বলিয়া উল্লেখ করিয়া অসমর্থদিগে পক্ষে রামকৃষ্ণে বকল্‌মা দিবার ব্যবস্থা উল্লেখ করিয়াছি। এক্ষণে অনেকের মনে সন্দেহ হইতে পারে, অনেকে এই কথায় প্রতিবাদ করিতে পারেন যে, এক সময়ে এক প্রকার ব্যবস্থা না হইয়া তাহার প্রকারান্তর হইবার হেতু কি? কলিকালের যুগধর্ম্মে ধ্যান নাই বলিয়া বার বার কথিত হইয়াছে, কিন্তু রামকৃষ্ণদেব সেই ধ্যানেরই ব্যবস্থা করিয়া গিয়াছেন, অতএব সর্ব্বাগ্রে ধ্যান, নাম এবং বকল্‌মা, এই তিনটী বিষয়ের মীমাংসা হওয়া আবশ্যক।

ধ্যান শব্দের তাৎপর্য্য কি? মনোমধ্যে কোন বস্তু বা বিষয় লইয়া ভাবনা করার নাম ধ্যান। ঈশ্বর বিষয় ব্যতীত বিষয় সম্বন্ধে মনের ঐরূপাবস্থার নাম চিন্তা এবং ঈশ্বর সম্বন্ধে ধ্যান শব্দ প্রয়োগ হইয়া থাকে। ফলে মনের ভিতরে ভগবান্ ভাবনা করিবার নাম ধ্যান। ধ্যানে মনের কার্য্য প্রকাশ পাইয়া থাকে।

মুখে নাম করা যায়, সুতরাং ইহাতে মনের সম্বন্ধ নাই বলিয়া অনেকের সংশয় আসিতে পারে। নাম যে কেবল মৌখিক বিষয় এবং মনের অধিকার বহির্ভূত, তাহা কখনই নহে। নাম করিবার পূর্ব্বে মনের ভিতরে নামের তাৎপর্য্য বোধ অবশ্যই হইয়া থাকে। যে পর্য্যন্ত মনে নাম পরিব্যাপ্ত না হয়, সেই পর্য্যন্ত কাহার মুখে ভগবানের নাম বাহির হইতে পারে না। মনের সহিত নামের সম্বন্ধ ব্যতীত যে নামোচ্চারণ করা যায়, তাহাকে নাম সাধনা বলা যায় না।

বকল্‌মায় আত্মনিবেদনের ভাব আছে। যাঁহাদের সাধনাদি করিবার শক্তি নাই, তাঁহাদের পক্ষে বকল্‌মার বিধি বিধায় তথায় মানসিক কার্য্য নাই বলিয়া সাব্যস্থ করা বিধেয় নহে। বকল্‌মায় যদিও সাধনা বলিয়া কোন বিশেষ প্রকার মানসিক কার্য্য করিতে হয় না, কিন্তু

যাঁহাতে আত্ম নিবেদন করিতে হয় বা বকল্‌মা দেওয়া যায়, তাঁহাতে সর্ব্বক্ষণ মন লিপ্ত হইয়া থাকে, সুতরাং তথায় মনের সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন হইতে পারে না। ধ্যানেই হউক, নামেই হউক এবং বকলমায়ই হউক, মনের সম্বন্ধ অতিক্রম করিয়া কোন কার্য্যই হইবার সম্ভাবনা নাই।

ধ্যান, নাম এবং বকল্‌মা, তিনটী স্বতন্ত্র শব্দ হইলেও এবং এই তিনটী শব্দের স্বতন্ত্র কার্য্য হইলেও ইহাদের উদ্দেশ্য একই প্রকার। ধ্যানের উদ্দেশ্য ভগবান্, নামের উদ্দেশ্য ভগবান্ এবং বকল্‌মার উদ্দেশ্য ভগবান্। মনের ভাবকে উদ্দেশ্য কহে, অতএব এই তিনটী ভিন্ন ভিন্ন সাধনার তাৎপর্য্য এক ভাবেই পর্য্যবসিত হইতেছে। এই ভাব মনের, সুতরাং উক্ত ত্রিবিধ কার্য্যে মনের সম্বন্ধ আছে বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে।

ধ্যান, নাম এবং বকল্‌মা, এই তিনটীর কার্য্য পর্য্যালোচনা করিয়া দেখিলে বুঝা যায় যে, নাম এবং বকল্‌মা ধ্যানের হেতুবিশেষ। কারণ, ধ্যান করা সাধকের প্রথম সাধনা নহে।

ধ্যানের যোগ্যতা লাভ করিবার নিমিত্ত সাধক সর্ব্বপ্রথমে মন্ত্র জপ করিয়া থাকেন। জপে সিদ্ধ হইলে তিনি ধ্যানের অধিকারী হইতে পারেন।

জপের উদ্দেশ্য এবং কার্য্য যেরূপ, নামের উদ্দেশ্য এবং কার্য্যও সেইরূপ। জপ এবং নাম একই প্রকার, কেবল সাধনায় কিঞ্চিৎ পার্থক্য দেখা যায়।

জাপক সর্ব্বাগ্রে মুখে মন্ত্রোচ্চারণ করিতে শিক্ষা করেন, মন্ত্র সম্পূর্ণ কণ্ঠস্থ হইলে ক্রমে তাহা মনে প্রবেশ করিয়া থাকে। সাধক যখন মনে মনে মন্ত্র জপ করিতে সক্ষম হন, তখন তিনি ধ্যান করিবার অধিকারী

হইয়া থাকেন। অতএব ধ্যান বলিলে সাধকের সাধনায় তৃতীয়াবস্থা বুঝাইয়া থাকে। যথা, প্রথমে মুখে মন্ত্র জপ বা নাম করা, দ্বিতীয়াবস্থায় উহা মনে মনে জপ করা এবং তৃতীয়াবস্থায় মন্ত্র বা নাম অথবা মন্ত্র এবং রূপ মনের সহিত একাকার হইয়া যাওয়া, এই অবস্থাকে ধ্যান কহা যায়। নাম সাধনায় ভগবানের নাম লইয়া উপর্য্যুপরি উচ্চারণ করিতে হয়। এই কার্য্যটী ঠিক জপের ন্যায়। নাম বলিতে বলিতে ক্রমে উহা মনোময় হইয়া যায়, তখন নামসাধকের অবস্থার সহিত ধ্যানীর বিশেষ কোন প্রভেদ থাকে না। ধ্যানীর মনে ভগবানের রূপ বা নাম, নামসাধকের মনেও নাম এবং রূপ। অতএব এই দুই সাধকের ভাব একপ্রকার।

বকল্‌মায়ও জপ এবং নাম। এই সাধনাও সম্পূর্ণ মানসিক। কারণ ভগবানে আত্মোৎসর্গ করিতে হইলে প্রথমে ভগবান্ বলিয়া ধারণা হওয়া চাই, এরূপ বিচার মুখের কার্য্য নহে, তাহা মনের দ্বারা সাধিত হয়। মন যখন এই প্রকার বিচারে লিপ্ত থাকে, তখন তাহাকে ধ্যান কহা যায়। বিচারাবসান হইলে আত্মোৎসর্গ করিবার পর মুখে ভগবানের নাম এবং মনে তাঁহার রূপ বিরাজিত থাকে। এই নিমিত্ত তাহা মনের কার্য্য বলিয়া সে অবস্থাকেও ধ্যান বলা কর্ত্তব্য।

ধ্যান, নাম এবং বকল্‌মা, এই তিনটী মনের কার্য্য বলিলেও সাধনায় তাহাদের সম্পূর্ণ পার্থক্য ভাব লক্ষিত হয়। এই জন্য রামকৃষ্ণদেব সাধক মাত্রেরই ধ্যান করা অনিবার্য্য বলিয়া তাহার স্থান নির্দ্দেশ কালে 'বনে; কোণে এবং মনে' উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন। সাধক যে প্রকার সাধনপ্রণালীমতে সাধনা করিতে প্রবৃত্ত হউন না কেন, সাধন করিতে হইলে স্থানের বিশেষ প্রয়োজন। ইচ্ছামত তাহা হইতে পারে না। যেমন আমাদের তিনটী সাধনার বিষয় বলিয়া উল্লিখিত

হইয়াছে, যথা ধ্যান, নাম এবং বকলমা, স্থান নির্ণয় সম্বন্ধেও প্রভু তিনটী স্থান দেখাইয়া গিয়াছেন, যথা মনে, কোণে এবং বনে। এই বিষয়টী বিচার করিতে হইলে সাধকদিগের অবস্থার দিকে দৃষ্টিপাত করিতে হইবে। মনে, কোণে এবং বনে বলিলে বকলমা, নাম এবং ধ্যানের অধিকারীবিশেষের কথা বলিয়া জ্ঞান হইয়া থাকে। অর্থাৎ কোন সাধক বকলমার অধিকারী, কোন সাধক নামের অধিকারী এবং কোন সাধক ধ্যানের অধিকারী। যে সাধক যে প্রকার অধিকারী, তাহার উদ্দেশ্য রক্ষা করিতে হইলে সেই প্রকার স্থানের অবশ্য প্রয়োজন হইয়া থাকে। যেমন বরফ কিম্বা ইথারাদি পদার্থকে উষ্ণ স্থানে রাখা যায় না, তাহাদের স্থান স্বতন্ত্র, তেমনি উদ্দেশ্যবিশেষ রক্ষা করিতে হইলে স্থানবিশেষেরও বিশেষ আবশ্যক হইয়া থাকে।

উল্লিখিত মনে কোণে এবং বনে, এই শব্দত্রয়ের তাৎপর্য্য বহির্গত করিলে মনে ও কোণের দ্বারা সংসারের ভিতরে এবং বনের দ্বারা সংসারের বাহিরে এই দুইটী স্থান নির্দ্দেশ করিতে হয়। সংসারে থাকিয়া সাধন করিতে হইলে মন এবং কোণ, সংসারের বাহিরে বনে ধ্যান সাধনা করিবার অভিপ্রায়। ফলে ধ্যান করিতে হইলে সংসার ত্যাগ করিবার এবং মন ও কোণ পর্য্যন্ত সংসারের ভিতরের কথা।

পূর্ব্ব বক্তৃতায় বলিয়াছি যে, মন লইয়াই সাধনা, মনের পূর্ণতা লাভ করিতে না পারিলে কখন সাধকশ্রেণীভুক্ত হওয়া যায় না। মনের ধারণাশক্তি বৃদ্ধি না হইলে কখন ধ্যানাবলম্বন পূর্ব্বক চিত্ত নিরোধ করিতে কৃতকার্য্য হওয়া যায় না। চিত্ত নিরোধ করিতে পারিলে তবে সময়ে সমাধিস্থ হইবার সুরাহা জন্মিতে পারে।

ধ্যানী হইতে হইলে পূর্ণ মনের প্রয়োজন। মনের পূর্ণতা সাধন করা

সাধনের প্রথম কার্য্য। অতএব পূর্ণ মন প্রাপ্ত হইবার জন্য বনই একমাত্র স্থান। সংসারের ভিতরে বাস করিয়া কখন কোন রূপে মনের পূর্ণতা রক্ষা করা যায় না। একথা বার বার বলা হইয়াছে এবং অদ্য তাহাই বলিতেছি।

মনের পূর্ণাবস্থা বলিলে অন্য কোন ভাব তাহাতে উপস্থিত থাকিবে না। যদ্যপি সমুদায় ভাব হইতে মন পরিষ্কৃত না হয়, তাহা হইলে ধ্যান করিবার সময় অন্যান্য ভাব আসিয়া সর্ব্বদা বিভীষিকা সমুত্থিত করিয়া থাকে। বিশেষতঃ, যাহার মনে যে ভাব অধিক পরিমাণে সঞ্চিত থাকে, বা ধ্যানের পূর্ব্বে যে ভাব উপস্থিত থাকে, নয়ন মুদ্রিত করিবামাত্র সেই ভাব আসিয়া মানসক্ষেত্রে নৃত্য করিতে থাকে। মনের এমন অবস্থায় কখন ঈশ্বরের ধ্যান হইতে পারে না। অতএব ধ্যানী হইলে অন্যান্য ভাব বিবর্জ্জিত হইয়া থাকা সর্ব্বতোভাবে বিধেয়। যেমন কর্দ্দমমিশ্রিত জলে সূর্য্য চন্দ্র দেখা যায় না, তেমনি অন্যান্য ভাবরূপ কর্দ্দম, মনরূপ জল হইতে পৃথক না হইলে ভগবানের প্রতিবিম্ব কখনই দেখা যায় না; অপরিষ্কৃত মন লইয়া কেবল চক্ষু বুজিয়া থাকা ধ্যানের মর্ম্ম নহে। ধ্যান করা বাহিরের কোন কার্য্য নহে, উহা সম্পূর্ণ মনের কার্য্য। মনকে ভগবানের ভাবে একীকরণ করাকে ধ্যান কহে। আমরা সংসারে যে ভাবে এবং যে অবস্থায় অবস্থিতি করিয়া থাকি, তাহাতে মনের পূর্ণতা রক্ষা হওয়া দূরে থাকুক, মন বলিয়া কোন বস্তু পাওয়া যায় না। মন বলিয়া যাহা জ্ঞাত হওয়া যায়, তাহা মনের ছায়া মাত্র। ছায়ার দ্বারা প্রকৃত পক্ষে কোন কার্য্য হয় না। তরবারির ছায়া যদিও তরবারির ন্যায় দেখায় বটে, কিন্তু তদ্দ্বারা কোন বস্তু কর্ত্তন করা যায় না। সংসার দ্বারা মন দুই ভাবে আকৃষ্ট হইয়া থাকে। প্রথম, বিষয়াদি দ্বারা সংস্কারগ্রস্ত এবং দ্বিতীয়, কামিনী দ্বারা হীনবল ও স্বতন্ত্র

প্রকার সংস্কার প্রাপ্ত হওয়া। এই অবস্থায় মনের এমন স্থান থাকে না, যথায় ভগবানের ভাব স্থান পাইতে পারে।

সংসারক্ষেত্রে দেখিতে পাওয়া যায় যে, সাংসারিক নরনারীরা যখন কোন ধর্ম্ম কর্ম্ম করিবার সঙ্কল্প করিয়া থাকেন, তাহা সাংসারিক ভাব বিমিশ্রিত হইয়া পড়ে। যথা, অপুত্রক স্থানে পুত্র কামনা, অর্থাভাব স্থলে অর্থ কামনা, সম্মানাদির বিরহাবস্থায় মান সম্ভ্রম আকাঙ্ক্ষা করা প্রভৃতি কামনাসংযুক্ত ভাবে ধর্ম্মানুষ্ঠান করা হয়।

সংসারের ভাব সম্পূর্ণ দৈহিক এবং তাহা প্রাপ্ত ও রক্ষা করিবার নিমিত্তই মানসিক বৃত্তি সকল সর্ব্বদা নিয়োজিত থাকে। যেমন ধনো-পার্জ্জন করা শারীরিক সুখ স্বচ্ছন্দতার নিমিত্ত, অবস্থাসঙ্গত উত্তম বাসস্থান প্রস্তুত করা শারীরিক সুখ স্বচ্ছন্দতার নিমিত্ত, অবস্থাসঙ্গত উত্তম ভোজন করা শারীরিক সুখ স্বচ্ছন্দতার জন্য, কামিনী সহবাস করা শারীরিক সুখ স্বচ্ছন্দতার জন্য এবং পুত্রাদি পরিবেষ্টিত হইয়া থাকা শারীরিক সুখ স্বচ্ছন্দতার নিমিত্ত, এই অবস্থায় মানসিক আনন্দ আছে বটে, কিন্তু তাহা শরীরের সহিত সম্পূর্ণ ভাবে জড়িত। মন যদ্যপি দৈহিক সম্বন্ধে আবদ্ধ থাকে, তাহা হইলে সে মন স্বাধীন না হইলে কেমন করিয়া ধ্যান করিবার যোগ্যতা লাভ করিতে পারে? এই নিমিত্ত কাহাকেও ধ্যানী হইতে হইলে বনই তাহার এক মাত্র স্থান, জানিতে হইবে।

ধ্যান করিবার জন্য বনই নির্দ্দিষ্ট স্থান, সে পক্ষে কোন মতে মতা-ন্তর হইতে পারে না। মনকে পূর্ণ ভাবে পরিণত করিতে না পারিলে কখন ধ্যানের ফললাভ করা যায় না। মনের পূর্ণতা লাভ করিতে হইলে মনের ধারণা শক্তি প্রকাশিত হইবার সময় হইতে সাংসারিক ভাবের লেশমাত্র উহাতে সংস্পর্শিত হইতে দেওয়া কর্ত্তব্য নহে। এই নিমিত্ত

প্রভু বলিতেন যে, ভাজনা খোলা হইতে যে খৈটী ভূমিতে ছিট্‌কাইয়া পড়ে, সে খৈটী নিদাগী হয়। ভাজনা খোলায় যে খৈগুলি থাকে, তাহারা সম্পূর্ণরূপে পুড়িয়া না যাউক, কিন্তু স্থানবিশেষে কিঞ্চিৎ পোড়া দাগ থাকিবেই থাকিবে। সংসারে সাধনা সেই প্রকার। অতি চতুর সাধক হইলেও সাংসারিক ভাবরূপ অন্ততঃ কিঞ্চিৎ দাগ তাঁহার মনে লাগিবেই, তাহাতে সন্দেহ নাই। মনে যদ্যপি কিঞ্চিৎ সাংসারিক ভাব থাকিয়া যায়, তাহা হইলে ধ্যানে ততদূর ব্যাঘাৎ জন্মিবে, সুতরাং সাধনের পূর্ণ ফললাভ করা গেল না। তিনি আরও বলিতেন, যেমন কোন ফলে যদ্যপি কোন পক্ষীর চঞ্চ্যাঘাত হয়, সে ফল আর ঠাকুরের সেবায় লাগে না, সেইরূপ যে মনে সাংসারিক অর্থাৎ কামিনীকাঞ্চনের ভাব যৎসামান্য রূপেও পতিত হয়, সে মনের দ্বারা কখন ধ্যান হইতে পারে না। অতএব সাংসারিক ভাববিবর্জ্জিত মন না হইলে তদ্দারা কস্মিন্ কালে ধ্যান করা যায় না। এই নিমিত্ত রামকৃষ্ণদেব ধ্যানের স্থান বন বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন।

এক্ষণে কথা হইতে পারে যে, যাঁহাকে ধ্যান করিতে হইবে, তাঁহা-কেই সংসার ত্যাগ করিয়া বনবাসী হহতে হইবে? তাঁহাকেই সাধের স্ত্রী, পুত্রাদি, ধনৈশ্বর্য্য, পিতা, মাতা পরিত্যাগ করিতে হইবে? ধ্যানী হইবার জন্য যাঁহার বাসনা সঞ্চারিত হইবে, তাঁহার পক্ষে বনই ব্যবস্থা। কিন্তু এ কথাটা স্মরণ রাখিতে হইবে যে, সাংসারিক ভাবসংযুক্ত মন লইয়া যদিও কেহ বনে গমন করেন, তথায় তাঁহার সর্ব্বকালে কল্যাণ হয় না। যে সময়ে সাংসারিক অর্থাৎ কামিনীকাঞ্চন ভাব উদ্দীপক কারণস্বরূপ হইবে, সেই সময়ে তাহার পূর্ব্ববর্ত্তী কারণস্বরূপ পূর্ব্ব সংস্কার প্রকাশিত হইয়া সমবর্ত্তী ও পরবর্ত্তী কারণ সহায়তা করিলে দৈহিক কার্য্যবিশেষ সংঘটিত হইতে কাল বিলম্ব হইবে না। যদিও সমবর্ত্তী

এবং পরবর্ত্তী কারণদ্বয় অনুকূল না হইলে কার্য্যবিশেষ সম্পূর্ণ না হউক, কিন্তু উদ্দীপক কারণ দ্বারা ভাববিশেষ উত্তেজিত হইলে ধ্যানের যথেষ্ট অপকার হইবার সম্ভাবনা। ধ্যানীর উদ্দেশ্য অনন্ত চিন্তা করা, তাঁহাকে স্থূল সূক্ষ্ম কারণাদির চিন্তা পরিত্যাগ পূর্ব্বক মহাকারণের ভাব মনে ধারণা করিতে হইবে। যদ্যপি এমন অবস্থায় স্থূলের কার্য্য লইয়া মনকে অবস্থিতি করিতে হয়, যদ্যপি স্থূলের ভাব দ্বারা মনকে ব্যাপৃত করা যায়, তাহা হইলে সাধকের এরূপ সাধনা বিড়ম্বনাবিশেষ হইয়া পড়ে। যেমন কোন ব্যক্তিকে ত্রিতল অট্টালিকায় আরোহণ করিতে হইবে। সে ব্যক্তি যদ্যপি একটী দুইটী সোপানে উঠিয়া ক্রমাগত নাবিয়া ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিয়া বেড়ায়, তাহা হইলে কখন ত্রিতল গৃহে গমন করা তাহার অদৃষ্টে ঘটিতে পারে না। ধ্যানেরও অবিকল সেইরূপ অবস্থা জানিতে হইবে।

কথিত হইয়াছে যে, পূর্ণ মন না হইলে ধ্যানের অধিকারী হওয়া যায় না। সেইজন্য কামিনীকাঞ্চন ভাব হইতে মনকে সম্পূর্ণ ভাবে রক্ষা করা ধ্যানীর সর্ব্ব প্রথম এবং সর্ব্বদা তাহাই তাঁহার বিশেষ কার্য্য হইয়া থাকে। কামিনীকাঞ্চন হইতে রক্ষা পাইতে হইলে সুতরাং যে স্থানে সে ভাব গমন করিতে না পারে, সেই স্থানে তাঁহাকে বাস করিতে হয়; অতএব অত্যন্ত জনশূন্য স্থানই তাঁহার পক্ষে বিধেয়।

ধ্যানের স্থান যে প্রকার কথিত হইয়াছে, তাহার উদ্দেশ্য বাহির করিলে পাত্রের এইরূপ অবস্থা হওয়াই কর্ত্তব্য। সংসারীদিগের পক্ষে এ সাধনা নহে। কারণ সংসারী যাঁহারা, তাঁহারা মন প্রাণ সংসারে সমর্পণ করিয়াছেন। সে ভাব পরিত্যাগ করা তাঁহাদের পক্ষে সাধ্যাতীত এবং যদ্যপি অবস্থাবিশেষে কেহ সাংসারিক ভাব হইতে অব্যাহতি পান, তাহা হইলেও তিনি সর্ব্ব সময়ে ধ্যানের যোগ্যতা লাভ

করিতে পারেন না, কারণ ধ্যান করিতে হইলে মনকে সংসার ভাব হইতে এক কালে পৃথক করিতে না পারিলে কখন ধ্যানী হওয়া যায় না। অতএব ধ্যান করিবার স্থল সংসারের বাহিরে।

ধ্যানপরায়ণ নরনারীদিগের স্থান বন, কখন সংসার নহে। সাংসারিক নরনারীদিগের মানসিক উদ্দেশ্যের সহিত ধ্যানীদিগের উদ্দেশ্য কখন মিলিতে পারে না। ইহাদের উভয়ের ভাব সম্পূর্ণ বিরুদ্ধধর্ম্মযুক্ত। এক পক্ষের ভাব সংসার ত্যাগ, আর এক পক্ষের ভাব তাহা রক্ষা করা। এই বিরুদ্ধ ভাববিশিষ্ট নরনারীর পক্ষে কখন এক স্থান হইতে পারে না। ইহারা উভয়ে উভয়ের ক্ষতি করিয়া থাকেন। যাঁহারা সংসারে থাকিয়া সাংসারিক ভাবের মস্তক মুণ্ডন করিতে চেষ্টা করেন, তাঁহাদের পদে পদে সঙ্কটাপন্ন হইতে হয়, এই নিমিত্ত কার্য্যক্ষেত্রে ধ্যনীরাই পরাজিত হইয়া থাকেন. সুতরাং ধ্যানীর স্থান সংসার নহে।

ধ্যানী বলিলে সোজা কথায় সন্ন্যাসী বুঝায়। সন্ন্যাসী এবং গৃহীর উদ্দেশ্য এক জাতীয় নহে, তাঁহাদের সাধনাও এক জাতীয় নহে, সুতরাং উভয় শ্রেণীর সাধনের স্থানও এক জাতীয় হইতে পারে না। এই নিমিত্ত রামকৃষ্ণদেব এই দুই শ্রেণীর নরনারীদিগের জন্য তিনটী স্থান নিরূপিত করিয়া গিয়াছেন। এই তিনটী স্থান দ্বারা সাধকদিগকে দুই শ্রেণীতে বিভাগ করা যাইতেছে। ১ম শ্রেণী সন্ন্যাসী, যাঁহাদের উদ্দেশ্য ধ্যান এবং স্থান সংসারের বাহিরে বা বন ; ২য় শ্রেণী গৃহী, তাঁহাদের স্থান কোণ এবং মন ; অর্থাৎ সংসার। ফলে, সাধনের স্থান দ্বিবিধ, যথা সংসারে থাকিয়া সাধনা এবং সংসার ত্যাগ করিয়া সাধনা। সংসারে থাকিয়া ধ্যান করা যায় না। তাহার কারণ পূর্ব্বে বলিয়াছি। নানাবিধ ভাব মনে উপস্থিত থাকায় ধ্যান করিবার সময় সেই সকল ভাব আসিয়া

সর্ব্বদা বিঘ্ন জন্মাইয়া দেয়, সুতরাং কোন মতে মন স্থির হইতে পারে না। একথা গৃহীমাত্রেই অবগত আছেন।

সাংসারিক নরনারীদিগের যখন সাধনার ভাব সঞ্চারিত হয়, তখন তাহাদের পক্ষে কোণ অর্থাৎ বাটীর নির্জ্জন স্থান ব্যবস্থা। সংসারের হিল্লোল কল্লোল হইতে কিয়ৎকাল স্বতন্ত্র থাকিয়া মনের সাময়িক পূর্ণাবস্থা লাভ করিবার চেষ্টা করিতে পারিলেও যথেষ্ট উপকারের সম্ভাবনা। যাঁহারা নির্জ্জন স্থানে বসিয়া মন স্থির করিতে অশক্ত, যাঁহাদের মন সর্ব্বদা চঞ্চল, এক পল স্থির হইয়া উপবেশন করিবার যাঁহাদের শক্তি নাই, সময় নাই, তাঁহাদের পক্ষে মনে মনে ভগবান্‌কে স্মরণ করা বিধেয়।

এক্ষণে আমাদিগকে মীমাংসা করিতে হইবে যে, ধ্যান করিতে হইলে সন্ন্যাসী হওয়া অনিবার্য্য কি না? এবং তাঁহাকে বনবাসী হইতে হইবে কি না?

এই প্রশ্নের উত্তর এই যে, যে নরনারী ভগবানের বৃত্তান্ত উপলব্ধি করিতে ইচ্ছা করিবেন, সে নরনারীকে সন্ন্যাসাশ্রম অবলম্বনপূর্ব্বক বনবাসী হইতে হইবে; তাহাতে তিলার্দ্ধ সন্দেহ নাই। সংসারে অবস্থিতি করিলে কখন ধ্যান কার্য্যে কৃতকার্য্য হওয়া যায় না। সাধনার উদ্দেশ্য ধ্যান, তাহার স্থান বন। সন্ন্যাসী না হইলে উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয় না। সন্ন্যাসী অর্থে ত্যাগীকে বুঝায়। যাহা ত্যাগ করা হয়, তাহা পুনরায় অবলম্বন করিতে পারা যায় না। যিনি সন্ন্যাসী বা সন্ন্যাসিনী, তিনি মন হইতে বৈষয়িকভাব বিদায় দিয়া তথায় ভগবান্‌কে উপবেশন করাইয়া সর্ব্বদা তাঁহার ধ্যানে নিমগ্ন থাকিবেন। এই অভিপ্রায় চরিতার্থ করিতে হইলে মনে যাহাতে কামিনীকাঞ্চন ছায়া পতিত না হয়, তাহা করা কর্ত্তব্য। সংসার কামিনীকাঞ্চনের ঘনীভূত রূপবিশেষ, তথায়

বাস করিলে কামিনীকাঞ্চনের ছায়া ব্যতীত আর কি ভাব তিনি লাভ করিবেন? যদ্যপি মনে এই ছায়া পতিত হয়, যদ্যপি মনে কামিনী-কাঞ্চন স্থান পায়, তাহা হইলে ধ্যানের বিঘ্ন জন্মিয়া থাকে এবং ভগবান্‌কে উপলব্ধি করা পক্ষে প্রতিবন্ধক হয়, ধ্যানী সুতরাং লোকালয় পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হইয়া থাকেন।

কামিনীকাঞ্চন ভাববিহীন মন কাহাকে কহে, তাহা প্রভু একটী দৃষ্টান্তের দ্বারা কহিয়া গিয়াছেন।

কোন ব্যক্তি তাঁহার স্ত্রীকে সর্ব্বদা বলিতেন যে, দেখ তোমার জন্য আমার ইহা পরকাল সমুদয় নষ্ট হইয়া গেল। আমি সকল বন্ধন ছেদন করিয়াছি। আমার পিতা মাতার আকর্ষণ তাঁহাদের পরলোক গমনের পরেই বিদূরিত হইয়াছে, এখন একবার তাঁহাদের কথা স্মরণও হয় না। স্মরণ হইলেও মনে অধিকক্ষণ সে ভাব দাড়াইতে পারে না। পুত্রাদি হয় নাই। পূর্ব্বে অপুত্রক বলিয়া মনে মনে আক্ষেপ হইত, কিন্তু এক্ষণে সে আক্ষেপ আর নাই। মান সম্ভ্রম বিশেষ কিছুই নাই, তাহার জন্য মনে চিন্তা হইবে কেন? কেবল তুমি একমাত্র আমার ধর্ম্ম পথের কণ্টক হইয়াছ, যদ্যপি তুমি মরিয়া যাও, তাহা হইলে আর আমায় উপার্জ্জন করিতে হয় না, আমি স্বচ্ছন্দে সন্ন্যাসী হইয়া গৈরিক বসন পরিধান পূর্ব্বক এদেশ ওদেশ করিয়া বেড়াই। বিশেষতঃ, যে স্থানে যাইব, সেই স্থানেই সন্ন্যাসী বলিয়া সমাদৃত হইব। সকলেই যত্ন করিয়া পাথেয় দিবে, আর আনন্দে ইচ্ছামত প্রাণ ভরিয়া ভগবানের শ্রীচরণ ধ্যান করিয়া মানব জন্ম সার্থক করিয়া লইব। তাঁহার স্ত্রী এই কথা শ্রবণপূর্ব্বক কহিলেন, আমি যদ্যপি তোমার সাধনপথে কণ্টক হইয়া থাকি, তুমি আমাকে স্বচ্ছন্দে পরিত্যাগ করিয়া যাও, আমার তাহাতে কোন ক্লেশ হইবে না। আমি বরং আপনাকে ভাগ্যবতী

বলিয়া মানিব যে, আমার দ্বারা তোমার সাধনার পথ পরিষ্কার হইল; ইহা অপেক্ষা সুখের বিষয় কি আছে? সকলেই বলেন যে, স্ত্রী পুরুষ-দিগের পতনের হেতুবিশেষ। যদ্যপি আমায় ত্যাগ করিলে তোমার উন্নতি হয়, সে কার্য্যে আমার পূর্ণ যোগ আছে। আমি জানি স্বামীর ঐশ্বর্য্যে যেমন স্ত্রী অধিকারিণী, স্বামীর সুখে যেমন স্ত্রী অধিকারিণী, তেমনি স্বামীর ধর্ম্মেও অধিকারিণী। তুমি ধর্ম্মোপার্জ্জন করিবে, আমি গৃহে বসিয়া তাহার অর্দ্ধেক অংশ পাইব, এমন কার্য্যে আমি প্রতিবন্ধক জন্মাইব কেন? কিন্তু তোমার উদ্দেশ্যের কিয়দংশ শুনিয়া আমি দুঃখিত হইয়াছি। তুমি দেশ পরিভ্রমণ করিবে, লোকালয়ে অবস্থিতি করিবে, তাহাতে কি লাভ হইবে, আমি কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না। আমার মনে হইতেছে যে, এখন তুমি একঘরে আছ, এই একঘর ত্যাগ করিয়া ঘরে ঘরে বেড়াইবে, দেশে দেশে বেড়াইবে। স্বামী! তাহাতে কি ধর্ম্ম লাভ হইবে? আমি বলি, তুমি এঘর ত্যাগ করিয়া এমন ঘরে যাও, যে ঘরে যাইলে আর ঘরে ঘরে বেড়াইতে হইবে না। স্ত্রীর এই কথা শ্রবণ করিয়া সেই ব্যক্তির তখন ভ্রম বিদূরিত হইল। তখন তাঁহার মনে হইল যে, আমার স্ত্রী সত্য কথাই বলিয়াছে, এদেশেও যাহা, অন্য দেশেও তাহা, এই গৃহে এই স্ত্রীও যাহা, অন্য গৃহে অন্য স্ত্রী ও তাহা। ঘর দেখিলে এই ঘর স্ফূর্ত্তি পাইবে, স্ত্রী দেখিলে এই স্ত্রীর কথা মনে হইবে, সে মনে ভগবানের স্ফূর্ত্তি হইবে কিরূপে? আহা স্ত্রী কি শিক্ষাই দিলে যে, বিষয়াসক্ত মনই সংসারে ঘুরিয়া বেড়ায়, যেহেতু তাহার প্রয়োজন সংসারে। যে মনে সংসার ভাব থাকিবে, তাহাকে সংসারেই অবস্থিতি করিতে হইবে। এখনও সংসারে, পরেও সংসারে, জন্মান্তরেও সংসার ব্যতীত আর কোন স্থানে স্থান হইবে না। সুতরাং সন্ন্যাসী হওয়ায় ঘর ঘর অর্থাৎ বার বার জন্মগ্রহণ নিমিত্ত সাংসারিক ক্লেশ হইতে

আমি পরিমুক্তি লাভ করিতে পারিব না, তবে গৃহ ত্যাগ করিলে কি ফল হইবে? যদ্যপি এক গৃহ ত্যাগ করিয়া শত সহস্র গৃহে প্রবেশ করিতে হয়, তাহা হইলে গৃহ ত্যাগ করিবার কোন ফলই ফলিবে না। এই দম্পতী পরিশেষে পরমানন্দে গৃহ ত্যাগ করিয়া বিভু চিন্তা করিবার জন্য বনাভিমুখে ধাবিত হইলেন। বনমধ্যে কতকগুলি হীরকাদি মহামূল্য রত্ন দেখিতে পাইয়া এই ব্যক্তি অতি সাবধানে উহা ধূলায় আবৃত করিয়া রাখিলেন। তাহার স্ত্রী সে সময়ে কোন কারণবশতঃ কিঞ্চিৎ পশ্চাদ্‌বর্ত্তিনী হইয়া পড়িয়াছিলেন। দূর হইতে স্বামী কি করিতেছেন তাহা তিনি দেখিয়াছিলেন, নিকটে আসিয়া কহিলেন, তুমি কি করিতেছিলে? স্বামী সসব্যস্ত হইয়া বলিলেন, বিশেষ এমন কিছুই নহে। তোমার বিলম্ব দেখিয়া আমি ধূলা খেলা করিতেছিলাম। স্ত্রী এই কথা শ্রবণপূর্ব্বক সেই ধূলারাশি বামপদের দ্বারা বিচ্ছিন্ন করিবা-মাত্র হীরকাদি বাহির হইয়া পড়িল। রত্ন বাহির হইবামাত্র স্বামী কহিলেন,দেখ, আমরা সন্ন্যাসী হইয়াছি, কাঞ্চনের দিকে দৃষ্টিপাত করিও না। দেখ, তুমি স্ত্রীলোক অবলা, অল্প বুদ্ধি তোমার, কি জানি নবীন সন্ন্যাসিনী, বিশেষতঃ এপ্রকার হীরকাদি মহা রত্ন সকল কখন দেখ নাই, পাছে লোভ জন্মিয়া তোমার সন্ন্যাস ভাব নষ্ট করিয়া দেয়, সেই জন্য ধূলারাশি দ্বারা উহা আবৃত করিয়া রাখিয়াছিলাম। সে যাহা হউক, চল এ বিষয় লইয়া অধিক আন্দোলন করিবার প্রয়োজন নাই। স্ত্রী স্থির হইয়া স্বামীর সমুদয় কথা শ্রবণ পূর্ব্বক কহিলেন, হায়! হায়! কি কুকর্ম্মই হইয়াছে এবং সেই কার্য্যে আমি সহায়তা করিয়াছি, এজন্য আমিও অপরাধিনী হইয়াছি। কামিনীকাঞ্চন ত্যাগ করা সন্ন্যাসীর ব্রত। কামিনীকাঞ্চন ভাববিহীন মন ধ্যানের অধিকারী, কিন্তু সেই কামিনীকাঞ্চন ভাব এখনও তোমার রহিয়াছে, তবে কেন

তোমায় বনবাসী হইতে অনুমোদন করিয়াছি? কেবল অনুমোদন নহে, তোমার সেই ভাবের সহায়তা করিবার নিমিত্ত সমভিব্যাহারে আসিয়াছি। দেখ, তোমার যেমন কামিনীকাঞ্চন ভাব অদ্যাপি মনে জাগরূক রহিয়াছে, এখনও আমার প্রতি স্ত্রী ভাব রহিয়াছে, আমি তোমার কাছে নাই এভাব তোমায় অভিভূত করিয়া গতিরোধ করাইয়াছে, পাছে আমি রত্নগুলি অঞ্চলে বাধিয়া লই, সেই জন্য আমার পতন ভয়ে তাহা ধূলাবৃত করিয়াছ, আমারও মনে তেমনি পতিভাব রহিয়াছে, আমারও এখন রত্ন বলিয়া জ্ঞান রহিয়াছে। তবে আমরা বৃথা বনে আসিলাম কেন? হায়! হায়! সাংসারিক প্রবল প্রতাপ প্রত্যক্ষ কর। আমরা জানি, রত্ন দেখিবামাত্র মনে তাহারই ভাব উদ্রেক হইয়া গিয়াছে। আমাদের সময় হয় নাই, আমরা সাধনার তাৎপর্য্য অদ্যাপি বুঝি নাই। এক্ষণে বুঝিলাম, যেমন স্বামী লইয়া সন্ন্যাসিনী হওয়া যায় না, হীরকাদি পদার্থ জ্ঞান থাকিলে মনের পূর্ণতা লাভ হয় না, তেমনি স্বামী! তুমিও বুঝিয়া দেখ, কামিনী লইয়া সন্ন্যাসী হওয়া যায় না। আমি তখনি বলিয়াছিলাম যে, আমায় সমভিব্যাহারে লইও না, তাহাতে উভয়ের বিঘ্ন হইবে। এখন বুঝিলে? যে আমার জন্য তোমার মনে কাঞ্চনভাব স্থান পাইয়াছে। কামিনী থাকিলে কাঞ্চন উপস্থিত হইয়া থাকে। যদ্যপি তুমি একাকী হইতে, তাহা হইলে হীরক দেখিয়া কখন চিন্তিত হইতে না। আমিও যদ্যপি একাকিনী হইতাম, তাহা হইলে তুমি কি করিতেছিলে একথা বলিতে হইত না এবং এই হীরক দেখিয়া তোমার সহিত এত কথা কহিতাম না। যখন অদ্যাপি সেই গৃহের ভাব আমাদিগকে সমভাবে অধিকার করিয়া রাখিয়াছে, যখন অদ্যাপি আমাদের মনে শারীরিক সম্বন্ধ সমভাবে রহিয়াছে, যখন অদ্যাপি হীরক মাটিতে পার্থক্যভাব রহিয়াছে, তখন

যাইব কোথায় ? করিব কি ? যাহা হউক, আমি এখন তোমার নিকট হইতে বিদায় লইলাম, তুমিও যথেচ্ছা গমন কর।

মন ভাঙ্গিবার যে কোন সাংসারিক ভাব আছে, তন্মধ্যে কামিনী-কাঞ্চন সর্ব্বাপেক্ষা প্রবল। কামিনী শব্দের দ্বারা এমন কথা কেহ মনে না করেন যে, পুরুষেরা সাধু, কামিনীরা অপবিত্রা এবং পুরুষদিগের সাধুতা নষ্ট করিবার তাহারাই একমাত্র কারণ। রামকৃষ্ণদেব যদ্যপি কামিনী শব্দের দ্বারা এইরূপ ভাব প্রকাশ করিয়া যাইতেন, তাহা হইলে তিনি কামিনীকে মাতৃস্থান প্রদান করিতেন না। যদিও কামিনী কর্তৃক পুরুষেরা বিকৃত হন, তথায় কামিনী উদ্দীপক কারণস্বরূপ মাত্র বলিয়া দেখা যায়। কিন্তু যে পুরুষের মনে কামিনী-ভাব-রূপ পূর্ব্ববর্ত্তী কারণ বা সংস্কার না থাকে, উদ্দীপক কারণ কামিনী তথায় কি কার্য্য করিতে পারেন ? অনেকের মনে কামিনী ভাব মাতৃ রূপে কিম্বা ভগ্নি রূপে অথবা খুড়ী জেঠাই প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন ভাবে অবস্থিতি করে, সে কামিনীর দ্বারা মন কখন বিকৃত হয় না। যখন পঞ্চমবর্ষীয় ধ্রুবের ধ্যান ভঙ্গ করিবার জন্য ইন্দ্রাদি দেবতারা বারাঙ্গনাদিগকে প্রেরণ করিয়াছিলেন, সেই বারাঙ্গনারা ধ্রুবের নিকটে যাইয়া উপস্থিত হইবামাত্র তাহাদের পয়োধর হইতে পয়োধারা বাহির হইয়া বাৎসল্য ভাবের উদ্রেক হইয়াছিল, এবং ধ্রুবকে পুত্র ভাবে ক্রোড়ে লইতে তাহাদের প্রাণ আকুলিত হইয়াছিল। বারাঙ্গনারা ধ্রুবের কামবৃত্তি উত্তেজনা করিবার মানসে উদ্দীপক কারণস্বরূপ গমন করিয়াছিল, কিন্তু একপক্ষে পূর্ব্ববর্ত্তী কারণের, অপর পক্ষে উদ্দীপক কারণের অভাবে বারাঙ্গনাদিগের অভিপ্রায় সিদ্ধ হয় নাই।

পুরুষ এবং স্ত্রীলোকের পক্ষে উভয়ভাব যদ্যপি পূর্ব্ববর্ত্তী কারণস্বরূপ বিরাজিত থাকে,তাহা হইলে উভয়ে উভয়ের উদ্দীপক কারণস্বরূপ হইতে

পারে। এই নিমিত্ত কামিনী বলিলে উভয় শ্রেণীর পক্ষে উভয়কেই বুঝিতে হইবে। কিন্তু হিসাব করিয়া দেখিলে কামিনী অপেক্ষা পুরুষকেই মন বিকৃত করিবার গুরু মহাশয় বলিয়া সাব্যস্থ করিতে হয়। কামিনী দেখিলে পুরুষ অস্থির হইয়া পড়ে; সুতরাং যাহাতে কামিনীর সংশ্রব না থাকে, সাধকদিগের পক্ষে তাহারই বিধান হইয়াছে। যদিও কামিনীকে ভুজঙ্গিনী প্রভৃতি নানা প্রকার বীভৎসসূচক শব্দে অভিহিত করা যায়. তাহা কেবল ভয়ের উদ্দীপনা মাত্র। ভগবানের সৃষ্টির আদিতে পুরুষ, পুরুষের আশ্রয়ীভূত প্রকৃতি, সুতরাং পুরুষের শক্তি অতিক্রম করিয়া কার্য্য করা প্রকৃতির শক্তির অতীত বিষয়। আমরা দেখিতে পাই যে, বালিকা মাতৃগর্ভ হইতে বাহির হইবামাত্র পুরুষের মনাপহরণ করিতে পারে না। তাহারা জানে না যে পুরুষ কি পদার্থ, তাহারা জানে না যে স্ত্রী পুরুষ সম্বন্ধ কি? তাহা সংসার হইতে ক্রমে শিক্ষা করে। কিন্তু তাহাদের বিশেষ শিক্ষার স্থল কোথায়? স্বামী অর্থাৎ পুরুষ হইতে পাশব ক্রিয়ার সূত্রপাত হয়; পুরুষ হইতে পাশব ক্রিয়ার পুষ্টিসাধন হয় এবং পুরুষ হইতে পাশব ক্রিয়ার উত্তেজনা হইয়া থাকে। বালিকার নবমনে পুরুষ ধরিবার বীজ পুরুষকর্তৃক নিক্ষিপ্ত হয়, সুতরাং সেই বীজের বৃক্ষ শাখা পল্লবাদি যাহা পরে প্রকাশিত হয়, তাহার আদি কারণ পুরুষ। আমরা কামিনীর কথা কহিয়া থাকি, সুতরাং তাহারা তদবস্থায় পূর্ব্ব কারণপ্রসূত ভাববিশেষ দ্বারা কার্য্য করিয়া থাকেন, এই নিমিত্ত সংক্ষেপে কামিনী শব্দেরই দ্বারা প্রভু এতগুলি ভাব প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন। অতএব ধ্যানসম্বন্ধে বিচার করিতে হইলে, নর নারীর পক্ষে নর নারীই ত্যজনীয়, সুতরাং সংসারে থাকা কাহারই স্থান হইতে পারে না।

কথা হইতে পারে, যাহারা কামিনীকাঞ্চনের রসাস্বাদন করিয়াছেন,

তাহাদের পক্ষে কামিনীকাঞ্চন উদ্দীপক কারণস্বরূপ হইতে পারে। কিন্তু যাহার সে রসের অধিকার হয় নাই, তাহার পক্ষে কামিনীকাঞ্চন কোন কার্য্য করিতে পারিবে না। সেই স্থলে বন কিজন্য ব্যবস্থা হইবে?

কুমার বৈরাগী হইলে যদিও সাক্ষাৎ সম্বন্ধে পূর্ব্ববর্ত্তী কারণের অভাব লক্ষিত হয়, কিন্তু কাম ভাব হইতে সকলের জন্ম হয় বলিয়া সে ভাব স্বভাবসিদ্ধ। এই নিমিত্ত উহাকে দূর-পূর্ব্ববর্ত্তী কারণ কহা যায়। যখন উদ্দীপক কারণ সদা সর্ব্বক্ষণ মানসক্ষেত্রে প্রতিফলিত হয়, তখন ক্রমে সেই দূর-পূর্ব্ববর্ত্তী কারণ নিকটবর্ত্তী হইতে থাকে, পরে যে পর্য্যন্ত সমবর্ত্তী এবং পরবর্ত্তী কারণদ্বয় যোগদান না করে, সে পর্য্যন্ত কার্য্য হইতে পারে না। কুমার বৈরাগীদিগের পতন বারম্বার এই কারণ-চতুষ্টয় দ্বারা সাধিত হইয়া থাকে। এই কারণচতুষ্টয় সংসারে সর্ব্বদা বলবর্ত্তী আছে, সুতরাং সেই স্থলে কার্য্য হইতে বিলম্ব কত দূর!

কোন উদ্যানে একটি কুমার সন্ন্যাসী সাধন করিতেন। এই কানন্টী লোকালয়ের মধ্যস্থলে ছিল বলিয়া মধ্যে মধ্যে অনেকেই তাঁহার নিকটে গমনাগমন করিতেন। সন্ন্যাসী হঠযোগের আসনাদি নেতি ধৌতি প্রভৃতি দেহ শুদ্ধ করিবার বিবিধ প্রক্রিয়াদি দ্বারা শরীরকে অনেক পরিমাণে প্রস্তুত করিয়া আনিয়াছিলেন। তিনি শীতকালে সন্ধ্যার সময় পুষ্করিণীর জলে গলা পর্য্যন্ত নিমজ্জিত করিয়া ধ্যান করিতে আরম্ভ করিতেন, পর দিন সূর্য্যোদয় হইলে ধ্যান ভঙ্গ করিয়া উপরে উঠিয়া আসিতেন। গ্রীষ্মকালে চতুর্দ্দিকে প্রজ্বলিত অগ্নি সংস্থাপন পূর্ব্বক সূর্য্যের দিকে এক দৃষ্টিতে চাহিয়া ধ্যানস্থ হইয়া থাকিতেন। বর্ষাকালে বৃষ্টিতে ভিজিয়া ধ্যান করিতেন, সময়ে সময়ে বৃক্ষশাখায় পদ বন্ধনপূর্ব্বক নিম্নে অগ্নিকুণ্ড করিয়া হেঁট মুণ্ডে করযোড়ে ধ্যানে নিমগ্ন থাকিতেন। এইরূপ তপঃপ্রভাবে তাঁহার অসাধারণ রূপলাবণ্য হইয়াছিল। চক্ষের

আর বহির্দ্দৃষ্টি ছিল না, সর্ব্বদাই যেন কি ভাবিতেছেন, কোন্ দিকে যেন মন রহিয়াছে। সম্মুখ দিয়া কেহ চলিয়া যাইলে অথবা নিকটে কেহ দাঁড়াইয়া থাকিলে তিনি জানিতে পারিতেন না। সময়ে কেহ কিছু আনিয়া দিলে হয়ত ভোজন করিতেন। তিনি কখন ঝুলি কাঁধে করিয়া ভিক্ষায় বহির্গত হইতেন না। তাঁহাকে দেখিলেই হৃদয়ে ভক্তি ভাবের উদয় হইত। অনেকে অনেক সময়ে তাঁহার নিকটে অনেক রকম প্রার্থনা করিতেন, কিন্তু তিনি হাসিয়া বলিতেন, গোলামের শক্তি কি? ক্রমে লোকে তাঁহাকে সর্ব্বদা এইরূপে বিরক্ত করিতে লাগিল, তিনি সময়ে সময়ে স্থানান্তরে লুকাইয়াও থাকিতেন। এক দিন সন্ধ্যার সময়ে তিনি একাকী বসিয়া আছেন. এমন সময়ে তাঁহার পূর্ব্বপরিচিত জনৈক সম্ভ্রান্ত ধনী ব্যক্তি দর্শন করিতে আসিলেন। নানাপ্রকার কথোপকথনের পর তিনি অতিশয় কাতর ভাবে কহিলেন, প্রভু! আমার প্রতি আপনার যথেষ্ট কৃপা আছে। আমার কোন বিষয়ের অভাব নাই, কিন্তু আমার স্ত্রী নিতান্ত কাতরা হইয়া একটী পুত্রের জন্য আপনাকে অনুরোধ করিতে বলিয়াছেন। সাধু ঈষৎ হাসিয়া কহিলেন, গুরুর কৃপায় তোমার পুত্রসন্তান হইবে, কিন্তু দেখো একথা কখন কাহার নিকট প্রকাশ করিও না। সকলে জানিতে পারিলে আমায় আর লোকালয়ে বাস করিতে দিবে না। সাধুর এই আজ্ঞায় ঐ ব্যক্তির কতদূর আনন্দ হইয়াছিল, তাহা অনায়াসে উপলব্ধি করা যাইতে পারে। যাহা হউক, বাস্তবিক বৎসরের মধ্যে সেই ব্যক্তি নবকুমারের মুখাবলোকন পূর্ব্বক পরমানন্দিত হইলেন। যে দিবস এই সাধু শুনিলেন যে, তাঁহার কথায় অপুত্রকের পুত্র জন্মিয়াছে, সেই দিন তাঁহার মনে অভিমান যাইয়া অধিকার করিল। তিনি তখন তাঁহার আপনার শক্তির বিষয় লইয়া অনেক সময় চিন্তা করিতেন,

সুতরাং সেই সময়ের মানসিকাবস্থা ভগবান্ হইতে পরিভ্রষ্ট হইয়া যাইত। ঐ ভদ্র লোক সদা সর্ব্বদা সাধুকে লইয়া অন্তঃপুরে স্ত্রীমণ্ডলীর মধ্যে কাল ক্ষেপণ করিতেন, সাধুর এই নবভাব বড়ই আনন্দজনক বোধ হইত। তিনি স্ত্রীলোকদিগের সহিত সদালাপন করিবার জন্য সর্ব্বদা তাহাদের নিকটে আপনিই উপস্থিত হইতেন। সিদ্ধ পুরুষ তিনি, এই জ্ঞানে কেহ কোন প্রকার সন্দেহ করিতেন না। সাধু যে মনে ভগবান্ চিন্তা করিতেন, সেই মনে এক্ষণে কামিনী ভাব যাইয়া অধিকার করিল। যদিও তিনি রমণীমণ্ডলী পরিবেষ্টিত থাকিতেন, তাহা হইলেও তাঁহার চরিত্র সম্বন্ধে তখন কোন কথা শ্রুত হওয়া যায় নাই।

চরিত্র দোষ হউক বা না হউক, কিন্তু ক্রমে ক্রমে তাঁহার অবস্থান্তর হইতে লাগিল। তিনি সিদ্ধপুরুষ বলিয়া দেশ দেশান্তরে পরিচিত হইলেন, অনেকেই তাঁহাকে গুরুত্বে বরণ করিলেন; গুরু হইয়া সাধুর মনে আর এক প্রকার ভাব প্রবেশ করিল। পূর্ব্ব হইতে বিলাসী হইয়া ছিলেন। শিষ্যবৃন্দ বৃদ্ধি হওয়ায় ক্রমে প্রকৃত পক্ষে ঘোর বাবু হইয়া উঠিলেন। যে ব্যক্তি এক সময়ে রাত্রিতে জলনিমগ্ন হইয়া এবং দিবাভাগে বিভূতি প্রলেপন দ্বারা শীত ঋতু সম্ভোগ করিতেন, সে ব্যক্তি স্থানের গুণে শালের জোড়া পরিয়া গদির উপরে শালের আসন বিছাইয়া ক্ষীর সর পুরী কচুরী মোহনভোগাদি রাজভোগ আহার করিয়া দিন যাপন কারতে লাগিলেন। কিছু দিনের পর তিনি এক দেবালয়ের মোহন্ত পদ প্রাপ্ত হইলেন। এই মঠের বাৎসরিক পনের হাজার টাকা আয় ছিল। সাধু কাঞ্চনের অধীশ্বর হইয়া অতি অল্পদিনের মধ্যে কামিনীর করগত হইয়া পড়িলেন। যে উদ্যানে তিনি বাস করিতেন, পূর্ব্বে তথায় সামান্য কুটীরাদি ছিল, সাধু

সেই কুটীর ভাঙ্গিয়া ইংরাজি ঢংয়ের সার্সি যুক্ত দ্বিতল অট্টালিকা নির্ম্মাণ পূর্ব্বক কামিনীকাঞ্চনের অধিকারভুক্ত হইয়া মন হইতে ভগবান্‌কে দূরীভূত করিলেন এবং তাঁহার স্থানে টাকা ও বারাঙ্গনাকে সমাদর করিয়া বসাইলেন। সাধুর এরূপ পতন কেবল স্থানের দোষে সংঘটিত হইল। যে সময়ে তাঁহার সিদ্ধাবস্থা হইয়াছিল, সে সময়ে যদ্যপি তিনি লোকালয় পরিত্যাগ করিয়া নির্জ্জন স্থানে যাইয়া বাস করিতেন, তাহা হইলে তাঁহার পূর্ব্বের সাধনের ফল বিফল হইয়া যাইত না। সাধুর ক্রমে সন্তানাদি হইতে লাগিল। তাহারা বাবা বলিয়া সর্ব্বদা নিকটে আসিত, কেহ কাঁধে উঠিয়া বসিত, কেহ ক্রোড়ে শয়ন করিত, কেহ জটা ধরিয়া টানিত, কেহ আসনের উপরে মলমূত্র ত্যাগ করিত। শিষ্যেরা গুরুর এইরূপ ভাব দর্শন করিয়া পাছে গুরুভক্তির ত্রুটি হয়, তজ্জন্য একে একে পলায়ন করিল। যখন এই সমাচার মঠের অভি-ভাবকেরা শুনিলেন, তখন তাঁহারা তাঁহাকে তথা হইতে বাহির করিয়া দিলেন।

সাধু অনন্যোপায় দেখিয়া পলায়ন করিবার চেষ্টা করিলেন, কিন্তু যাইবেন কোথায়? সেই রমণী ছুটিয়া আসিয়া জটা ধারণপূর্ব্বক বলিল, তবে রে সাধু? যাইবি কোথায়? আমার সর্ব্বনাশ্ করিয়াছিস্, স্মরণ নাই? এতগুলি নাবালক নাবালিকা, এদের খাওয়াবে কে? মাতাকে জটা ধরিতে দেখিয়া ছেলেরা ছুটিয়া আসিয়া বহির্ব্বাস ধরিয়া বলিতে লাগিল, বাবা আর ছাড়িয়া দিব না। কেহ বলিল যে, বাবা তুমি কোথায় যাবে বাবা? এই গোলযোগে প্রতিবাসীরা আসিয়া এক-ত্রিত হইলেন এবং তাঁহারা সাধুকে সহস্র লাঞ্ছনা করিলেন। সাধু অগত্যা সেই রমণীর গৃহে যাইয়া বাস করিতে বাধ্য হইলেন। পরদিবসে তিনি জটা ছেদন করিলেন এবং কৌপীন বহির্ব্বাস পরিত্যাগ পূর্ব্বক গৃহীর

পরিচ্ছদ পরিধান করিয়া অব্যর্থ মহৌষধ বিক্রয় দ্বারা একপ্রকার দিন যাপন করিতে চেষ্টা করিতে লাগিলেন। স্থানের নিমিত্তও এ প্রকার দৃষ্টান্ত সর্ব্বদাই দেখা যায়।

সংসারে যেমন ধ্যানীদিগের পতন সম্ভাবনা, আবার ধ্যানীদিগের দ্বারা সংসারের নানাবিধ অকল্যাণ এবং বিভীষিকা সমুপস্থিত হইবার তেমনি সম্পূর্ণ আশঙ্কা আছে। সন্ন্যাসী হইতে গৃহীদিগের দুই প্রকারে ক্ষতি হইয়া থাকে। প্রকৃত সন্ন্যাসী যাঁহারা, তাঁহারা ইন্দ্রিয়াদি দৈহিক কার্য্য সকল এককালে পরিসমাপ্ত করিয়া থাকেন। তাঁহাদের আর সাংসারিক ভারের প্রয়োজন থাকে না বলিয়া তৎপক্ষে অনাস্থা প্রদর্শন করাই একমাত্র কার্য্য হইয়া দাঁড়ায়। এই নিমিত্ত সামাজিক শাস্ত্রানু-সারে সান্ন্যাসীদিগকে স্পর্শ করিলে স্নান করিয়া গৃহে প্রবেশ করা বিধেয় বলিয়া কথিত হয়। সন্ন্যাসীর ভাব গৃহীর মনে স্থান পাইলে সংসার নষ্ট হইয়া যায়, সুতরাং সংসারীর পক্ষে তাহা নিতান্ত অনিষ্টকারী। যে ব্যক্তি সংসার করিতেছেন, তাঁহার সন্ন্যাস ভাব হইলে সংসারের দিকে তাঁহার আস্থা কমিয়া যায়, সংসারের পরিজনেরা তাহাতে ক্ষতিগ্রস্থ হন, সুতরাং সন্ন্যাস ভাব সংসারের পক্ষে অকল্যাণের নিদানস্বরূপ।

যে সন্ন্যাসীগণ পরিপক্কাবস্থা লাভ করেন নাই, তাঁহাদিগকে লইয়া সহবাস করিলে সাংসারিক নানাপ্রকার গোলযোগ ঘটিবার সম্ভাবনা। এরূপ সন্নাসীদিগের সামাজিক লোকলজ্জা নাই, সম্বন্ধ জ্ঞান নাই, সুতরাং তাঁহারা যা ইচ্ছা করিতে পারেন। এইরূপে লোমহর্ষণজনক পারিবারিক দুর্ঘটনা যে কত ঘটিয়াছে, তাহার সংখ্যা করা যায় না।

এই নিমিত্ত ধ্যানী অর্থাৎ সন্ন্যাসীকে স্পর্শ করা গৃহীর অকর্ত্তব্য এবং সন্ন্যাসীদিগেরও গৃহীর সংস্পর্শে থাকা নিতান্ত অন্যায়। অতএব যাঁহাকে ধ্যান করিতে হইবে, তাঁহাকে অবশ্যই সংসার ছাড়িয়া যাহাতে সাং-

সারিক বায়ু তাঁহার গাত্রে সংস্পর্শিত হয় না, এরূপ স্থানে অবশ্য বাস করিতে হইবে।

ধ্যানীর উদ্দেশ্য সাংসারিক ভাব হইতে মনকে স্বতন্ত্র করা অর্থাৎ সংসার ত্যাগ করা,সে স্থলে যাহা ত্যাগের বিষয়, তাহা লইয়া কখন সাধনা হইতে পারে না। অতএব স্ত্রী, পুত্র, কন্যা, পিতা, মাতা, বিষয় কর্ম্ম, লোক লৌকিকতা প্রভৃতি সমুদয় বজায় রাখিয়া কখন ধ্যান করা যায় না। এ প্রকার অবস্থায় যদ্যপি কেহ ধ্যানপরায়ণ হন, তাহা তাঁহার পক্ষে বিড়ম্বনাবিশেষ হইয়া থাকে। পরিজন পরিবেষ্টিত হইয়া ধ্যান হয় না, প্রাণায়াম করিতে যাইলে কাশাদি রোগ আসিয়া উপস্থিত হয়। আমি ইতিপূর্ব্বে বলিয়াছি যে, রামকৃষ্ণদেব বলিয়া গিয়াছেন যে, রেত ধারণ করা ধ্যানের প্রধান উদ্দেশ্য। যে ব্যক্তি বাল্যকাল হইতে রেত ধারণ করিতে পারেন, তাঁহার কথাই নাই, যিনি তাহাতে অশক্ত হন, তাঁহার পক্ষে ব্যবস্থা আছে যে, তিনি যদ্যপি দ্বাদশ বর্ষকাল ধৈর্য্য-ধারণ করিতে পারেন, তাহা হইলে তাঁহাকে ধৈর্য্যরেতা কহা যায় এবং দ্বাদশ বর্ষান্তে উর্দ্ধরেতা নামে তিনি অভিহিত হইয়া থাকেন। উর্দ্ধরেতা হইলে তাঁহার মেধা নামে একটী নাড়ীর উৎপত্তি হয়। মেধা বর্দ্ধিত হইলে তবে সেই ব্যক্তির ধারণা শক্তি সঞ্চারিত হইয়া থাকে। ধারণা হইলে মনের পূর্ণ বল হয়, সেই মনের দ্বারা ধ্যান কার্য্য সমাধা হইয়া থাকে। রামকৃষ্ণদেব বলিতেন যে, ধ্যান করিতে হইলে কামিনীকাঞ্চন ভাব হইতে এককালে অবসর গ্রহণ করা কর্ত্তব্য। যে নরনারী তাহা না পারে, তাহার ধ্যান করা অনুচিত।

কথিত হইল যে, অধোরেতা কখন ধ্যানের অধিকারী নহেন। যাহার কামিনীসঙ্গলালসা বিদূরিত হয় নাই, কামিনী কামিনী কামিনী করিয়া যাহার মন সর্ব্বদা লালায়িত, সে ব্যক্তির ধ্যান করিতে প্রয়াস

পাওয়া পণ্ডশ্রম মাত্র। অনেক সময়ে অবস্থাক্রমে অনেকে সন্ন্যাসাশ্রম অবলম্বন পূর্ব্বক বনে বাস করেন বটে, কিন্তু মনে কামিনী উদ্দেশ্য থাকায় যে সময়ে কামিনী উদ্দীপক কারণস্বরূপ হয়, সেই সময়ে তাহার সাধন ভজন, ধ্যান ধারণা একেবারে ছিন্ন ভিন্ন হইয়া যায়।

কোন বনে এক সাধু বাস করিতেন। সাধুর গুণগ্রাম গ্রামব্যাপীছিল, সুতরাং মধ্যে মধ্যে অনেকে তাঁহাকে দর্শন করিতে যাইতেন। একদা কোন অনুরাগিনী সন্ন্যাসিনী সাধুজীর নাম শ্রবণপূর্ব্বক দর্শন লাভের নিমিত্ত তথায় উপস্থিত হইয়াছিলেন। সর্ব্বপ্রথমে সাধুর শিষ্যবৃন্দদিগের সহিত সাক্ষাৎ হয়। সন্ন্যাসিনীর রূপ দর্শন করিয়া শিষ্য সকলে বিমোহিত হইয়া নানাবিধ ইঙ্গিত ইসারা দ্বারা কুৎসিত ভাব প্রকাশ করেন, কিন্তু সন্ন্যাসিনী সে দিকে দৃক্‌পাত না করিয়া সাধুর নিকটে গমন পূর্ব্বক সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত করিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে কহিলেন, প্রভু! আমি অতিশয় দীনহীনা, আপনার নাম শুনিয়া চরণে স্থান প্রত্যাশায় আগমন করিয়াছি। আশীর্ব্বাদ করুন, যেন ভগবানের প্রতি আমার অচলা ভক্তি থাকে। সাধু সন্ন্যাসিনীর মুখের দিকে চাহিয়া একেবারে উন্মাদের ন্যায় হইয়া পড়িলেন। তাঁহার নিজ অবস্থা বিস্মৃত হইলেন, তিনি কামিনীত্যাগী হইয়া ধ্যান করিবার অভিপ্রায়ে বনবাসী হইয়াছেন, তাহা ভুল হইয়া গেল, তিনি অতি পুলকে বলিলেন, ভগবান্ তোমার প্রতি প্রসন্ন হইয়াছেন, সেই জন্য আমার নিকট তুমি আসিতে পারিয়াছ। তোমার কথা শুনিয়া এবং তোমাকে দেখিয়া আমি যারপরনাই আনন্দিত হইয়াছি। বনে আসিয়া এমন শুভদিন আমার ভাগ্যে কখন হয় নাই। তোমার অনুরাগ দেখিয়া আমার অনুরাগ বৃদ্ধি হইয়া গিয়াছে। এত গুলি শিষ্য সেবক আছে এবং সময়ে সময়ে কত সাধু শান্ত এবং তীর্থাদি পর্য্যটকগণ আসিয়া থাকেন, কিন্তু কাহাকে দেখিয়া

অন্যকার ন্যায় আমার প্রেমানন্দ প্রস্ফুটিত হয় নাই। তুমি স্বচ্ছন্দে আমার আশ্রমে বাস কর। সন্ন্যাসিনী সাধুর কথা শ্রবণ করিয়া তাঁহার হৃদয়ের ভাব বুঝিয়াছিলেন। তিনি বিনীতভাবে কহিলেন, সাধুজী! আপনার অপার করুণা, তজ্জন্য আমি বিশেষ প্রীতি লাভ করিলাম। কিন্তু আমি নিতান্ত পাপিনী, আমার মানসিক দৌর্ব্বল্য অদ্যাপি বলবতী আছে, আমি সাধুর আশ্রমে বাস করিবার অধিকারিনী হই নাই। কৃপা করুন, যেন শীঘ্র সেরূপ অবস্থা লাভ করিতে পারি! সাধু সন্ন্যাসিনীর কথার মর্ম্ম বুঝিতে না পারিয়া কহিলেন, আপনার অবস্থা আপনি বুঝা যায় না। তুমি সাধুর সেবার প্রকৃত অবস্থা লাভ করিয়াছ, অতএব আমার সেবায় তুমিই একমাত্র অধিকারিণী। বল, আমার সেবায় কি তুমি নিযুক্ত হইবে? সন্ন্যাসিনী তথাপি কহিলেন, মহাশয়! সন্ন্যাসী আপনি, আপনার সেবায় স্ত্রীলোক থাকিবে কেন? সেবকেরা সে কার্য্যের অধিকারী। যাহা হউক, আমায় আশীর্ব্বাদ করুন, যেন সাধুর চরণে আমার ভক্তি থাকে। সন্ন্যাসী দণ্ডায়মান হইয়া বাহু প্রসারণ পূর্ব্বক কহিলেন, অল্পবয়স তোমার, সুতরাং বুদ্ধিও অল্প, বহুদর্শন নাই, দর্শনশাস্ত্রাদিও দর্শন কর নাই, তত্ত্ব নিরূপণ সম্বন্ধে অতি অল্পই অধিকার জন্মিয়াছে। বনে বনে ভ্রমণ করিলে কি হইবে? আমি বনে বাস করিতেছি, নানাবিধ কঠোর সাধনা করিয়াছি এবং অদ্যাপি করিতেছি, কিছুতেই কিছু নাই। শুনিয়াছ কি, যে সেবাই একমাত্র সাধনা, সেবা ব্যতীত কোন ফল হয় না এবং হইবার নহে, এই জন্য তোমায় কৃপা করিয়া আমি সেবাদাসী করিতে ইচ্ছা করিয়াছি। দীনহীনা বলিয়া, শরণাগত হইলে বলিয়া, আমি কৃপা করিয়া তোমাকে এমন কি আলিঙ্গন দিতেও অগ্রসর হইয়াছি। এই বলিয়া সন্ন্যাসিনীকে স্পর্শ করিতে উদ্যত হইলেন। তেজস্বিনী অমনি অতি গম্ভীর স্বরে

কহিতে লাগিলেন, সাধু! সাবধান হও। তোমার অভিপ্রায় আমি ইতিপূর্ব্বেই বুঝিয়াছি। মনে করিও না যে, আমি স্ত্রীলোক বলিয়া একেবারে কাণ্ডজ্ঞানহীনা। আমি যখন বনে বাহির হইয়াছি, তখন আমার শক্তি না বুঝিয়া সে ব্রত গ্রহণ করি নাই। বনে বাঘ ভাল্লুক হিংস্রক জন্তু বাস করে, তাহা আমি জানি এবং তাহা হইতে রক্ষা পাইবার নিমিত্ত মহামন্ত্ররূপ কবচ সর্ব্বাঙ্গে আবৃত করিয়া রাখিয়াছি। হিংস্রক পশুদিগের সামর্থ্য কি যে, সে কবচ ছিন্ন করিয়া আমার অঙ্গ স্পর্শ করিতে পারে। এই বলিয়া সন্ন্যাসিনী প্রস্থান করিতে চেষ্টা পাইলেন, কিন্তু সন্ন্যাসী বাহু প্রসারণ পূর্ব্বক তাঁহার গতিরোধ করিলেন। তখন সেই তরুণ হরিপ্রেমাকাঙ্ক্ষিণী অনুরাগিণী আরক্তিম নয়নে ভ্রুকুটি করিয়া কহিলেন, অবোধ! মূর্খ! তোর এবিড়ম্বনা কেন? তোর অদ্যাপি মনের বল হয় নাই, অদ্যাপি কামিনীর গন্ধে কামান্ধ হইয়া পশুবৎ কাৰ্য্য করিতে প্রবৃত্ত হইতে ইচ্ছা হয়, তোর সন্ন্যাসী হওয়া কেন? কেন বিভূতির অপমাননা করিতেছিস্! কেন জটাভার বহন করিতেছিস্। কেন এতগুলো ব্যক্তির হৃদয় কলুষিত করিতেছিস্? কেন পবিত্র সন্ন্যাস ভাব বিকৃত করিতেছিস্? কে তোকে সন্ন্যাস দিয়াছিল? আমি তাহাকে শতবার তিরস্কার করি। তোর মনের এত নিম্ন গতি, তোকে যখন বহির্দৃষ্টিতে বিঘূর্ণিত করিয়া দেয়, আত্মহারা করিয়া ফেলে, তখন তোর অন্তর্দৃষ্টি কোথায়? অন্তর্দৃষ্টি না হইলে পূর্ণ মন হওয়া যায় না। যাহার অন্তর দর্শন করিবার শক্তি লাভ হয়, সেই সন্ন্যাসের পাত্র এবং তাহারই বনে বাস সম্ভবে। এ কথা কি গুরু মুখে শুনিস্ নাই, শাস্ত্রের পাতায় দর্শন করিস্ নাই? যাহার বহির্দর্শন স্থগিত হয়, বাহিরের পদার্থ দেখিবার যাহার শক্তি থাকে না, আমড়া আঁবের পাথক্য জ্ঞান যাহার থাকে না, মেয়ে পুরুষের ভেদজ্ঞান

যাহার রহিত হয়, তাহারই মানসচক্ষু প্রস্ফুটিত হয়। তাহারই অন্তর-দর্শনেন্দ্রিয় সপ্রকাশিত হয়, সেই ধ্যানের একমাত্র অধিকারী। একথা গুরু মুখে না শুনিয়া, না প্রত্যক্ষ করিয়া, না বুঝিয়া বনে আসিয়াছিস্? আমাতে কি দর্শন করিলি? আমার কি দেখিলি? আমার কি দেখিয়া পরমপদ পরিত্যাগ পূর্ব্বক উন্মাদবৎ হইয়াছিস্? বুঝিয়া দেখ্! তোর মনের গতি কোথায়? গুরুমুখে শুনিস্ নাই যে, ইন্দ্রিয়ে মন নামিয়া আসিলে তাহাকে জীব কহে। ইন্দ্রিয়ে মন থাকিলে সে মনে আর ঈশ্বরের বাস সম্ভবে না। যে ঈশ্বর চাহে, তাহার মন কখন কোন কারণে ইন্দ্রিয়াদিতে যাইবে না। এই জন্য ইন্দ্রিয় নিগ্রহ করা সাধকের প্রথম সাধনা। ইন্দ্রিয়ের রাজ্যে বাস করিয়া ইন্দ্রিয় নিগ্রহ করা যায় না। যেমন কোন রাজার রাজ্যে থাকিয়া রাজার প্রতি-কুলতাচরণ করা সাজে না, তেমনি সংসারে বসিয়া সংসারের নিগ্রহ করা একেবারেই অসম্ভব। সেই জন্য সংসার ত্যাগ করা সন্ন্যাসীর নিয়ম। তুই সেই নিয়ম ভঙ্গ করিতে উদ্যত হইয়াছিস্। তোর স্থান বনে নহে। যা! পামর যা! লোকালয়ে যা! পামর! যা কামিনীর পদসেবা করিয়া জীবনের অবশিষ্ট দিবসকয়েক অতিবাহিত করিয়া যা। হায়! কি লজ্জার কথা! তুই যে থুতু একবার ফেলিয়া দিয়াছিস্, সেই থুতু যত্নপূর্ব্বক পুনরায় ভক্ষণ করিতে সাধ করিয়াছিস্?

সাধু এই সকল কথা শ্রবণ পূর্ব্বক সরোদনে সন্ন্যাসিনীর চরণ ধারণ করিয়া বলিতে লাগিলেন, মাগো! কে তুমি? তোমার পরিচয় দাও। তুমি কি ভগবতী? তাহা না হইলে সামান্য নারীর কখন কি এপ্রকার শক্তি সম্ভবে?

সন্ন্যাসিনী বলিতে লাগিলেন যে, আমি কে জানিনা। ভগবতী কি তাঁহার দাসী, তাহাও জানি না। আমি প্রেমহীনা, প্রেমের

কাঙ্গালিনী, তোমাকে প্রেমিক জ্ঞানে প্রেম ভিক্ষা করিতে আসিয়াছিলাম। সংসার কামে পরিপূর্ণ, তথায় প্রেম নাই। তাই বিজন বনে তোমার নাম শ্রবণ করিয়া বড় সাধে ছুটিয়া আসিয়াছিলাম কিন্তু, কি মনস্তাপ! এখানেও কাম? এখানেও কামের প্রাদুর্ভাব! এখানেও কাম ছদ্মবেশে বসতি করিতেছে?

সন্ন্যাসী মাতৃসম্বোধনে পুনরায় সন্ন্যাসিনীকে কহিলেন, মা! দয়া করিয়া আমার আশ্রমে চরণধূলি দিয়া পবিত্র করিয়াছ, তোমার চরণ রেণু লাভ করিবার সময় পাপদেহ পবিত্র হইয়াছে। আমি তোমার সন্তান, তুমি আমার মাতা। মা আমায় কিঞ্চিৎ উপদেশ দিয়া কৃতার্থ করুন।

সন্ন্যাসিনী কহিলেন, আমি কি উপদেশ দিব বল? শ্রীগুরুদেব কৃপা করিয়া এ দাসীকে যাহা বলিয়াছিলেন, তাহাই এতক্ষণে বলিলাম, আরও কিছু বলিতেছি, শ্রবণ কর। কামিনীকাঞ্চনবিরহিত মনে ভগবানের নাম লইয়া সাধনা করিলে তাহা ধারণা হইবার সম্ভাবনা। সেই নাম ধারণাকে ধ্যানসিদ্ধি কহে। সাধকের ইহা দ্বিতীয়াবস্থা। এই অবস্থা লাভ করিতে হইলে বনই সাধনের উপযুক্ত স্থান, যেহেতু তথায় কামনা স্থান পায় না। কিন্তু তুমি সেই কামনাবিহীন স্থানে আসিয়া হৃদয়ে কামনারাশি যত্নপূর্ব্বক সঞ্চিত করিয়া রাখিয়াছ। অতএব সেই কামনাপুঞ্জ এই মুহূর্ত্তে জ্ঞানাগ্নির দ্বারা ভস্মীভূত করিয়া ফেল, তাহা হইলে তোমার পূর্ণ মন হইবে। পূর্ণ মন হইলে তাহার কি প্রকার ফল ফলিয়া থাকে, তুমি আপনি বুঝিতে পারিবে। এই কথা বলিয়া সন্ন্যাসিনী প্রস্থান করিলেন।

এক্ষণে কথা হইবে যে, ধ্যানের পাত্রপাত্রী কাহারা? ধ্যানের তাৎপর্য্যানুসারে পাত্রপাত্রী নির্ণয় করিতে যাইলে দেখা যায়, যে নর

নারীদিগের ইন্দ্রিয় চালনা না হইয়াছে, তাঁহারাই ধ্যানের অধিকারী ও অধিকারিণী। এই কথায় একটী প্রশ্ন হইতে পারে যে, যাঁহারা ইন্দ্রিয় চালনা না করেন, তাঁহারাই যদ্যপি ধ্যানের উপযুক্ত পাত্র পাত্রী হন, তাহা হইলে নপুংসকদিগকে সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ সাধক বলিয়া স্বীকার করাই কর্ত্তব্য। কিন্তু ইতিহাসে নপুংসক সাধকের কোন কথা শুনিতে পাওয়া যায় না। হিন্দুমতে নপুংসকেরা অপবিত্র বলিয়াই পরিগণিত। ভগবানের নিয়মে নর নারী সকল কতিপয় মানসিক বৃত্তি প্রাপ্ত হইয়া সংসারক্ষেত্রে বিচরণ করিয়া থাকে। একপক্ষে কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ, মাৎসর্য্য এবং অপর পক্ষে ক্ষমা, দয়া, দাক্ষিণ্য ইত্যাদি বৃত্তিগুলির কার্য্যের দ্বারা মনুষ্যেরা আনন্দ লাভ করিয়া থাকে। কাম কাহাকে বলে? কোন বস্তুর বিরহ হইলে যে নিরানন্দ ভোগ করা যায়, তাহা পূর্ণ করিবার স্পৃহাকে কাম বলে। কামের রূঢ় তাৎপর্য্য রমনেচ্ছাকেই নির্দ্দেশ করিয়া থাকে; রমন শব্দে মহাসুখকে বুঝায়। সংসারে যে সকল সুখদ বিষয় আছে, তন্মধ্যে রমণী সম্ভোগ মহাসুখ বলিয়া পরিগণিত। মহাসুখাস্বাদন স্পৃহা হওয়া কামবৃত্তির কার্য্য। যাহাদের ইন্দ্রিয়াদি শিথিল, অথবা নিষ্ক্রীয়, কিম্বা অভাব হইয়াছে, তাহাদের রমণ স্পৃহা কমিয়া যায় অথবা থাকে না। সুতরাং এ অবস্থায় একটি মানসিক বৃত্তি খর্ব্ব হইয়া থাকে। নপুংসকাদিরা সেই জন্য বৃত্তিবিশেষ হইতে বঞ্চিত হইয়া জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করে। যাঁহারা ঈশ্বর লাভ করিবেন, তাঁহাদের সকল বৃত্তিগুলিকে সহজ করিবার জন্য পূর্ণমনের প্রয়োজন হইয়া থাকে। রমণ কার্য্যের দ্বারা যাঁহারা কামবৃত্তি চরিতার্থ করিয়া লন, তাঁহাদের স্পৃহাশক্তি ক্রমে হীন হইয়া মানসিক শক্তি কমিয়া আইসে। সুতরাং সে স্থলে মনের আংশিক অভাব হইয়া পড়ে।

রমণ কার্য্যে দেখা যায়, যাঁহার মানসিক বল যত অধিক, তাঁহার সে শক্তি তত বৃদ্ধি হইয়া থাকে। যাঁহার মানসিক বল দুর্ব্বল, রমন কার্য্যে তাঁহার তত দৌর্ব্বল্য প্রকাশ পাইয়া থাকে।

মানসিক বল বলিলে মস্তিষ্কের বল বুঝিতে হইবে। মস্তিষ্ক ও তাহার প্রবর্দ্ধিতাংশ মেরু মজ্জা হইতে স্নায়ুদিগের উৎপত্তি হয়। সুতরাং মস্তিষ্কাদি সবল থাকিলে স্নায়ুরাও সবল থাকে এবং তাহাদের কার্য্যও সুচারুরূপে সম্পন্ন হয়। মস্তিষ্ক দুর্ব্বল হইলে স্নায়ুরাও দুর্ব্বল হয়, ফলে তাহাদের কার্য্যে বিশৃঙ্খলা ঘটিয়া যায়। মানসিক বলে একজন মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াও মরে না, কিন্তু মানসিক বল না থাকিলে সহজাবস্থায়ও সে মরিয়া যাইতে পারে। যোগীরা সর্পাহত হইলে সর্পাঘাত দ্বারা সেই বিষ পুনরায় শরীর হইতে বাহির করিয়া দিতে পারেন। অথবা যে স্থানের বিষ সেই স্থানেই চিরকাল আবদ্ধ করিয়া রাখিতে পারেন অর্থাৎ শরীরে বিষ সঞ্চার হইতে দেন না। যেমন হস্ত পদাদিতে সর্প দংশন করিলে তাহার কিঞ্চিৎ ঊর্দ্ধে বন্ধন দ্বারা শরীরের সর্ব্বত্রে বিষের সঞ্চার হওয়া রক্ষা হয়, মানসিক বল থাকিলেও অবিকল ঐ প্রকার কার্য্য হইয়া থাকে। যেমন, কাহার কোন স্থানে কণ্টক বিদ্ধ হইলে সে অস্থির হয়, কেহ বা তরবারি আঘাতও সহ্য করিতে পারে। উভয় স্থলে মানসিক বলের ক্রিয়া মাত্র।

মানসিক শক্তির কার্য্য নির্ণয় করিবার জন্য ইংরেজ বাহাদুরেরা অনেক প্রকার পরীক্ষা করিয়াছেন। একদা কোন ব্যক্তি রাজদ্বারে প্রাণদণ্ডের শাস্তি পায়। রাজসরকারের নিয়মানুসারে সংহার না করিয়া পণ্ডিতেরা তাহাকে একটী গৃহের মধ্যে লইয়া যাইয়া বলিলেন, দেখ, এই তীক্ষ্ণ শাণিত সুবৃহৎ অস্ত্রের দ্বারা তোমার হাতটী কাটিয়া ফেলিব। হস্ত কাটিয়া ফেলিলে শোণিত বহির্গত হইবে। যখন সমুদয়

শোণিত বাহির হইয়া যাইবে, তখন তোমার কম্প উপস্থিত হইবে এবং কাঁপিতে কাঁপিতে মরিয়া যাইবে। এই কথা তাহার মনে প্রত্যয় মানিল। তাহার মানসিক শক্তি আর থাকিল না, ভয় আসিয়া তাহাকে অধিকার করিল। পণ্ডিতেরা এই কথা বলিয়া বস্ত্রের দ্বারা উহার চক্ষু বাঁধিয়া দিল এবং হস্তপদ বন্ধন পূর্ব্বক তাহার বাহুবিশেষে একটী আলপিন স্পর্শ করিবামাত্র সে চীৎকার করিয়া বাপরে! মারে! করিয়া ছট্‌ফট্ করিতে লাগিল। সে মানসিক চক্ষে দেখিতে লাগিল, যেন, সেই শাণিত অস্ত্রাঘাত হইয়াছে। পণ্ডিতেরা আলপিন স্পর্শিত স্থানে শোণিতের উষ্ণানুষ্ণ সদৃশ জল মৃদু ধারায় ঢালিতে লাগিলেন। এই জলধারাকে সে শোণিত বলিয়া মনে করিল এবং কিয়ৎকালের মধ্যে তাহার কম্পন আসিয়া উপস্থিত হইল এবং কাঁপিতে কাঁপিতে তৎক্ষণাৎ মরিয়া গেল। মানসিক বল না থাকিলে এইরূপ পরিণামই প্রায় ঘটিয়া থাকে।

পূর্ণভাবে মানসিক শক্তি বর্দ্ধিত হইলে মানসিক বৃত্তিগুলিও পূর্ণভাবে বর্দ্ধিত হইয়া থাকে। কামবৃত্তি বর্দ্ধিত করিয়া যদ্যপি সংসারে অবস্থিতি করা যায়, তাহা হইলে অত্যধিক রমণেচ্ছা ও তৎকার্য্যে সর্ব্বদা ব্যাপৃত থাকিতে সকলে বাধ্য হইয়া থাকে। কিন্তু যে ব্যক্তি ধ্যানপরায়ণ যোগী, তাঁহার সেই বৃত্তি ভগবানের সহবাসজনিত মহাসুখের দিকে নিয়োজিত হয় বলিয়া ইন্দ্রিয়সুখের দিকে তাহা ধাবিত হইতে পারে না। কামরূপ মানসিক বৃত্তি ভগবানের দ্বারা পরিতৃপ্তি লাভ হইয়া যায়। যেমন রমণ কালে আনন্দে মন মাতিয়া উঠে, ভগবানের সহিত সংযোগ হইলে তদপেক্ষা কোটি কোটি গুণে আনন্দ উথলিয়া উঠে, সে সময়ে মন যাইয়া তাঁহাতেই লিপ্ত হইয়া থাকে। বাহ্যিক রমণের বিরাম আছে, তাহার দ্বারা মানসিক বলের

হ্রাস হয়, তাহার দ্বারা শরীর দুর্ব্বল হয় এবং ইচ্ছামত রমণের শক্তি কমিয়া যায়, কিন্তু সে রমণের ফল স্বতন্ত্র প্রকার। তদ্দ্বারা মানসিক শক্তি বৃদ্ধি হয়, শরীর বলিষ্ঠ হয়, পরমানন্দ লাভ করিবার ক্রমে অধিকারী হওয়া যায়। সেই জন্য প্রভু বলিতেন যে, যে পরিমাণে কাম শক্তি খর্ব্ব করিবে, ভগবান্‌কে লইয়া রমণ সুখ অর্থাৎ সম্ভোগ করিবার সে তত অধিকারী হইবে। যোনি লিঙ্গের রমণ সাময়িক সুখের নিমিত্ত। তাহা যেমন সীমাবিশিষ্ট, সুখও তেমনি ক্ষণিক। যখন পূর্ণ কামী হইয়া ভগবানের সহিত রমণ করা হয়, তখনকার সুখের অবধি থাকে না। ভগবানের সহিত রমণ কি প্রকার? যখন ধ্যানী ধ্যানের দ্বারা অর্থাৎ পূর্ণমন পূর্ণ পরিমাণে পরম পুরুষে প্রদান করেন, তখন ভগবান্ আধেয় অর্থাৎ লিঙ্গরূপে সাধকের আধার অর্থাৎ মনরূপ যোনিতে প্রবেশ করিয়া অনন্ত রমণের সুখ প্রদান করিয়া থাকেন। কাম বৃত্তির প্রকৃত উদ্দেশ্য এই।

এই স্থানে আর একটি কথা জিজ্ঞাস্য হইতে পারে। ভগবানের সহিত যে রমণের কথা উল্লিখিত হইল, তাহাতে নর নারী উভয়কে নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। পুরুষেরা নারীর সহিত রমণ কার্য্য সম্পন্ন করিয়া থাকে, কিন্তু ভগবানের সহিত রমণ কালে পুরুষদিগকে প্রকৃতি বলা হইল কেন?

পুরুষ প্রকৃতি বিচার করিতে হইলে রামকৃষ্ণদেবের মতে এক ভগবান্‌ই পুরুষ এবং জীবমাত্রেই প্রকৃতির অন্তর্গত। সাধারণ পুরুষ প্রকৃতি ভাবকে জৈব ভাব বলে, প্রকৃতি ভাব আনয়ন করাই সাধনের উদ্দেশ্য। আধার আধেয় সম্বন্ধ জ্ঞান হইলে সুতরাং আপনাকে প্রকৃতি জ্ঞান না করিয়া আর কি করিবে? কেহ বলিতে পারেন যে পুরুষের দ্বারা সন্তান জন্মায়, সেই জন্য আধেয় বিশেষ, কিন্তু রামকৃষ্ণদেব

বলিয়াছেন যে, উহা ভগবানের কল ঘরা অর্থাৎ ব্যবস্থা মাত্র। নরনারী-গণ যখন ভগবানের সাধনা করেন, তখন তাঁহাদের পরস্পর কোন প্রভেদ থাকে না। তাঁহাদের উভয়ের অভিপ্রায় এক প্রকার, সাধনা এক প্রকার এবং কার্য্যও ফলতঃ এক প্রকার। একদা মীরাবাই সনাতন গোস্বামীর কৃষ্ণানুরাগের কথা শুনিয়া তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিবার অভিপ্রায় প্রকাশ করেন। সনাতন গোস্বামী স্ত্রীলোকের নাম শ্রবণ করিয়া অতিশয় বিনীতভাবে বলিয়া পাঠান যে, তিনি সন্ন্যাসী, সুতরাং কামিনীর মুখাবলোকন করিলে তাঁহার ব্রতভঙ্গ হইয়া যাইবে। সনাতনের এই কথায় মীরা হাসিয়া বলিয়াছিলেন, কি! কি! সনাতন কি বলিয়াছে? সন্ন্যাসী! পুরুষ! এ যে নূতন কথা শুনিলাম। বৃন্দাবনে কৃষ্ণচন্দ্রই একমাত্র পুরুষ, আমরা তাঁহার দাসী। মনে করিয়াছিলাম, প্রভু আমার আবার কি রকম দাসী আনিয়াছেন; একবার ভগ্নীর সহিত আমরা পরিচয় করি, তাহা না হইলে পাছে প্রাণবল্লব কিছু মনে করেন। একি আশ্চর্য্য কথা যে, কৃষ্ণচন্দ্রের অন্তঃপুরে, তাঁহার মহিলার মধ্যে পরপুরুষ আসিয়া প্রবেশ করিয়াছে? ললিতা সখী কি এ সংবাদ পান নাই? আমি এখনি তাঁহাকে বলিয়া সনাতনকে বৃন্দাবন হইতে দূর করিয়া দিব। এতক্ষণে সনাতন গোস্বামীর চৈতন্য হইল। অতএব কামবৃত্তির পূর্ণতা লাভ করা ধ্যানীর উদ্দেশ্য।

কামবৃত্তির ন্যায় ক্রোধের পূর্ণতা লাভ করা ধ্যানীর দ্বিতীয় উদ্দেশ্য। ক্রোধ অর্থে উত্তেজনা। সংসারে এই মানসিক বৃত্তিটী খর্ব্ব করা নীতি শিক্ষার অন্তর্গত। সকলেই জানেন যে, ক্রোধী হওয়া উচিত নহে। ক্রোধে আমরা অপরের অনিষ্ট সাধন করিয়া থাকি, সুতরাং স্বার্থভঙ্গের সূত্রানুসারে কামের ন্যায় ক্রোধকে নিকৃষ্ট বৃত্তির অন্তর্গত বলিয়া কথিত হয়। সংসারে কামশক্তির কার্য্য দ্বারা মানসিক শক্তি যত কমিয়া আইসে,

ক্রোধও সেই পরিমাণে প্রস্ফুটিত হইতে পারে না। সংসারে ক্রোধ কোথায়? উত্তেজনা কোথায়? কামেই সমুদায় বৃত্তিগুলির সর্ব্বনাশ করিয়া রাখিয়াছে। কোন ব্যক্তির এক দুরন্ত পুত্র ছিল। ইহার উৎপাতে প্রতিবাসীরা যারপরনাই উত্যক্ত হইয়া তাহার পিতার সহিত পরামর্শ পূর্ব্বক উহার বিবাহ দিবার ব্যবস্থা করিল। বিবাহের পরদিবস হইতে তাহার স্বভাব পরিবর্ত্তিত হইয়া যাইল। সে স্ত্রী লইয়া সর্ব্বদা ব্যতিব্যস্ত থাকিত এবং ঘন ঘন কামবৃত্তি চরিতার্থ দ্বারা অল্প দিবসের মধ্যে স্নায়বীয় বিকারগ্রস্থ হইয়া দুর্ব্বল হওয়ায় শক্তি বৃদ্ধির নিমিত্ত নেশা করিতে আরম্ভ করিল। নেশার সাময়িক উত্তেজনায় কামশক্তিও সাময়িক উত্তেজিত হইত বটে, কিন্তু যৌগিক অবসাদনের অতি ভীষণ দুরবস্থা অচিরাৎ প্রকাশিত হইল। সে তখন নেশা করিয়া জড়ের ন্যায় পড়িয়া থাকিত। একদিন সন্ধ্যাকালে তাহাকে মশক দংশন করায় তাহাদিগকে সম্বোধন করিয়া বলিল, আচ্ছা ভাই! যত পার কামড়াইয়া লও, বাবা আসিলেই তোমাদের উৎপাতের কথা বলিয়া একটা একটা বিবাহ দিয়া দিব। কামের দ্বারা এতদূর হীনাবস্থায় পরিণত হইতে হয়, সুতরাং অন্য বৃত্তির আর চিহ্ন মাত্রও খুঁজিয়া পাওয়া যায় না।

ক্রোধের অর্থে উত্তেজনা বলা হইয়াছে। উত্তেজনা না থাকিলে কখন কামের সহায়তা হয় না। ধ্যানীর পক্ষে উত্তেজনা যারপরনাই প্রয়োজন। যাহাকে মহারমণ করিতে হইবে, যাহাকে ভগবানের সমীপে গমন করিতে হইবে, তাহার পক্ষে উত্তেজনা কতদূর প্রয়োজন, তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না। যেমন কোন উদ্দেশ্য বস্তু লাভ করিতে হইলে যে প্রকার উত্তেজনা বা অনুরাগ জন্মিবে, উদ্দেশ্য সাধন পক্ষে ততদূর সুবিধা হইবে। যাহার উত্তেজনা নাই, যাহার ক্রোধ নাই,

তাহার কোন কার্য্য করিবার শক্তি নাই; সে বাস্তবিক অপদার্থ মৃৎপিণ্ড-বিশেষ। উত্তেজনা ব্যতীত কাহারও উন্নতি হয় না, উত্তেজনা ভিন্ন কেহ সুখী হইতে পারে নাই, উত্তেজনার অভাবে কেহ এ পর্য্যন্ত ভগবান্ লাভ করিতে পারে নাই। কিন্তু মস্তিষ্ক দুর্ব্বল হইলে, মন বিচ্ছিন্ন হইলে, মনের শক্তি কমিয়া যাইলে উত্তেজনা আসিবে কিরূপে? এই জন্য পূর্ণমন হইতে হইলে পূর্ণ ক্রোধের প্রয়োজন হইয়া থাকে। অমুকের এতবড় যোগ্যতা, যে আমায় এত বড় কথা বলে, মার্ শালাকে। সর্ব্বস্ব কাড়িয়া লও, ইত্যাকার পরানিষ্ট করা ক্রোধের কার্য্য। কিন্তু ধ্যানীর ক্রোধ সেরূপ নহে। ধ্যানী মনে মনে ক্রোধের চরণ ধরিয়া বলেন, ভাইরে ক্রোধ! আমায় আর কতদিন এই ভাবে প্রভুর বিরহে ফেলিয়া রাখিবি? সুসজ্জিত হইয়া আয়, তোর স্কন্ধে আরোহণ পূর্ব্বক সত্বর চলিয়া যাই। তোমার গতি অতি প্রবল, প্রভঞ্জনও তোমার নিকটে পরাজয় মানিয়াছে। ধ্যানীর অনুরাগকেই ক্রোধের কার্য্য কহে। অনুরাগ না থাকিলে কি কেহ ভগবান্ লাভ করিতে পারেন? প্রহ্লাদ অনুরাগে স্তম্ভের ভিতর হইতে হরিকে বাহির করিয়াছিলেন, ধ্রুব বনের ভিতরে হরির মদনমোহন রূপ দর্শন করিয়াছিলেন। যোগী, ঋষি, মুনি, সকলেই অনুরাগে সিদ্ধমনোরথ হইয়াছেন। সাধকের অনুরাগই সর্ব্বস্ব। সেই অনুরাগ পূর্ণ মনের ফলস্বরূপ। সুতরাং পূর্ণমন হইতে হইলে তাহার স্থান বন।

লোভ অর্থাৎ আকাঙ্ক্ষা। সংসারে নানাবিধ বস্তুতে মন ধাবিত হয় এবং তাহা প্রাপ্ত হইলে আরও আকাঙ্ক্ষা বাড়িয়া থাকে। ধনে লোভ হইলে আরও ধন লিপ্সা বৃদ্ধি হয়, পুত্র হইলে আরও পুত্র পাইবার ইচ্ছা বৃদ্ধি হয়, মান সম্ভ্রমের বাসনা কখনই এক স্থানে সীমাবদ্ধ থাকে না। এইরূপে ক্রমান্বয়ে বস্তুবিশেষে লোভ জন্মিয়া মনের অংশ

প্রত্যংশ হইয়া যায়, সুতরাং মন দুর্ব্বল হইয়া পড়ে। মন আর স্বস্থানে থাকিতে পারে না, উহা নানাস্থানী হইয়া কিয়ৎ কালের মধ্যে অদৃশ্যপ্রায় হইয়া আইসে। পূর্ণমনে পূর্ণ লোভ বিরাজিত থাকে। ঐ লোভ হরির পাদ-পদ্ম দর্শনের জন্য নিযুক্ত হওয়া সাধকের অভিপ্রায় ; হরি কথা শুনিব, হরিনাম উচ্চারণ করিব, শ্রীহরির সেবা দ্বারা জীবন সার্থক করিব,এমন দিন কবে হইবে, এই লোভে তিনি সর্ব্বদা অপেক্ষা করিয়া থাকেন।

মোহ অর্থে ভ্রম। সংসারে পদার্থদিগের সর্ব্বদা পরিবর্ত্তন দেখিয়া প্রকৃত বস্তুর সহিত ভ্রম জন্মিয়া থাকে। ভ্রমে দেহাদিতে আত্মবুদ্ধি বদ্ধমূল হয়। আত্মবুদ্ধিতে মনের অবস্থা সুতরাং স্থানভ্রষ্ট হইয়া থাকে। আত্মবুদ্ধিতে এ আপনার, ও পর ইত্যাকার ভ্রমজনিত কার্য্যে মনের পূর্ণতা সংরক্ষা হইতে পারে না। সংসারে মোহের এই অবস্থা। পূর্ণমনে পূর্ণমোহ বিরাজিত থাকে এবং সাংসারিক ভাবের সহিত ভগবানের প্রতি যাহাতে ভ্রম না হইতে পারে, তাহার ব্যবস্থাপকরূপে প্রতীক্ষা করিয়া থাকে। যখনই সাংসারিক ভাব মনে প্রতিফলিত করিতে চেষ্টা করে, মোহ অমনি যাইয়া নিজের অবস্থা দর্শনপটে দেখাইয়া বলে যে, যাহা কিছু দেখিতেছ, সমুদয় ভ্রম—সত্য, ভগবান্।

সাংসারিক ভাবে মনের অবস্থিতিকালীন আপন বস্তুতে ভ্রম জন্মানই ভ্রমের কার্য্য। যে স্থান হইতে আসিয়াছি, যে স্থানে যাইতে হইবে ; যিনি অতীত, বর্ত্তমান এবং ভবিষ্যতের একমাত্র সহায়, সম্পত্তি, উপায় এবং অবলম্বন, তাঁহাতে প্রতিক্ষণই, প্রতি কথায়, প্রত্যেক অবস্থায়, সন্দেহ, বিচার এবং কুতর্ক উত্থাপন পূর্ব্বক জীবনপথের পথিকদিগকে সর্ব্বস্ব জ্ঞান করান মোহের কার্য্য। মনের পূর্ণতা হইলে মোহবৃত্তিও পূর্ণতা লাভ করে। তখনই সংসারের আভ্যন্তরিক রহস্য ভেদ হইবার সম্ভাবনা।

মদ-শব্দে গর্ব্ব বা মত্ততা। সংসারে সাংসারিক ভাবে মনের এই বৃত্তিবিশেষকে নিয়োজিত করিয়া রাখিলে ক্রমে তাহার শক্তি ক্ষয় হইয়া যায়। বিষয়ের মত্ততা বা ঐহিক গর্ব্বের পরিণাম পরিসমাপ্তি না হউক, উহা শীঘ্রই তেজহীন হইয়া আইসে। মনের মত্ততা সংসারে ধাবিত হইতে না দিয়া যদ্যপি মনের পূর্ণতা কাল পর্য্যন্ত মনেই বর্দ্ধিত করা হয়, তাহা হইলে ভগবানের নামে ও ভাবে উন্মত্ত হইবার সময় তাহার অভাব হয় না। কিন্তু সংসারক্ষেত্রে তাহা ব্যয়িত হইয়া যাইলে প্রকৃত কার্য্য-কালে আর তাহার সম্বন্ধ স্থাপন না হওয়ায় সে সময়ে কার্য্যক্ষেত্রে ঠকিয়া যাইতে হয়।

মাদকাদি দ্রব্যের দ্বারা যেমন মত্ততা জন্মায়, সাংসারিক প্রত্যেক পদার্থেরও তেমনি মত্ততা জন্মাইবার শক্তি আছে, তাহা আমরা সকলেই জানি। মত্ততা আসিলে সে সময়ে মন এক দিকেই ধাবিত হয়। মন যখন দিকবিশেষে চলিয়া যায়, তখন দিকবিশেষে তাহার অভাব হইয়া পড়ে। সুরাদি পান করিলে মনের ভাব যখন যেরূপ প্রকার হয়, তখন অন্য প্রকার ভাব তথায় স্থান পাইতে পারে না। মদের ধর্ম্মই এই। মনে যখন সাংসারিক মদ অবস্থিতি করে, তখন সে মন ভগবানের দিকে গমন করিতে অশক্ত হয়। মন যখন ভগবানে লিপ্ত থাকে, তখন মত্ততা আসিয়া পূর্ণভাবে কার্য্য করিয়া যাইতে পারে। সংসারে যে মত্ততা আমাদের সুখের কারণ হয়, যে মত্ততায় আমাদের আত্মপ্রতারণা উপস্থিত হয়, যে মত্ততায় আমাদের কর্ত্তব্য জ্ঞান বিলুপ্ত হয়, সে মত্ততা ভগবানে যাইলে আমাদের আনন্দের আর অবধি থাকে না। যেমন বিষয় রসাদির মাত্রা বাড়াইলে মত্ততার পরিমাণ বৃদ্ধি হয়, ভগবানের নাম রস পান করিলে তেমনি মত্ততা আইসে। এই রস যতই পান করা যায়, ততই মত্ততার আধিক্য হয়। সুরার মত্ততায় যেমন কটির বস্ত্র

মস্তকে বাঁধিতে লজ্জা হয় না, নামরসের মত্ততায় তেমনি লজ্জা ঘৃণা ভয় এককালে চলিয়া যায়। বিষয়াদি মদে অচৈতন্য করে, কিন্তু নামরসে চৈতন্য-রাজ্যে গমন করিবার অধিকারী হওয়া যায়। সেই নিমিত্ত মনের বৃত্তিবিশেষ মদের আবশ্যকতা হইতেছে।

মাৎসর্য্য বলিলে ঈর্ষা বা পরভাগ্যকাতরতা বুঝায়। আমরা সংসার-ক্ষেত্রে ঈর্ষাবৃত্তিটীকে যথোচিত মতে নিয়োজিত করিয়া রাখিয়াছি। এমন বিষয় নাই, যাহাতে আমাদের ঈর্ষা নাই। ঈর্ষার কার্য্য পরনিন্দা এবং বিদ্রূপ করা। পরনিন্দা করিতে আমরা সকলেই সিদ্ধ। এই বৃত্তিটী বাল্যকালেই প্রস্ফুটিত হয়, সুতরাং অল্প দিবসের মধ্যেই তাহার ফল ফলিতে আরম্ভ হইয়া থাকে। এই জন্য আমরা কাহার ভাল দেখিতে পারি না, কেহ দুই পয়সা উপার্জ্জন করিয়া দুই সন্ধ্যা দুই মুঠা অন্ন উদরে আহুতি দিতে পারিলে তাহাকে না বলি এমন কথাই নাই। যে দিকে দৃষ্টিপাত করা যায়, সেই দিকেই ঈর্ষা দেদীপ্যমান রহিয়াছে।

যদিও কখন কেহ কাহার সুখ্যাতি করেন, তাহাতেও ঈর্ষা পূর্ব্ববর্ত্তী কারণরূপে অবস্থিতি করে। একজনকে অপদস্থ করিবার ছলে অপরকে প্রশংসা করা হয়। সর্ব্বত্রে এইরূপে ঈর্ষা ব্যয়িত হইয়া যায় এবং তাহার অশান্তিপ্রদ ফল পাইয়া নীতিজ্ঞ ব্যক্তিরা অন্যান্য বৃত্তির ন্যায় ঈর্ষা বৃত্তিকেও পরিত্যাগ করিতে উপদেশ দিয়া থাকেন। ক্রমে এই বৃত্তিটী হ্রাস হইয়া আইসে। ঈর্ষাবৃত্তি কমিয়া যাইলে আমাদের আর ভগবান্ লাভের প্রত্যাশা থাকে না। আমারা সংসারক্ষেত্রে ঈর্ষাকে নিরানন্দ প্রদানের নিদান বলিয়া বুঝি বটে এবং তাহার শক্তি ক্রমে হীনবল হইয়া আইসে বলিয়া তাহা হইতে আপনিই অব্যাহতি লাভ করিতে পারি, কিন্তু ভগবান্ লাভ করিবার পক্ষে যে চিরকালের

জন্য উহা দুর্লঙ্ঘ্য প্রাচীরবৎ হইয়া থাকে, তাহা আমরা বুঝিতে অশক্ত হইয়া থাকি। পূর্ণমনে পূর্ণ ঈর্ষাভাব প্রকাশ পায়। পূর্ণ ঈর্ষা না থাকিলে কখন কেহ ভগবান্ লাভ করিতে পারে না। যাঁহার ভগবানের প্রয়োজন হয়, তিনি কি মনে করেন? কেবল দৃষ্টান্ত তাঁহার পক্ষে অমৃতবৎ কার্য্য করে। যখন তিনি মনে করেন যে, বালক প্রহ্লাদ হিরণ্যকশিপুর মহা অত্যাচারে কবলিত হইয়াও ভগবানের ক্রোড়ে উপবেশন করিয়াছিলেন, জড় পিতার ক্রোড়চ্যুত ধ্রুব জগৎপিতা নারায়ণের ক্রোড়ে স্থান পাইয়াছিলেন, তখন তাঁহার মনে ঈর্ষাবৃত্তি উত্তেজিত হইয়া বলে যে, তুমিও সেই ব্রহ্মাণ্ডেশ্বর লাভ করিতে না পারিবে কেন? ঈর্ষাবৃত্তি যাঁহার আছে, যাঁহার পূর্ণ ঈর্ষাবৃত্তি আছে, তাঁহার অভাব কিসের? সর্ব্বদা ধ্রুব প্রহ্লাদের সৌভাগ্যের কথা হৃদয়-মাঝে জাগরূক থাকায় ঈর্ষানলে তিনি যত দগ্ধীভূত হইতে থাকেন, ততই ভগবান্ ভগবান্ বলিয়া তাঁহার ব্যাকুলতা আইসে, তাঁহাকে লাভ করিবার জন্য ততই তিনি চেষ্টা করিয়া থাকেন। ঈর্ষাহীন হইলে মনের ঐরূপ ইচ্ছা থাকে না, সুতরাং তাঁহাকে সাধনপথে ঠকিয়া যাইতে হয়।

রামকৃষ্ণদেব এই নিমিত্ত ধ্যানীদিগকে বনে যাইবার জন্য ব্যবস্থা করিয়া দিয়াছেন।

ধ্যানের তাৎপর্য্য দ্বারা বুঝা যাইতেছে যে, পূর্ণমন না হইলে কস্মিন্ কালে ধ্যানের অধিকার জন্মায় না। এক্ষণে কোন্ সাধক ধ্যানের যোগ্য, তাহা অনায়াসে জ্ঞাত হওয়া যাইবে। ইচ্ছামত কেহই ধ্যান করিতে পারেন না, সখ হইলেই ধ্যানী হওয়া যায় না। রামকৃষ্ণদেব বলিতেন যে, উকীলেরা হাকিমের সম্মুখে দাড়াইয়া অনর্গল কতই বলিয়া থাকেন। সেইরূপ বলিতে অনেকের সাধ হইতে পারে, অথবা

যখন ডাক্তার রোগীকে দেখিয়া তৎক্ষণাৎ কাগজ লইয়া চড় চড় করিয়া ঔষধ লিখিয়া দেন, তখন সেইরূপ ব্যবস্থা করিবার শক্তি লাভ করিতে অনেকের ইচ্ছা হয়। কেবল ইচ্ছা হইলে কি হইবে? উকিল, ডাক্তারকে বাহিরে দেখিতে অতি সহজ। মনে হয়, ইহারা ফাঁকি দিয়া বিশেষ পরিশ্রম বিনা মুঠা মুঠা টাকা লইয়া যায়, কিন্তু তাঁহাদের সেই অবস্থা লাভ করিবার জন্য যে কত সাধ্য সাধনা করিতে হইয়াছে, কত আমড়া ভাতে ভাত খাইতে হইয়াছে, তাহা কে গণনা করেন? সেইরূপ ধ্যানের ফল অতি সুন্দর, ধ্যানের কার্য্য অতি চমৎকার। সেই জন্য যোগীদিগের কথা লইয়া চিরকাল আন্দোলন হইয়া থাকে। কেবল আন্দোলন করিলে কি হইবে? তাহা সাধনার বিষয়, অনুকরণ কিম্বা বাক্যের ছটার অধিকারভুক্ত নহে। ধ্যানী হইতে হইলে পূর্ণ মনের আবশ্যক। পূর্ণ মন লাভ করিতে হইলে সংসারে তাহা ঘটিতে পারে না, এই জন্য বনই তাঁহাদের একমাত্র স্থান।

কোণে এবং মনের দ্বারা সংসার বুঝায়। যাঁহারা বনগমনে অসমর্থ, যাঁহাদের পূর্ণ মন হইবার আপাততঃ উপায় নাই, তাঁহাদের মনের অবস্থার তারতম্যের দ্বারা কোণ এবং মন শব্দ কখন কখন উল্লিখিত হইতে পারে। কোণের বলিলে গৃহের নির্জ্জন স্থানের ভাব আইসে। নির্জ্জন স্থানে উপবেশন করিয়া দুই দণ্ড যাঁহারা ধ্যান করিতে পারেন, তাঁহাদের মনের অবস্থা সাধারণ সংসারী অপেক্ষা উচ্চ এবং বলবান না হইলে তাঁহারা সাময়িক মন স্থির করিতে কখনই পারিবেন না। যাঁহার যে বস্তু থাকে, তাঁহার সে বস্তু লইয়া কার্য্য হইতে পারে। যাঁহার বিদ্যা নাই, তাঁহার বিচার করা সাজে না, যাঁহার ধন নাই, তাঁহার দাতা কর্ণের ভাবে কার্য্য হয় না, যাঁহার পা নাই, তাঁহার দৌড়ান হয় না, যাঁহার চক্ষু নাই, তাঁহার দর্শন করার ফল

ফলে না, সেইরূপ যাঁহার মানসিক বল নাই, তাঁহার ধ্যান করা কখনই সম্ভবে না।

নির্জ্জন স্থান নির্দ্দেশ করিয়া রামকৃষ্ণদেব সাংসারিক হিল্লোল হইতে মনকে কিয়ৎকাল রক্ষা করিবার ভাব প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন। ইহা বাস্তবিক বনগমন করিবার অবস্থার পূর্ব্বের কথা।

সাধনার ভাব মনে উদয় হইবামাত্র কেহ তাহাতে কৃতকার্য্য হইতে পারেন না। ক্রমাগত সাধনা বা অভ্যাস করিতে করিতে মন ক্রমে আয়ত্তাধীন হইলে তাহার বন্ধন বা পূর্ব্বসংস্কারাদি কমিয়া আইসে। এই জন্য বনে প্রবেশ করিবার পূর্ব্বে সংসারে ধ্যান করিতে শিক্ষা করা কর্ত্তব্য। যে সাধক সংসারের ভিতর মন স্থির করিয়া নির্জ্জন স্থানে ধ্যান করিতে পারেন, তাঁহার পক্ষে বনগমন বিধি। কারণ মনের আবেগে কিবা কোন হেতুবিশেষের দ্বারা যদ্যপি কেহ সন্ন্যাসী হইয়া বন গমন করেন, তাহা হইলে এরূপ সাধকের অনেক সময়ে পতন হইয়া থাকে, এরূপ ঘটনা আমি পূর্ব্বে বলিয়াছি।

সংসারে থাকিয়া সাধন করিবার কথা বলা হইল বলিয়া কামিনী-কাঞ্চন লিপ্ত নরনারীদিগকে নির্দ্দেশ করা যাইতেছে না। রামকৃষ্ণদেব কামিনীকাঞ্চনবিবর্জ্জিত নরনারীদিগের জন্যই এই ব্যবস্থা করিয়া গিয়াছেন। সাংসারিক নরনারীদিগের ধ্যান করিবার অধিকার কস্মিন্‌কালে নাই এবং হইতে পারে না, যেহেতু তিনি বলিয়াছেন যে, কেহ এক হাজার বৎসর রেত ধারণ করিয়া যদ্যপি এমন কি স্বপ্নাবস্থায় তাহা স্খলিত হইয়া যায়, তাহা হইলে তাহার সন্ন্যাস ভ্রষ্ট হইয়া যায়। সেস্থলে যে নর নারী কল্য ইন্দ্রিয় চালনা করিয়াছেন, তাঁহার পক্ষে অদ্য ধ্যান করিবার সাধনা কোন মতে ব্যবস্থা হইতে পারে না।

আমার এ কথা উপর্য্যুপরি বলিবার হেতু এই যে, আমরা যোগের

প্রক্রিয়া লইয়া সংসারের বক্ষে, সাংসারিক কার্য্য কলাপ সমাধা করিয়া ধ্যান করিবার জন্য, সাধনা করিতে যত্নবান হইয়া থাকি। এ প্রকার চেষ্টা করা সর্ব্বতোভাবে অন্যায় এবং ভ্রমের কার্য্য। যে ব্যক্তি যে কার্য্য করিবার উপযুক্ত, তাহার পক্ষে যে কার্য্য সমাধা হইতে পারে, কিন্তু পাত্রদোষ থাকিলে উদ্দেশ্য সাধন হওয়া সম্পূর্ণ অসম্ভব।

রামকৃষ্ণদেব কোণ শব্দের দ্বারা এক পক্ষে কামিনীকাঞ্চনবিবর্জ্জিত অর্থাৎ যাহারা কস্মিন্ কালে স্ত্রী গমন অথবা ধনোপার্জ্জনাদি না করিয়াছেন, এরূপ সাধকদিগকে, আর এক পক্ষে কামিনীকাঞ্চন সম্বন্ধবিহীন অর্থাৎ যাহাদের আপাততঃ কামিনীকাঞ্চন ত্যাগ হইয়াছে, তাঁহাদিগকে নির্দ্দেশ করিয়া গিয়াছেন। যে নরনারীর সাংসারিক ভাব বিষ বোধ হয়, তাঁহার অগ্রে গুপ্ত সাধন অর্থাৎ নির্জ্জনস্থানে থাকিয়া সাধন করা কর্ত্তব্য। যখন তিনি সংসারের প্রলোভন এবং কামিনীকাঞ্চনের আকর্ষণ হইতে মনকে স্বাধীন ভাবে রক্ষা করিতে পারিবেন, তখন তাঁহার আর সংসারে থাকা বিধি নহে। মনের বল পরীক্ষা না করিয়া যদ্যপি কেহ ধ্যানী হইতে অভিলাষ করেন, অথবা তদবস্থায় পদার্পণ করেন, তাহা হইলে তাঁহার ধ্যানভ্রষ্ট হওয়া অধিক দূরের কথা নহে।

মনে সাধন করা সাধকের প্রথমাবস্থার কথা। পূর্ব্বে বলিয়াছি যে, মনে নানাবিধ সংস্কার থাকিলে ধ্যানের সময় সেই সকল ভাব ক্রমান্বয়ে প্রকাশিত হইয়া ইষ্ট চিন্তায় বিভীষিকা ঘটাইয়া থাকে। রামকৃষ্ণদেব একদিন রহস্য করিয়া বলিয়াছিলেন যে, "সভাদি স্থানে সকল সভ্য একত্রিত হইয়া যখন ধ্যান করে, তাহাদের দেখিলে ঝাউতলার বাঁদরদিগের নয়ন মুদিয়া বসিয়া থাকার কথা স্মরণ হয়। বাঁদরগুলো রৌদ্রের সময় ছায়া পাইবে বলিয়া ঝাউগাছের নিম্নে সদলে আসিয়া চক্ষু বুজিয়া

চুপ করিয়া বসিয়া থাকে। কেহ নিকটে যাইলে অমনি চাহিয়া দেখে, সুতরাং তাহাদের তাহা নিদ্রাবস্থা নহে। যেমন কাহারও নিদ্রা না হইলে যখন চক্ষু বুজিয়া পড়িয়া থাকে, তখন তাহার মনে কি ভাবনা হয়? অনেক সময়ে অনেকে লাক টাকার এবং পূর্ব্বদৃষ্ট কামিনীবিশেষের স্বপ্নই দেখিয়া থাকে। বাঁদরদিগের দুইটী ভাব দেখা যায়। উদর এবং শীশ্ন। বাঁদরীরা সমভিব্যাহারেই থাকে, সে বিষয়ের চিন্তা করিতে হয় না। বিশেষতঃ একটী দুইটী নহে, বাঁদর বা হনুমানাদি একাকী অধিক সংখ্যক বাঁদরীর কর্ত্তা হইয়া বিহার করিয়া থাকে। তবে চিন্তার মধ্যে উদর। যখন চক্ষু বুজিয়া বসিয়া থাকে, তখন কাহার মাচায় শশা আছে, কাহার চালে লাউ আছে, কাহার গাছে পেয়ারা আছে, সে সেই সময়ে তাহাই চিন্তা করিয়া রাখে, রৌদ্র কমিয়া যাইলে অমনি সদলে হুপহাপ করিয়া পূর্ব্ব চিন্তিত স্থানে যাইয়া উদর পূর্ণ করিয়া লয়। দলবাঁধিয়া ধ্যান করাও অবিকল সেইরূপ। পাঁচ জনে একত্রিত হইলে যে কেবল সভা বুঝায় তাহা নহে, সংসারকেও নির্দ্দেশ করিয়া থাকে। এরূপ ধ্যানের সময় কখনই চিত্ত স্থির হইতে পারে না। হয় সাংসারিক চিন্তাপরম্পরা মানসাকাশে উদয় হইয়া ধ্যানের সময় কাটিয়া যায়, না হয় নিদ্রাকর্ষণ হইয়া থাকে। যে সকল সাধু সন্ন্যাসীরা সর্ব্বদা সংসারক্ষেত্রে ঘুরিয়া বেড়ান এবং তন্ত্রাদি সাধনে মনের চাঞ্চল্য নিবারণের নিমিত্ত মাদক দ্রব্যাদি পান করিয়া থাকেন, তাঁহাদের তদ্দ্বারা মানসিক বল নিস্তেজ হইয়া আইসে। তান্ত্রিক ধ্যানীরা মাতাল হইয়া পড়েন এবং সাধু সন্ন্যাসীরা গাঁজার বাদসাহত্ব লাভ করেন। একে দুর্ব্বল মন, তাহাতে যদ্যপি তাহাকে কৃত্রিম উপায়ে ক্রমান্বয়ে উত্তেজিত করা যায়, তাহা হইলে উত্তেজনার পরিণাম অবসাদন কালে মনের পূর্ব্বাপেক্ষা দৌর্ব্বল্য উপস্থিত হয়।

নেশার দ্বারা মন যত দুর্ব্বল হয়, ততই মাদক দ্রব্যের মাত্রা না বাড়াইলে আর চলে না, সুতরাং ক্রমেই নেশা বাড়িয়া যায়। মনকে প্রকৃতিস্থ করা ধ্যানের উদ্দেশ্য, বিকৃত করা কর্ত্তব্য নহে। এই জন্য সাধনায় প্রবৃত্ত হইবার সময় নেশাদি কৃত্তিম উপায় অবলম্বন না করিয়া বিবেকাবলম্বন করা বিধেয়। মনে সর্ব্বদা বিচার ভাব রাখিয়া ইষ্টের দিকে মন সংগ্রহ করা সাধকের প্রথম সাধনা, তাহা সংসারেই আরম্ভ হইয়া থাকে, সুতরাং এইরূপ ধ্যান মনে সাধন করিতে হয়, তজ্জন্য রামকৃষ্ণদেব মনে শব্দ প্রয়োগ করিয়া গিয়াছেন। ধ্যান করিবে মনে, কোণে, বনে বলিলে সাধনের ত্রিবিধ অবস্থার ভাব জ্ঞাত হওয়া যায়। যথা সাধন প্রবর্ত্ত, সাধক, এবং সিদ্ধ। সাধন প্রবর্ত্তের প্রথম সাধনার স্থান মনে, সাধনা আরম্ভ করিলে কোণে, যখন ধ্যান করিবার সময় বাস্তবিক চিত্তস্থির হইবার উপক্রম হয়, সেই সময়ে বনে গমন করিয়া ধ্যান সিদ্ধ হইবার প্রয়াস পাইলে সিদ্ধ মনোরথ হইবার সম্ভাবনা।

কোণে এবং মনের দ্বিতীয় ভাবে সাংসারিক নরনারীদিগকেও বুঝা যায়। তাঁহাদের মনের অবস্থা সম্বন্ধে পূর্ব্বে বলা হইয়াছে যে, নানাবিধ সংস্কার দ্বারা তাহা এপ্রকার কলুষিত হয় যে, তদ্দ্বারা ভগবানের চিন্তাকার্য্য সমাধা করা প্রায় দুঃসাধ্যজনক হইয়া থাকে। কিন্তু যে নরনারীদিগের বিশেষ বলক্ষয় হইবার পূর্ব্বে সংযোগবিহীন হয়, তাহাদের পক্ষে সময়ে ধ্যানের ব্যবস্থা হইতে পারে এবং এই প্রকার সাংসারিক নরনারীদিগের সাধনের স্থান কোণে। সংযোগবিহীন নরনারী বলিলে যে পুরুষের স্ত্রী নাই এবং যে স্ত্রীর স্বামী নাই বুঝায়। স্বামী স্ত্রী বিবর্জ্জিত নরনারীরা পিতা মাতা এবং পুত্র কন্যাদির ভারগ্রস্ত হইয়া সংসারে অবস্থিতি করিয়া থাকে। যদিও ইহাদের মন নানাভাবে

বিহার করিয়া থাকে কিন্তু ইন্দ্রিয়চালনা স্থগিত থাকিলে মস্তিষ্কের শক্তি ক্রমে বৰ্দ্ধিত হয়। মস্তিষ্কের শক্তি সঞ্চিত হইলে যখন মনের বল জন্মায়, তখন সে মনে ধ্যান হইতে পারে। এই নিমিত্ত রামকৃষ্ণদেবের মতে এই শ্রেণীর সাধকদিগের স্থান "কোণে" বলিয়া উল্লিখিত হইল।

পূর্ণ সংসারভাবাপন্ন নরনারীদিগের সাধনের স্থান মনে। যেহেতু ইহাদের মন স্থির করিবার উপায় নাই। সর্ব্বদা বিষয় চিন্তা এবং সর্ব্বদা ইন্দ্রিয়াসক্ত হইয়া থাকিলে মস্তিষ্কের অতি শোচনীয়াবস্থা উপস্থিত হয়। মস্তিষ্কের ধারণাশক্তি প্রায় থাকে না। মনের গতি এবং স্থিতি ইন্দ্রিয়বিশেষে আবদ্ধ থাকিলে তাহার স্থানান্তরের কার্য্য কিরূপে প্রত্যাশা করা যাইতে পারে? পাঁচটা চিন্তার সহিত ছয়টা চিন্তা করা যায় অর্থাৎ কোন বস্তুর সাময়িক ভাবনা করা যাইতে পারে। ভগবান্ সম্বন্ধীয় এই প্রকার সাময়িক চিন্তা করিবার স্থান তজ্জন্য মনে বলা হইয়াছে।

সাধনের স্থান দ্বারা সাধকের অবস্থা নির্ণয় করা যায়। রামকৃষ্ণদেব সাধনের যেমন তিনটী স্থান দেখাইয়া গিয়াছেন, তেমনি যে নরনারী-দিগের যে প্রকার অবস্থা, সেই অবস্থাসঙ্গত স্থানে অবস্থিতি করিয়া তাঁহাদের সাধন করা কর্ত্তব্য। অবস্থা অতিক্রম করিয়া কার্য্য করিতে যাইলে পদে পদে বিপদের আশঙ্কা ঘটিয়া থাকে এবং কস্মিন্‌কালে সাধনে কৃতকার্য্য হওয়া যায় না।

আমি এপর্য্যন্ত ধ্যান সাধনার বিষয় আলোচনা করিলাম। ধ্যানই যে একমাত্র সাধনা এবং ভগবান্‌কে লাভ করিবার একমাত্র উপায়, তাহা নহে, তবে উপায়বিশেষ বটে। ধ্যান সম্পূর্ণ মনের কার্য্য, সুতরাং যে স্থানে মানসিক বল লাভ এবং তাহা রক্ষা করিয়া সাধন সিদ্ধ হওয়া যায়, তাহাই কথিত হইল। রামকৃষ্ণদেব ধ্যানীদিগকে

কামিনীকাঞ্চনের সংস্রব হইতে সর্ব্বদা স্বতন্ত্র থাকিবার জন্য উপদেশ দিতেন। কামিনীদিগকে পুরুষ এবং পুরুষদিগকে কামিনী হইতে পৃথক হইয়া থাকিবার জন্য যে বার বার বলিতেন, তাহার ভূরি ভূরি দৃষ্টান্ত প্রদান করিয়াছি এবং অনেকেই সে সম্বন্ধে অনেক কথাই জানেন। স্ত্রীপুরুষ একত্রিত হইয়া ধ্যান হয় না, সস্ত্রীক হইয়া ধ্যান হয় না এবং সামাজিকভাবেও ধ্যান হয় না। যদিও কিয়ৎকাল কোনমতে ধ্যান সাধনা চলিতে পারে, কিন্তু পরিণামে তাহা রক্ষা করিয়া যাওয়া একেবারেই মনুষ্যের সাধ্যাতীত। যদিও কোন স্থানে হয়, তথায় অন্য কোন বিশেষ কারণ অবশ্যই থাকিবে। আমি পূর্ব্ব বক্তৃতাদিতে বলিয়াছি যে, আমার প্রভু সর্ব্বদা বলিতেন যে,

"কাজলকী ঘরমে যেত্তা সেয়ান হোয়ে থোড়া বুঁদ্ লাগে পর লাগে।
যুবতীকা সাৎমে যেত্তা সেয়ান হোয়ে থোড়া কাম জাগে পর জাগে।"

যেমন কর্জ্জলসংলগ্ন গৃহে বাস করিলে অতি সুচতুর ব্যক্তির গায়েও তাহার দাগ লাগিবার সম্ভাবনা, তেমনি যুবতীর নিকটে যতই বুদ্ধিবান হউক তাহার অন্ততঃ কামবৃত্তির উত্তেজনা হইবেই হইবে।

এই কথায় সহস্র সহস্র প্রতিবাদ উত্থাপন হইতে পারে। কিন্তু কথাটা বুঝিয়া দেখিলে আর কাহারও দ্বিরুক্তি করিবার অধিকার থাকে না। কিয়ৎকাল পূর্ব্বে বলিয়াছি যে, যাঁহারা সর্ব্বদা স্ত্রীমণ্ডলীর মধ্যে বাস করেন, তাঁহাদের অভ্যাসক্রমে এবং কামবৃত্তি অতি চরিতার্থ হইয়া যায় বলিয়া সাময়িক কার্য্য সাধন হইতে পারে কিন্তু যাঁহার অন্ততঃ এক পরমাণু কামবৃত্তি আছে, যুবতী দর্শনে তাঁহার চিত্তের বিকার উপস্থিত হইবে না, এ কথা যিনি বলেন, তিনি নিশ্চয় মিথ্যা-বাদী, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। যখন সাক্ষাৎ ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির মনুষ্যের মানসিক দৌর্ব্বল্য, কতদূর স্বীকার করিয়া গিয়াছেন, তখন

কামিনীলিপ্ত ধর্ম্মকর্ম্মবিহীন ব্যক্তিদিগের কথা কথার ভিতরে গণনীয় হইতে পারে না। মনের পাপ গতি নিবারণের জন্য হিন্দুসমাজে নানাবিধ গুরুতর সম্বন্ধের দ্বারা নর নারীরা সংবদ্ধ হইয়া আছে। এই সংবন্ধন দ্বারা যদিও সমাজ সংরক্ষিত হইতেছে কিন্তু তাহার তত্ত্ব অনুসন্ধান করিয়া দেখিতে যাইলে স্বতন্ত্রপ্রকার রহস্য বাহির হইয়া যায়। এ ক্ষেত্রে অধিক দূর যাইব না, তাহা সময়ান্তরে আলোচনা করিব। তবে রামকৃষ্ণদেব সাধকদিগকে কেন যে বনে যাইতে বলিয়াছেন, তাহা একটী জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত দ্বারা মীমাংসা করিয়া দিতেছি।

কথিত হইল যে, সমাজ গুরুতর সম্বন্ধ দ্বারা সংবদ্ধ হইয়াছে। অন্যান্য সম্বন্ধ অপেক্ষা মাতৃ সম্বন্ধ অতিশয় গুরুতর। যে ব্যক্তি কোন স্ত্রীলোককে মা বলিয়া সম্বোধন করেন, সে স্ত্রীলোক সে ব্যক্তিকে বিশ্বাস করিতে পারেন, ইহা সামাজিক প্রথা। কাহাকে মা বলিয়া কোন ব্যক্তি তাহার প্রতি ভাবান্তরের কার্য্য করিতে পারে না, ইহা সামাজিক নীতি শিক্ষার কথা। এই ভাবে কেহ সন্দেহ করিলে সমাজ তাহার কণ্ঠরোধ করিতে বাহু প্রসারণ করিয়া থাকে। কিন্তু প্রভু এই সমাজকে একেবারে অবিশ্বাস করিতে সাধকদিগকে উপদেশ দিয়া গিয়াছেন এবং রামকৃষ্ণদেব স্ত্রীমাত্রেরই প্রতি মাতৃভাব দেখাইয়াছিলেন বলিয়া সময়ে সময়ে অনেকের অন্তর্দাহ উপস্থিত হয়। রামকৃষ্ণতত্ত্ব বিষয়ে বক্তৃতা-কালে আমি বলিয়াছিলাম যে, বর্ত্তমান সমাজের অবস্থা দেখিয়া তিনি সাধারণের কল্যাণার্থে মাতৃভাবের শিক্ষা দিবার জন্য আপনি সাধকা-কারে তাহা প্রদর্শন করিয়া গিয়াছেন। মাতৃভাবের শিক্ষার কতদূর প্রয়োজন হইয়াছে, তাহাই বলিবার জন্য একটী প্রত্যক্ষ ঘটনা দৃষ্টান্ত-স্বরূপ প্রদান করিব বলিয়াছি।

একদা কোন কৃষ্ণ-প্রেমাকাঙ্ক্ষিনী অনুরাগিণী সন্ন্যাসিনী গৃহত্যাগ-

পূর্ব্বক দেশ-দেশান্তর, তীর্থ, বন পরিভ্রমণ করিয়া বেড়াইতে লাগিলেন। এই নবীন সন্ন্যাসিনী নবীন বয়সে নবীন নীরদবরণ শ্যামনটবরকে হৃদয়াসনে বরণ করায়, তাঁহার অপূর্ব্বরূপের ছটায় দিক্ বিমোহিত হইতে লাগিল। যে স্থানে তিনি গমন করিতেন, স্ত্রী, পুরুষ, বালক, বৃদ্ধ এক দৃষ্টিতে তাঁহাকে নিরীক্ষণ করিত। সুতরাং নানাবিধ বিভীষিকা উপস্থিত হইয়া সময়ে সময়ে তাঁহার অতিশয় যন্ত্রণার হেতু হইত। একদা তিনি শ্রীশ্রীপুরুষোত্তম তীর্থে গমন করিয়াছিলেন। পথে জনৈক ভদ্র-লোকের সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হয়। সন্ন্যাসিনীকে দর্শন করিবামাত্র ভদ্রলোকটী সাষ্টাঙ্গে প্রণাম পূর্ব্বক কহিল, মাগো! কে তুমি? আমার পঞ্চাশ বৎসরের উপর বয়ঃক্রম হইয়াছে কিন্তু তোমার মত অনুরাগিণী সন্ন্যাসিনী কাহাকেও দেখি নাই। মা! আমি তোর পুত্র, যগুপি দয়া করিয়া ছেলে বলিয়া আমার বাটী পবিত্র করিস্, তাহা হইলে আমি জানিব যে, সার্থক ভগবতীর পূজা করিয়া থাকি। সন্ন্যাসিনী কহিলেন, বাবা! তুমি কে? ভদ্রলোক কহিল, আমি তোমার পুত্র। সন্ন্যাসিনী পুনরায় কহিলেন, শ্রীক্ষেত্রে তোমার বাস কেন? ভদ্রলোক কহিল, আমি ওকালতি পেসার অনুরোধে এদেশে আসিয়াছিলাম। জন্মভূমিতে আপনার কেহ নাই, সন্তানাদি হয় নাই, বৃদ্ধ হইয়াছি, এ অবস্থায় তীর্থ ত্যাগ করিয়া আর কোথায় যাইব? এই ভাবিয়া জগবন্ধুর পাদপদ্মে স্মরণ লইয়া পড়িয়া আছি। সন্ন্যাসিনী জিজ্ঞাসা করিলেন, এখানে তোমার আর কে আছে? ভদ্রলোক কহিল, আর কেহ নাই, থাকিবে কে? তবে ব্রাহ্মণী আছেন, তিনিই সেবা শুশ্রূষা করিয়া থাকেন। এই কথা বলিয়া ভদ্রলোকটী কহিতে লাগিল, মা! আমার মনোসাধ কি পূর্ণ হইবে? সন্ন্যাসিনী মনে মনে চিন্তা করিতে লাগিলেন, যে কোন স্থানে হউক, থাকিতে হইবে। গৃহস্থের বাড়ী কিয়ৎ পরিমাণে

নিরাপদ বটে। কোথায় থাকিব? কি হইবে? দেশের অবস্থা বিশেষ জানি না। যাহা হউক, এই ব্যক্তি বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ, সস্ত্রীক থাকেন এবং ছোট ছোট ছেলেদের উপদ্রব নাই। জগন্নাথদেব আমার মনের মত স্থান স্থির করিয়া দিয়াছেন। সন্ন্যাসিনী আনন্দচিত্তে ভদ্রলোকের বাটীতে যাইয়া অবস্থিতি করিলেন।

সন্ন্যাসিনীর মুখে তত্ত্ব কথা শ্রবণ করিবার জন্য ব্রাহ্মণ সর্ব্বদা তাঁহার নিকটে বসিয়া থাকিতে ভালবাসিত। সন্ন্যাসিনীর তাহা অনিচ্ছা হইলেও অনেক সময়ে ব্রাহ্মণের সহিত বাক্যালাপ করিতে হইত। ব্রাহ্মণ কখন কখন মাতা সম্বোধনে কাঁদিতে কাঁদিতে সন্ন্যাসিনীর চরণধারণপূর্ব্বক বলিত, মা! আমায় আর পরিত্যাগ করিয়া কোথাও যাইও না। জগন্নাথদেব করুন, যেন আমি তোমার কাছে থাকিয়া জীবনের অবশিষ্ট কয়েক দিন কাটাইয়া যাইতে পারি। ব্রাহ্মণের এরূপ ভাব সন্ন্যাসিনীর নিতান্ত কটু বলিয়া বোধ হইত এবং এরূপ প্রকার করিয়া তাঁহাকে স্পর্শ করিতে তিনি সর্ব্বদা নিষেধ করিতেন, কিন্তু ব্রাহ্মণ সে কথা কোন মতে শুনিত না। সন্ন্যাসিনী ব্রাহ্মণের প্রতি ক্রমে বিরক্ত হইয়া উঠিলেন এবং ব্রাহ্মণীকেও তাহা বলিলেন। ব্রাহ্মণের বিরুদ্ধে সন্ন্যাসিনীর অভিযোগ করায় ব্রাহ্মণী কিঞ্চিৎ ক্রুদ্ধা হইয়া কহিলেন, মা! এমন কথা কি মনে করিতে আছে? তোমাকে যত্ন করিয়া বাটীতে রাখিয়াছেন, নানাবিধ ভাল মন্দ সামগ্রী আনিয়া সেবা করিতেছেন, সে জন্য কৃতজ্ঞতা স্বীকার না করিয়া বাছা তাহার চরিত্রে কালী দিলে? কালের গতিই এই প্রকার। ভাল করিতে যাইলে সে তাহার মন্দই করিতে চাহে। তোমার অল্প বয়স, পাছে তোমার স্বভাব বিকৃত হয়, সেই জন্য ব্রাহ্মণ বিশেষ চিন্তিত, এবং কুসঙ্গে না পড়, মিথ্যা কুচিন্তা না আইসে, সেই জন্য সর্ব্বদা সকল কাজ কর্ম্ম

ত্যাগ করিয়া তোমার কাছে তোমায় রক্ষা করিবার জন্য বসিয়া থাকেন। তুমি সন্ন্যাসিনীই হও, গৈরিকই পর, আর হরি হরি বলিয়া কাঁদ, বয়স কালের যাহা হইবার তাহা অবশ্যই হইয়া থাকে। আমারও অনেক বয়স হইয়াছে, অনেক সন্ন্যাসিনীও দেখিয়াছি। আরও কত দেখিব। সে যাহা হউক, যাহা ব্রাহ্মণের নামে আর কিছু বলিও না।

সন্ন্যাসিনী ব্রাহ্মণীর কথায় প্রতিবাদ না করিয়া পরদিন তথা হইতে প্রস্থান করিবেন স্থির করিয়া রাখিলেন, কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ সেই দিন বিসূচিকা রোগের ন্যায় ভেদ ও বমন হওয়ায় নিতান্ত দুর্ব্বল হইয়া পড়িলেন, সুতরাং সে দিন তাঁহার যাওয়া হইল না।

একে রোগে দুর্ব্বল, তাহাতে ঔষধ এবং পথ্যাদির কোন ব্যবস্থা না হওয়ায় সন্ন্যাসিনী হতচেতনবৎ পড়িয়া রহিলেন। ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণী কেহ একবার তাঁহাকে ডাকিয়া একবিন্দু জল প্রদান করিতে যাইল না। সন্ন্যাসিনী প্রতিদিন গৃহের দ্বার রুদ্ধ করিয়া অতি সাবধানে শয়ন করিতেন, কিন্তু সে দিন তাহা পারেন নাই। গভীর রজনীকালে ব্রাহ্মণ গাত্রোত্থান পূর্ব্বক সন্ন্যাসিনীর গৃহের দ্বারে আসিয়া ভাবিতে লাগিলেন, উহাকে যে পর্য্যন্ত দর্শন করিয়াছি, সে পর্য্যন্ত যে ক্লেশে দিন যাপন করিতেছি, তাহা জগন্নাথই জানেন। মুখের গ্রাস হইতে প্রায় বঞ্চিত হইয়াছিলাম কিন্তু বোধ হয় আমার বাসনা চরিতার্থ হইবে বলিয়া বিধাতা রোগের ছলনায় উহাকে অচৈতন্য করিয়া রাখিয়াছেন। এই ভাবিয়া ব্রাহ্মণ নিঃশব্দে সন্ন্যাসিনীর গৃহে প্রবেশ করিলেন। সন্ন্যাসিনী সমস্ত দিবস রোগ ভোগ করিয়া ভূমিতলে যামিনীর ক্রোড়ে গভীর নিদ্রাভিভূত হইয়া শান্তিলাভ করিতেছিলেন। ব্রাহ্মণ গৃহে প্রবেশ করিবামাত্র সন্ন্যাসিনীর সহসা নিদ্রা ভঙ্গ হইয়া গেল। তিনি আতঙ্কে গাত্রোত্থান পূর্ব্বক বাবা বাবা বলিয়া চীৎকার করিয়া উঠিলেন।

ব্রাহ্মণ মৃদুস্বরে কহিলেন, চীৎকার করিতেছ কেন? আমি আসিয়াছি। ব্রাহ্মণের এইরূপ নীচ প্রবৃত্তি দেখিয়া সন্ন্যাসিনী কহিতে লাগিলেন, বাবা! তোমার এই কাজ? আমি তোমার কন্যা, পীড়ায় কাতরা হইয়া মৃতবৎ পড়িয়া আছি। তুমি আমায় আশ্রয় দিয়া নিরাপদ করিয়াছিলে, সেই ভরসায় নিশ্চিন্ত হইয়া নিদ্রিত ছিলাম। বাবা! তুমি এ অবস্থায় আমার গৃহে একাকী প্রবেশ করিয়াছ কেন? সন্ন্যাসিনীকে আক্রমণ করিবার মানসে ব্রাহ্মণ ক্রমে ক্রমে অগ্রসর হইতে লাগিল। সন্ন্যাসিনী ব্রাহ্মণের কু-অভিপ্রায় বুঝিতে পারিয়া কটিদেশে অঞ্চল বন্ধনপূর্ব্বক মা! মা! বলিয়া যতবার ডাকিলেন, ব্রাহ্মণ কিন্তু ততবার নিষেধ করিল। কিরূপে বিপদ হইতে পরিত্রাণ পাইবেন, সন্ন্যাসিনী তাহা ভাবিয়া দশদিক শূন্য দেখিতে লাগিলেন। তিনি তখন ব্রাহ্মণকে পুনরায় কাতর হইয়া কহিলেন, বাবা! আমি তোমার আশ্রিতা, তুমি মা বলিয়া অভয় দিয়াছিলে, সেই জন্য তোমার গৃহে বাস করিয়াছিলাম। আমি অবলা. রোগে দুর্ব্বলা, সহায় সম্পত্তিহীনা। বাবা! তোমার মা আমি, তোমার কন্যা আমি, আমায় পরিত্যাগ করিয়া যাও। বাবা! আমার সর্ব্ব শরীর কম্পিত হইতেছে, মস্তিষ্ক বিঘূর্ণিত হইতেছে, কণ্ঠ শুষ্ক হইয়া গিয়াছে, হৃৎপিণ্ড অস্থির হইয়াছে। বাবা! তোমার পায়ে ধরিতেছি, যোড় হস্তে মিনতি করিতেছি, আমার সম্মুখ হইতে সরিয়া যাও। ব্রাহ্মণ কহিল. সন্ন্যাসিনা! আজও ধর্ম্মের মর্ম্ম কিছু বুঝিতে পার নাই—"জননী রমণী রমণী জননী" কথাটা কি অদ্যাপি শ্রবণ কর নাই? এই কথা ব্রাহ্মণের মুখ বিনিঃসৃত হইবামাত্র সন্ন্যাসিনী ভীম গর্জ্জনে বলিলেন, রে বর্ব্বর! এতদূর আস্পর্দ্ধা! এতদূর নীচাশা! মনে করিয়াছিস্ কি? তোর গৃহে আমায় একাকিনী পাইয়া পশুর ন্যায় ব্যবহার করিতে আসিয়াছিস্? পশু তুই! তোকে আমি

পশু অপেক্ষা নিকৃষ্ট জ্ঞান করি, যদ্যপি আত্মকল্যাণ কামনা থাকে, এখনি দূর হইয়া যা! ব্রাহ্মণ তথাপি প্রস্থান করিল না। সেই গৃহের প্রবেশ প্রস্থানের একটিমাত্র দ্বার ছিল, ব্রাহ্মণ সেই দ্বারের দিকে বাহু প্রসারণ পূর্ব্বক দণ্ডায়মান ছিল। কিরূপে তথা হইতে বাহির হইবেন, সন্ন্যাসিনী তাহার বৃথা সুযোগ অন্বেষণ করিতে লাগিলেন। কোনরূপে পলাইবার সুযোগ না দেখিয়া তিনি মনে মনে জগন্নাথকে স্মরণ করিলেন, তথাপি কোন উপায় হইল না। সন্ন্যাসিনী পুনরায় অতি বিনীতভাবে ব্রাহ্মণকে বলিলেন যে, বাবা কি করিতেছ? একবার ভাবিয়া দেখ দেখি? প্রাতঃকালে এই কথা প্রকাশ হইলে তুমি লোকালয়ে কিরূপে মুখ দেখাইবে? এখানে কেহ নাই বটে, অন্ধকারে চক্ষু বুজিয়া অকর্ত্তব্য কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়াছ, কিন্তু দিনমণি উদয় হইলে তখন কি আর আমার দিকে এরূপভাবে চাহিতে পারিবে? এখনও বলিতেছি প্রস্থান কর। এই কথা শ্রবণ করিয়া ব্রাহ্মণ নিজ দৌর্ব্বল্য প্রকাশ করিয়া অস্থির হইয়া উঠিল। এমন সময়ে সন্ন্যাসিনীর বামপদে একখানি কাটারি স্পর্শিত হইল। সন্ন্যাসিনী মহিষমর্দ্দিনীরূপে বামহস্তে সেই কাটারিখানি ধারণপূর্ব্বক গম্ভীরনিনাদে কহিলেন, তবে রে ব্রাহ্মণ! এখনও তোর চৈতন্য হইল না? এই অস্ত্রে আজ তোর মাতৃহরণ পাপের প্রায়শ্চিত্ত বিধান করিব। ব্রাহ্মণ তখন প্রাণভয়ে পলায়ণ করিল। কাটারি হস্তে সন্ন্যাসিনী উন্মাদিনীর ন্যায় ব্রাহ্মণের বাটী হইতে বাহির হইয়া জগন্নাথ-দেবের মন্দিরের নিকটে গমনপূর্ব্বক কহিতে লাগিলেন, জগন্নাথ এক-বার বহির্গত হও, তোমার সহিত আমার কয়েকটী কথা আছে। আমার এ কথা আর শুনিবে কে? তোমার পবিত্রধামে সুখে বাস করিব মনে করিয়া আসিয়াছিলাম। তুমি আমায় যে সুখী করিলে, তাহা বুঝিবার কেহ আছে কি না আমি এখন বুঝিতে পারিতেছি না।

আমি ইতিপূর্ব্বে জানিতাম যে, কলিকালে কালমাহাত্ম্যে সকল সম্বন্ধ বিকৃত হইয়াছে। কিন্তু মাতৃ সম্বন্ধ অদ্যাপি সংসারে পবিত্র ভাবে আছে। সেই মধুর বিমল মাতৃভাবও গিয়াছে? জগন্নাথ! মাতৃভাবও বিকৃত হইল, ইহা অপেক্ষা পরিতাপের বিষয় আর কি আছে? যে মা শব্দ শ্রবণ করিলে হৃদয়ে অপূর্ব্ব ভাবোদয় হয়, যে মা শব্দে মনের আবেগ দূর হইয়া শান্তি প্রকাশিত হয়, যে মা শব্দের প্রয়োগে অবলাগণ বিপদে বিশ্রাম পায়, সেই মাতৃভাবের ভাবান্তর জন্মিল, সেই মাতৃভাব বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ কর্ত্তৃক বিকৃত হইল! জগন্নাথ! আর যাইব কোথায়? আর বিশ্বাস করিব কাহাকে? সংসার মরুভূমি! সংসার শ্মশান! সংসার ব্যাঘ্রভল্লুকসঙ্কুল নিবিড় বন! জগন্নাথ! একবার বাহির হও, এই অস্ত্রে তোমায় খণ্ড খণ্ড করিয়া তোমার অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়া সাধন করিয়া যাই। তুমি পতি থাকিতে, তোমার বাটীতে, তোমার সমক্ষে, তোমার সন্তান, তোমার বিলাসের দেহ অভিলাষ করে, এ আক্ষেপ রাখি কোথায়? হৃদয়বিহারী জগন্নাথ সন্ন্যাসিনীর হৃদয়ে উদয় হইয়া বলিতে লাগিলেন, সন্ন্যাসিনী একবার অন্তরে চাহিয়া দেখ, আমি তোমায় অধিকার করিয়া রহিয়াছি। আমার বিলাসের বস্তুতে অন্যের বিলাস সম্ভব নহে। তোমাকে শিক্ষা দিবার নিমিত্ত আমি এই কৌশল করিয়াছিলাম। তুমি সন্ন্যাসিনী হইয়া কি জন্য সংসারের ভিতরে দীর্ঘকাল বাস করিয়াছ? আমি তোমার ভিতরে রহিয়াছি, তাহা না দেখিয়া বাহিরের ভাবে দিন যাপন করিতেছ কেন? সংসারে স্থূলভাবে কার্য্য হয় তাহা তুমি জানিয়া, সংসারীর মনের বাহ্য কার্য্যের পুষ্টিসাধন করিয়াছ। মন বাহিরে থাকিলে ভিতরের ভাব ক্রমে বিস্মৃত হইয়া যায়, ব্রাহ্মণের সেই অবস্থা ঘটিয়াছিল। কামিনীর সংশ্রব, সন্ন্যাসী সন্ন্যাসিনীর একবারে নিষেধ,

ইহা জ্ঞাত হইয়া তুমি তাহার বিপরীত কার্য্য করিয়াছ, সুতরাং সেই অপরাধে তুমি অপরাধিনী হইয়া ক্লেশ পাইয়াছ। এই জন্য প্রভু ধ্যানপরায়ণ সাধকদিগের স্থান বনে ব্যবস্থা করিয়া গিয়াছেন।

ধ্যান সম্বন্ধে যাহা কথিত হইল, তাহার দ্বারা সংসারত্যাগীদিগের পক্ষে ব্যবস্থা জানিতে হইবে। সংসারীরা সন্ন্যাসীর ধর্ম্ম আচরণ করিতে পারেন না এবং তাহা করা উচিত নহে। সংসারীদিগের স্বতন্ত্র ধর্ম্ম ও স্বতন্ত্র সাধনা। সংসারী বলিলে কামিনীকাঞ্চনে পরিবেষ্টিত ব্যক্তিকে বুঝায়। সংসারীদিগের জন্যই সময়বিশেষে নব নব ধর্ম্মের অভ্যুদয় হয়। সংসারীদিগের জন্য ভগবান্ বার বার অবতীর্ণ হইয়া থাকেন। যুগধর্ম্ম সংসারীদিগের নিমিত্ত প্রকটিত হয়। এই নিমিত্ত যুগধর্ম্ম পালন করা সংসারীদিগের কর্ত্তব্য। গৃহীদিগের সাধনের স্থান সংসার। ভগবান্ সর্ব্বব্যাপী অন্তর্য্যামী ; যে, যে ভাবে যে স্থানে তাঁহাকে চিন্তা করেন, তাঁহার মনোরথ সেই স্থানে সেইরূপে পূর্ণ করিয়া থাকেন।

বলা হইয়াছে, মন লইয়া ধ্যানীদিগের সাধনা হইয়া থাকে এবং মনের বলাধানের নিমিত্ত তাঁহাকে সংসার পরিত্যাগ করিতে হয়। সুতরাং জনশূন্য স্থানই তাঁহাদিগের ব্যবস্থা। সংসারীদিগের স্থান সংসার, তথায় মন বিলয় প্রাপ্ত হইয়া থাকে। এক্ষণে জিজ্ঞাস্য হইতে পারে যে, গৃহীরা কি লইয়া সংসারে সাধন করিবে? যাঁহার যে পরিমাণে মন বিলুপ্ত হইবে, তাঁহার সেই পরিমাণে প্রাণ কাঁদিবে। যাঁহার প্রাণ যত ব্যাকুলিত হইবে, তাঁহার প্রাণে প্রাণেশ্বর যাইয়া সেই পরিমাণে অধিকার করিবেন। প্রাণ লইয়া সংসারে সাধনা করিবার নিমিত্ত রামকৃষ্ণদেব বলিয়া গিয়াছেন। মনের সাধন বনে, প্রাণের সাধন সংসারে।

ভগবান্ যখন নররূপ ধারণ করেন, তখন সংসারেই তিনি লীলা করিয়া থাকেন। পতিতদিগকে খুঁজিয়া খুঁজিয়া পবিত্র করেন, অসমর্থ অসমর্থাদিগকে বলদান করেন, সংসারজলধিনিমগ্নপ্রায় নরনারী-দিগের হস্ত ধারণ পূর্ব্বক উত্তোলন করেন, অজ্ঞান, আত্মহারাদিগের বিজ্ঞান চক্ষু ফুটাইয়া দেন, নারকী, নরপিশাচদিগকে ক্রোড়ে তুলিয়া লন। অবতারদিগের এই কার্য্য চিরপ্রসিদ্ধ। সংসারে যখন ধর্ম্মপ্রাণ বিবর্জ্জিত হইয়া নরনারীগণ পশুবৎ আহার বিহারে পরিণত হয়, সেই সময়ে প্রাণের অভাব তাহারা বোধ করিতে পারে। প্রাণের অভাব বোধ হইলেই তাহার অন্বেষণ হইয়া থাকে, সেই সময়ে প্রাণেশ্বর আসিয়া উদয় হইয়া থাকেন। লীলার দ্বারা অবগত হওয়া যায় যে, প্রাণের ব্যাকুলতাই সংসারের সাধনা।

এই বর্ত্তমান কালের অবস্থা দেখিয়া ভগবান্ রামকৃষ্ণ রূপে অবতীর্ণ হইয়া সংসারীদিগের সাধনার ফল প্রদান করিয়া গিয়াছেন। সংসারে অন্য সাধনা নাই, কেবল বকল্‌মাই একমাত্র সাধনা; এই জন্য তিনি তাঁহাতে বকল্‌মা দিয়া নিশ্চিন্ত চিত্তে সংসারে দিন যাপন করিয়া যাইবার জন্য আজ্ঞা করিয়া গিয়াছেন। যাহার যে মনের সাধ আছে, তাহা রামকৃষ্ণে অর্পণপূর্ব্বক নিজ কর্ত্তৃত্ব ত্যাগ করিয়া রামকৃষ্ণের ইচ্ছায় সম্পূর্ণ নির্ভর করিতে পারিলে দিন দিন হৃদয়ে স্বর্গীয় ভাব আপনি স্ফূর্ত্তি পাইবে। ঈশ্বর সাধনা আনুমানিক কার্য্য নহে, আকাশকুসুমবৎ কোন বিষয় নহে, মানসিক চিন্তাবিশেষ নহে, কল্পনাপ্রসূত চিত্র-বিশেষ নহে; তাহা প্রত্যক্ষ, প্রাণের শান্তিপ্রদ অপূর্ব্ব ব্যাপার।

বর্ত্তমানকালে রামকৃষ্ণ ব্যতীত কাহার উপায় নাই। সাধকেরা হউন, অসাধকেরা হউন, উভয় শ্রেণীর কল্যাণ বিধানের নিমিত্ত পূর্ণব্রহ্ম রামকৃষ্ণ রূপে অবতীর্ণ হইয়া যে ব্যবস্থা করিয়া গিয়াছেন, তাহাই আমি

তাঁহার আদেশে এই প্রচার করিলাম। যে সাধকের ধ্যান করিতে ইচ্ছা হইবে, তিনি কামিনীকাঞ্চন সম্বন্ধ যে পরিমাণে ত্যাগ করিবেন, সেই পরিমাণে তিনি সিদ্ধকাম হইবেন। ধ্যানের পূর্ণফল লাভ করিতে হইলে পূর্ণভাবে কামিনীকাঞ্চন ত্যাগ করিতে হইবে। এইরূপ সাধনের স্থান বন। যাঁহারা তাহা পারিবেন না, তাঁহাদের কেবল লোক-দেখান সাধনায় প্রাণ শীতল হয় না, তাঁহাদের পক্ষে বকল্‌মা ব্যতীত সাধন নাই। রামকৃষ্ণে বকল্‌মা-দেওয়া নরনারীদিগের স্থান সংসারে।

কেহ বলিতে পারেন যে, অন্য অবতারে যদ্যপি বকল্‌মা দেওয়া যায়, তাহা হইলে চলিবে কি না? যে অবতারেরা যে ভাব প্রচার করিয়া গিয়াছেন সেই ভাব অবলম্বন করা বিধেয়। বকল্‌মা দিতে এক রামকৃষ্ণই বলিতেন, অতএব বকল্‌মার ভাবে রামকৃষ্ণই অদ্বিতীয়।

বর্ত্তমান কালে রামকৃষ্ণই একমাত্র উপায় এবং অবলম্বন। আমরা সকলেই মন বিহীন হইয়া সংসারে ছায়ার ন্যায় ঘুরিয়া বেড়াইতেছি। মনের শক্তি নাই—বল নাই, ভগবানের ভাব ধারণা করিব কিরূপে? ভগবান্‌কে চিন্তা করিব কিরূপে? এই দুর্ব্বল মন লইয়া যখন সংসারে সাধনা করা যায় না, কামিনীকাঞ্চন বিশিষ্ট মন লইয়া যখন বনেও বাস করা যায় না, তখন আমাদের উপায় কি হইবে? সাধন ব্যতীত ভগবানের কৃপা লাভ করা যায় না, কিন্তু আমরা সাধনে অসমর্থ। প্রাণে উত্তেজনা হইলে যদিও সংসারেই ভগবান্‌কে লাভ করা যায় বটে কিন্তু সে উত্তেজনাও নাই। এমন সময় উপস্থিত হইয়াছে। আমাদের কোন উপায় নাই বলিয়া, কোন অবলম্বন নাই বলিয়া, কোন সহায় নাই বলিয়া ভগবান্ স্বয়ং জীবের হিতার্থে আপনি সাধকরূপে অবতীর্ণ হইয়া আপনার কার্য্য আপনি সাধনপূর্ব্বক সাধন ফল জীবের জন্য রাখিয়া গিয়াছেন। আইস কে সাধন লইবে? একবার রামকৃষ্ণ নাম

বল, আর অঞ্জলি পূরিয়া সাধন ফল লইয়া যাও। যে কোন শ্রেণীর সাধক হউক, হিন্দু হউক, খৃষ্টান হউক, মুসলমান হউক, রামকৃষ্ণে সকলের অধিকার। সকলেই নিজ নিজ ভাব রাখিয়া, জাতি রাখিয়া, সমাজ রাখিয়া, ধর্ম্ম রাখিয়া রামকৃষ্ণের দোহাই দিয়া আপনার সাধ মিটাইয়া লইয়া যাউক। অতি শুভসমাচার—অসমর্থ অসমর্থাদিগের পক্ষে অমৃত কথা; একথা কেহ কখন ইতিপূর্ব্বে শুনেন নাই যে, নিজ-ভাব বজায় রাখিয়া এক নামে সকলেই সিদ্ধ মনোরথ হইবেন।

যাহার সাধন করিবার সাধ থাকে, তিনি স্বচ্ছন্দে বন গমন করিতে পারেন, কিন্তু কয়জনের এ সাধ পূর্ণ হইতে পারে? আমরা সকলেই সংসারী, আমরা সকলেই কামিনীকাঞ্চনের আশ্রয়ীভূত, আমরা শারীরিক এবং মানসিক নিতান্ত দুর্ব্বলাবস্থায় পতিত হইয়া রহিয়াছি, ধ্যানের সাধ হইলেও আমরা বনগমন করিতে পারিব না। আমাদের কি হইবে? আমরা কোথায় যাইয়া সাধন করিব? মন নাই যে, মনে ধ্যান করিব। মনের সামর্থ্য নাই যে বনে যাইয়া ধ্যান করিব, মনের পূর্ণতা শক্তি নাই যে তপশ্চরণ করিব, আমাদের স্থান কোথায়? যদ্যপি একথা আমরা একবার ভাবিয়া দেখি, তাহা হইলে দশদিক শূন্যময় বোধ হইবে। তাই বলিতেছি যে, এ প্রকার নরনারীদিগের সাধনের স্থান শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-দেবের শ্রীচরণ। তাঁহার শ্রীচরণ ব্যতীত এ প্রকার নরনারীদের আর স্থান নাই।

দিন গেল। বৃথা কুতর্কে দিন যাপন না করিয়া, বৃথা অভিমানে বিঘূর্ণিত না হইয়া, সংকীর্ণ জ্ঞানগর্ব্বে গর্ব্বিত না হইয়া মনে মনে রাম-কৃষ্ণ বলিয়া দেখুন, নামের গুণে কি ফললাভ হয়! আমি বার বার বলিতেছি যে, ভগবান্ এক অদ্বিতীয়, তাঁহার ভাবও এক অদ্বিতীয়, যে সময়ে সেই ভাব—সেই প্রকৃত ভগবৎ ভাব—হৃদয়ে উপস্থিত হইবে,

তখন আপনাআপনি বুঝিতে পারা যাইবে। সেই ভাব জন্মান্তরের কথা নহে। তিনি বলিয়া গিয়াছেন, বারো ক্ষণে, বারো দিনে, বারো মাসে, তাহা প্রাপ্ত হইবার কথা। অনুমান অপেক্ষা প্রত্যক্ষই গ্রহনীয়, অতএব রামকৃষ্ণের নাম পরীক্ষা করিয়া দেখিলেই চক্ষু কর্ণের বিবাদ মিটিয়া যাইবে।

(গীত)

[১]

সত্য ত্রেতা আদি, দ্বাপর অবধি, শুনেছি নিয়ম সার।
বিনা নিরশন, কঠোর সাধন, বিভু দরশন ভার॥
অন্নগত জীবে, শক্তি না সম্ভবে,
তাই এলে ভবে, ভক্তি শিক্ষা দিবে,
তাও যেবা নারে, নাম দিলে তারে,
উথলে ভকতি স্মরণে তার॥
বিজ্ঞান ব্যাপিত নেহারি মেদিনী,
নাহি চায় কেহ নীরস কাহিনী,
শুনে সেই বাণী সত্য হৃদে মানি,
শান্তি আনে প্রাণে শ্রবণে যার॥
বুঝি সে কারণ, পতিতপাবন, তব আগমন ভবে এবার ;—
বলির বন্ধন, কালিয়দমন, নহে দশানন নাশিবার॥
বিজ্ঞান জিনিতে জ্ঞান প্রয়োজন,
তেজহীন নরে না করে ধারণ,
সহজে শিখালে, নামে প্রেম ঢেলে,
গ'লে গেল জ্ঞান বিজ্ঞান আর॥

নতশির জ্ঞান চাহে ও চরণ,
ভক্তি করে ধীরে ও পদ বন্দন,
যুগল মিলন, প্রেম প্রস্রবণ, জ্ঞান ভক্তি একাকার ;—
হের জীব রামকৃষ্ণ পূর্ণ অবতার ॥

[২]

তব পদে মনসাধে সঁপিনু জীবন।
যথা ইচ্ছা কর প্রভু অনাথশরণ ॥
হয়েছি হে দিশেহারা, না দেখি কুল কিনারা,
এ ভব-জলধি-ধারা বুঝিতে অজ্ঞান ;—
হিতাহিত জ্ঞান হীন, মূঢ়মতি অতি দীন,
কুপথে সতত চিত করেছে গমন ॥
কি করিব কোথা যাব, কাহার শরণ ল'ব,
কেবা আর আছে বল তোমার সমান ;—
মন মত্ত করী প্রায়, যথা ইচ্ছা তথা ধায়,
কভু নাহি শুনে হায় বিনয় বারণ ॥
প্রাণ যাহা নাহি চায়, মন তা করিতে যায়,
ঘটে দায় তাই নাথ জ্বলি অনুক্ষণ ;—
দয়াময় তোমা বিনে, কেহ নাই ত্রিভুবনে,
দয়াঘন রূপ ধরি দাও দরশন ॥

[৩]

বনে বা ভবনে, ডাক যে যেখানে, সরল প্রাণে পেতেই হবে।
গৃহী বা সন্ন্যাসী, ভোগী উপবাসী, সবাই সমান আপন ভাবে ॥

ত্যজি পরিজনে, বিজন গহনে, যাহার সন্ধানে অনুরাগী মন,
সংসার মাঝারে, ডাক প্রাণভরে, হের সাধে অনুক্ষণ :
হলে চুরী ভাবের ঘরে থেকে ও কাছে দূরে রবে ॥

[৪]

পিয়াসী পরাণ পায় পরম রতন ।
অনাথ অধীন তরে অভয় চরণ ॥
প্রাণ মন সঁপে পায়, বিদায় দেরে কালের দায়,
ভুলনা মোহ মায়ায় খোলরে নয়ন ; —
রাখরে হৃদয়ে সদা হৃদয়মোহন ॥
ভাবের ঘরের কপাট খোল, মনের মলা দূরে ফেল,
আনন্দে রামকৃষ্ণ বল ভরিয়ে বদন ; –
অকুলে আকুলে তারে অধমতারণ ॥

[৫]

সাধে সাধ মিটায়ে, রামকৃষ্ণ নাম বদনভরে বলনা ।
(ওরে রসনা এখন সরস আছে)
ত্যজি বিরস বাসনা, বিষয় কামনা, পরম রতনে মজনা ॥
ওরে মূঢ় মন, খোল দুনয়ন, আপন জনে চেননা ।
এ দেহ দুর্ব্বল, রামকৃষ্ণ বল, দিন গেলে দিন ফেরেনা ॥
অলস ত্যজিয়ে, ভ্রম পাশরিয়ে, রামকৃষ্ণ লয়ে থাকনা ।
ত্যজিয়ে অসার, অনিত্য সংসার, রামকৃষ্ণ সার করনা ॥
বৃথা সুখ আশা, না মিটে পিয়াসা, ভবে যাওয়া আসা ঘুচেনা ।
আজি সবে মিলে, নাচি কুতুহলে, রামকৃষ্ণ ব'লে ডাকনা ॥

রামচন্দ্রের বক্তৃতাবলী।

দ্বাদশ বক্তৃতা।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেব কথিত

সাধনের অধিকারী।

১৩০০—২১শে ফাল্গুন, রবিবার—মিনার্ভা থিয়েটারে

প্রদত্ত।

৫৯ রামকৃষ্ণাব্দ।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ

শ্রীচরণ ভরসা।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেব কথিত

সাধনের অধিকারী।

ব্রাহ্মণাদি সকলের চরণে প্রণাম।

প্রভুর ইচ্ছায় বিগত বৎসর কাল নানাবিধ গুরুতর বিষয় লইয়া আলোচনা করিয়া আসিতেছি। ইহার সুখ্যাতি অখ্যাতি উপকার অপকার যাহা কিছু হইয়াছে বা হইবে, তাহা আমার নহে। রামকৃষ্ণের আজ্ঞায় তাঁহারই আজ্ঞা পালন করিয়াছি; এখন করিতেছি এবং পরে যেরূপ প্রকারে নিয়োজিত করিবেন, তাহাই করিতে বাধ্য হইব। তিনি দয়া করিয়া যাহা করান, আমি তাহাই করিতে পারি, যাহা তিনি বলান, তাহাই বলিতে পারি। আপনি কিছু বলিব বলিয়া মনে করিলে তাহা কখনও বলিতে পারি না। তাঁহার কথা আমি বলিব কি? সাধারণ ব্যক্তিবিশেষেরই কোন বিষয় অনুমান করা যায় না এবং যদ্যপি কেহ আপনার ইচ্ছার বশবর্ত্তী হইয়া কোন কথা বলিতে সাহসী হন, সে কথা সম্পূর্ণ অলীক এবং কাল্পনিক হইয়া দাঁড়ায়। প্রভুই বলিতেন, যেমন কোন্ ব্যক্তির কত ঐশ্বর্য্য আছে, তাহা প্রত্যক্ষ প্রমান ব্যতীত কখনই নিরূপণ করা যায় না। যে ব্যক্তির যাহা কিছু আছে, সেই ব্যক্তি তাহা অপরকে না দেখাইয়া দিলে অথবা না খুলিয়া বলিলে অপরে কখন জানিতে পারে না। ভগবান্ এবং সাধারণ জীব

সম্বন্ধীয় বৃত্তান্ত এক ভগবান্‌ই জানেন. যে সময়ে, যেরূপে, যাহা বলিলে ভাল হয়. তাহা তিনিই স্বয়ং বলিয়া যান, তাঁহার কার্য্য এবং বাক্য আলোচনা করিলে সাধারণের জ্ঞান জন্মিবার এবং কল্যাণ হইবার একমাত্র উপায়। তিনি তজ্জন্য ব্যক্তিবিশেষের দ্বারা তাহা সম্পন্ন করিয়া থাকেন। সাধনার অধিকারী নিরূপণ প্রসঙ্গ লইয়া অদ্য আপনাদের নিকটে আমার উপস্থিত হওয়া তাঁহারই আজ্ঞা জানিবেন। ঈশ্বর সাধনার অধিকারী কাহারা, যদ্যপি এই বিষয় লইয়া চিন্তার স্রোতে ভাসিতে চেষ্টা করা যায়, তাহা হইলে আর কূল পাওয়া যায় না. ভাবিতে ভাবিতে একেবারে ভাসিয়া যাইতে হয়। ঈশ্বর সাধনা করিবার কে যোগ্য বা অযোগ্য, ইহার সিদ্ধান্ত করিয়া দেওয়া একেবারেই মনুষ্যশক্তির অতীত কথা। আমাদের শাস্ত্রজ্ঞেরা বলেন, শাস্ত্রবিশেষের অভিপ্রায়ে জাতি ও ব্যক্তিবিশেষ ব্যতীত অন্যের সাধন কার্য্যের অধিকার নাই। সাধন করা দূরের কথা, এমন কি ব্যক্তিবিশেষের প্রণব উচ্চারণ করাও ধর্ম্মত: নিষিদ্ধ। ইতিহাস এই সকল কথার বিরুদ্ধে পরিচয় দিয়া থাকে। অর্থাৎ যাহারা শাস্ত্রবিশেষ মতে সাধনে অনধিকারী,সেই সকল নরনারীরা সাধনের ফল লাভ পূর্ব্বক মানব দেহ সফল করিয়া গিয়াছেন এবং অদ্যাপি যাইতেছেন। সুতরাং কার্য্যক্ষেত্রে দ্বিবিধ মত বলবতী দেখিতে পাওয়া যায়। বর্ণ ও জাতিবিশেষে সাধনায় অধিকারী এবং বর্ণ ও জাতিবিশেষে তাহাতে অনধিকারী বলিলে ব্রাহ্মণাদি দ্বিজ এবং শূদ্র ও পৃথিবীর যাবতীয় জাতি বুঝায়। কোন মতে ব্রাহ্মণেরাই সাধনের এক অদ্বিতীয় পাত্র এবং অপরাপর জাতিরা সুকৃতি ফলে জন্মান্তর প্রক্রিয়ায় আত্মার বিশুদ্ধতা লাভ করিয়া ব্রাহ্মণ কুলে জন্মগ্রহণ করিলে তবে তাহাদের সাধনের অধিকার জন্মায়, অতএব এই পক্ষের মতে ব্রাহ্মণই সাধনের অধিকারী বলিয়া জ্ঞাত হইতে

হইবে। ব্রাহ্মণ বলিলে কেবল পুরুষদিগকে বুঝাইবে, তাহাতে স্ত্রীলোকদিগের ভাব একেবারেই নাই।

এই সকল শাস্ত্রমতে স্ত্রীলোকদিগের সাধনায় অধিকার আছে কি না, এমন কথা দেখিতে পাওয়া যায় না. মন্বাদির মতে স্ত্রীদিগকে অপদার্থ বলিয়াই বর্ণনা করা হইয়াছে। সুতরাং স্ত্রীলোকেরা ব্রাহ্মণকুলে জন্মগ্রহণ করিলেও তাহাদের সাধনার অধিকার নাই। তাঁহারা বোধ হয় যে পর্য্যন্ত নরাকারে পরিণত না হন, সে পর্য্যন্ত তাঁহাদেরও উপায় হইতে পারে না।

যদিও আমাদের দেশীয় শাস্ত্রবিশারদদিগের মতে ব্রাহ্মণ ব্যতীত অপর জাতির সাধনায় অধিকার নাই বলিয়া কথিত হয়, কিন্তু মনু প্রভৃতি গ্রন্থে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় এবং বৈশ্যাদি দ্বিজেরা বেদাধ্যয়ন করিতে পারেন, সুতরাং তাঁহাদের সাধনেরও অধিকার থাকিবার সম্ভাবনা। ক্ষত্রিয় রাজারা সংসারাদি আশ্রম পরিভ্রমণপূর্ব্বক বানপ্রস্থাশ্রম অবলম্বন করিতেন, ইহা ইতিহাস কহিয়া থাকে। এই বর্ণত্রয়ের সেবাদি কার্য্য ভিন্ন শূদ্রদিগের অন্য কোন প্রকার সাধনের অধিকার ছিল না। যে সময়ে বর্ণচতুষ্টয় সৃষ্টি হয়, সে সময়ে ইহাঁরা কার্য্যবিশেষের নিমিত্ত সৃজিত হইয়াছিলেন, সুতরাং তাঁহাদিগকে তদনুযায়ী শ্রেণীতে নিবদ্ধ থাকিতে হইয়াছিল। এই জাতিচতুষ্টয়ের সবিশেষ কোন বিবরণ প্রাপ্ত হইবার উপায় নাই। যদ্যপি আমরা এই কথা জিজ্ঞাসা করি যে, ব্রহ্মা, কয়জন ব্রাহ্মণ এবং কয়জন ব্রাহ্মণী, কয়জন ক্ষত্রিয় এবং কয়জন ক্ষত্রিয়াণী, কয়জন বৈশ্য এবং কয়জন বৈশ্যানী, কয়জন শূদ্র এবং কয়জন শূদ্রাণী সৃষ্টি করিয়া কিরূপে অসংখ্যক ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য এবং শূদ্র উৎপাদন করিলেন, তাহা হইলে বাস্তবিক আমরা নিতান্ত অপ্রতিভ হইয়া থাকি। আমরা এমন কোন কথা শ্রবণ করি নাই যে,ব্রহ্মার চারিটী

অঙ্গ হইতে অনর্গল চারিটী বর্ণের নরনারী বাহির হইয়া পৃথিবী প্লাবিত করিয়া দিয়াছিলেন। তবে এই বর্ণচতুষ্টয় বৰ্দ্ধিত হইল কিরূপে? একথা অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে যে, ভিন্ন ভিন্ন বর্ণের সংযোগে অসংখ্যক নরনারীর উৎপত্তি হইয়াছে। এই নরনারীদিগের কার্য্য-হিসাবে তাঁহারা সময়ে সময়ে নানাবিধ শ্রেণী বা জাতিতে পরিণত হইয়াছেন। আমাদের বর্ণচতুষ্টয়ের মধ্যে যবন, ম্লেচ্ছ, কাফ্রি, চীন প্রভৃতি কোন জাতির সমাবেশ হইতে পারে না। তবে কি তাঁহারা ব্রহ্মার রাজ্য ছাড়া, না তাঁহাদিগকে অপর ব্রহ্মা সৃষ্টি করিয়াছেন? তাঁহাদের সৃষ্টিকর্ত্তা স্বতন্ত্র ব্রহ্মা না হইলে বর্ণচতুষ্টয় মধ্যে তাঁহাদিগকে স্থান দিতে হয়। কিন্তু তাহা কিরূপে সম্ভবে? তাঁহাদিগকে ব্রাহ্মণ. ক্ষত্রিয়, বৈশ্য বলা যায় না, যেহেতু তাঁহাদের যজ্ঞসূত্র ধারণ করিবার অধিকার নাই। তাঁহাদিগকে হিন্দুমতে অস্পর্শনীয় বলিয়া ঘৃণা করা হয়। তাঁহাদিগকে শূদ্রও বলা যায় না, যেহেতু তাঁহারা নিকৃষ্ট বৃত্ত্যোপ-জীবী নহেন। তাঁহারা সকলেই স্ব স্ব প্রধান, সকলেই বিশাল সাম্রাজ্য-শালী শৌর্য্য বীর্য্যবান এবং সকলেই স্ব স্ব জাতীয় ধর্ম্মানুষ্ঠান দ্বারা আনন্দে দিন যাপন করিয়া যাইতেছেন। তাঁহাদিগকে শূদ্র বলাও যায় না। তবে তাঁহারা কোথা হইতে আসিলেন? তাঁহাদের গতি-মুক্তিই বা কিরূপে হইতেছে? অনেকে অনুমান করেন যে, তাঁহারা যাহা কিছুই করুন, জন্ম জন্মান্তর ক্রমানুযায়ী জাতিবিশেষ হইতে ঊর্দ্ধ-গামী হইয়া ব্রাহ্মণকুলে প্রবেশ করিবেন। ব্রাহ্মণ হইলে তাহাদিগেরও সাধনা করিবার যোগ্যতা সঞ্চার হইবে। এই মতে ব্রাহ্মণ জাতিরই ঈশ্বর সাধন করিবার একমাত্র অধিকার।

যদ্যপি হিন্দুশাস্ত্রের এই রূপই অভিপ্রায় হয়, যদ্যপি ব্রাহ্মণকুলে জন্মিয়া উপবীত ধারণ করিতে পারিলেই ঈশ্বর সাধন করিবার তাঁহার

অধিকার হয়, তাহা হইলে প্রত্যেক ব্রাহ্মণেরই সাধনা করিবার শক্তি লাভ হইত। কিন্তু কার্য্যক্ষেত্রে তাহার বিপরীত ফল দেখা যাইতেছে। ব্রাহ্মণকুলোদ্ভব হইলে বর্ণবিশেষ ব্রাহ্মণ হওয়া যায় বটে, ব্রাহ্মণকুলোদ্ভব হইলে সামাজিক কার্য্যবিশেষে সময়ে সময়ে দক্ষতা হয় বটে, ব্রাহ্মণ-কুলোদ্ভব হইলে কার্য্যবিশেষে অধিকার হয় বটে কিন্তু ব্রাহ্মণকুলোদ্ভব হইলেই ঈশ্বর সাধনের অধিকারী হইতে পারেন না। এ কথা আনু-মানিক নহে, তাহা প্রত্যক্ষ। রামকৃষ্ণদেব বলিতেন যে, ব্রাহ্মণের পুত্র যবন, ব্রাহ্মণের পুত্র ম্লেচ্ছ, ব্রাহ্মণের পুত্র শূদ্র। ব্রাহ্মণের কোন পুত্র ঠাকুর পূজা করিতে পারেন, কোন পুত্র চণ্ডী পাঠের উপযুক্ত হইতে পারেন, কোন পুত্র বেদপারগ হইতে পারেন, কোন পুত্র দশ কর্ম্মান্বিত হইতে পারেন, আবার কোন পুত্র পুরাণাদি পাঠ করিতে পারেন, আবার কোন পুত্র জুতার দোকান করেন এবং কোন পুত্র ভাত রাঁধেন। কুল হিসাবে সকলেই ব্রাহ্মণ, তদ্বিষয়ে কাহারও দ্বিরুক্তি করিবার অধিকার নাই, কিন্তু ভূদেব ব্রাহ্মণ বলিয়া সমুদায় ব্রাহ্মণের শক্তি এক প্রকার নহে। সমুদয় ব্রাহ্মণ দ্বারা এক জাতীয় কার্য্য সাধন হইতে পারে না। এই জন্য বিশুদ্ধ ব্রাহ্মণ হইতে চণ্ডাল ব্রাহ্মণ পর্য্যন্ত নানাবিধ ব্রাহ্মণের উল্লেখ দেখা যায়।

আমাদের দেশে ব্রাহ্মণেরা যেরূপ চিন্তাশীল ছিলেন, এক্ষণে আর সেরূপ প্রায় নাই। যাঁহারা আছেন, তাঁহাদিগকে আর সমাজে দেখা যায় না। অতএব তাঁহাদের কথা গণনার বিষয় নহে। পূর্ব্বকালের ব্রাহ্মণদিগের ন্যায় বর্ত্তমানকালে অন্যান্য জাতীর মধ্যে প্রচুর চিন্তাশীল ব্যক্তি জন্মিয়াছেন, যাঁহাদের মস্তিষ্কুসুম লইয়া সমগ্র পৃথিবীর সুখ স্বচ্ছন্দতা বর্দ্ধিত এবং সংরক্ষিত হইতেছে। আধ্যাত্মিক জগতের ব্যাপার স্বয়ং ভগবানের দ্বারাই প্রকটিত হয়, সুতরাং সে বিষয়ে

জীববিশেষের কোন অধিকারই নাই। বর্ত্তমান কালে আমাদের দেশ যে প্রকার অবস্থায় দাঁড়াইয়াছে, তাহাতে কোন্ বর্ণ যে কোন্ বর্ণ অপেক্ষা উৎকৃষ্ট এবং নিকৃষ্ট, তাহা নির্ণয় করিতে যাইলে হতাশ হইতে হয়। যে ব্রাহ্মণ এক সময়ে সকল বর্ণের উপরে একছত্রী মহারাজচক্রবর্ত্তী হইয়া কার্য্য করিয়া গিয়াছেন, সেই ব্রাহ্মণ এক্ষণে না করিতেছেন কি? যবনের দাস, ম্লেচ্ছের দাস হইয়া শূদ্রাধমের ন্যায় অবস্থায় পরিবর্ত্তিত হইয়া আসিয়াছেন। সত্যপ্রিয়, ধর্ম্মনিষ্ঠ, শম দম ধৃতি প্রভৃতি দশম লক্ষণাক্রান্ত ব্রাহ্মণ কোথায়? আমি একথা বলিতেছি না, স্থানবিশেষে তাঁহার সম্পূর্ণ অভাব হইয়াছে। কিন্তু ব্রাহ্মণকুলোদ্ভব হইলেই পুরাকালের ব্রাহ্মণ বুঝায় না। এক্ষেত্রে বর্ত্তমান কালে ঈশ্বর সাধনার অধিকারী কে?

রামকৃষ্ণদেব ব্রাহ্মণ সম্বন্ধে যে কথা বলিয়া গিয়াছেন, তাহার তাৎপর্য্য বাহির করিলে বুঝা যায় যে, ব্রাহ্মণের ঔরসজাত পুত্র ব্রাহ্মণ হইলেও শক্তির ইতর বিশেষ দ্বারা তাঁহার অবস্থা সাব্যস্থ হইয়া থাকে। যে ব্রাহ্মণ শাস্ত্রাদি জ্ঞানরহিত, সে ব্রাহ্মণের সামাজিক আবশ্যকতা কতদূর? ব্রাহ্মণ ভোজন পর্য্যন্ত চলিতে পারে। অথবা কিঞ্চিৎ দানের পাত্রবিশেষ বলিয়া বিবেচিত হইতে পারেন। এই ব্যক্তিকে তত্ত্বকথা জিজ্ঞাসা করিলে অথবা তাঁহাকে তত্ত্বানুসন্ধানে নিয়োজিত করিলে সে কার্য্যে তিনি কতদূর কৃতকার্য্য হইবেন, তাহা অনায়াসে অনুমান করা যাইতে পারে। ব্রাহ্মণের মতানুসারে সামাজিক কার্য্য চলিতেছে। ব্রাহ্মণ বলিয়া যে কেহ হউন, অতি উচ্চ কুলীনের সন্তানই হউন, আর বংশজই হউন, ব্রাহ্মণ হইলেই তিনি সকল কার্য্যে অধিকারী হইতে পারেন না। সামান্য সামাজিক কার্য্যে যখন ব্রাহ্মণের বিচার রহিয়াছে, তখন আধ্যাত্মিক কার্য্যে যে ব্রাহ্মণের

ঔরসজাত বলিয়া সকলেই সাধনের অধিকারী হইবেন, ইহা একেবারেই অসম্ভব। কিন্তু ব্রাহ্মণ আর্য্যদিগের বংশসম্ভূত এবং সামাজিক হিসাবে শ্রেষ্ঠবর্ণ ; এই নিমিত্ত সামাজিক সম্বন্ধে ব্রাহ্মণ উচ্চপদ অধিকার করিয়া আছেন এবং তজ্জন্য তাঁহারাই সর্ব্বাগ্রে প্রণম্য হইয়া থাকেন।

সামাজিক এবং আধ্যাত্মিক ভাব সম্পূর্ণ বিভিন্ন প্রকার। কোন ব্রাহ্মণ সামাজিক উন্নত হইতে পারেন, কিন্তু তাহা বলিয়া কি তিনি সর্ব্বপ্রকার বিষয়েই উন্নত হইবেন? সামাজিক ক্রিয়াবিশেষে কিম্বা ব্যবসাবিশেষে তিনি অতি বিচক্ষণ এবং অতিশয় সুদক্ষ হইতে পারেন, কিন্তু ব্রাহ্মণ বলিয়া কি, যোগী তাঁহার নিকট যোগ শিক্ষা করিতে যাইবেন, অথবা তাঁহাকে কস্মিন্‌কালে যোগী করা যাইতে পারিবে? এরূপ স্থলে ব্রাহ্মণেরা যে ঈশ্বর সাধনায় একমাত্র অধিকারী, একথা বর্ত্তমান কালে একেবারে অসম্ভব। এক্ষণে কথা হইতেছে, তবে অধিকারী কাহারা? এবং হিন্দু শাস্ত্রে ব্রাহ্মণেরা সাধনায় অধিকারী বলিয়া যাহা লিপিবদ্ধ হইয়া আছে, তাহা মিথ্যা হইয়া যাইতেছে। আমি ইতিপূর্ব্বে অনেক স্থলে বলিয়াছি যে, শাস্ত্রবিশেষের ভ্রম প্রমাদ বাহির করিলে অন্য শাস্ত্রের এক পরমাণু মর্য্যাদা থাকিবে না। শাস্ত্রে যাহা উল্লিখিত হইয়াছে, তাহাও সত্য এবং প্রত্যক্ষ বা ঐতিহাসিক ঘটনাকে কেহ মিথ্যা বলিতে পারেন না, তাহা জোর করিয়া মিথ্যা বলিয়া প্রমাণ করিতে যাওয়া নিতান্ত অসঙ্গত এবং বাচলতা ব্যতীত তাহাকে আর কিছুই বলা যায় না।

শাস্ত্র এবং ইতিহাসের বিবাদ মিটাইবার নিমিত্ত রামকৃষ্ণদেব অবতীর্ণ হইয়াছিলেন, তিনি এই নিতান্ত দুরূহ এবং সর্ব্বজনের অতিশয় প্রয়োজনীয় বিষয় সাধনের অধিকারী সম্বন্ধে যে প্রকার উপদেশ প্রদান করিয়াছেন, অদ্য তাহারই আলোচনা করা আমার অভিপ্রায়।

কিন্তু আমি অতিশয় দুর্ব্বল ; প্রভু কেন যে এই ভৃত্যকে এই বিষম কার্য্যে নিয়োজিত করিয়াছেন, তাহা তিনিই জানেন। প্রভু যাহা বলাইবেন, আমি তাহাই বলিতে চেষ্টা করিব, কিন্তু বলিবার দোষে যদ্যপি আপনারা বুঝিতে না পারেন, সে জন্য আপনারা আমায় দয়া করিবেন। তাহা হইলে আপনারা এই সিদ্ধান্ত করিয়া লইবেন যে, আমিই অভিমানের বশবর্ত্তী হইয়া আপনার জ্ঞান গরিমার পরিচয় দিতে আসিয়াছিলাম। যদ্যপি এই প্রস্তাবটীর মীমাংসা হয়, তাহা হইলে তাহা রামকৃষ্ণদেবের করুণা জানিয়া তাঁহার জয়ধ্বনি দিবেন।

রামকৃষ্ণদেব সকল ধর্ম্মপ্রণালী সত্য বলিয়া উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন। তিনি নিজে সাধক হইয়া গুরুকরণপূর্ব্বক সাধনাদ্বারা ধর্ম্মপন্থাবিশেষের চরমাবস্থায় উপনীত হইয়া ধর্ম্ম সমন্বয় করিয়া বলিয়াছিলেন যে, যে যেরূপেই উপাসনা করুক না কেন, তাহার মনোবাঞ্ছা সিদ্ধির বিঘ্ন হইবে না। এই কথাটী সর্ব্বপ্রথমে শ্রীকৃষ্ণ উচ্চারণ করিয়াছিলেন, রামকৃষ্ণদেব তাহার প্রত্যক্ষ প্রমাণ দিয়া গিয়াছেন। এসম্বন্ধে আমি বার বার অনেক কথা বলিয়াছি। যদ্যপি শ্রীকৃষ্ণকথিত এবং রামকৃষ্ণ মীমাংসিত, যে, যেরূপে, যে ভাবে, যেমন করিয়া উপাসনা বা সাধনা করিবে, সেইরূপে সেই ভাবে এবং তেমনি কার্য্যের দ্বারা ভগবান্‌কে লাভ করিবে, এই কথায় বিশ্বাস করিতে হয়, তাহা হইলে অধিকারী সম্বন্ধে একেবারেই নির্দ্দিষ্ট বিধি হইতে পারে না। যে, যেরূপে, যে ভাবে অর্থে ব্রাহ্মণ বুঝায় না। কারণ কার্য্যক্ষেত্রে দেখা যাইতেছে যে, কেবল ব্রাহ্মণ কেন হিন্দু ব্যতীত অন্যান্য জাতিরাও ভগবান্‌কে লাভ করিয়া শান্তিময়ের শান্তি ছায়ায় উপবেশনপূর্ব্বক দিনযাপন করিয়া যাইতেছেন। যদ্যপি কেহ তাহাতে এই বলিয়া আপত্তি করেন যে, তাহা তাহাদের ভ্রম, তাহা তাহাদের আত্মপ্রতারণা, তাহা

হইলে বিশ্বপতির বিশ্ব সংসারের কার্য্যকলাপ এবং নিয়মাদি পর্য্যালোচনা করিয়া দেখা কর্ত্তব্য। রামকৃষ্ণদেব এই নিমিত্ত বলিতেন যে, ঊর্দ্ধদিকে চাহিয়া দেখ, এক নীলচন্দ্রাতপ দ্বারা ভূমণ্ডল সমাচ্ছাদিত। অন্ধকার দূরীভূত করিয়া বিশ্বসংসারের কার্য্য নির্ব্বাহের নিমিত্ত গ্যাস এবং ইলেক্‌ট্রিক আলোকের ন্যায় চন্দ্র এবং সূর্য্যের ব্যবস্থা করিয়াছেন। এই দ্বিবিধ আলোক ভূমণ্ডলস্থ জীববিশেষের নহে, শ্রেণীবিশেষের নহে, সম্প্রদায়বিশেষের নহে, সর্ব্বপ্রকার জীব, জন্তু, জলচর, ভূচর, খেচর, স্থূল, সূক্ষ্ম কীটানুকীট, উদ্ভিদ এবং পার্থিব পদার্থমাত্রেই সমভাবে প্রাপ্ত হইয়া থাকে। সূর্য্য চন্দ্রের এমন অভিমান নাই যে, উহাকে আলোক দিব এবং উহাকে দিব না। তাঁহাদের আলোক দানের কার্য্য; নিয়মিতরূপে সেই কার্য্য সাধন করিয়া যাইতেছেন। বায়ুও তদ্রূপ। তাহার নিকট ইতর বিশেষ নাই. ধনী নির্ধনী নাই, সাধু অসাধু নাই, ব্রাহ্মণ শূদ্র নাই, যবন ম্লেচ্ছ নাই, সকলের সহিত সমভাবে কার্য্য করিয়া থাকে। ভগবানের নিকট সকলেই সমান। এই নিমিত্ত শ্রীকৃষ্ণ, যে যে ভাবে উপাসনা করিবার ভাব দ্বারা কেবল ব্রাহ্মণদিগকে নির্দ্দেশ করেন নাই। এইরূপ মীমাংসা করিবার হেতু এই যে, ভগবান্‌কে প্রাপ্ত হইবার নিমিত্ত যাঁহার ইচ্ছা হইবে, তিনিই ভগবান্‌কে পাইবেন, তিনিই তাঁহার সাধনার যোগ্য। ব্রাহ্মণ যদ্যপি ভগবান্‌কে লাভ করিতে চাহেন, তাহা হইলে তিনি সাধনের অধিকারী হইতে পারেন, কিন্তু যদ্যপি তাঁহার উদ্দেশ্য কামিনীকাঞ্চনে পরিপূর্ণ থাকে, তিনি যদ্যপি সেই উদ্দেশ্য সাধনের নিমিত্ত সর্ব্বদা ব্যতিব্যস্ত থাকেন, কামিনীকাঞ্চন যদ্যপি তাঁহার জ্ঞান, ধ্যান এবং জপমালা হয়, কামিনীকাঞ্চনের নিকটে যদ্যপি দাসখত লিখিয়া দিয়া থাকেন, কামিনীকাঞ্চনের পুষ্টি সাধনের

নিমিত্ত যদ্যপি তাঁহার শাস্ত্রালোচনা হয়, কামিনীকাঞ্চনের উদর পূর্ত্তির মানসে যদ্যপি শাস্ত্র ব্যাখ্যা হয়, তাহা হইলে তিনি ঐশ্বরিক ভাব বিবর্জ্জিত হইলেন, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। ঐশ্বরিক ভাব, ঐশ্বরিক উদ্দেশ্য, ঐশ্বরিক কামনা যথায় নাই, তথাকার কার্য্য অবশ্যই ঈশ্বর-বিহীন হইবে। মনে ঈশ্বর নাই, সে ব্যক্তি কিরূপে ঈশ্বর সাধনের অধিকারী হইবেন? এই নিমিত্ত ব্রাহ্মণ বর্ণ একমাত্র ঈশ্বর সাধনার অধিকারী বলা যাইতে পারে না।

শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র গৌরাঙ্গরূপে অবতীর্ণ হইয়া যেরূপে কার্য্য করিয়াছিলেন, তদ্দ্বারা অধিকারী এবং অনধিকারী সম্বন্ধে বিশেষ জ্ঞান প্রাপ্ত হওয়া যাইতে পারে। তাঁহার পারিষদবর্গদিগের মধ্যে ব্রাহ্মণ ব্যতীত সকল প্রকার বর্ণই ছিলেন। হিন্দু জাতির কথাই নাই, যবনকুল-গৌরব হরিদাস তাঁহার কৃপা লাভ করিয়া বৈষ্ণবচূড়ামণি হইয়াছিলেন। হরিদাসের জন্য মহাপ্রভু সর্ব্বদা অস্থির থাকিতেন। হরিদাস মুসলমান ছিলেন, তিনি সর্ব্বদা প্রভুর নিকটে গমন করিতে সঙ্কুচিত হইতেন। তিনি কখন ভক্তমণ্ডলীর সহিত একাসনে উপবেশন করিতে চাহিতেন না, এই নিমিত্ত মহাপ্রভু, হরিদাস আসিয়াছেন শুনিবা মাত্র, অন্যান্য ভক্তদিগের সহিত কথা না কহিয়া বৎস-রব শ্রবণ মাত্র গাভী যেমন ঊর্দ্ধশ্বাসে ধাবিত হয়, তিনি আমার হরিদাস, কোথায় আমার হরিদাস বলিয়া বাহু প্রসারণ করিয়া হরিদাসকে আলিঙ্গন-পূর্ব্বক প্রেমাশ্রু বিসর্জ্জন করিয়া ভক্তের প্রাণ সুশীতল করিতেন। হরিদাস যবন, ব্রাহ্মণ ছিলেন না, ইহা প্রত্যক্ষ কথা, ঐতিহাসিক কথা। যবন ভগবানের আলিঙ্গন পাইয়াছিলেন, যবন ভগবানের হৃদয়ে স্থান পাইয়াছিলেন, যবন ভগবানের ক্রোড়ে উপবেশন করিয়াছিলেন। যবনের জন্য প্রভু অস্থির হইয়াছিলেন, যবনকে তিনি সর্ব্বাপেক্ষা সম্মান

দিয়াছিলেন, হরিদাস যবন হইয়া হিন্দুর ভগবান্‌কে লাভ করিয়াছিলেন, ইহা দ্বারাও কি ঈশ্বরের সাধনায় অধিকারী নির্ণয় করা যায় না ?

মহাপ্রভু শ্রীগৌরাঙ্গ যেরূপে অধম হরিদাসকে কৃপা করিয়াছিলেন, আমরা প্রভু রামকৃষ্ণদেবের লীলায়ও সেইপ্রকার দৃষ্টান্ত প্রত্যক্ষ করিয়াছি। উইলিয়ম নামক জনৈক খৃষ্টান প্রভুর নাম শুনিয়া তাঁহাকে দর্শন করিবার মানসে গুড্‌ফ্রাইডের দিন দক্ষিণেশ্বরে গমন করিয়াছিলেন। তিনি খৃষ্টান, এ কথা যেন সকলের স্মরণ থাকে। রামকৃষ্ণদেবকে দর্শন করিবার জন্য উইলিয়মের কেন যে ইচ্ছা হইয়াছিল, তাহা তিনিই জানিতেন। তিনি দক্ষিণেশ্বরে প্রভুর গৃহের বহির্দেশে কৃতাঞ্জলিবদ্ধ হইয়া দাঁড়াইবামাত্র রামকৃষ্ণদেব উলঙ্গপ্রায় হইয়া ছুটিয়া যাইয়া তাঁহাকে আলিঙ্গন করিলেন। উইলিয়মের দুই চক্ষে গঙ্গা যমুনা বহিয়া গেল, তিনি একবার প্রভুর বদনকান্তি দর্শন করিয়া চরণ চুম্বন পূর্ব্বক হেঁট মস্তকে নয়নজলে প্রভুর চরণযুগল অভিষিক্ত করিতে লাগিলেন। সে সম্মিলনের কথা আমি কি বলিব ! সে অপূর্ব্ব ভক্ত ভগবানের সম্বন্ধ আমি কেমন করিয়া বর্ণনা করিব ! সে কাহিনী বচনাতীত, ভাবাতীত ! আমি মূর্খ, সাধন ভজনবিহীন কেমন করিয়া ভক্ত ভগবানের আভ্যন্তরিক লীলার ব্যাপারের আভাসমাত্রও প্রদান করিতে কৃতকার্য্য হইব ! চক্ষে যাহা দেখিয়াছি, তাহাই যথাসাধ্য বর্ণনা করিতে চেষ্টা করিলাম, ভাবময় যদ্যপি ইহার ভাব কাহাকে দয়া করিয়া প্রদান করেন, তাহা হইলে তিনি তাহা অবশ্যই প্রাণে প্রাণে উপলব্ধি করিতে পারিবেন। উইলিয়মকে রামকৃষ্ণদেব নিজ গৃহে লইয়া যাইয়া সম্মুখে উপবেশন করাইয়া কহিলেন যে, অত চিন্তিত হইতেছ কেন ? আর দুই দিন আসিলে তোমার মনোসাধ পূর্ণ হইবে। এ সম্বন্ধে অনেক কথা রহিল, তাহা প্রস্তাবান্তরে আলোচনা করিব।

আমাদের অদ্যকার উদ্দেশ্য সমর্থন জন্য যে পর্য্যন্ত প্রয়োজন, সেই পর্য্যন্ত বলিলাম, এক্ষণে বুঝা যায় যে, ব্রাহ্মণই যে সমগ্র অধিকারী. তাহা নহে। কুতার্কিকদিগের সন্দেহ ভঞ্জনার্থ অন্যান্য অবতার কর্ত্তৃক নীচ জাতির কৃপা লাভ করিবার দৃষ্টান্ত প্রদত্ত হইতেছে।

রামাবতারে গুহক চণ্ডাল পবিত্র হইয়াছিলেন, রাক্ষসেরা কৃতার্থ হইয়াছিলেন, পশুজাতি বানরবৃন্দেরা কৃতার্থ হইয়াছিলেন, তখন সাধারণ মনুষ্যেরা কেন তাঁহাকে লাভ করিবার জন্য সাধনা কার্য্যে অধিকারী না হইবেন? যদ্যপি একথা বলা হয় যে, তাঁহারা দেবতা. ভগবানের লীলার পুষ্টিপোষানার্থে ঐ প্রকার নিকৃষ্ট জন্তু ভাবে জন্মিয়াছিলেন, তাহা হইলেও প্রত্যক্ষ ঘটনার দোষ জন্মিতেছে না। তাঁহারা কেহই ব্রাহ্মণ কুলে জন্ম গ্রহণ করেন নাই, ইহা স্থির সিদ্ধান্ত। অতএব ব্রাহ্মণ ছাড়া এমন কি জীব জন্তুও ভগবানের সহবাস লাভ করিতে পারেন। অনেকের মত এই এবং আজ কাল অনেক কৃতবিদ্য পণ্ডিতপ্রবরেরা অনুমান করেন, স্নায়ুবৃন্দের শক্তি সঞ্চালনে ঊর্দ্ধাধোগতি অবলম্বনপূর্ব্বক ধর্ম্মবৃত্তিটী পশুদিগের মস্তিষ্কে প্রকাশিত হইতে পারে না বলিয়া বৃথা সিদ্ধান্ত করিয়া থাকেন। রামচন্দ্র প্রভুর হনুমানাদির বৃত্তান্ত বোধ হয় তাঁহারা বিশ্বাস করেন না। অথবা যেমন অনেকে হনুমানাদিকে ব্যক্তিবিশেষের নাম নির্দ্দেশ পূর্ব্বক কবিতার অতিরঞ্জিত ভাব বলিয়া নিশ্চিন্ত হইয়া থাকেন। আমরা এই শ্রেণীর পণ্ডিতদিগের সহিত সহানুভূতি করিতে একেবারেই অশক্ত। প্রথমতঃ হনুমান বাস্তবিক লাঙ্গুলধারী বানর শ্রেণীর পশু ছিলেন। সে কথায় আমাদের অনুমাত্র সন্দেহ নাই। কারণ রামকৃষ্ণদেব বলিয়াছেন যে. তিনি যখন রামমন্ত্রে হনুমানের ভাব সাধনা করিয়াছিলেন, সে সময়ে তাঁহার মনুষ্য স্বভাব পরিবর্ত্তিত হইয়া গিয়াছিল। তিনি যে সময়ে

হনুমানের ভাবাবেশে বসিয়া থাকিতেন, তখন কেহ তাঁহার নিকট গমন করিলে তাহাকে আঁচড়াইতে এবং কামড়াইতে যাইতেন। পেয়ারা, কলাদি ফল না দিলে কেহ তাঁহার ভাবের সাম্য করিতে পারিতেন না। বৃক্ষ শাখায় বসিয়া থাকিতে তাঁহার ভাল লাগিত। এই সাধন কালে তিনি আপনি বলিয়াছেন যে, তাঁহার এক ইঞ্চের অধিক লাঙ্গুল বাহির হইয়াছিল। অবিশ্বাসী, তত্ত্বজ্ঞানান্ধ, বহির্দ্রষ্টারা অনেকে এই কথা শ্রবণ করিয়া অনেক কথাই বলিতে পারেন, কিন্তু তত্ত্ব নিরূপণ করিতে হইলে প্রত্যক্ষ ঘটনার আশ্রয় ব্যতীত কস্মিন্‌কালে নিগূঢ় ভাব বাহির হয় নাই, হইবেও না। প্রত্যক্ষ ঘটনাই মানব-গবেশনার একমাত্র উপায় এবং অবলম্বন। প্রত্যক্ষ ঘটনাবলীর আশ্রয়ীভূত সূক্ষ্মতম ভাব। ভাব কখন মনুষ্যচক্ষের গোচর নহে। তাহা জ্ঞানচক্ষুর অধিকারসম্ভূত। প্রত্যক্ষ ঘটনা হইতে সূক্ষ্মজ্ঞানের উদয় হয়, সেই সূক্ষ্মভাব বিজ্ঞান বলিয়া প্রচলিত। ফল পাকিলে বৃক্ষ হইতে ভূবক্ষে নিপতিত হয়, এ কথা কে না জানেন, এই স্থূল ঘটনা কে না দেখেন, কে এই ঘটনাকে গণনায় স্থান দিতেন এবং এক্ষণেই বা তাহাকে মূল্যবান বলিয়া কয় জন লোকে স্বীকার করেন? ফল পাকিয়া ভূমিতে পড়িয়া যায়, এই কথা কি অজ্ঞসমাজে একটা কথা বলিয়া স্থান পাইতে পারে? না সে কথা যে আলোচনা করে, বাতুলশ্রেণী ব্যতীত তাহার অন্য স্থান সম্ভব? কিন্তু ভূ-বক্ষে আপেল নিপতিত হওয়া মহাত্মা নিউটন দেখিলেন। তিনি এই ঘটনা, এই প্রত্যক্ষ স্বাভাবিক ঘটনা দর্শন করিয়া কি নিশ্চিন্ত হইয়া রহিলেন? না তিনি ঘটনার গর্ভস্থিত সত্য বাহির করিবার নিমিত্ত ঘটনাবলম্বন পূর্ব্বক চিন্তাসাগরে ঝাঁপ দিলেন। ঘটনা ক্রমে তাহার কারণ দেখাইয়া দিল। তিনি তখন জ্ঞানচক্ষে বিশ্বব্যাপিনী মাধ্যাকর্ষণ শক্তি উপলব্ধি করিতে পারিলেন।

স্থূল চক্ষে এপেল পড়া] ঘটনা, সূক্ষ্ম বা মানস বা জ্ঞান চক্ষে আকর্ষণী শক্তি দর্শন ও উপলব্ধি করিয়া সত্য বাহির করিয়া দিয়া গিয়াছেন। অতএব ঘটনা ত্যাগ করিয়া কেবল কল্পনার রাজ্যে বাস করিলে কার্য্যক্ষেত্রে দয়ার পাত্র হইয়া যাইতে হয়।

রামকৃষ্ণদেব হনুমানের সাধনের সময় যে কেবল বাহ্যাকৃতি এবং ভাববৈলক্ষণ্যের পরিচয় দিয়া গিয়াছেন, তাহা নহে। হনুমান রাম সীতার যুগল মূর্ত্তি হৃদয়ে জমাইয়া রাখিয়াছিলেন। তিনি ঐ যুগল মূর্ত্তি যাহাতে না দেখিতেন, তাহাতে তাঁহার মন অবনত হইত না। রাবণ নিধনের পর জানকীর উদ্ধার কার্য্য পরিসমাপনান্তে রামচন্দ্র অযোধ্যায় রাজদণ্ড গ্রহণ করিলে লক্ষণ ঠাকুর হনুমানকে অতি মূল্যবান মোতীর মালা পারিতোষিক দিয়াছিলেন। হনুমান রামসীতার মূর্ত্তি দর্শন করিবার নিমিত্ত সমুদয় মুক্তামালা দ্বিখণ্ড করিয়াছিলেন, হনুমানের সেইরূপ ঘটনায় লক্ষণঠাকুর হনুমানের ভাব না বুঝিয়াই বানুরে বুদ্ধি বলিয়া হাসিয়া ছিলেন।

লক্ষণ ঠাকুরের ন্যায় স্থূল দ্রষ্টারা রামকৃষ্ণের এই ঘটনায় উপহাস করিতে পারেন, কিন্তু লক্ষণ ঠাকুর যখন হনুমানের ভাব শ্রবণ করেন, তখন তাঁহার জ্ঞান চক্ষের একটী দ্বার খুলিয়া গিয়াছিল। হনুমানের ভাব সাধনকালীন রামকৃষ্ণদেব যে স্থূল ঘটনা প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন, তদ্দ্বারা বর্ত্তমান কালের বৃথা জ্ঞানান্ধ এবং কল্পনার রাজ্য নিবাসীদিগের ভ্রমপ্রমাদ নিবারণের উপায় হইবে। যাঁহাদের বিশ্বাস যে, মস্তিষ্কের যে অংশ বর্দ্ধিত না হইলে ধর্ম্মবৃত্তি জন্মিতে পারে না, তাঁহাদের শিক্ষার নিমিত্ত রামকৃষ্ণের এই হনুমানে সাধনার বিশেষ প্রয়োজনীয় হইবে। হনুমান বাস্তবিক পশু ছিলেন এবং তজ্জন্য রামকৃষ্ণদেব মনুষ্যাকারেও সাময়িক পশুভাবের অভিনয় করিয়া গিয়াছেন, কিন্তু সেই অবস্থায়

রাম সীতার ভাব কেবল স্ফূর্তি পাওয়া নহে, আপনার হৃদয়স্থিত রাম সীতা দেখাইবার নিমিত্ত হৃদয় বিদারণ করিবার যত্ন করিতেন এবং নখাঘাতে তাঁহার বক্ষঃস্থল ছিন্ন ভিন্ন হইত। তিনি বলিয়াছেন যে, হনুমানের ন্যায় ভাবোন্মাদের ভাব আর কুত্রাপি দেখা যায় না। হনুমান এই ভাবের অদ্বিতীয় দৃষ্টান্তস্থল। ভাবোন্মাদ কাহাকে কহে,তাহা জগৎকে শিক্ষা দিবার জন্য রামকৃষ্ণদেব এই সাধনা করিয়াছিলেন। তাহার সাধনা শুনিয়া ভাবোন্মাদ শব্দটা ভাবরাজ্যে স্থান পাইবে।

হনুমানের দ্বিতীয় ভাব এই যে, রাম সীতা মূর্ত্তি ব্যতীত অন্য মূর্ত্তি তিনি দেখিতেন না। এরূপ নৈষ্টিক ভাব আর কাহারও শুনা যায় না। বর্ত্তমান কালে এরূপ নৈষ্টিক ভাব বিশেষ আবশ্যক, তাহার উপমা হনুমান, সুতরাং হনুমানের ভাব গ্রহণ করিবার পূর্ব্বে তাহা গ্রহনীয় কি না, সে বিষয়ের বিশেষ মীমাংসা হওয়া উচিত। সময় আসিবে, এখন যদিও সে দিন উপস্থিত হয় নাই, যে দিন হনুমানের ভাব বিশেষ কার্য্যে আসিবে, এই জানিয়া ভাবের একাকার করিবার জন্য রামকৃষ্ণদেব এ প্রকার সাধনা করিয়াছিলেন। সে যাহা হউক, যখন হনুমান সাধনের অধিকারী হইয়া রামসীতাকে ঘনীভূত করিয়া হৃদয়মন্দিরে আবদ্ধ করিয়া বসিয়াছিলেন, তখন মনুষ্যমাত্রেই যে সেরূপ সাধনার অধিকার লাভ না করিবেন, ইহার বিচিত্র কি ?

কৃষ্ণাবতারেও দেখা যায় যে, তাঁহাকে কে না লাভ করিয়াছেন ? ব্রহ্মা হইতে রজকিনী পর্য্যন্ত সকলেই তাঁহাকে প্রাপ্ত হইবার অধিকারী এবং অধিকারিণী হইয়াছিলেন। শূদ্র জাতি গোপগোপিকারা শ্রীকৃষ্ণকে লইয়া সহবাসের চূড়ান্ত করিয়া দিয়াছেন। তখন এক ব্রাহ্মণ জাতি ভিন্ন অপর জাতির ঈশ্বর সাধনার অধিকার নাই, এ কথা প্রচার করা নিতান্ত অদূরদর্শীতার ফল বলিয়া অবশ্যই সাব্যস্থ করিতে হইবে।

আমরা ঈশ্বর সাধনের অধিকারী নিরূপণ সম্বন্ধে ঐতিহাসিক কয়েকটী স্থূল ঘটনা প্রদর্শন করিলাম। কিন্তু এক্ষণে কথা হইতেছে যে, শাস্ত্রে চারিটী বর্ণ নিরূপণ করিয়াছেন, তাহার মীমাংসা হইবে কিরূপে?

বর্ণচতুষ্টয়ের তাৎপর্য্য বাহির করিলে শক্তির তারতম্যই এই বিধানের প্রধান কারণ বলিয়া বুঝা যায়। বল্লাল সেন শক্তি বা গুণ বিচার দ্বারা যে প্রকার কৌলীন্যাদি বিভাগ করিয়াছিলেন, কুলীনেরা পূর্ব্বলক্ষণ বিহীন হইয়াও সমাজে পূর্ব্ব মর্য্যাদায় আদরণীয় হইতেছেন, সেই প্রকার যোগ, তপঃ, দম, শৌর্য্য, বিদ্যা, বিজ্ঞান প্রভৃতি বিবিধ গুণসম্পন্ন ব্যক্তিই ব্রাহ্মণপদবাচ্য হইয়াছিলেন। এই লক্ষণ বর্জ্জিত হইলে তাঁহার আর পূর্ব্বশক্তি থাকিতে পারে না, সুতরাং ব্রাহ্মণ বলিয়া বৃথা পরিচিত হইয়া থাকেন। যেমন ব্রাহ্মণকুলে জন্মিয়া যদ্যপি খৃষ্টান মুসলমান বা ব্রাহ্ম হন, তাহা হইলে তাঁহার ব্রাহ্মণত্ব লোপ হয় কেন? কারণ ব্রাহ্মণের লক্ষণাদি আর তাহাতে থাকে না। সামাজিক ব্রাহ্মণগণের সহিত আর তাঁহাদের লক্ষণের মিল থাকে না। সেইরূপ যদ্যপি শাস্ত্রকথিত লক্ষণগুলির সহিত আধুনিক ব্রাহ্মণদিগকে তুলনা করা যায়, তাহা হইলে সমুদয় লক্ষণ না হউক, অন্ততঃ একটীও দেখা যাইবে না। সে দিন নাই, সে ব্যবস্থাও নাই। মনুসংহিতা লইয়া যদ্যপি ব্রাহ্মণের কার্য্যকলাপ জীবন গঠনের প্রণালী পর্য্যালোচনা করা যায়, তাহা হইলে যে ব্রাহ্মণেরা ব্রাহ্মণকে ঈশ্বর সাধনের শ্রেষ্ঠ পাত্র বলিয়া ঘোষণা করেন, তাঁহারাই লজ্জিত হইবেন। বেদত্রয় অধ্যয়ন করা প্রত্যেক ব্রাহ্মণের অবশ্য কর্ত্তব্য। কেহ দীর্ঘকাল কেহ বা অন্ততঃ স্বল্পকালের জন্য একখানি বেদও অধ্যয়ন পূর্ব্বক বিদ্যা লাভ করিবেন, ইহাই ব্রাহ্মণাদি দ্বিজদিগের জীবনের প্রথম কার্য্য। সে কার্য্য আদৌ নাই বলিলে প্রকৃত কথা বলা হয়। বিদ্যা সম্বন্ধে এইরূপ বিশৃঙ্খলা জন্মিয়াছে,

যোগ জপের কথা উপহাস মাত্র। অতএব ব্রাহ্মণ যদ্যপি সাধনের একমাত্র অধিকারী হন, তাহা হইলে সেরূপ ব্রাহ্মণের অভাব। এক্ষণে সাধনের অধিকারী কাহারা হইবেন ?

পূর্ব্বকালে ব্রাহ্মণেরা বিদ্যাধ্যয়ন কার্য্যে ষট্‌ত্রিংশৎবৎসর ব্রহ্মচর্য্যায় অতিবাহিত করিয়া কেহ দার পরিগ্রহ পূর্ব্বক সংসারাশ্রমে প্রবেশ করিতেন এবং কেহ সাধন কার্য্যে জীবন উৎসর্গ করিতেন। যাঁহারা ব্রহ্মচর্য্যাশ্রম হইতে যোগী হইতে ইচ্ছা করিতেন, তাঁহারা আর দার পরিগ্রহ করিতেন না। যোগীরা জিতেন্দ্রিয় হইতেন। সংসারী হওয়া বা না হওয়া ব্রাহ্মণের ইচ্ছাধীন ছিল। পিতা মাতা জোর করিয়া উদ্বাহশৃঙ্খলে পদবন্ধন করিয়া ফেলিয়া রাখিতেন না। ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য-দিগের যদিও ব্রহ্মচর্য্যাবস্থায় অধ্যয়নাদি করিবার অধিকার ছিল এবং ইচ্ছাক্রমে যোগাবলম্বন করিতে পারিতেন, কিন্তু কার্য্যবিশেষ কর্ত্তব্য বলিয়া স্থির নিশ্চয় থাকায় অনেক সময়ে তাহাই করিতে হইত। এই নিমিত্ত ব্রাহ্মণেরা সাধন কার্য্যে সম্পূর্ণ অধিকারী ছিলেন। কিন্তু বর্ত্তমানকালে সে অবস্থার সম্যক্‌রূপে পরিবর্ত্তন হইয়া গিয়াছে। এক্ষণে ঈশ্বর সাধন কার্য্যে অধিকারী কাহারা ? এ প্রস্তাব সম্বন্ধে শাস্ত্রাদির মতামত লইয়া আন্দোলন করিবার আমাদের শক্তি নাই, তাহা পণ্ডিত-দিগের অধিকারসম্ভূত কথা। রামকৃষ্ণদেব যে প্রকার অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়াছেন, তাহাই অদ্যকার আলোচ্য বিষয়।

রামকৃষ্ণদেব বলিয়াছেন যে, কামিনীকাঞ্চনের লেশমাত্র সম্বন্ধ থাকিতে ঈশ্বর সাধনের অধিকারী হওয়া যায় না। তাঁহার মতে জাতি, বর্ণ বা ব্যক্তিবিশেষে যে নির্দ্দিষ্ট অধিকারী, তাহা নহে। যে জাতিই হউক, যে বর্ণই হউক, কামিনীকাঞ্চন ভাব হইতে সম্পূর্ণরূপে অব্যাহতি লাভ করিতে পারিলেই ঈশ্বর সাধনের একমাত্র অধিকারী হইবেন।

এক্ষণে জিজ্ঞাস্য হইতেছে যে, কামিনীকাঞ্চন ত্যাগ করিতে পারিলে ঈশ্বর সাধনার অধিকারী হওয়া যায়। রামকৃষ্ণের কথার ভাবে তাহা বুঝায়। সাধনায় ব্রতী হইতে হইলে হীনবীর্য্য হইলে কখন ধ্যান ধারণা এবং সমাধিলাভ হইতে পারে না। সাধনার উদ্দেশ্যই সমাধিলাভ করা। এই উদ্দেশ্য যাহাতে সিদ্ধ হয়, সাধকদিগের তাহাই করা কর্ত্তব্য, সুতরাং কামিনীকাঞ্চন সম্বন্ধ একেবারেই থাকিবে না। শ্বাসকাশ ব্যাধিগ্রস্থ কি কখন প্রাণায়াম করিবার যোগ্য, না কেহ তাঁহাকে সাধক-শ্রেণীতে গ্রহণ করিতে পারেন? পুত্র পৌত্রাদি পরিবেষ্টিত ব্যক্তি কি কখন ধ্যান করিয়া দুই দণ্ড চিত্তস্থির করিতে সমর্থ হন? সমাধির কথাই নাই।

কামিনীকাঞ্চন সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন করিয়া কেহ অদ্যাপি ঈশ্বর সাধনের অধিকার লাভ করিতে পারেন নাই। এই কথা শ্রবণ মাত্রেই অনেকে বিস্ময়াপন্ন হইবেন। অনেকে আমাকে পাগল মনে করিয়া আমার মুখের দিকে অবাক্ হইয়া চাহিয়া থাকিবেন। সংসার ত্যাগ করিয়া চিরকাল লোকে সাধক হইয়া আসিতেছেন, সংসারাশ্রমের পর বান-প্রস্থাশ্রমাদির কথা শাস্ত্রে দিব্যাক্ষরে লিখিত রহিয়াছে, বিশেষতঃ আমাদের দেশে পাইকপাড়া নিবাসী লালাবাবু সন্ন্যাসাশ্রম অবলম্বন পূর্ব্বক জীবনের শেষ ভাগ অতিবাহিত করিয়াছিলেন এবং উত্তর পশ্চিমাঞ্চলে এ প্রকার অগণন সাধক দেখিতে পাওয়া যায়, তখন আমি রামকৃষ্ণদেবের যে উপদেশ প্রচার করিতেছি, তাহার আর স্থান না হইবে কোথায়?

কথা সত্যবটে, সংসার ত্যাগ পূর্ব্বক অনেকে সাধকশ্রেণীতে সন্নিবিষ্ট হইয়াছেন, সে কথা ঐতিহাসিক ঘটনা, সুতরাং তাহার বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হওয়া যায় না; তবে রামকৃষ্ণদেব এপ্রকার অন্যায় ব্যবস্থা করিলেন কেন?

রামকৃষ্ণদেব যে সাধনার কথা বলিয়াছেন, তাহার উদ্দেশ্য স্বতন্ত্র, ভগবান্ লাভ করিবার যে সাধনা, তিনি তাহারই কথা বলিয়া গিয়াছেন। মালা জপকরাও সাধনা, হরি নাম করাও সাধনা, একাদশীর উপবাস করাও সাধনা, আসন অভ্যাস করাও সাধনা, এবং ভগবান্ লাভ করাও সাধনা। কিন্তু এই সকল সাধনার কি তারতম্য নাই? এক কাঠা জমির অধীশ্বরকে জমিদার বলা যায় বটে, একটী প্রজা থাকিলেও জমিদার নামে পরিকীর্ত্তিত হইতে পারেন বটে, কিন্তু তাঁহাকে কি বর্দ্ধমানাধিপতির সহিত একাসনে বসান যায়? তেমনি সাধনা বলিলে তাহারও অবস্থান্তর আছে। সাধারণ কথায় যাহাকে সাধন বলে, তাহার দ্বারা ইহজীবনে ভগবানের সাক্ষাৎলাভ করা যায় না। ক্রমে ক্রমে জন্মজন্মান্তরে অগ্রসর হইয়া কোন সময়ে, হয়ত সাধক সিদ্ধ মনোরথ হইতে পারেন, না হয় পুনরায় পদস্খলিত হইয়া অধঃপাতিত হইয়া যান। এ প্রকার সাধনের কথা রামকৃষ্ণদেব বলেন নাই। তাঁহার এ কথা অনুমোদন না করিবার হেতু এই যে, আজ কাল পর জন্ম না মানিয়া অনেকে ভগবান্ লাভ করিতে চাহেন, যাঁহারা ভগবান্ লাভের প্রত্যাশা করেন, তাঁহাদের পক্ষে কামিনী-কাঞ্চন সম্বন্ধ একেবারেই থাকিবে না, ইহাই প্রভু স্পষ্টাক্ষরে বলিয়া গিয়াছেন।

ইতিপূর্ব্বের বক্তৃতাদির অনেক স্থলে বলিয়াছি যে, মনে কামিনী-কাঞ্চন ভাব থাকিলে তাহাকে সঙ্কল্প বা কামনা কহে। কামনাসংযুক্ত নরনারীর গতি পৃথিবীতে। তাঁহারা পার্থিব সুখের জন্য লালায়িত হইয়া থাকেন, তাঁহারা তাহারই অনুসন্ধান করেন এবং তাহা প্রাপ্ত হইলে স্থির হইয়া সম্ভোগ করেন। তাঁহাদের ভগবান্ লাভ হইবে কেন? তাঁহারা তাঁহাকে চাহেন না। অতএব কামনা বা সঙ্কল্প-বিবর্জ্জিত মন ব্যতীত ভগবানের সাধনার অধিকার হয় না।

স্বীকার করা গেল, যে সময়ে যাহার মন হইতে বৈষয়িক ভাব বিদূরিত হইবে, সেই সময়ে সাধনায় তাহার অধিকার জন্মিবে। এই স্থানে জিজ্ঞাস্য হইতে পারে যে, যে নরনারীর যে সময়ে সেই অবস্থা উপস্থিত হইবে, সেই নরনারী সেই মুহূর্ত্তে সাধনার পাত্র পাত্রী বলিয়া বিবেচিত না হইবেন কেন? ইহার অভ্যন্তরে একটী কথা আছে।

ভগবানের স্বরূপ তত্ত্বে কথিত হইয়াছে যে, তাঁহার দুইটী অবস্থা। নিত্য এবং লীলা। এই দুই ভাবের দুইটী সাধন পন্থা প্রচলিত আছে। নিত্য পন্থাকে জ্ঞান মার্গ এবং লীলা পন্থা সাধারণ কথায় ভক্তি-মার্গ বলিয়া প্রকাশ আছে। জ্ঞান পন্থায় মনের সাধনা ব্যতীত উপায় নাই। যেহেতু স্থূল, সূক্ষ্ম, কারণ এবং মহাকারণাদি ধারণা করিবার যোগ্যতা লাভ করা চাই। স্থূল বস্তু দর্শন করিয়া সত্যস্বরূপের ভাব উপলব্ধি করিতে কেহ পারেন না। যেহেতু স্থূলে প্রত্যেক বস্তু পরিবর্ত্তনশীল, সত্য জ্ঞান হইবে কিরূপে? সুতরাং সেই স্থূল বস্তু লইয়া সূক্ষ্মে গমন করিতে হয়, সূক্ষ্ম ভাব ধারণা করিতে হইলে মানসিক বলের প্রয়োজন। মন বলবান থাকিলে অল্লায়াসে ভাব গ্রহণ করা যায় এবং সেই ভাব যতই পরিবর্দ্ধিত হইতে থাকে, ততই তাহার কারণ ও মহাকারণ ধারণা করিবার শক্তিসঞ্চার হইয়া থাকে। এই নিমিত্ত মানসিক বলের বিশেষ প্রয়োজন। যাহাতে তাহা জন্মিতে পারে, যদ্দারা তাহা রক্ষিত হইতে পারে, তাহাই সাধনার মূল ভিত্তিভূমি। এই অবস্থাপন্ন যে নর নারী, সেই নরনারীই সুতরাং এই প্রকার সাধনার অধিকারী এবং অধিকারিণী।

জ্ঞান পন্থায় মানসিক চিন্তা ব্যতীত কার্য্য নাই। যদ্যপি কেহ মনকে কামিনীকাঞ্চন দ্বারা দুর্ব্বল করেন, তাহা হইলে তাঁহার কার্য্যকারী শক্তিও দুর্ব্বল হইয়া আসিবে; ফলে সাধনের সময় তিনি নিশ্চয় অকৃতকার্য্য হইবেন, এ বিষয়ে সন্দেহ নাই।

কামিনীকাঞ্চনের দ্বারা মানসিক শক্তি দুর্ব্বল হয় কেন? তাহার কারণ আমি ক্রমান্বয়ে নানা ভাবে আজ কয়েক মাস বলিয়া আসিতেছি, কিন্তু তথাপি এখনও অনেক বলিবার আছে।

বলা হইয়াছে যে, কামিনীকাঞ্চন দ্বারা মনে নানাবিধ সংস্কার পতিত হইয়া তাহাকে অবস্থান্তরে আনয়ন করে। এই নিমিত্ত বিশুদ্ধ মনের কার্য্য হওয়া যারপরনাই অসম্ভব। কামিনীকাঞ্চন অর্থাৎ স্ত্রী পুরুষ ও বিষয়াদি ভাবাপন্ন মনের কার্য্যে স্ত্রী পুরুষ এবং বিষয়ের অবশ্য সম্বন্ধ থাকিবে, সুতরাং তথায় মনের স্থূলভাব রহিয়া গেল। স্থূলভাব থাকিলে সূক্ষ্ম, কারণ এবং মহাকারণ ভাব কিরূপে আসিবে? এ কথা কেহ যেন বিস্মৃত না হন যে, সাধনার উদ্দেশ্য মহাকারণে গমন করা। যদ্যপি স্থলেই বসিয়া থাকিলাম, স্থূলেই যদ্যপি ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিলাম, তাহা হইলে উচ্চসোপানে উঠিবার আর যোগ্যতা হইল না, সুতরাং এ প্রকার অবস্থাপন্ন ব্যক্তিকে কখন সাধনের অধিকারী কহা যায় না। ভাবের কার্য্য সূক্ষ্মানু হইতে সূক্ষ্ম। স্থূল জগতে স্থূলের কার্য্যই আমরা দর্শন করিয়া থাকি। কিন্তু যাঁহার সূক্ষ্ম দৃষ্টি সঞ্চারিত হইয়াছে, তিনি অণু এবং পরমাণুর বিষয়ও ভাবিয়া লইতে পারেন এবং তাঁহার দর্শনপটে পরমাণুদিগের কার্য্যপরম্পরাও প্রতিফলিত হইতে পারে। তিনি বুঝিতে পারেন যে, কেন বীজ অঙ্কুরিত হয়? অঙ্কুরের সময়ে কেন জলের প্রয়োজন এবং তখন উত্তাপ জন্মায় কি জন্য? কেন সূর্য্যরশ্মি আবশ্যকীয়, কেন বায়ু তথায় উপস্থিত থাকিতে বাধ্য হইয়া থাকে? স্থূলে দেখা যায় যে, মৃত্তিকায় বীজ বপন পূর্ব্বক কিঞ্চিৎ জল ঢালিয়া আবৃত ভাবে রাখিতে হয়। এতদ্দ্বারা যে সকল পরিবর্ত্তন ঘটে, তাহা স্থূলে বুঝা যায় না। সূক্ষ্মে সূক্ষ্মেরই কার্য্য সম্পাদন হইয়া থাকে, সূক্ষ্ম দৃষ্টিতে তাহা দর্শন করিবার কথা। সেইরূপ কাঞ্চনের

স্থূল কার্য্য ব্যতীত সূক্ষ্ম, অতি সূক্ষ্ম ভাবেও কার্য্য হইয়া থাকে। যদিও কাহার মনে কাঞ্চন ভাব সাময়িক অদৃশ্য হইয়া যায় বটে, কিন্তু শরীরে তাহার সত্ত্বা থাকে বলিয়া মানসিক ও শারীরিক কার্য্যের দ্বারা কামিনী-কাঞ্চনের সঙ্কল্পিত কার্য্য সাধিত হইয়া যায়।

রামকৃষ্ণদেব কহিয়াছেন যে, একদা কোন প্রৌঢ়াকে মুমূর্ষু ভাবাপন্না দেখিয়া তাঁহার পুত্রাদিরা গঙ্গাযাত্রা করিয়াছিল। গঙ্গাতীরে কিয়দ্দিবস অবস্থিতি করিয়া সজ্ঞানে জাহ্নবী সলিলে জীবনান্ত করাইলে পারলৌকিক মোক্ষপদ পাইবেন ভাবিয়া তাহার পরিজনেরা সময় বুঝিয়া অন্তর্জলি করিল। প্রৌঢ়ার অর্দ্ধেক অঙ্গ গঙ্গাজলে এবং অর্দ্ধাঙ্গ তাহার জ্যেষ্ঠ পুত্রের ক্রোড়ে রহিল। এই সময়ে গঙ্গার ঢেউ উঠিতে লাগিল ; ঢেউএর দ্বারা প্রৌঢ়ার কটিদেশ স্পন্দিত হওন কালে জীবনান্ত হইয়া যায়। সজ্ঞানে ভাগিরথীর জলে মৃত্যু হইল দেখিয়া সকলে ভাগ্যবতী বলিয়া তাঁহার অদৃষ্টকে শত ধন্যবাদ দিতে দিতে গৃহে প্রত্যাগমন করিল। কিন্তু তাহার পরিণাম কি হইল, সে কথা চিন্তা করিবে কে ? স্থূলের কার্য্য স্থূল দর্শনের অধিকারভুক্ত, সূক্ষ্মভাব তথায় স্থান পাইতে পারে না। সজ্ঞানে গঙ্গাজলে মৃত্যু হইল বলিয়া যে পরমগতি লাভ করিতে হইবে, তাহার অর্থ নাই ; সেই প্রৌঢ়া বেশ্যার গর্ভে প্রবেশ করিলেন এবং পরে খ্যাতনামা বেশ্যা হইয়া বিপুল ঐশ্বর্য্যের অধিশ্বরী হইলেন। এ প্রকার ঘটনার তাৎপর্য্য বুঝিতে বাস্তবিক সাধারণ নরনারীর মস্তিষ্ক বিঘূর্ণিত হইয়া যাইবে, তাহার সন্দেহ নাই। গঙ্গায় মরিতে পারিলেই হয় না, স্বচ্ছন্দে পাপ ক্রিয়া সম্পন্ন করিয়া কোন মতে গঙ্গা বা তীর্থাদিতে মরিতে পারিলেই হয় না। স্থূলে যদিও অনেক সময়ে তাহা হইতে পারে, কিন্তু সূক্ষ্মে তাহার যে প্রকার ফলোদয় হয়, বলিয়াছি তাহা স্থূল দৃষ্টির অতীত কথা।

এই প্রৌঢ়া সংসারে চিরদিন সাংসারিক অর্থাৎ কামিনীকাঞ্চন (কামিনী বলিলে স্ত্রী-পুরুষদিগের পক্ষে উভয়কেই বুঝায়) ভাবে দিন যাপন করিয়া আসিয়াছেন। যদিও তিনি প্রৌঢ়া হইয়াছিলেন, কিন্তু পতিভাব তাঁহার অগোচর বিষয় ছিল না। তাঁহার স্বামীর পরকালের পর তিনি বৈধব্য দশায় স্থির স্বভাব রক্ষা করিয়াছিলেন, কিন্তু পতির ভাব তাঁহার মনে দেদীপ্যমান ছিল। যখন একাকিনী শয্যায় শয়ন করিয়া থাকিতেন, তখন পতির সহিত সহবাসাদির কথা অন্ততঃ এক-দিনও স্মরণ হইয়াছিল, সেই বাসনা—সেই সঙ্কল্প আর খর্ব্ব হয় নাই, তাহা শরীরে সূক্ষ্মভাবে পরিব্যাপ্ত হইয়াছিল। পতিসহবাসলালসা তাঁহার দেহকে অবলম্বন পূর্ব্বক পূর্ব্ববর্ত্তী কারণরূপে প্রচ্ছন্নাবস্থায় ছিল, গঙ্গার ঢেউয়ের দ্বারা তাঁহার কটিদেশ স্পন্দিত হইবামাত্র উহা যেন উদ্দীপক কারণস্বরূপ হইয়া গেল। প্রৌঢ়ার মনও বিষয়বিরহিত ছিল না, মরিবার সময় সাধের সংসার কোথায় ফেলিয়া যাইতেছি, হয়ত বধুমাতারা পরস্পর বিবাদ বাধাইয়া পৃথক্ হইয়া যাইবে, আমার সংসার ছিন্নভিন্ন হইবে, এই সময়ে যদ্যপি কর্ত্তা জীবিত থাকিতেন, তাহা হইলে আমি মরিলে ক্ষতি হইত না। এইরূপ চিন্তা আসিয়া উপস্থিত হইয়াছিল। মনে পতির কথাও যেমন উদয় হয়, অমনি ওদিকে অঙ্গ বিচলিত হইয়া উঠে, সুতরাং মৃত্যু সময়ে পতি ও কাঞ্চনভাব লইয়া মৃত্যু হইল। মা জাহ্নবীতে মরিলে তিনি প্রচুর ফলপ্রদান করেন, কিন্তু ফললাভ সঙ্কল্পের প্রতি নির্ভর করিয়া থাকে। মরণকালে যে ভাব উপস্থিত থাকিবে, সেই ভাবানুযায়ী ফলের আধিক্যতা হইবে। প্রৌঢ়ার মনে পতিভাব আসিবার সময় মৃত্যু হয়, তন্নিমিত্ত তাহারই সংখ্যা বৃদ্ধি হইয়াছিল। তাই তাঁহাকে বেশ্যা হইয়া সংখ্যাতীত-পতি সহবাস করিতে হইয়াছিল এবং বৃদ্ধকাল পর্য্যন্ত কাঞ্চনের সম্বন্ধ

রাখিতে হইয়াছিল। অতএব কামিনীকাঞ্চন ভাব মনের ভিতরে কোন ভাবে থাকা উচিত নহে। কে জানে কোন্ সময়ে তাহা স্মরণ পথে আসিবে, কে জানে পরম সময়ে, যে সময়ে তাহার মানসক্ষেত্রে ভগবানের দৃষ্টি পতিত হইবে, সেই সময়ে যে সে ভাব উদ্দীপিত হইবে না, তাহা কে বলিতে পারে? এই নিমিত্ত যত্ন সহকারে কামিনীকাঞ্চন ভাব মন হইতে একবারে পৃথক্ করিতে না পারিলে কস্মিন্‌কালে সাধনে অধিকারী হওয়া যায় না। সাধন সময়ে যতবার কামিনীকাঞ্চন মানসাকাশে উদয় হইবে, ততবার তাহার ফললাভ করিতে হইবে। সুতরাং সে সাধকের ঈশ্বর লাভ না হইয়া ঘোর সংসারী হইয়া জন্ম জন্মান্তর কাল কামিনীকাঞ্চনের আশ্রয়ে অবস্থিতি করিতে হইবে। আমরা সাধারণ দৃষ্টান্তে দেখিতে পাই, যে সময়ে কাহার ফটোগ্রাফ লওয়া যায়, সে সময়ে সে ব্যক্তি যে অবস্থায় থাকে, সেই অবস্থানুরূপ ছবি উঠিয়া থাকে। চক্ষু থাকিতেও অন্ধের ছবি হইতে পারে, সুরূপ সত্ত্বেও কুরূপ ছবি হইতে পারে। অথবা স্বাভাবিক ভাবে স্বাভাবিক ছবিও উঠিতে পারে। ভাল মন্দ হওয়া ছবি তুলিবার সময়ের প্রতি সম্পূর্ণ নির্ভর করিয়া থাকে। সাধনাও তদ্রূপ, সাধনা কালীন ভগবান্‌কে স্মরণ করা হয়, তিনি কল্পতরু, তাঁহার তৎক্ষণাৎ সেই দিকে দৃষ্টি পড়ে। সাধকের মনের তখন যে অবস্থা তিনি দেখিবেন, সেই অবস্থার উৎকর্ষ সাধন হইবে, এই নিমিত্ত সাংসারিক ভাববিশিষ্ট মন লইয়া সাধন করিলে বিপরিত ফল ফলিতে দেখা যায়। এরূপ সাধকদিগের কামিনী-কাঞ্চন লাভ করিবার পক্ষে আনুকূল্য হয়, সুতরাং ভগবানের নিকটে অগ্রসর হইতে পারে না।

ভগবান্ যাহাতে দৃষ্টিপাত করেন, প্রচুর পরিমাণে তাহা বৃদ্ধি হয়, একথা আমাদের কাহার অবিদিত নাই, নরনারী উভয়েই তাহা

জানেন। লক্ষ্মী পূজার কথায় প্রকাশ আছে যে, এক দীন দরিদ্রা ব্রাহ্মণী ছোট ছোট বালক বালিকা লইয়া অন্নাভাবে সর্ব্বদা ক্লেশ পাইতেন। তিনি কিয়দ্দিবস অন্নকষ্ট সহ্য করিয়া পরিশেষে স্থির করিলেন যে, আমি অনাহারে মরি তাতে ক্ষতি নাই, কিন্তু শিশুদিগের আর শুষ্ক বদন দেখিতে পারি না। যখন তাহারা "মা খিদে পাইয়াছে" বলিয়া গ্রীবা ধারণ করে, কঠিন প্রাণ তাহা শুনিয়াও দেহে অবস্থিতি করে! এই দুঃখের অবধি হইল না, হইবারও কোন উপায় নাই। তিনি ইতস্ততঃ ভাবিয়া জীবনের ভার পরিশেষ করিবার অভিপ্রায়ে একটা বিষাক্ত সর্প আনাইয়া হাঁড়িতে জল পূরিয়া সিদ্ধ করিতে আরম্ভ করিলেন। মনে মনে স্থির করিয়া রাখিলেন যে, এই বিষাক্ত জল পান দ্বারা আমি নিজের এবং ছেলেকটীর প্রাণনাশ করিয়া ক্লেশের পরিসমাপ্তি করিব। ক্রমে তাঁহার নিদ্রাকর্ষণ হইল। ছেলেগুলিও ঘুমাইয়া পড়িল। এমন সময়ে লক্ষ্মীদেবী সেই স্থান দিয়া গমন করিতেছিলেন। ব্রাহ্মণী প্রাণের জ্বালায় প্রাণ বিনাশ করিবেন স্থির করিয়া প্রাণপণে মা মা বলিয়া প্রাণে প্রাণে ডাকিয়াছিলেন। জগন্মাতা তৎক্ষণাৎ তথায় উপস্থিত হইয়া ব্রাহ্মণীর মুখের দিকে দৃষ্টিপাত করিলেন। ব্রাহ্মণী চাহেন কাঞ্চন। যদিও সর্প ফুটাইতেছিলেন, যদিও স্থূলে তাঁহার বিষের প্রয়োজন ছিল, কিন্তু কাঞ্চন হইতে সেই স্থূলভাব প্রসূত হয় বলিয়া মাতা সূক্ষ্মভাবরূপ কাঞ্চনের প্রতি দৃষ্টি করিলেন, বিষধর ও বিষজল কাঞ্চনে পরিণত হইয়া যাইল। এই জন্য কামিনীকাঞ্চনের সংস্রব রাখিয়া সাধনা করিতে যাইলে কখন আশা ফলবতী হয় না। কখন কি ভাবে যে কি প্রকার ফলদান করে, তাহার কিছুই স্থিরতা নাই।

সঙ্কল্প বা বাসনা এতদূর সাধন পথের বিঘ্ন জন্মাইয়া থাকে। যাহাতে ইহা একেবারে মনের অধিকারবহির্ভূত হইয়া যায়, তাহা

করাই সাধকের কর্ত্তব্য এবং এই প্রকার অবস্থাপন্ন নরনারীই সাধনের অধিকারী এবং অধিকারিনী।

কথায় আছে, "একা রামে রক্ষা নাই, দোসর লক্ষ্মণ"। কামিনী-কাঞ্চনের এক সঙ্কল্পই ভাবরূপে বিভু দরশনে সম্পূর্ণরূপে বঞ্চিত করিয়া রাখিতে পারে, কিন্তু যগুপি তাহাদের কার্য্য হয়, তাহা হইলে আর রক্ষা নাই। যগুপি কামিনীকাঞ্চন সম্ভোগ করা যায়, তাহা হইলে কখন সাধনা পথে পরিভ্রমণ করিতে পারা যায় না। কাঞ্চনসম্ভোগীর মন কাঞ্চনময় হইয়া যায়। কাঞ্চনের বিরহে মন শরীর হইতে বিখণ্ডিত হইয়া পড়ে। যেমন কাহারও জমিদারী হস্তান্তর হইলে তাহার সঙ্গে মনও চলিয়া যায়। সে ব্যক্তি সর্ব্বদাই মর্ম্মপীড়নে অভিভূত হইয়া থাকে। যদ্যপি সে ব্যক্তি সাধন করিতে যায়, তাহা হইলে মন স্থির করিবার কালে জমিদারী তাহাকে দিক্‌ভ্রান্ত করিয়া লইয়া যাইবে। সুতরাং সাধনায় কোন ফল হইবে না।

কামিনীর দ্বারা গুরুতর ব্যাপার সাধিত হয়। কথিত হইয়াছে যে, মস্তিষ্কে মনের স্থান। কামিনী সম্ভোগে মস্তিষ্ক দুর্ব্বল হয়, সুতরাং মানসিক চিন্তা করিবার শক্তি বিলুপ্ত হইয়া থাকে। সঙ্কল্প এবং ক্ষয় দ্বারা মন কিরূপে ক্ষতিগ্রস্ত হয়, তাহার হেতু নিরূপণ করিতে না পারিলে সাধনের অধিকারী বিষয় মীমাংসা হইতে পারে না।

মস্তিষ্ক কি পদার্থ এবং কি প্রকারে জন্মায়, এই সকল বিষয় লইয়া আমাদের আলোচনা করা এ স্থলে অনধিকার চর্চ্চা হইবে। মস্তিষ্কের কার্য্য কলাপ, ঘটনার দ্বারা আমরা কিয়দ্ পরিমাণে বুঝিতে পারি, তজ্জন্য আমি মস্তিষ্কের কার্য্য লইয়া কিঞ্চিৎ বিচার করিব।

আমরা যাহা কিছু চিন্তা করি বা বুঝিতে চেষ্টা করি, তাহা মন, বুদ্ধি এবং অহঙ্কার দ্বারা সমাধা করিয়া থাকি। অহঙ্কার অর্থাৎ আমি

আছি, এই জ্ঞান উপলব্ধি করা মনের কার্য্য, যাহার দ্বারা উপলব্ধি করা যায়, তাহাকে বুদ্ধি বা বিচার কহে। যেমন, আমি গোলাপ ফুল দেখিতেছি। আমি, অহঙ্কার, দেখিতেছি কি? ফুল, ইহা মনের কার্য্য; কি ফুল? এই বিচার, বুদ্ধির দ্বারা সাধিত হয়। সচরাচর আমরা এই তিন ভাবে সকল কার্য্য করিয়া থাকি। যতক্ষণ আমাদের মস্তিষ্ক স্বাভাবিক ভাবে থাকে, ততক্ষণ আমরা অবস্থাসঙ্গত সকল বিষয় লইয়া ভাবিতে পারি, ধারণা করিতে পারি এবং বিচারও করিতে পারি। আমাদের বাল্যাবস্থায় মন, বুদ্ধি এবং অহঙ্কারের কার্য্য আরম্ভ হয়, তাহাও আমরা বুঝিতে পারি। গাছ দেখিলে তাহার ভাব মনে পতিত হয়, আপনি বুদ্ধি আসিয়া বলে এটা কি? যত অহঙ্কারের বৃদ্ধি হয়, ততই মানসিক শক্তি বৃদ্ধি হয় এবং ততই বিচার করিবার, শক্তিলাভ করিবার শক্তি সঞ্চারিত হইয়া থাকে। যেমন, গাছ কি বস্তু, এক সময়ে যে মন ধারণা করিতে পারে না, সেই মন সময়ক্রমে তাহার মহাকারণ পর্য্যন্ত আয়ত্তে আনিতে পারে। যে মন এক সময়ে দুই দু গুণে চারি ধারণা করিতে অসমর্থ হয়, সেই মন গণিতাদির উৎকট গণনায় সুপণ্ডিত হইয়া থাকে। যে মন চন্দ্র সূর্য্যকে সোনারূপার থালা বলিয়া বুঝিয়া থাকে, সেই মন উহাদের গতি বিধি ও অবস্থা সুচারুরূপে জ্ঞাত হইতে পারে। অতএব অহঙ্কার পরিবর্দ্ধনের সহিত মন ও বুদ্ধির পরিবর্ত্তন এবং উৎকর্ষ ও অপকর্ষ সাধন হয়, ইহা স্থূল ঘটনা।

শরীর-তত্ত্বানুসারে অবগত হওয়া যায় যে, মোটের উপর সপ্তমবর্ষ বয়সে প্রায় সকলের মস্তিষ্ক শীঘ্র শীঘ্র বিস্তীর্ণ হইয়া থাকে। তৎপরে ষোড়শ হইতে বিংশতি বর্ষ বয়স পর্য্যন্ত ইহার বৃদ্ধির ক্রম অনেক পরিমাণে কমিয়া আইসে, কিন্তু তথাপি আয়তনে এবং গঠনে বর্দ্ধিত হইয়া

থাকে। এইরূপ পরিবর্ত্তন প্রায় চত্তারিংশ বর্ষ পর্য্যন্ত দেখা যায়। চল্লিশ বর্ষ গত হইলে মস্তিষ্ক ক্রমে কমিতে আরম্ভ হয় এবং দশ বৎসরের মধ্যে উহা স্বভাবতঃ অর্দ্ধ ছটাক ওজনে কমিয়া যায়। সুতরাং ইহার সহিত মানসিক বৃত্তিগুলিও হীনবল হইয়া আইসে। আমরা এক্ষণে যদ্যপি মনুসংহিতার মতে পূর্ব্বকালের ব্রাহ্মণদিগের শিক্ষার ব্যবস্থা তুলনা করিয়া দেখি, তাহা হইলে বুঝিতে পারিব যে, অন্ততঃ ষট্‌-ত্রিংশদ্বর্ষ পর্য্যন্ত গুরুকুলে বাস করিয়া অধ্যয়ন করিতে হইত। তাহার পর, হয় সাধনা, না হয় সংসার। ৩৬ বৎসরের পর পূর্ণ মস্তিষ্ক থাকে, সেই মস্তিষ্কের দ্বারা সাধনা হইবার প্রকৃত সাধকের অবস্থা এবং তজ্জন্য তাঁহারাই সাধনের অধিকারী হইতেন। ৩৬ বৎসরের পর সংসারে প্রবেশ করিলে মস্তিষ্কের পরিবর্দ্ধন তৎকালে স্বল্প হইলেও তাহা স্থগিত হইয়া যায় এবং তৎসঙ্গে হীনবীর্য্য হইলে ৪০ বৎসরের পর মস্তিষ্কের স্বাভাবিক ক্ষয়ের সহিত সঙ্কল্পিত ক্ষয় বৃদ্ধি হইয়া মানসিক বৃত্তি অচি-রাৎ দুর্ব্বল হইবে কি না আর চিন্তা করিয়া দেখিতে হইবে না। ৩৬ বৎসরের পর অন্ততঃ পঞ্চাশবর্ষ পর্য্যন্ত সাধনা করিলে পূর্ণ মস্তিষ্ক প্রাপ্ত না হইবার কোন আশঙ্কা থাকে না, কিন্তু সেই সময় হইতে তাহাকে ক্ষয় করিলে তদ্দ্বারা সাধনা হইবে মনে করা উপহাসের কথা। পুরা-কালে যাঁহারা ব্রহ্মচর্য্যাশ্রম ত্যাগপূর্ব্বক সাধনা করিয়াছেন, তাঁহারাই সমাধিলাভ করিয়া মহাকারণে উপনীত হইতে পারিয়াছেন। যাঁহারা তাহা করেন নাই, তাঁহারা সমাধিস্থ হইতেও পারেন নাই। ব্রহ্মচর্য্যাশ্রম অতিক্রম করিয়া যাঁহারা সাধনায় নিযুক্ত হন, তাঁহাদের মনে কামিনী-কাঞ্চন ভাব থাকে না। তাঁহারা যেমন বালক, বয়োবৃদ্ধ হইলেও তেমনি বালক থাকেন। এই জন্য তাঁহারাই সাধনের একমাত্র অধি-কারী ছিলেন।

উল্লিখিত হইয়াছে যে, অহঙ্কার বৃদ্ধির সহিত মানসিক বল বর্দ্ধিত হইয়া থাকে। এক্ষণে ইহার তাৎপর্য্য জ্ঞাত হওয়া কর্ত্তব্য।

হীনবীর্য্য হইলে মস্তিষ্ক ক্ষয়গ্রস্থ হয়, তন্নিমিত্ত তাহার মানসিক বল দুর্ব্বল হইয়া আইসে বলিয়া অনন্ত ভাবময়কে ধারণা করিতে পারে না বলিয়া এক পক্ষীয় কারণ প্রদর্শিত হইয়াছে। হীনবীর্য্য হইলে যদিও মস্তিষ্কের গঠনের ক্ষয় হয় বটে, এতদ্ব্যতীত আর একটী বিশেষ কারণও আছে।

জীবতত্ত্ব ভেদ করিলে দেখা যায় যে, প্রত্যেক জীব পরমাত্মা হইতে সঙ্কল্প-রূপ স্বতন্ত্র দেহ লইয়া লীলাক্ষেত্রে অভিনয় করিতেছেন। রাম-কৃষ্ণদেব কীট, পতঙ্গ, স্থাবর, জঙ্গম প্রভৃতি দৃশ্য, অদৃশ্য, আনুমাণিক এবং অনানুমানিক সমুদয় পদার্থ এবং অপদার্থকে পরমাত্মার বিকাশ বলিয়া গিয়াছেন। সে যাহা হউক, জীব বলিলে সঙ্কল্পরূপী পরমাত্মা বুঝিতে হইবে।

পরমাত্মা বা ব্রহ্ম যে পর্য্যন্ত কোন প্রকার সঙ্কল্প বা ইচ্ছা না করেন, সে পর্য্যন্ত তিনি এক অদ্বিতীয় ভাবে অবস্থিতি করেন, তখন সৃষ্টি বলিয়া কিছুই থাকে না এবং সৃষ্ট পদার্থ বলিয়াও কিছু থাকে না। যখন পরমাত্মা সঙ্কল্প করেন, সেই সময়ে তিনিই ভিন্ন ভিন্ন রূপে আপনি প্রকটিত হইয়া থাকেন। রামকৃষ্ণদেব বলিয়াছেন, যেমন বালকেরা আপনাপন চক্ষু বস্ত্রাবৃত করিয়া অন্ধের ক্রীড়া করে, বাস্তবিক সে কানা না হইয়াও সাময়িক কানা হয়। কানা হওয়া যেমন সঙ্কল্প হইতে উদ্ভূত হয়, পরমাত্মার জীব হওয়াও তদ্রূপ। অথবা, যেমন যাত্রা বা থিয়েটারাদিতে দেখিতে পাওয়া যায় যে, সকলে আপনাপন স্বাভাবিক অবস্থার ভাবান্তর করিয়া কেহ রাম, কেহ হনুমান, কেহ রাবণের অভি-নয় করে। যে রাম সাজে, সে রাম নহে, তাহা সাময়িক সঙ্কল্পবিশেষ

মাত্র। যেমন কেহ সঙ্কল্পের অনুবর্ত্তী হইয়া কখন দিগম্বর, কখন সাম্বর, কখন হ্যাট কোট পরা, কখন মলিন বেশধারী। বেশাদি সংযুক্ত সেই ব্যক্তির এক অবস্থা এবং বেশ পরিত্যাগ করিলে সেই ব্যক্তির স্বতন্ত্র অবস্থা হইয়া থাকে। সেইরূপ সঙ্কল্পযুক্ত পরমাত্মাকে জীব কহে এবং সঙ্কল্পবিহীন জীবই পরমাত্মা বলিয়া উল্লিখিত হইয়া থাকেন। যেমন দৃষ্টান্তস্বরূপ বায়ু গৃহীত হউক। বায়ু সর্ব্বত্রে এক ভাবে অবস্থিতি করিতেছে, সেইরূপ পরমাত্মা একভাবে সর্ব্বব্যাপী রূপে সর্ব্বত্রে বিরাজ করিতেছেন। বায়ু আধারবিশেষে কার্য্যবিশেষ দ্বারা আখ্যাবিশেষ প্রাপ্ত হইয়া থাকে। যেমন জীবদেহে বায়ুর এক প্রকার কার্য্য, উদ্ভিদ-দেহে সেই বায়ুর কার্য্য স্বতন্ত্র প্রকার। জালা,কলসী, ভাঁড়, গেলাস,ঘর, বাড়ী প্রভৃতি প্রত্যেক বস্তুতে বায়ু রহিয়াছে কিন্তু স্থূল ভাবে দেখিলে পাত্রবিশেষে প্রত্যেকের বায়ু যেন এক নহে বলিয়া প্রতীতি হয়, জালার বায়ুর সহিত ক্ষুদ্র ভাঁড়ের বায়ুকে এক বলিয়া বুঝিয়া লওয়া অজ্ঞানের কর্ম্ম নহে। পরমাত্মার লীলাভাবও তদ্রূপ। তিনি সঙ্কল্প-বিশেষে অবতার রূপে পরিভ্রমণ করেন। এ অবস্থায় তাঁহার চক্ষে যেন এক খানি পাতলা বস্ত্র বাঁধা থাকে। সঙ্কল্পবিশেষে তিনি বিষয় কুম্ভী-রের ন্যায় অর্থাৎ সহস্র সহস্রখানা ক্যাম্বিসের দ্বারা চক্ষু বাঁধিয়া রাখেন। কখন সঙ্কল্প হিসাবে অচল হইয়া এক স্থানে পড়িয়া থাকেন। যেমন আমরা ধনোপার্জ্জন করিতে দেশ দেশান্তরে গমন করিয়া থাকি, দেশান্তরে যাওয়া আমাদের সঙ্কল্পবিশেষ। যত দিন আমরা সঙ্কল্পের উপর সঙ্কল্প করি, ততদিন আর দেশে ফিরিয়া আসা হয় না। দেশান্তরে থাকিয়া পুনরায় নূতন সঙ্কল্প করিলে হয় ত সেই দেশেই চিরস্থায়ী হইতে হয় অথবা তথা হইতে অন্য স্থানে যাইতে বাধ্য হইতে হয়। তথা হইতে পুনরায় সঙ্কল্প বাহির করিলে আর সহজে

দেশে প্রত্যাগমন করা যায় না। অনেকে সঙ্কল্পারূঢ় হইয়া বিলাত যাত্রা করেন। তথায় সেই সঙ্কল্প ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইয়া হিন্দুস্থাননিবাসী হিন্দু ক্রমে সাহেব হইয়া বিবির সহবাসে এতদূর দূরে যাইয়া পড়েন যে, সাক্ষাৎ সম্বন্ধে, যে কারণেই হউক, পুনরায় স্বগৃহে প্রবেশ করা সাধ্যাতীত হইয়া পড়ে। সেই ব্যক্তির ব্যক্তিগত বিশেষ কোন পরিবর্ত্তন হয় না। দুই পদের স্থানে তিনটী কি চারটী পা হয় না, দুই হস্তের পরিবর্ত্তে সংখ্যাতীত হস্ত হয় না, তথাপি তাহার পূর্ব্বাবস্থায় পরিণত হওয়া কঠিন হয় কেন? কেবল সঙ্কল্প। সাহেব হইব, সাহেবের ন্যায় থাকিব, ইত্যাকার সঙ্কল্পের স্রোতে ভাসিয়া যায়, সুতরাং ফিরিয়া আসা একেবারে আশার অতীত কথা হইয়া পড়ে।

যেমন এই এক ব্যক্তি ভদ্রলোকের ন্যায় এখন রহিয়াছেন। সঙ্কল্প উঠিল যে, অমুকের গলায় ছুরি দিয়া কিম্বা অমুককে বিষ খাওয়াইয়া সর্ব্বস্ব আত্মসাৎ করিব। সঙ্কল্প হইবামাত্র তাহা কার্য্যে পরিণত হইয়া গেল। সেই ব্যক্তি তখন খুনের জন্য ফাঁসির দণ্ড পাইল। খুনের পূর্ব্বে যে ব্যক্তি, খুনের পরেও সেই ব্যক্তি। ব্যক্তি সম্বন্ধে কোন প্রভেদ হইল না। কিন্তু যে ব্যক্তি খুন করিবার পূর্ব্বে ছিল, সঙ্কল্প হিসাবে সে ব্যক্তি আর নাই। যেহেতু পূর্ব্বে সে নিরীহ ছিল, এক্ষণে সে খুনী। এই ব্যক্তির অবস্থান্তর ঘটাইবার কারণ সঙ্কল্প। সঙ্কল্পের দ্বারা প্রত্যেক নর নারীর অবস্থার পরিবর্ত্তন হইয়া থাকে। সঙ্কল্পের দ্বারা নর নারী সাধু হয়, সঙ্কল্পের দ্বারা নর নারী খুনী হয়, লম্পট ও বেশ্যা হয়। সঙ্কল্পই যাবতীয় পরিবর্ত্তনের নিদান। সঙ্কল্পের আশ্রয় লইয়া ব্রহ্মেরও সাময়িক অবস্থার পরিবর্ত্তন হয়। এ কথাটা তত্ত্বজ্ঞান ব্যতীত সহসা ধারণা করা যারপরনাই কঠিন। কোন মতে তাহা সহজে বুঝিবার উপায় নাই। ভগবান্ আপনি জীবাদি রূপে পরিণত

হন, এ কথা মনে করিলে পাপ হয় বলিয়া অনেকের ধারণা। সে ধারণা অন্যায় নহে, এবং অনধিকারীর ওরূপ জ্ঞান থাকা অপেক্ষা না থাকা বাঞ্ছনীয়। স্থূল জগতে আমরা নানাবিধ বিরুদ্ধ ধর্ম্মযুক্ত পদার্থ দেখিতে পাইয়া থাকি। আমরা দেখি মনুষ্য, গো, অশ্ব, হস্তী, ছাগ ইত্যাদি। এই জীবগণ কি একজাতীয়? এক জাতীয় না বলিবার দোষ কি? মনুষ্য দেহেও রক্ত মাংস এবং চৈতন্য বিরাজ করিতেছে, গো মহিষাদিতেও অবিকল সেইরূপ পদার্থ সকল আছে,তবে গো,মহিষ এবং মনুষ্যাদি এক শ্রেণীর জীব বলিয়া উল্লিখিত না হইবে কেন? শরীর এবং শারীরিক গঠন ও চৈতন্য বিচার করিলে কেহই স্বতন্ত্র নহে। সকলের শোণিত এক প্রকার, শোণিত হইতে শুক্রের উৎপত্তি, তাহাও এক প্রকার, কার্য্যহিসাবে আকৃতির রূপান্তর হয় মাত্র। সেই কার্য্যের কারণকে সঙ্কল্প কহে। মানুষ যখন গরুর মত সঙ্কল্প করে, তখন তাহাকে তদাকারে পরিবর্ত্তিত হইতে হয়। এইরূপ পরিবর্ত্তন হওয়া সঙ্কল্পের দ্বারা সাধিত হয়। যেমন জল সঙ্কল্পের হিসাবে বরফ এবং বাষ্প হয়। ইচ্ছা করিলে তাহাকে যে কোনরূপে অনন্তকাল পর্য্যন্ত রাখা যায়। সেইরূপ গো মনুষ্য ভগবানের সঙ্কল্পবিশেষের কার্য্য ব্যতীত আর কিছুই নহে। এইজন্য প্রত্যেক জীবই পরমেশ্বরের লীলারূপবিশেষ বলিয়া কথিত হয়।

ভগবানের জৈবাবস্থা আমাদের প্রবাসে বাস করা অথবা চক্ষে বস্ত্রাবরণ দেওয়ার ন্যায় বুঝিতে হইবে। স্বগৃহে প্রত্যাগমন কিম্বা চক্ষুর বস্ত্রোন্মোচন করিলেই সঙ্কল্পের অবসান হইয়া যায়। জীবদিগের পক্ষে মায়াবরণ সরাইয়া সঙ্কল্পের উপসংহার পূর্ব্বক জীবাত্মাকে স্বপ্রকাশ করিতে পারিলেই পরমাত্মার সহিত একাকার হইয়া আইসে। যেমন জালা এবং ভাঁড়ের বায়ু, জালা ও ভাঁড় রূপ আবরণের দ্বারা মূল

বায়ুর স্থানিক স্বতন্ত্র ভাব লক্ষিত হয়, সেই প্রকার দেহমধ্যস্থিত আত্মা পাত্রের বায়ুর ন্যায় জীবাত্মা রূপে পরমাত্মা হইতে পৃথক্ বলিয়া সর্ব্ব প্রথমে জ্ঞাত হওয়া যায়। যেমন জালা-রূপ সঙ্কল্প ভাঙ্গিয়া দিলে জালা-স্থিত বায়ু ভূবায়ুর সহিত একাকার হইয়া যায়। সেইরূপ জীবদেহ হইতে আত্মবুদ্ধি অপসৃত হইলে অর্থাৎ জীব সঙ্কল্পবিহীন হইলে জীবাত্মা আশ্রয়চ্যুত হইয়া পরমাত্মাতে বিলীন হইয়া যান। জীবের দেহ লইয়া সঙ্কল্পের সঞ্চার ও বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়, এই দেহজ্ঞানকে অহঙ্কার বলে। অহঙ্কার দুইরূপে কার্য্য করে। দেহ লইয়া এবং দেহ ছাড়িয়া। দেহ লইয়া যে অহঙ্কার বৃদ্ধি হয়, তাহাকে সঙ্কল্প কহে। এই সঙ্কল্পযুক্ত নর-নারী জীব শব্দে অভিহিত হইয়া থাকেন। দেহ লইয়া সঙ্কল্প করিলে দৈহিক কার্য্যই বর্দ্ধিত হয়। কামিনীকাঞ্চন এইরূপ সঙ্কলের ফলস্বরূপ। কাঞ্চনের দ্বারা সঙ্কল্পের অবসান হয় না, তাহা আমরা অনায়াসে বুঝিতে পারি। আমার অর্থ আছে কিন্তু তাহাতে আমার স্বত্ব নাই, এরূপ ভাবে কেহ কখন কাঞ্চনের সহিত সম্বন্ধ রাখিতে পারেন না। তাহা হয় না, হইবার নহে। রামকৃষ্ণদেব সে সম্বন্ধে আপনি কার্য্য করিয়া শিক্ষা দিয়াছেন। লক্ষ্মীনারায়ণ নামক জনৈক মাড়োয়ারী রামকৃষ্ণদেবকে দশহাজার টাকা প্রদান করিতে মনস্থ করিয়া, কিরূপে এই প্রস্তাব করিবেন, তাহার সুবিধা অন্বেষণ করিতেছিলেন। একদা রামকৃষ্ণদেবের বিছানার চাদর ছিন্ন দেখিয়া লক্ষ্মীনারায়ণ অতি বিনীত ভাবে কহিয়াছিলেন যে, অনুমতি হয় ত আমি আপনার নামে দশ-হাজার টাকার কোম্পানীর কাগজ কিনিয়া দিই। তাহার সুদে আপ-নার সমুদয় খরচ সংকুলান হইবে। রামকৃষ্ণদেব বলিয়াছিলেন যে, দিন চলিয়া যাইতেছে। আমার কোন ক্লেশ হয় নাই। তোমার সাহায্যে প্রয়োজন নাই। লক্ষ্মীনারায়ণ বলেন, আপনার বিছানার

চাদরখানি ছিঁড়িয়া গিয়াছে, কেহ অদ্যাপি পরিবর্ত্তন করিয়া দেয় নাই। আমাদের দেশের প্রথা এই যে, সাধুদিগের নিত্য ব্যয়ের জন্য ধনীরা ব্যবস্থা করিয়া রাখেন। সাধুকে যদ্যপি দৈনিক ব্যয়ের নিমিত্ত চিন্তিত হইতে হয়, তাহা হইলে তাঁহার সাধন ভজন হইবে কিরূপে? অতএব আপনি স্বীকার করুন, আমি কল্যই দশহাজার টাকা লইয়া আসি। রামকৃষ্ণদেব এই বলিয়া আপত্তি করিয়াছিলেন যে, দেখ কাঞ্চনের সহিত সম্বন্ধ স্থাপন করিলেই মন সঙ্কল্পযুক্ত হইবে। এখন আমার মন ভগবানে আছে। আমার ধন নাই, অন্য সম্পত্তি নাই, মন কি লইয়া সঙ্কল্প করিবে? মা কালীর কাছে থাকি, তিনি যখন যাহা ভাল বুঝেন, তাহাই করেন। আমার সঙ্কল্পাদি সকলই মার ইচ্ছা। যদ্যপি তুমি কাঞ্চনের সহিত আমার সম্বন্ধ স্থাপন করিয়া দিতে চাও, তাহা হইলে আমার মন মা কালী হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া তোমার দশ হাজারে আসিবে। অতএব এমন সর্ব্বনাশ করিয়া দিও না। লক্ষ্মীনারায়ণ কহিলেন যে, সাধারণ জীবের পক্ষে সে কথা সম্ভবে, আপনার তাহাতে কি হইবে? যেমন তৈলের সহিত জল মিশাইলে কখন চূড়ান্ত রূপে মিশিয়া যায় না, তৈল জলের উপরে ভাসিয়া থাকে; সেইরূপ যে মন একবার বিষয় হইতে পৃথক হইয়াছে, তাহা আর বিষয়ের সহিত কখন মিশিতে পারে না। রামকৃষ্ণদেব হাসিয়া বলিলেন, যে কথা বলিয়াছ, তাহা সত্য বটে। তৈলের সহিত জল একেবারে মিলিত হয় না। কিন্তু তাহারা একত্রিত হইলে মন রূপ তৈলের সূক্ষ্মকণাসকল জলের সহিত মিশ্রিত ভাবে থাকিতে পারে না? অবশ্যই থাকে। এবং তজ্জন্য জলে তৈলের গন্ধ পাওয়া যায়। অতএব দেখ, তোমার উপমায় তুমিই আমায় শিক্ষা দিলে যে, বিষয়ের সহিত মন মিশ্রিত হইলে কিয়ৎপরিমাণে তাহার হ্রাস হইয়া যায়। দ্বিতীয় কথা এই

যে, তৈল এবং জলের সন্ধিস্থান অচিরাৎ বিকৃত হইয়া আইসে, এবং তৈল ক্রমে পচিয়া যায়। লক্ষ্মীনারায়ণ অপ্রতিভ হইয়া পুনরায় কহিলেন যে. তবে আপনার কোন বিশ্বাসী আত্মীয়ের নামে লিখিয়া দিই। রামকৃষ্ণদেব তাহাতে বিরক্ত হইয়া কহিলেন যে, বেনামা করিয়া বিষয় রাখা অপেক্ষা আত্মপ্রতারণা আর কি হইবে? ইহার দ্বারা মানসিক বিকৃতির আর অবধি থাকিবে না। মনে জানিব আমার অর্থ. লোকের নিকট নির্লোভী পরম সাধু বলিয়া পরিচিত হইবার অভিপ্রায়ে বেনামী করিয়া রাখিয়াছি; ইহার দ্বারা কি আমি অন্ধ এ কথা বুঝিব না? এ প্রসঙ্গ যে রূপে শেষ হয়, তাহা রামকৃষ্ণতত্ত্বে আমি বলিয়াছি। আমাদের অদ্যকারপ্রস্তাব সম্বন্ধে যাহা প্রয়োজন, তাহা উল্লিখিত হইল। কাঞ্চন লইয়া নির্লিপ্ত ভাবে কখন অবস্থিতি করা যায় না! অনেকে জনক রাজার দৃষ্টান্ত দিয়া থাকেন কিন্তু তাঁহারা একবার ভাবিয়া দেখেন না যে, সত্য ত্রেতা দ্বাপর এবং কলি, এই চারি যুগের মধ্যে কয়জন জনক জন্মিয়াছেন? অনেকে সখ করিয়া জনক হন বটে। অনেকে পুত্রাদির প্রতি বিষয়ের ভার দিয়া নির্লিপ্ত ভাবের পরিচয় দিতে চেষ্টা করেন বটে কিন্তু কে তাঁহার অন্তর অনুসন্ধান করিয়া দেখিয়াছেন, কেই বা তাঁহাকে পরীক্ষা করিয়া লইয়াছেন? কাঞ্চন হস্তান্তরে থাকিলেও মনের সম্বন্ধচ্যুত হয় না। লক্ষ্মী নারায়ণ যখন বেনামী করিয়া টাকা রাখিতে পরামর্শ দিয়াছিলেন, তখন রামকৃষ্ণদেব বলিয়াছিলেন যে, আমি জানিব যে আমার টাকা আছে, কাহাকে কিছু অবশ্যই দিতে ইচ্ছা হইবে। অন্ততঃ গাড়ী ভাড়া দিতেও বলিব! এই জন্য রামকৃষ্ণদেব কহিয়াছেন যে, সাধন করিতে হইলে কাঞ্চনের সহিত কোন মতে কোন ভাবে আত্মসম্বন্ধ স্থাপন করা একেবারেই অকর্ত্তব্য। ইহার দ্বারা অহঙ্কার দেহের দিকেই

ধাবিত হইয়া থাকে। সুতরাং ক্রমাগত সঙ্কল্পাবরণ পতিত হইয়া যায়।

কামিনীর দ্বারা অতিশয় অহঙ্কার বৃদ্ধি হয়। ইহাতে দৈহিক ব্যাপারই চূড়ান্ত রূপে সাধিত হইয়া থাকে। দৈহিক কার্য্যের সঙ্কল্প করিতে করিতে মনের সমুদয় শক্তি নিঃশেষিত হইয়া যায়। আমার স্ত্রী, আমার স্বামী বলিলে সঙ্কল্প এবং অহঙ্কার উভয়কেই বুঝায়। এই সঙ্কল্প এবং অহঙ্কার কেবল তথায় সীমাবদ্ধ থাকে না। স্ত্রী পুরুষের অহঙ্কার অর্থাৎ আমরা স্ত্রী পুরুষ বোধ করিয়া সহবাস স্পৃহা রূপ সঙ্কল্প পথারূঢ় হইলে শুক্র স্খলিত হয়। শুক্রে অসীম চৈতন্যবিশিষ্ট কীট-বিশেষ বহির্গত হইয়া থাকে। এই কীট দ্বারা সন্তান জন্মে। এই নিমিত্ত সন্তানকে অহঙ্কার বা সঙ্কল্পপ্রসূত পদার্থ কহে।

কথা হইতে পারে, যে স্থানে সেরূপ সঙ্কল্প নাই, যে স্থানে কেবল ইন্দ্রিয় চরিতার্থই সঙ্কল্প হয়, তথায় অনিচ্ছাসত্ত্বে সন্তান জন্মিলে তাহাকে সঙ্কল্পের কার্য্য বলা যাইবে না কি?

যদিও সন্তানকে সাক্ষাৎ সম্বন্ধে এ স্থানে সঙ্কল্পিত কার্য্যপ্রসূত না বলা হউক কিন্তু পরম্পরা সঙ্কল্প অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে। যেহেতু স্ত্রী পুরুষ সংযোগ সঙ্কল্পের আশ্রয়ীভূত। সে যাহাহউক, সঙ্কল্প ব্যতীত অহঙ্কারের বিশেষ কার্য্য দেখিতে পাওয়া যায়। শুক্র অহঙ্কারের মূর্ত্তি-বিশেষ। এই নিমিত্ত সন্তানাদিকে আত্মজ ও আত্মজা কহা যায়। অর্থাৎ আত্মা হইতে জন্মায় বলিয়া তাহারা এই নামে সুপ্রসিদ্ধ। সাধন ভজন আত্মকল্যাণ অকল্যাণ এই স্থানেই সম্পূর্ণ নির্ভর করে। অতএব এই বিষয়টী বুঝিয়া লওয়া সকলের কর্ত্তব্য।

অনেকে মনে করেন যে, এইরূপ প্রসঙ্গকে অশ্লীল বলে কিন্তু তাহা মনে করাই অশ্লীলতা। ভিত্তির সুব্যবস্থা না হইলে তদুপরি বৃহৎ

অট্টালিকা নির্ম্মান করা যায় না, সেইরূপ কামিনী প্রসঙ্গে ভঙ্গ দিয়া সাধনার অধিকারী নিরূপণ করিতে যাওয়া বিড়ম্বনা মাত্র। সে যাহা হউক, এক্ষণে স্থির করিতে হইবে যে, শুক্র ক্ষয়ের দ্বারা কিরূপে সঙ্কল্পের বৃদ্ধি এবং অহঙ্কার হ্রাস হয়।

বলা হইয়াছে যে, সঙ্কল্পের দ্বারা ইন্দ্রিয়াসক্ত হইতে হয়, একথায় আর সন্দেহ নাই এবং শুক্র বহির্গমনের দ্বারা আত্মার অংশবিশেষ শরীর হইতে সঙ্কল্পসূত্রেই বহির্গত হইয়া যায়। যাহারা কিছুদিন কামিনী সম্ভোগাদি দ্বারা সঙ্কল্পের পর্য্যবসান করিয়া মনে করেন, এইবার সাধনা করিব, তাহাতে তাঁহাদের আত্মপ্রতারণা হইয়া থাকে। যদিও সাক্ষাৎ সম্বন্ধে সঙ্কল্পের বিরাম হয় বটে কিন্তু শুক্র ক্ষয়ের দ্বারা যে সংখ্যাতীত অহঙ্কার বা আত্মার অংশ বাহির হইয়া গিয়াছে, সেদিকে দৃষ্টি রাখেন কে?

কথিত হইয়াছে যে, প্রত্যেক নরনারী সঙ্কল্পের আবরণে কার্য্যক্ষেত্রে জৈবলীলা সম্পাদন করিতেছেন। যতদিন জৈবলীলার সঙ্কল্প বাড়িবে, তত দিন স্বস্বরূপে গমন অথবা তদবস্থা লাভ হইতে পারে না। কামিনীর দ্বারা সেই সঙ্কল্পের বৃদ্ধি হয়, অতএব সাধনের অধিকারী হইতে হইলে সঙ্কল্প রঙ্গভূমির যবনিকা নিপতিত করিতে হইবে।

এই স্থানে আর একটী কথা জিজ্ঞাস্য হইতে পারে। বলা হইয়াছে যে, শুক্রে অসীম চৈতন্যবিশিষ্ট কীট বহির্গত হয় এবং ইহাদের দ্বারা জীব জন্মিয়া থাকে। শুক্রের মধ্যে এই কীটেরাই বাস্তবিক সন্তানোৎপাদনের নিদান। তদ্বিষয়ে কোন কথা নাই। শুক্র দ্বারা আত্মা দেহ ধারণ করেন। শুক্ররূপী আত্মা সর্ব্ব সময়ে দেহ লাভ করিতেও পারেন না। তাহার হেতু এই, যেমন বীচ মৃত্তিকা ব্যতীত বৃক্ষে পরিণত হয় না। তেমনি জরায়ুস্থিত ডিম্ববৎ স্থান না পাইলে শুক্রস্থিত আত্মা

দেহ লাভ করিতে পারেন না। যে সময়ে এইরূপ সংঘটনা না হয়, তাহারা অন্য রূপে অবস্থিতি করেন। যদিও শুক্রস্থিত কীটগুলিকে মরিয়া যাইতে দেখা যায়, কিন্তু বাস্তবিক তাহাদের চৈতন্য বিনষ্ট হয় না। যেমন মানুষ মরিয়া যাইলে তাহার শব দেহ পতিত থাকে, কীটদিগের সম্বন্ধেও তাহাই অনুমান করিতে হইবে তাহারা জরায়ুর ডিম্ববৎ পদার্থ পাইলে তথায় বর্দ্ধিত হইয়া থাকে। যদ্যপি তাহা না পায়, তাহা হইলে যে কি ভাবে তাহারা অবস্থিতি করে, তাহার মীমাংসা করা অতিশয় দুরূহ ব্যাপার। রামকৃষ্ণদেব বলিয়াছেন যে, তিনি রসের সাধনা করিয়াছিলেন। যদ্যপি কেহ রসিক থাকেন, তিনি তাহা বুঝিয়াছেন। কিন্তু সাধারণে তাহার অভ্যন্তরে প্রবেশ করিতে পারিবেন না। এই সাধন অতিশয় গুহ্যতম। যাহাতে সাধারণে তাহা না জানিতে পারেন, এমন সাবধানে সাধকেরা নিজ নিজ ভাব গোপন করিয়া রাখেন ; আমার তাহা প্রকাশ করিয়া দেওয়া উচিত নহে। তজ্জন্য আমি অনেক সময়ে গুপ্ত সাধন বলিয়া উহা উল্লেখ করিয়াছি। কিন্তু কি করিব অদ্য অনন্যোপায় হইয়া তাহা সাধারণের সমক্ষে প্রকাশ করিতে বাধ্য হইয়াছি। একথা প্রকাশ হইলে ক্ষতি অপেক্ষা লাভের পরিমাণ অধিক হইবে। রসের কাজ বলিয়া এই সাধনা প্রসিদ্ধ। ইহাতে শোণিত, শুক্র, মল, মূত্র এবং মুখের লাল, এই পাঁচ প্রকার রসের দ্বারা সাধকেরা সাধনা করেন। এই সাধনায় অবশ্য কোন প্রকার উদ্দেশ্য সাধন হয়, তাহার সন্দেহ নাই। কোন্ শ্রেণীর সাধকেরা এই প্রকার সাধন করেন, তাহা আমি বলিব না। রামকৃষ্ণদেব ভারতবর্ষীয় প্রচলিত সমুদয় সাধনা সম্পন্ন করিয়া গুপ্ত সাধনের মধ্যে কতকগুলি বাদ দিয়া কতকগুলি সাধন করিয়াছিলেন। এই রসের সাধনের সময় তিনি বলিয়াছেন যে, তিনি যখন শুক্রের

সাধনা করেন, অবশ্য তিনি অন্যান্য সাধকের ন্যায় নিজ শরীর হইতে শুক্র বাহির করেন নাই, তিনি যেমন সকল সাধনার পূর্ব্বে আদ্যাশক্তি কালীকে জিজ্ঞাসা করিতেন, এ সম্বন্ধেও তিনি সেইরূপ ব্রহ্মময়ীকে জিজ্ঞাসা করিবামাত্র তিনি প্রত্যক্ষ করিলেন যে, যেন শুক্রের প্রবাহ চলিয়া আসিতেছে। তিনি তাহা দর্শন করিয়া অতিশয় আনন্দিত হইতে লাগিলেন। ক্রমে তাঁহার চতুর্দ্দিকেই সেইরূপ প্রবাহ দেখিতে লাগিলেন এবং অতি অল্পক্ষণের মধ্যে তিনি শুক্রে নিমজ্জিতপ্রায় হইয়া উঠিলেন। তিনি বলিতেন যে, শুক্র নদীতে তাঁহার কণ্ঠ পর্য্যন্ত ডুবিয়া গিয়াছিল। তিনি যখন শুক্রের দিকে দৃষ্টিপাত করেন, তখন তিনি তাহা চৈতন্য বলিয়া প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন। এই নিমিত্ত যে সঞ্চালিত চৈতন্য শুক্ররূপে বহির্গত হয়, তাহা সঙ্কল্পবিশেষে অবস্থিতি করেন।

শুক্রস্থিত সচেতন কীটগুলি যখন শরীর হইতে বাহির হইয়া যায়, সুতরাং তখন সেই ব্যক্তির আত্মা অংশ হইয়া যায় বলিতে হইবে কিন্তু আত্মার অংশ হয় কিরূপে? সন্তানাদিতে দেখিতে পাওয়া যায় যে, পিতা মাতার আকৃতির আভাস এবং স্বভাব ও ব্যাধি প্রভৃতি নানা প্রকার ভাব প্রকাশ পাইয়া থাকে। এস্থলে কি কহা যাইবে?—অংশ শব্দই প্রয়োগ হয়। অংশ বলিলে আমরা কোন বস্তুর খণ্ড বুঝিয়া থাকি, কিন্তু সন্তানাদি সম্বন্ধে তদ্রূপ নহে। যেমন একটী দীপ হইতে সহস্র দীপ জ্বালান যাইতে পারে। আদি দীপ তাহাতে বিখণ্ডিত হয় না। যদিও এই দীপের দৃষ্টান্তে বুঝা যায় যে, আদি দীপটী নিবিয়া যাইলে অন্যান্য দীপ যে তদ্‌সহ নিবিয়া যাইবে, তাহা নহে। আদি দীপ যদিও তাহার ভাবে জ্বলিতে পারে, নাও জ্বলিতে পারে এবং তৎপ্রসূত দীপের সহিত স্থূলে বিশেষ সম্বন্ধ দেখা যায় না। কিন্তু সূক্ষ্ম দৃষ্টিতে আদি দীপের সহিত প্রত্যেক

দীপের সম্বন্ধ দেখিতে পাওয়া যায়। এই দীপ হইতে অসংখ্য প্রকার শাখাদীপ জ্বলিতে পারে, তাহাদের সহিতও আদি দীপের দুর সম্বন্ধ স্বীকার করিতে হইবে। সেইরূপ মনুষ্যদিগের পুত্র, পৌত্র, প্রপৌত্র এবং অন্যান্য শাখা প্রশাখা সম্বন্ধ যতদিন স্থূল পৃথিবীতে থাকিবে, ততদিন তাঁহার সাধনে অধিকার জন্মিতে পারে না! যেমন, একজন টাকা কড়ির দেনা পাওনা করিতেছেন। তিনি কি মনে করিলেই দেশান্তরে চলিয়া যাইতে পারেন? তাঁহার প্রাপ্য টাকা না হয় তিনি ছাড়িয়া দিতে পারেন, কিন্তু পাওনাদারেরা ছাড়িয়া দিবে কেন? তেমনি সন্তান, সন্ততি, পিতা, মাতা, প্রতিবাসী, প্রত্যেকের নিকট প্রত্যেকের দায়িত্ব আছে। বিশেষতঃ সন্তানসন্ততি, স্ত্রী এবং পিতা-মাতার ঋণ সহজে পরিশোধ হয় না। সেই ঋণ শোধ না করিলে কস্মিন্‌কালে মুক্তিলাভ করা যায় না, মুক্তিলাভ করিতে না পারিলে সাধন কার্য্যে নিযুক্ত হওয়া কেবল পণ্ডশ্রমমাত্র।

সঙ্কল্পের দ্বারা আত্মার কিরূপ অবস্থা হয়, রামকৃষ্ণদেব একটী সামান্য উদাহরণ দ্বারা ব্যক্ত করিয়া গিয়াছেন। একটী মোহরকে ষোল অংশ করিতে হইলে ষোল খণ্ড না করিয়া ১৬ টাকার দ্বারা তাহা সমাধা করা যায়। ষোল টাকার মূল্য যাহা, একটী মোহরের মূল্যও তাহা। ষোল টাকাকে পয়সার ভাগ করিলে ১০২৪ খণ্ড হইবে। সেই এক হাজার চব্বিশ খণ্ডের মূল্য যাহা, ষোল টাকার মূল্যও তাহা এবং একখানি মোহরের মূল্যও তাহা। যদ্যপি এক হাজার চব্বিশ পয়সাকে কড়িতে পরিণত করা যায়, তাহা হইলে এক পয়সায় ২৫ গণ্ডা ধরিলে ১০২৪০০ এক লক্ষ দুই হাজার চারি শত খণ্ড হইবে। এই সমুদায় কড়ির মূল্য এক খানি মোহরের সমান। মোহর স্বর্ণের অংশবিশেষ। মূল সোণা পরমাত্মা এবং মোহর জীবাত্মার স্বরূপ।

সোণা যেমন সঙ্কল্পানুসারে মোহর, টাকা, পয়সা এবং কড়িতে বিস্তীর্ণ হইয়া পড়িল, সেইমত পরমাত্মাও জীবাত্মার পুত্র পৌত্রাদি এবং অন্যান্য নানা প্রকার সঙ্কল্পে বিভাজিত হইয়া পড়েন। এক টাকায়, একটী পয়সায় অথবা এক কড়া কড়ির দ্বারা মোহর পূর্ণ হয় না, সেইরূপ সঙ্কল্প বিস্তারিত করিয়া কোন নরনারী সাধনের অধিকারী বা অধিকারিণী হইতে পারেন না, পয়সা বা কড়ি মোহরের অংশবিশেষ বটে, কিন্তু তাই বলিয়া সে একাকী মোহরত্বলাভ করিতে পারে না; পয়সা মোহরের অংশ বটে কিন্তু তাহার মূল্যের সহিত মোহরের তুলনা হয় না। একটী টাকা মোহরের অংশ বটে, তাহা অস্বীকার করা যায় না, কিন্তু উহা মোহর নহে, সেই প্রকার সঙ্কল্পবিশিষ্ট নরনারী সম্পূর্ণরূপে পূর্ণত্বহীন সুতরাং কিরূপে তাঁহারা মহাকারণে গমনের অধিকারী ও অধিকারিণী হইবেন।

সঙ্কল্পবিবর্জ্জিত না হইলে আত্মার পূর্ণত্ব রক্ষা হয় না। কামিনী-কাঞ্চনকেই সঙ্কল্প কহে, অতএব যাহার কামিনীকাঞ্চন ভাব না থাকিবে, সেই নরনারীই সাধনের অধিকারী এবং অধিকারিণী।

কথিত হইয়াছে যে, মহাকারণে অর্থাৎ পরমাত্মাতে মিলিত হওয়া জ্ঞান মার্গের উদ্দেশ্য। জ্ঞান মার্গে স্থূল, সূক্ষ্ম এবং কারণ অতিক্রম করিয়া যাইতে হয়। স্থূলে সম্পূর্ণ সঙ্কল্পের কার্য্য হইয়া থাকে, স্থূলে বসিয়া সূক্ষ্ম এবং কারণের অনুশীলন হইতে পারে বটে কিন্তু তাহার কার্য্য হওয়া একেবারেই অসম্ভব।

কড়ি হইয়া মোহর হওয়া যায় না, তেমনি কামিনীকাঞ্চনে লক্ষ-ভাগে বিভক্ত হইয়া আত্মার পূর্ণত্ব সমাধান পূর্ব্বক কিরূপে পরমাত্মার সন্নিধানে যাইবার যোগ্যতা লাভ হইবে? অতএব সাধনে ব্রতী হইতে হইলে কামিনীকাঞ্চন ভাব হইতে এককালে সম্যকরূপে

বিমুক্ত হইতে হইবে। এরূপ নরনারী ব্যতীত অন্যের সাধনে অধিকার নাই।

দ্বিতীয় প্রকার অর্থাৎ ভক্তি মার্গের সাধনেও কামিনীকাঞ্চন ভাব সত্ত্বে তাহা সাধিত হইতে পারে না। যে হেতু যে সকল অবতার বা দেবদেবীর অর্চ্চনা বা সাধনা করা যায়, তাঁহারা এক্ষণে লীলা রূপে উপস্থিত নাই। শ্রীকৃষ্ণকে লাভ করিতে হইলে তাঁহার সাধনা করা চাই। কিরূপে এবং কে তাঁহাকে সাধনা করিবে? তাহাকে ধ্যান করিতে হইবে, তাঁহার নাম জপ করিতে হইবে, তাঁহার গুণগাণ বা ভজনা করিতে হইবে। এই সকল কার্য্যেই মানসিক বলের প্রয়োজন কিন্তু সে মন কোথায়? মন কামিনীকাঞ্চনে বিভক্ত হইয়া গিয়াছে; মন স্থির হইবে না, সাধনা হইবে কিরূপে? সাধন কার্য্য মনের, হাত পায়ের বা মুখের নহে। অনেকে হাতে মালা জপ করেন কিন্তু মুখে রাজা উজীর মারিয়া বেড়ান, সে জপের লাভ কি? এই প্রকার সাধনের দ্বারা কি কেহ অদ্যাপি শ্রীকৃষ্ণের দর্শন লাভ করিয়াছেন? যদ্যপি ভগবানের লীলা রূপ দর্শন করিতে না পারা যায়, তাহা হইলে সাধন করা না করা সমান ফল। প্রভু বলিতেন যে, "গৌরাঙ্গ বলেন শুন নিত্যানন্দ ভাই। সংসারী জীবের গতি কোন কালে নাই॥" কামিনীকাঞ্চনে বিক্রীত দাস যাঁহারা, তাঁহাদের না নিত্য, না লীলা, কোন মার্গেই পরিভ্রমণ করিবার অধিকার নাই।

এক্ষণে কথা হইতেছে যে, এত লোকে ত্রিসন্ধ্যা করিতেছেন, এত লোকে সাধন ভজন করিতেছেন, এত লোকে ভগবানের নাম অবলম্বন পূর্ব্বক মাতিয়া রহিয়াছেন, ইঁহারা সকলেই সংসারী, সকলেরই কামিনী-কাঞ্চন সম্বন্ধ আছে, তাঁহাদের কি হইতেছে, তাঁহারা কোথায় যাইতে-ছেন? কামিনীকাঞ্চনের ভাব সত্ত্বে সাধনে অধিকার হয় না, ইহা

চিরপ্রসিদ্ধ বিধি, তাহা কেহ কখন খণ্ডন করিয়া যাইতে পারেন নাই। অদ্য নূতন ব্যবস্থা হইবে কেন? সত্য যুগে মানবেরা কামিনীকাঞ্চন পরায়ণ ছিলেন না, তাঁহারা সেইজন্য সাধনের অধিকারী ছিলেন এবং যুগধর্ম্মে তাহাই ব্যবস্থা ছিল। ত্রেতা, দ্বাপর এবং কলিতে ধ্যানের উল্লেখই নাই। তদ্দ্বারা অধিকারীর ইতর বিশেষ বুঝাইতেছে। সত্যতে যে সাধনার ব্যবস্থা ছিল, সত্যতে যে নিয়মাদি প্রতিপালন পূর্ব্বক সমাধি মন্দিরে প্রবেশ করিবার অধিকার হইত, এক্ষণে সেই অবস্থা লাভ করিবার অন্ততঃ মনে স্থান দিতে পারে, এমন ব্যক্তির অভাব। ভগবানের নিয়ম পরিবর্ত্তনশীল নহে। যে নিয়মের দ্বারা যে ফল ফলে, তাহা সেই নিয়মে চিরকাল চলিয়া থাকে। স্থূল ত্যাগ করিয়া মহাকারণে যাইতে হয়, ইহা তখন এবং এখন সমান ভাবে আছে। যে ভাবে তখন কার্য্য হইত, সে ভাব না হইলে এখন সেই কার্য্য হইবে কিরূপে? কার্য্যের দ্বারা ফললাভ হয়। যেমন কার্য্য, তাহার ফলও তদ্রূপ হইয়া থাকে। তখনকার সময়ে কামিনীকাঞ্চন বুদ্ধি যাহার না থাকিত, তিনিই পরমাত্মা লাভ করিতেন। কিন্তু এই ঘোর কলিকালে কামিনীকাঞ্চনে সিদ্ধ হইয়া পরমাত্মা লাভ করিবেন বলিয়া ধারণা হওয়াও আশ্চর্য্যের বিষয়।

রামকৃষ্ণদেব সাধনের অধিকারী সম্বন্ধে যাহা বলিয়া গিয়াছেন, তদ্দ্বারা এই বুঝা যাইতেছে যে, বর্ণ হিসাবে সাধনার অধিকারী বিষয় নির্দ্ধারিত হয় নাই। কামিনীকাঞ্চনে বিভাজিত না হইলে সাধন সম্বন্ধে ব্রাহ্মণের যে অধিকার, একজন নিকৃষ্ট শূদ্র অথবা যবন, কিম্বা ম্লেচ্ছেরও সেইরূপ অধিকার, ব্রাহ্মণ যদ্যপি অবিশ্বাসী হন, যদ্যপি মিথ্যা-বাদী হন, যদ্যপি লম্পট হন, যদ্যপি মাতাল হন, যদ্যপি প্রতারক হন, তাহা হইলে কি তিনি সাধন করিতে অধিকারী হইবেন? ব্রাহ্মণ

নৈয়ায়িক হইতে পারেন, দার্শনিক হইতে পারেন, বৈজ্ঞানিক হইতে পারেন, পৌরাণিক হইতে পারেন কিন্তু তাঁহাকে সাধনের অধিকারী বলা যাইতে পারে না।

অনেকের মনে এই সংশয় হইতে পারে যে,এখন এমন জাপক ব্রাহ্মণ আছেন, এখন এমন হোতা আছেন, এখন এমন গ্রহ যাগ যজ্ঞাদিদক্ষ ব্রাহ্মণ আছেন যে, তাঁহাদের দ্বারা গৃহস্থের শান্তি বিধান হয়। ইহা ব্রাহ্মণের দৈবশক্তি ব্যতাত আর কি বলা যাইবে? এই প্রকার শক্তি সম্পন্ন হইবার যে সাধনা, তাহাদের প্রকৃত পক্ষে সাধনা বলা যায় না। ভগবান্ এবং ভগবানের ঐশ্বর্য্য সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র পদার্থ। রামকৃষ্ণদেব বলিতেন যে, রাজার সহিত আলাপ করিতে কে চাহে? রাজার বাগান দেখিয়া, বাগানের পরী দেখিয়াই সকলের মাথা ঘুরিয়া যায়। অর্থাৎ যাঁহার সিদ্ধি শক্তি সঞ্চার হয়, তিনিই অমনি আপনাকে সর্ব্বোচ্চ জ্ঞান করিয়া সেই অভিমানেই স্ফীত হইয়া পড়েন। আর ভগবানের দিকে যাওয়া ঘটিয়া উঠে না। যিনি জপ করিয়া ভগবান্‌কে কিঞ্চিৎ প্রসন্ন করিতে পারিয়াছেন, তিনি ভগবান্‌কে ভুলিয়া সেই প্রসন্নতা অর্থের নিমিত্ত অপরকে বিক্রয় করিতেছেন। যিনি যাগ যজ্ঞের দ্বারা যজ্ঞেশ্বরের আসন টলাইতে পারিয়াছেন, তিনি অর্থের অনুরোধে তাঁহাকে যত্ন পূর্ব্বক অন্য স্থানে লইয়া যাইতেছেন। এ স্থলে তাঁহাদিগকে সাধনের অধিকারী বলা যাইবে কিনা, তাহা চিন্তা করিয়া দেখিলেই বুঝা যাইবে। কার্য্যক্ষেত্রে দেখা যায় যে, রামকৃষ্ণদেব যাহা বলিয়া গিয়াছেন, তাহা ব্যতীত অন্যের সাধনার অধিকার নাই। রামকৃষ্ণদেব সাধনের অধিকারী সম্বন্ধে যাহা কহিয়া গিয়াছেন, তাহা তাঁহার অভিনব মত নহে, এই কথা তিনি চারিযুগ বলিয়া আসিতেছেন, ভাবিয়া দেখিলে নূতন কিছুই বলেন নাই। সাধক এবং গৃহীর এক জাতীয়

অবস্থা নহে। সাধকের জীবনের লক্ষ্য স্বতন্ত্র, গৃহীর জীবনের লক্ষ্য স্বতন্ত্র, সাধক আত্মা ও পরমাত্মাকে স্বপ্রকাশ করিতে চাহেন, গৃহী আত্মাকে সহস্র সহস্র হস্ত পরিমিত মৃত্তিকাগর্ভে নিক্ষেপ করিতে চাহেন। সাধক মহাকারণে গমন করিবার জন্য প্রস্তুত হইয়া থাকেন, গৃহী স্থূলের স্থূলে বিচরণ করিবার ব্যবস্থা করেন। সাধক সঙ্কল্পের মস্তকে অশনি নিপাতন পূর্ব্বক পূর্ণাত্মা হইয়া পরম ব্রহ্মে বিলীন হন, গৃহী অসংখ্যক সঙ্কল্পের বশবর্ত্তী হইয়া পৃথিবীমণ্ডলে নানারূপে নানা ভাবে বিহার করিয়া থাকেন। অতএব সাধক এবং গৃহীর ভাব এক স্থানে থাকিতে পারে না। সাধকেরা গৃহী হইতে পারেন না এবং গৃহীরা সাধক হইতে পারেন না। এই কথা বলিলে অনেকে জনকের উপমা দিয়া থাকেন; কিন্তু সে উপমা গৃহীদিগের মনের ছলনা মাত্র। চারিযুগের মধ্যে জনক ব্যতীত দ্বিতীয় গৃহী সাধকের কথা প্রকাশ নাই, তখন সে কথা সর্ব্বসাধারণে প্রয়োগ হইতে পারে না।

তবে অধিকারী কে? পুরাকালে কামিনীকাঞ্চন-ত্যাগী অর্থাৎ বাল-সন্ন্যাসী হইয়া যে কেহ কঠোর তপশ্চারণ করিতে পারিতেন, তাঁহারাই সাধনের অধিকারী হইতেন, এই জন্য ব্রাহ্মণই তপঃ কার্য্যের এক অদ্বিতীয় অধিকারী ছিলেন। তাঁহারাই প্রথমাবস্থায় অধ্যয়ন করিয়া যুবাকালে সন্ন্যাসী হইয়া পরমাত্মা ধ্যানে নিযুক্ত থাকিতেন। তাঁহাদের মস্তিষ্ক বলবান থাকিত, তাঁহাদের শুক্রক্ষয় দ্বারা সঙ্কল্প বাহির হইত না এবং কাঞ্চনের নিমিত্ত মানসিক চিন্তা অথবা সংস্কারবিশেষ লাভ হইত না, সুতরাং পূর্ণ মন থাকিত। তাঁহাদের মনে পৃথিবীর কোন ভাব অধিকার পাইত না। এইরূপ ব্রাহ্মণ ব্যতীত গৃহী ব্রাহ্মণেরা কখন সমাধি লাভ করিতে পারেন নাই; রামকৃষ্ণদেব বর্ত্তমান কালে পাত্র বিচার করিয়া বলিয়া গিয়াছেন যে, কেবল কামিনী-

কাঞ্চনের সংস্কার এবং সঙ্কল্প হইতে যে কেহ স্বতন্ত্র হইয়া থাকিতে পারিবেন, তিনিই সাধনের অধিকারী হইবেন।

কেবল কামিনীকাঞ্চনের দ্বারা অধ্যয়ন ও যোগ প্রক্রিয়াদির কার্য্য কমাইয়া দিয়াছেন, কারণ পরমায়ু অল্প, অধ্যয়নাদিতে সময় অতিবাহিত হইয়া যাইলে সমাধি লাভের বিলম্ব হইবে। তিনি জ্ঞান পন্থায় সাধক হইয়া দেখাইয়াছেন যে, কামিনীকাঞ্চনবিরহিতচিত্ত হইয়া অনুরাগে ভগবান্ চিন্তা করিলে তিন দিবসে সমাধি লাভ অর্থাৎ জীবাত্মা ও পরমাত্মা একীভূত হইতে পারে। জীবের পক্ষে তিন দিন না হউক, তাঁহার শ্রীমুখের কথায় অন্ততঃ বারো ক্ষণ, বারো দিন, বারো মাস বা বারো বৎসর নির্দ্ধারিত হইয়াছে।

তবে কি গৃহী হইলে সাধনের অধিকার একেবারে হয় না? গৃহীদিগের সাধনা শব্দ মুখে বাহির হইলে বাচালতা প্রকাশ পায়? যেমন ছোট ছোট ছেলেরা মাথায় পাগড়ী বাঁধিয়া কানে কলম গুঁজিয়া আফিসে যাইবার অভিনয় করে, অথবা রঙ্গালয়ে সাধু মহান্তের কিম্বা বাদশাহের অভিনয় হয়; গৃহী হইয়া সাধনা করাও তদ্রূপ। গৃহী বলিলে কামিনীকাঞ্চনশ্রেণীভুক্ত ব্যক্তিকে বুঝায়। এ কথা স্মরণ রাখিতে হইবে যে, ব্রাহ্মণ হউন, ক্ষত্রিয় হউন, বৈশ্য হউন, আর শূদ্র হউন—সকলেরই এক দশা। শাস্ত্রজ্ঞ হইলে পণ্ডিত কহা যায়, শাস্ত্রজ্ঞানবিহীন হইলে মূর্খ বলে। এই দুই অবস্থায় কেহই সাধক বলিয়া পরিগণিত হইতে পারেন না। মোক্ষমূলার শাস্ত্রজ্ঞ বটেন, তাই বলিয়া কি তিনি সাধক? সেই প্রকার আমাদের দেশের পণ্ডিতেরা শাস্ত্রজ্ঞ বটেন, কিন্তু সাধক নহেন। যেহেতু, তাঁহারা কামিনীকাঞ্চনের উপাসক।

গৃহী অর্থাৎ কামিনীকাঞ্চনের দাসত্ব করিয়া আত্মার উৎকর্ষ সাধন হয় না। কি করিলে আত্মা স্বপ্রকাশ হয়, কিরূপে তাহা রক্ষা হয়,

গৃহী কিরূপে জানিবেন? এই জন্য বর্ত্তমান কালে গুরুকরণ দ্বারা কোন ফল ফলিতেছে না। গুরু যাহা জানেন, শিষ্যও তাহা জানেন। শিষ্য অপেক্ষা গুরু না হয় কয়েকটী সংস্কৃত শ্লোক জানেন, তাহা দ্বারা বিশেষ ক্ষতি বৃদ্ধি হয় না। রামকৃষ্ণদেব তন্নিমিত্ত বলিতেন যে,

আম্‌লি কর্‌কে করে ধ্যান
গৃহী হোকে বাতায় জ্ঞান ;
যোগী হোকে কুটে ভগ্‌
এ তিন আদ্‌মি কলিকা ঠগ্‌।

অর্থাৎ নেশা করিয়া ধ্যান করা, গৃহী হইয়া জ্ঞানগর্ভ উপদেশ দেওয়া, যোগী হইয়া কামিনী সেবা করা, এই প্রকার স্বভাববিশিষ্ট ব্যক্তিরা কলিকালের জুয়াচোর। যাঁহারা নেশা করিয়া ঈশ্বর সাধনা করেন, তাঁহাদিগকে কলির ঠগ্‌ বলা হইয়াছে। তাহার হেতু কি? চিত্ত স্থির করা সাধনের উদ্দেশ্য। কিন্তু সংস্কার এবং সঙ্কল্পগ্রস্থ চিত্ত পূর্ণ হইবে কিরূপে? ধ্যান করিতে বলিলেই নানা দিকে ছুটিয়া বেড়ায়। মনের এই চাঞ্চল্য নিবারণের নিমিত্ত সাধকশ্রেণীবিশেষে গাঁজার ধূম এবং মদিরিকা পানের আধিক্যতা দেখা যায়। এই সাধকেরা যদিও সাধনা করেন বটে কিন্তু অন্তর অপরিস্কার এবং ভাব অপ্রস্ফুটিত থাকে বলিয়া সে সাধনায় বিপরীত ফল জন্মায়। ভগবানের দিকে অগ্রসর হওয়া দূরে থাকুক, তাঁহাদিগকে ঠগ্‌ শ্রেণীভুক্ত হইয়া যাইতে হয়। তাহার কারণ এই যে, সে স্থানে ভাবের ঘরে চুরি হইয়াছে। বাহিরে যাহা তাঁহারা প্রকাশ করেন, ভিতরে তাহা নহে। এই প্রকার সাধক-দিগের পতন সঙ্কল্পের নিমিত্তই হয়। অতএব সঙ্কল্পবিবর্জ্জিত হওয়া সাধকের লক্ষণবিশেষ। গৃহী যাঁহারা, তাঁহাদের সঙ্কল্পের অবধি নাই। তাঁহারা কামিনীকাঞ্চনের সহিত আত্মার সম্বন্ধ স্থাপন পূর্ব্বক অবস্থিতি

করিয়া থাকেন, সেই অবস্থায় যদ্যপি তাঁহারা কামিনীকাঞ্চন মিথ্যা বলিয়া প্রচার করেন, তাহা হইলে তাঁহাদিগকে ঠগ্ ভিন্ন অন্য নামে বাস্তবিক উল্লেখ করা যায় না। মুখে বলিলাম যে, দেখ সংসার ভ্রম, দারা পুত্রাদি কেহ কাহার নহে। স্ত্রী অসুস্থ হইলে সেই ব্যক্তি চতুর্দ্দিক অন্ধকার দেখেন। তাঁহার মুখে কি স্ত্রীর অসারতা কথা সাজে? গৃহীরা সেই জন্য এই অবস্থায় ঠগ্ বলিয়া পরিচিত হয়েন। ঠগ্ হইবার হেতু ভাবের ঘরে চুরি। অন্তরে বাহিরে সামঞ্জস্য নাই।

যোগী অর্থাৎ সাধক হইয়া যাঁহারা বাহিরে কামিনীকাঞ্চন ত্যাগের ভান দেখাইয়া গুপ্তভাবে যদ্যপি কামিনী সহবাস করেন, তাঁহাদের ভাবের ঘরে চুরি হয়, সুতরাং তাঁহারা ঠগ্। এই তিনটী দৃষ্টান্তের তাৎপর্য্য বাহির করিলে কি বুঝা যায়?

এক পক্ষে কামিনীকাঞ্চন ত্যাগ, আর এক পক্ষে ভাবের ঘরে চুরি না থাকা। এই অবস্থা যাহার হইবে, তিনিই প্রকৃত সাধনের অধিকারী।

এক্ষণে উপায় কি? গৃহী আমরা, কামিনীকাঞ্চনে সিদ্ধ হইয়াছি। কামিনীকাঞ্চনে নাগপাশে আবদ্ধ হইয়াছি! কোন সূত্রে সে সূত্র ছিন্ন করিবার উপায় নাই! সঙ্কল্পের স্রোতে কোথায় ভাসিয়া গিয়াছি, তাহার কূল কিনারা দেখিতে পাওয়া যাইতেছে না? কতই সঙ্কল্প করিতেছি। সঙ্কল্পের অবধি নাই, কেমন করিয়া সে সঙ্কল্প ক্ষয় হইবে? খুন করিয়াছি, এখন অনুশোচনা করিলে কি ফল হইবে? কার্য্যের অনুগামী ফল, ইহাই বিধাতার অপরিবর্ত্তনীয় বিধি। সে বিধির বিপর্য্যয় হইবে কিরূপে? ভাবের ঘরে চুরি করিতে শিক্ষা করিয়াছি, তাহা অভ্যস্থ হইয়া গিয়াছে। অভিমান আমাদিগকে বর্ম্মাবৃত করিয়া রাখিয়াছে, অভিমান কখন হৃদয়ের প্রকৃত ভাব বাহির

করিতে দেয় না। মনে করিলেও তাহা দেখাইবার যো নাই। অভিমানের ভিতর দিয়া প্রকৃত ভাব বাহির হইবার সময় বিকৃত হইয়া যায়। সে অভিমান যাইবার নহে। এখন কি হইবে, কেমন করিয়া আমরা সাধনা করিব? সাধনের যে গুরুতর ব্যাপার শুনিলাম, তাহাতে আমরা কখনই উপযুক্ত নহি—হইবারও উপায় নাই। কে বলে—সন্ন্যাসী হইয়া কামিনীকাঞ্চন ভাবের বাহিরে থাকিতে পারিবে? কে পূর্ণাত্মা হইয়া পূর্ণ ব্রহ্মের সাক্ষাৎকার লাভ করিবে? কেই বা ভগবানের লীলারূপ দর্শন করিতে কৃতকার্য্য হইবে? গৃহীদিগের আশা ভরসা নাই! ভবসাগরে গৃহীদিগের কূল কিনারা নাই! সংসারক্ষেত্রে উপায় অবলম্বন নাই! যে গৃহীর এই অবস্থা হয়, যে গৃহী আপনার বলিতে কাহাকেও না পায়, যে গৃহী বাস্তবিক দয়ার পাত্র মনে করেন, যে গৃহী নিজের বলবুদ্ধি অকিঞ্চিৎকর মনে করেন, যে গৃহী আপনাকে সহায়হীন, সম্পত্তিহীন মনে করেন, যে গৃহী আপনাকে বন্ধুহীন আত্মীয়হীন মনে করেন, সেই গৃহীর হৃদয় তখন শূন্যময় হয়, সেই গৃহীর মন সঙ্কল্পবিবর্জ্জিত হয়। সেই গৃহীর তখন কামিনীকাঞ্চন ভাব চলিয়া যায়, সেই গৃহী পথের ভিখারী হইয়া পড়েন। ভিখারী দেখিলে ধনীর দয়া হয়। অনাথ দেখিলে ধনীর দয়া হয়, জরা জীর্ণ হইয়া রাজপথে পতিত থাকিলে সে দয়ার পাত্র হয়। যে গৃহী অন্তরে ভিখারী হইয়াছেন, যে গৃহী সংসারজ্বরে জর্জ্জরীভূত হইয়াছেন, যে গৃহী পতিত হইয়াছেন, সেই গৃহীই দয়াময় অনাথনাথ পতিতপাবনের দয়ার পাত্র। যে আতুর, যে নিরুপায়, যে কাঙ্গাল, যে ব্যাধিগ্রস্থ, রাজভৃত্য কর্ত্তৃক সে হাঁসপাতালে আনীত হয়, সেইরূপ যে গৃহী গৃহে থাকিয়া গৃহচ্যুত হইয়াছেন, যে গৃহী কামিনীর ক্রোড়ে থাকিয়া কামিনীত্যক্ত হইয়াছেন, যে গৃহী কাঞ্চনের বিরাগভাজন হইয়াছেন,

সেই গৃহীর স্থান কোথায় ? তিনি কোথায় দাঁড়াইবেন ? নিজের বল নাই, কেহ দয়া করে না। নিজের ধন নাই, কেহ ধন দেয় না। সে অবস্থায় তাহার উপায় কোথায় ? তাহার এমন শক্তি নাই যে, কাহাকে ডাকিয়া আপনার দুঃখ জানায়, সে পথপ্রান্তে পতিত মুমূর্ষু দশা-প্রাপ্ত দীনহীনের প্রতি কাহার কটাক্ষ না পড়িলে তাহার গতি মুক্তি হয় না। যিনি যত ধনী হউন, যত দয়ালু হউন, সম্পত্তিবিহীনবিহীনা কাঙ্গালকাঙ্গালিনীর প্রতি কাহারও অধিকার নাই। রাজাই তাহাদের আশ্রয় স্থান। তাই মহারাণীর রাজ্যে সেই ব্যবস্থা দেখা যায়। তাই পথের ধারে পড়িয়া থাকিলে পাহারাওলা হাঁসপাতালে লইয়া যায়, তাই অনাথার জন্য রাণী মাতার সুব্যবস্থা আছে, তাই অনাথ অনাথারা মরিয়া যাইলে তাহাদের গতির নিমিত্ত জাহ্নবী কূলেও স্থান দিবার ব্যবস্থা করিয়াছেন। মহারাণী মাতা যে নিয়মে কার্য্য করেন, তাহাই ব্রহ্মময়ী মাতার নিয়ম। তাঁহার বিশেষ বিভূতির দ্বারা মহারাণীর আবির্ভাব, তাই তাঁহার হৃদয়ে পতিতপাবনা অনাথতারিনীর ভাব কার্য্য করিতেছে, যে গৃহীর এইরূপ অবস্থা হয়, সেই গৃহীই ব্রহ্মময়ীর দৃষ্টিগোচর হন, যে গৃহী অনাথ, তাঁহার জন্য ব্রহ্মময়ী কাতরা। যে গৃহী সংসার ও সমাজভ্রষ্ট হইয়া কাতর ভাবে কাঁদিতে কাঁদিতে বলে যে, "হায় রে ! আমার কি কেহ নাই ; আমায় দয়া করে এমন কি কেহ নাই, আমায় এক মুষ্ঠা অন্ন দিয়া জঠরানল নিবারণ করে, এমন দয়াময় দয়াময়ী কি কেহ নাই ?" দয়াময়ী কি আর দেখিতে পারেন ? কাঙ্গালের আর্ত্তনাদে কাঙ্গাল জননী অস্থিরা হন। তিনি কখনই স্থির থাকিতে পারেন না। যে শিশু আত্মরক্ষায় অশক্ত, জননীর দৃষ্টি সেই দিকেই অধিক থাকে। সে চুপ করিয়া শুইয়া থাকিলেও মাতা মধ্যে মধ্যে দেখিয়া যান যে, শিশুর কোন ক্লেশ হইতেছে কি না। নাসিকা

বস্ত্র চাপা পড়িয়াছে কি না, শয্যায় পিপীলিকা উঠিয়াছে কি না। শিশু কাঁদিলে মাতা সমদায় কার্য্য পরিত্যাগ করিয়া ছুটিয়া শিশুকে ক্রোড়ে লইয়া স্তন্য সুধা দান করেন। সেইরূপ যে গৃহী একেবারে কার্য্যে শিশুর ন্যায় অবস্থায় পতিত হন, তাঁহার জন্যই মা প্রস্তুত আছেন।

অতএব গৃহী হইয়া যদ্যপি সাধন করিতে হয়, তাহাদের পক্ষে তপশ্চরণ নহে, সংযমী হওয়া নহে, কঠোর ব্রতাদি পালন করা নহে, দয়ার পাত্র হইবার সাধনই এক মাত্র সাধন, যে নরনারীর এই ভাব উপস্থিত হইবে, তাঁহারাই সংসারক্ষেত্রে সাধনের অধিকারী এবং অধিকারিণী।

এক্ষণে বুঝিলাম যে, সঙ্কল্প হইতে জীবের উৎপত্তি, সঙ্কল্পে জীবের স্থিতি এবং সঙ্কল্পের দ্বারা পরিণাম নিরূপিত হইয়া থাকে। সঙ্কল্পবিহীন নরনারীদিগকে মুক্ত কহা যায়। অতএব সঙ্কল্প ক্ষয়ের নিমিত্ত যাঁহাদের অভিলাষ জন্মায়, তাঁহারাই সাধনের অধিকারী এবং অধিকারিণী। ইহাতে জাতি বা বর্ণ বিচার নাই। বালক বৃদ্ধ নাই, স্ত্রী পুরুষ নাই। যিনি সঙ্কল্পের পাশ ছিন্ন করিতে ইচ্ছা করিবেন, তিনিই অধিকারী হইবেন।

কিন্তু আমাদের উপায় কি? আমরা যে কেহই অতি পরিমার্জ্জিত ধীশক্তিসম্পন্ন পুরুষই হই, অথবা সমাজিক উচ্চ পদস্থ ব্যক্তিই হই, সঙ্কল্পবিবর্জ্জিত না হইলে যখন আত্মজ্ঞান লাভের উপায় নাই, ভগবানের দর্শনের সম্ভাবনা নাই, তখন পরিণাম চিন্তা করিলে কণ্ঠ শুষ্ক না হইবে কেন? আমরা পিতা মাতার সঙ্কল্পে জন্মিয়াছি, আমরা নিজে প্রতিক্ষণে অসীম প্রকার সঙ্কল্প করিতেছি, ইহার পরিসমাপ্তি কি কখন হইবে? সঙ্কল্পসূত্রে এ ঘর ও ঘর, এ দেশ ও দেশ, এজাতি ওজাতি করিয়া বেড়াইতেছি। আজ সঙ্কল্পের নিমিত্ত রাজরাজ্যেশ্বর,

কাল সঙ্কল্পের জন্য পথের ভিখারী, আজ সঙ্কল্পের নিমিত্ত ব্রাহ্মণ, কাল সঙ্কল্পানুরোধে যবন বা ম্লেচ্ছ হইতেছি। সঙ্কল্পের হস্ত হইতে পরিত্রাণ পাইব কিরূপে? সঙ্কল্পের দ্বারা সঙ্কল্পবিহীন হওয়া যায় না। আর্য্যদিগের সঙ্কল্পবিহীন অবস্থার সহিত পূর্ণ সঙ্কল্পযুক্ত বর্ত্তমান হিন্দুদিগের কি তুলনা হয়? তাঁহারা সঙ্কল্প পরিত্যাগ করিয়া যে অবস্থায় অবস্থিতি করিতেন, এক্ষণে কি তাঁহাদের পরমাণু প্রমাণ কোন ভাব কাহাতেও দেখিতে পাওয়া যায়? তাঁহাদের মস্তিষ্কপ্রসূত কার্য্যকলাপ স্মরণ করিলে কে না বিমোহিত হইয়া থাকেন? তাঁহারা না করিতে পারিতেন কি? তাঁহারা ইচ্ছা করিলে সৃষ্টি স্থিতি প্রলয় করিতে পারিতেন। কিন্তু বর্ত্তমান কালেতে সেই আর্য্যদের ন্যায় কি কেহ আছেন? কেন নাই? সঙ্কল্পই সর্ব্বতোভাবে সর্ব্বনাশ করিয়াছে।

আমরা সকলেই সঙ্কল্পের দাস। সঙ্কল্প ব্যতীত একপদ অগ্রসর হই নাই, কোন বিষয় চিন্তা করি না, আমাদের উপায় ভরসা কিছুই নাই। একবার আপনার দিকে আপনি দৃষ্টিপাত করিলে নিজ নিজ অবস্থা বুঝা যাইবে। সঙ্কল্পহিল্লোলে কোথায় ভাসিয়া যাইতেছি। সঙ্কল্প করিতে শিক্ষা করিয়া এতদূর সিদ্ধ হইয়াছি যে, আপনার অনিচ্ছা সত্বেও সঙ্কল্প হইয়া যায়। এ অবস্থায় কস্মিন্ কালেও সঙ্কল্পের অধিকার বহির্ভূত হইবার আশা নাই।

সংসারে দেখা যায় যে, আতিশয্যাবস্থার একই প্রকার ফল। অবস্থাবিশেষে উত্তাপ এবং শৈত্যের একই প্রকার ফল। জলে উত্তাপ প্রয়োগ করিলে তাহা বিস্তীর্ণ হয় এবং অতি শৈত্যেও উহাতে তদ্রূপ ফল ফলিয়া থাকে। আমীর এবং ফকীরের অবস্থার ফল সমান। সেইরূপ প্রকার সঙ্কল্পবিহীন এবং সঙ্কল্পের আতিশয্য হইলে উভয়বিধ অবস্থার একই প্রকার ফল। আমরা এক্ষণে সঙ্কল্পের আতিশয্যাবস্থায়

উপনীত হইয়াছি। আমাদের সঙ্কল্পের আর অবধি নাই। সুতরাং আমাদের আর গতি মুক্তি হইবে কিরূপে? তাই অগতির গতি নারায়ন অবতীর্ণ হইয়া আমাদিগকে ক্রোড়ে লইয়াছেন। আমরা একদিনও ভাবি নাই যে, ভগবান্ লাভ করিবার জন্য সাধন ভজন করিতে হইবে। সাধন ভজন করিব কেন? কিসে বড় লোক হইব, কিসে কামিনীকাঞ্চনের বিশেষ সুবিধা হইবে? কিসে মান সম্ভ্রম হইবে? কিসে পাঁচজনাকে ঠকাইয়া আপনার অবস্থার উন্নতি করিব, এই সঙ্কল্পেই বাদশাহ হইয়া সংসারের বক্ষে অবস্থিতি করিতেছিলাম। সঙ্কল্পের রাজ্যে যাহার বাস, তাহার ন্যায় অশান্তিগ্রস্থ আর কেহ নাই। একথা আমরা সকলে প্রাণে প্রাণে বিলক্ষণ অনুভব করিতে পারি। যে দিন সঙ্কল্পের চূড়ান্ত হইয়া আসিল, যে দিন চারিদিক অন্ধকার দেখিলাম, যে দিন আপনাদের বল বুদ্ধির পরিচয় পাইলাম, যে দিন সংসার অকুল পাথার বলিয়া জ্ঞান হইল, সেই দিনই রামকৃষ্ণকে লাভ করিয়া কূল পাইলাম, সেই দিন সংসারের রহস্য ভেদ হইল, সেই দিন জীবনরঙ্গভূমির রঙ্গজ্ঞান হইল। আপনার অবস্থা দেখিয়া, আপনার অবস্থার ন্যায় অপরের অবস্থা বুঝিয়াছি যে, রামকৃষ্ণদেবই অকূলের কূল স্বরূপ অনাথার আশ্রয়দাতা, সঙ্কল্পযুক্ত নরনারীর একমাত্র অবলম্বন। সঙ্কল্প ক্ষয় করিতে আমরা অশক্ত, সঙ্কল্প ক্ষয় করিয়া ক্রোড়ে লইতে আর দ্বিতীয় কোন দেবতা নাই। আমরা সঙ্কল্পের দাস হইয়া কেমন করিয়া সঙ্কল্প ক্ষয় করিব! সঙ্কল্পও থাকিবে, মুক্তও হইবে, একথা রামকৃষ্ণের পূর্ব্বে সকলের অজ্ঞাত বিষয় ছিল। এক্ষণে যাহাকে সঙ্কল্প রাখিয়া আত্মতত্ত্ব অবগত হইবার ইচ্ছুক হইতে হইবে, রামকৃষ্ণের আশ্রয় ব্যতীত তাহার দ্বিতীয় পন্থা নাই।

গীত।

(১)

জয় রামকৃষ্ণ প্রভু, জয় ত্রিলোকের বিভু,
জয় জয় পতিতপাবন।
জয় দর্পহারী হরি, বিপদের কাণ্ডারী,
জয় জয় শ্রীমধুসূদন ॥
জয় অগতির গতি, জয় জয় বিশ্বপতি,
জয় পূর্ণ ব্রহ্ম সনাতন।
জয় ভব ভয় হারী, জয় জয় ত্রিপুরারী,
জয় জয় প্রভু নারায়ণ ॥
তুমি আদি অন্ত জীব, তুমি কালী তুমি শিব,
তুমি হও অনাদি অপার।
তুমি সূক্ষ্ম তুমি স্থূল, তুমি জল তুমি স্থল,
তুমি নাথ জঙ্গম স্থাবর ॥
অনল অনিল তুমি, আকাশ পাতাল ভূমি,
দুর্গা ব্রহ্মা বিষ্ণু আদি করি।
তুমি নিত্য তুমি লীলা, নানা রূপে কর খেলা,
তুমি হও রাসরসেশ্বরী ॥
কভু মৎস্য রূপ ধর, কভু কূর্ম্ম কলেবর,
কভু শ্যাম রসিক নাগর।
কভু রাম যীশু শাক্য, বরাহ আল্লা নানক,
কখন বামন রূপ ধর ॥
নাম ধর্ম্ম প্রকাশিতে, রাধা প্রেম বিলাইতে,
এলে প্রভু শচীসুত হয়ে।

জগাই মাধাই করি, মহাপাপী গেল তরি,
তোমার চরণ রেণু পেয়ে ॥
রামকৃষ্ণ রূপ ধরি, হলে এবে অবতরী,
নরনারী দুর্গতি হেরিয়ে ॥
অনাথ পতিত জনে, তারিলেহে নিজগুণে,
অকূলেতে আকুল দেখিয়ে ॥
মোরা দীন হীন অতি, নাহি জানি স্তব স্তুতি,
রাখ সবে পদছায়া দিয়ে।
বাসনা সদাই প্রাণে, যাপি দিন গুণ গানে.
দাও বল কৃপা প্রকাশিয়ে ॥

(২)

সাধন বিনা পায় না তোমায়, সাধন যেজন চায়।
নিজগুণে শক্তি হীনে রাখ রাঙ্গা পায় ॥
যে তোমায় পেতে চায়, বিদায় দেয় সে বাসনায়,
(আমার) নিয়ত বাসনা ধায় কি হবে উপায় ;—
কৃপাধীনে নয়ন কোণে হের করুণায় ॥
তোমাবিনে ত্রিভুবনে, চায় না কেউ মুখ পানে,
(ঠাকুর) কে আর বল দীন হীনে রাখে চরণে ;—
পতিত ব'লে নাও হে তুলে তোমারি ত দায় ॥

(৩)

পড়েছি বিষম টানে কূল কিনারা আছে কি নাই।
না দেখি সহায় সুহৃদ কোথায় বা কারে সুধাই ॥

কে যেন বল্‌ছে কাছে, আছি আমি সবার পাছে,
ভয় কিরে তার, নাম যে আমার প্রাণে রেখেছে,
তৃণ সম ভেসে ভেসে আস্‌বে শেষে আমার ঠাঁই ॥
তরঙ্গ সঙ্গ ছাড়ে না,
ফিরে ঘুরে রঙ্গ করে ভঙ্গ মানে না ;
আতঙ্গে অঙ্গ চলেনা ;—
নিরুপায় ডাকি তোমায় দিয়ে নামেরি দোহাই ;—
বলি রামকৃষ্ণ, রামকৃষ্ণ, রামকৃষ্ণ বলে ভেসে যাই ॥

রামচন্দ্রের বক্তৃতাবলী।

ত্রয়োদশ বক্তৃতা।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেব কথিত

আত্মা।

১৩০০—১৯শে চৈত্র রবিবার,—সিটি থিয়েটারে

প্রদত্ত।

৬০ রামকৃষ্ণাব্দ।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ
শ্রীচরণ ভরসা।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবকথিত আত্মা।
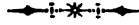
ব্রাহ্মণাদি সকলের চরণে প্রণাম।

প্রভুর কৃপায় এক বৎসর কাল তাঁহার গুণানুকীর্ত্তন করিয়া আসিতেছি। এই সময়ে যদিও নানাবিধ বিঘ্ন বাধা উপস্থিত হইয়াছিল, কিন্তু তদ্দ্বারা আমাদের কার্য্যের বিশেষ অপকার করিতে পারে নাই। দ্বিতীয় বৎসরের প্রারম্ভে পূর্ব্ব বৎসরের ন্যায় নানাবিধ বিভীষিকা করালবদন ব্যাদান করিয়া আমাদের দিকে ধাবিত হইবার উপক্রম করিতেছে, এই বিভীষিকা সকল এতদূর বাড়িয়া উঠিয়াছে যে, তাহা ভাবিয়া দেখিলে অতি ভীষণ পরিণাম মানসপটে প্রতিফলিত হইয়া আমাদিগের হৃদয় আকুঞ্চিত করিয়া ফেলে। বলিতে পারি না, প্রভুর মনে কি আছে।

প্রথম বিভীষিকা স্থানাভাব। গত বৎসর যখন বক্তৃতার সূচনা হয়, সেই সময় হইতে স্থান লইয়া গোলযোগ চলিয়া আসিতেছে, এই নিমিত্ত এক স্থানে বক্তৃতা হইবে বলিয়া বিজ্ঞাপন দিয়া স্থানান্তরে যাইতে বাধ্য হইয়া থাকি। সকলেই আপনাপন উদ্দেশ্যানুসারে পরিচালিত হইতে বাধ্য হইয়া থাকেন। সেই উদ্দেশ্য বজায় রাখিয়া লোকে অপরের সহিত যোগ দিতে পারেন। সুতরাং, এরূপ যোগের কার্য্য দীর্ঘস্থায়ী হয় না। এই নিমিত্তই স্থান লইয়া আমাদিগকে সর্ব্বদা ব্যতিব্যস্ত হইতে হইতেছে। রামকৃষ্ণদেব কোথায় যে স্থায়ী করিবেন, তাহা তিনিই জানেন।

আমরা মনে করিয়াছি যে, সিটি রঙ্গভূমি হইতে আপাততঃ স্থান পরিবর্ত্তন করিব না। সিটি কোম্পানী সাদরে আমাদের স্থান দিয়াছিলেন এবং কখন বিরক্তির ভাব দেখান নাই। স্থান সংকীর্ণ বলিয়া সাধারণের সুবিধার নিমিত্ত আমরাই আপনারা স্থানান্তরে যাইতে বাধ্য হইয়াছিলাম। বোধ হয়, প্রভুর ইচ্ছা যে, সিটিতেই তাঁহার গুণানুকীর্ত্তন হইবে, এই নিমিত্ত পুনরায় আমাদিগকে প্রত্যাগমন করিতে হইয়াছে। আপাততঃ যাহা হউক হইল, কিন্তু আমরা অধিক দিন থিয়েটারে কার্য্য করিতে পারিব না। আমাদের ইচ্ছা এই যে, মাসিক বক্তৃতাদি না হইয়া সাপ্তাহিক হয়, কিন্তু তাহা হইলে আপনাদের নিজস্ব স্থানের প্রয়োজন হইবে। রামকৃষ্ণ-মন্দির প্রতিষ্ঠিত হওয়া চাই। কিন্তু আমরা সর্ব্বসাধারণের নিকট এই প্রস্তাবটী সম্পূর্ণ করিবার নিমিত্ত সহায়তা প্রার্থনা করিতে পারি না। সাধারণ ব্যক্তিদিগের সহিত অর্থের সম্বন্ধ স্থাপন করা রামকৃষ্ণদেবের সম্পূর্ণ অমত ছিল. সুতরাং আমরা কিরূপে তাঁহার আজ্ঞা লঙ্ঘন করিতে পারি। এবং টাকা চাহিলেই কে বাহু প্রসারণ করিয়া বসিয়া আছেন যে, অমনি আমাদের ইচ্ছা পূর্ণ করিয়া দিবেন? অতএব চাঁদা সংগ্রহ পূর্ব্বক যে রামকৃষ্ণ-মন্দির স্থাপন করিতে হইবে, তাহা এক্ষণে কল্পনায়ও স্থান দেওয়া হয় নাই। সেবকমণ্ডলীর দ্বারা যদ্যপি একখানি পর্ণকুটীরও স্থাপিত হয়, তাহাপেক্ষা পরম প্রীতির বিষয় আর কিছুই নাই।

থিয়েটারে রামকৃষ্ণ-গুণানুকীর্ত্তন হওয়া সকলের অভিপ্রায় নহে। কামিনীকাঞ্চন পরিত্যাগ অথবা তাহাদের সম্বন্ধ খর্ব্ব করিয়া ধর্ম্মালোচনা করা রামকৃষ্ণদেবের অভিপ্রায়, কিন্তু আমরা সেই ভাবের সম্পূর্ণ বিরুদ্ধভাবসংযুক্ত স্থানে তাঁহাকে লইয়া যাতায়াত করিতেছি। থিয়েটার কামিনীকাঞ্চনের ঘনীভূত স্থান, সুতরাং এ স্থান রামকৃষ্ণের নহে।

কিন্তু কি করা যাইবে? আমরা রামকৃষ্ণ-মন্দিরের জন্য বিশেষ চেষ্টায় রহিলাম, কিন্তু আমাদের দ্বারা কি হইবে? আমরা যন্ত্রবৎ কার্য্য করিয়া যাইতেছি। আমরা প্রভুর মুখাপেক্ষা করিয়া রহিলাম।

দ্বিতীয় বিভীষিকা সেবকমণ্ডলীর অসুস্থতা। যে সকল সেবকগণ কাঁকুড়গাছী যোগোদ্যানে প্রভুর সেবায় নিযুক্ত হইয়াছেন, তাঁহারাই এই প্রচার কার্য্যের বিশেষ বল এবং ভরসা। বলিব কি, অদ্য তাঁহাদের মধ্যে অনেকে জ্বররোগে অচেতন হইয়া রহিয়াছেন; উঠিবার সামর্থ্য নাই। আমার নিজের কথা বলিয়া সকলকে বিষাদিত করিতে ইচ্ছা হইতেছে না, কিন্তু কার্য্যক্ষেত্রে তাহা বলাও কর্ত্তব্য। কারণ, বলিতে পারি না, হয় ত কোন্‌দিন বক্তৃতার বিজ্ঞাপন দিয়া অনুপস্থিত হইয়া পড়িব। পূর্ব্বে বলিয়াছি যে, বিগত দুই মাস হাঁপানি পীড়ায় বিশেষ কাতর হইয়া রহিয়াছি। এমন দিন নাই, যে দিন না হাঁপানি দেখা দেন। ঔষধের বিক্রমে কার্য্য করিয়া বেড়াই। একে ডায়াবিটিস্ রোগে শরীর পূর্ব্ব হইতেই ভাঙ্গিয়া গিয়াছে, তাহাতে হাঁপানির সর্ব্বদা গতিবিধি হইতে থাকিলে পরে যে কি দাঁড়াইবে, তাহা রামকৃষ্ণদেবই জানেন। যাহা হউক, আমাদের অবস্থা আপনাদিগকে জানাইয়া রাখিলাম, যদ্যপি কখন কথার ব্যতিক্রম হয়, দয়া করিয়া আমাদিগের অপরাধ মার্জ্জনা করিবেন।

ইতিপূর্ব্বে আমি যে সকল বিষয় লইয়া আলোচনা করিয়াছি, তাহা হইতে অদ্যকার বিষয় কোন অংশে স্বল্প প্রয়োজনীয় অথবা সহজ নহে। আমার বিবেচনায় আত্মা প্রসঙ্গটী সর্ব্বাপেক্ষা কঠিন এবং সকলের অবশ্য জ্ঞাতব্য বিষয়। আত্মা বিশ্বাস করিলে তবে ধর্ম্মকর্ম্মের কথা স্থান পায়, আত্মা বিশ্বাস না করিলে সে নাস্তিক হয় এবং শিশ্নোদর-পরায়ন হইয়া পশুবৎ আচার ব্যবহার দ্বারা সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ করিয়া

চলিয়া যায়। অতএব আত্মা সম্বন্ধীয় আলোচনা করা প্রত্যেক মনুষ্যের প্রথম কর্ত্তব্য। যেমন ভিত্তি না হইলে তাহার উপর অট্টালিকা নির্ম্মাণ করা যায় না, তেমনি আত্মা বিশ্বাস না করিলে কেহ কস্মিন্‌কালে ধর্ম্মোপার্জ্জন করিতে পারেন না।

আত্মা কি বস্তু? ইহার বিচার এবং মীমাংসা এত অধিক যে, যুগকাল প্রমাণ আলোচনা করিলেও ফুরাইবে না। সে সকল কথা লইয়া আন্দোলন করা আমাদের উদ্দেশ্য নহে। তবে সাধারণ ব্যক্তিরা যে সকল যুক্তি এবং প্রমাণ প্রদর্শন করাইয়া আত্মার অস্তিত্ব অস্বীকার করেন, সেই সকল প্রশ্ন লইয়া আমি সর্ব্বাগ্রে কিঞ্চিৎ আলোচনা করিয়া প্রভুর উপদেশ উল্লেখ করিব। নাস্তিকেরা বলেন যে, আত্মা বলিয়া এমন কোন বস্তু নাই। মনুষ্যদেহ মনুষ্যদেহ হইতে জন্মায়, পার্থিব পদার্থ দ্বারা পরিবর্দ্ধিত হয় এবং কালসহকারে শরীর বিধানের বিকৃতির নিমিত্ত মনুষ্যেরা মরিয়া যায়।

মনুষ্যশরীর কলের ন্যায় চলিতেছে। কতিপয় পদার্থের বিশেষ ব্যবস্থা করিলে কল চলে, মনুষ্যদেহও কতকগুলি পদার্থের দ্বারা চলিয়া থাকে। শোণিত, বায়ু, জল, আহার ইত্যাদি বিবিধ প্রকার পদার্থ ব্যতীত দেহ-কল অচল হইয়া পড়ে। যেমন শ্বাস বদ্ধ হইলে মানুষ মরিয়া যায়। সুস্থকায় ব্যক্তিরা গলায় দড়ি দিয়া অথবা ফাঁসি কাটে মরিতেছে। এরূপ মৃত্যুর কারণ শ্বাসরুদ্ধ হওয়া। শরীরের ভিতরে বায়ুর গতিবিধি না থাকিলে জীব কখন জীবিত থাকিতে পারে না, ইহা সকলের প্রত্যক্ষ বিষয়। শ্বাসপ্রক্রিয়ার বিজ্ঞানাদি তদন্ত করিলে বুঝা যায় যে, ভূবায়ুস্থিত বাষ্পবিশেষ অক্‌সিজেন জীবদেহের ফুস্‌ফুস্ অর্থাৎ বক্ষ গহ্বরস্থিত শোণিতপরিষ্কারক যন্ত্রের মধ্যে বিকৃত শোণিত পরিষ্কার করিয়া দিলে তদ্দ্বারা দৈহিক কার্য্য সুচারুরূপে সম্পাদন

হইবার উপায় হয়। ফুস্‌ফুসে বায়ু প্রবেশ করিতে না পাইলে বিকৃত শোণিত কর্ত্তৃক শারীরিক কার্য্য একেবারে স্থগিত হইয়া আইসে। এই নিমিত্ত আত্মার স্বাতন্ত্র্য স্বীকার না করিয়া শরীরকে স্বাভাবিক ঘটনা-প্রসূত পদার্থবিশেষ বলিয়া স্থূলবাদীরা সাব্যস্ত করিয়া থাকেন।

বায়ুর অভাবজনিত মৃত্যু হওয়া প্রকৃত ঘটনা। পূর্ব্বে অনেক স্থানে বলিয়াছি যে, বায়ুর অক্‌সিজেনই জীবনের নিদানস্বরূপ। যখন বায়ুর অক্‌সিজেনের পরিমাণ কমিয়া আইসে, জীবগণ তখন তাহাতে জীবিত থাকিতে পারে না। সিরাজুদ্দৌলার রাজত্বকালে ইংরাজদিগকে অন্ধকূপে আবদ্ধ করিয়া যে হত্যাকাণ্ড সমাধা হইয়াছিল, বায়ুর অক্‌সিজেনের অভাবই তাহার কারণ। যে স্থানে অনেক লোকসমাগম হয়, সে স্থানে আমরা অনেক সময় শ্বাসক্লেশ অনুভব করিয়া থাকি। অনেক সময়ে অনেকে মূর্চ্ছিত হইয়াও পড়েন। এই সকল দৃষ্টান্ত দেখিলে বায়ুকেই জীবজীবনের কারণ বলিতে হয়। বায়ুর দ্বারা যদ্যপি মরিতে বাঁচিতে হয়, তাহা হইলে আত্মা স্বীকার করিবার হেতু কি?

আর একপক্ষ হইতে শুনিতে পাওয়া যায় যে, বায়ুতে যদিও জীব-জীবন রক্ষা হয় বটে, কিন্তু যে সময়ে সন্তান মাতৃগর্ভে থাকে, সে সময়ে তাহার সহিত বায়ুর কোন প্রকার সাক্ষাৎ সম্বন্ধ দেখা যায় না। মাতৃ-গর্ভস্থিত সন্তান মাতৃশোণিত দ্বারা পুষ্টিলাভ করিয়া জীবিত থাকে। ভূমিষ্ঠ হইবার পর যদ্যপি নাড়ি ছেদন করিবার পূর্ব্বে সন্তানের দিকে বন্ধন না দেওয়া যায়, তাহা হইলে শোণিতস্রাব দ্বারা সন্তান মরিয়া যাইতে পারে।

ভূমিষ্ঠ হইবার পরে সন্তান স্তনপান না করিলে অথবা দুগ্ধাদি পান না করাইলে বাঁচে না। স্তন্যদুগ্ধই হউক, কিম্বা গাধার দুগ্ধই হউক, অথবা গোদুগ্ধই হউক, তাহা শোণিতের অবস্থান্তর মাত্র। সন্তান

বর্দ্ধিত হইলে যখন অন্যান্য পদার্থ ভোজন দ্বারা জীবন ধারণ করে, তখন তাহাও পরিশেষে শোণিতে পর্য্যবসিত হয়। মনুষ্যের জন্ম হইতে মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত বিচার করিয়া দেখিলে শোণিতকেই জীবজীবনের একমাত্র কারণ বলিয়া দেখিতে পাওয়া যায়। শুক্র শোণিত হইতে উৎপত্তি হয়, মাতৃগর্ভস্থিত ওভাম নামক ডিম্ববৎ পদার্থ শোণিত হইতে জন্মে। গর্ভে শোণিত, পৃথিবীতেও শোণিত। এই শোণিতের অভাব হইলে জীব মরিয়া যায়। এই শোণিতের সহিত অন্য পদার্থ মিশ্রিত হইলে উহার দ্বারা আর সুচারুরূপে কার্য্য হইতে পারে না। বায়ুকেই যে জীবনস্বরূপ কহা যায়, তাহা শোণিতের সহায়তাকারী ব্যতীত অন্য কিছুই নহে। এই নিমিত্ত শোণিতকেই জীবন কহা যায়। সুতরাং আত্মা বলিয়া কিছু মনে করিয়া লওয়া সম্পূর্ণ কাল্পনিক কথা।

কেহবা শারীরিক কার্য্য দেখিয়া মনে করেন যে, জীবনীশক্তি বলিয়া স্বতন্ত্র শক্তিও আছে, যাহাকে ইংরাজীতে ভাইট্যাল্ ফোর্স (Vital Force) বলে। তড়িৎ, চুম্বক, রাসায়নিক শক্তি যেমন জড় শক্তির বিকাশ, তেমনি চেতন পদার্থ সম্বন্ধে জীবনীশক্তি বুঝিতে হইবে।

যেমন তড়িৎ-শক্তির দ্বারা অপর বস্তু তড়িৎ-শক্তিবিশিষ্ট দেখায়, যেমন লোহাদিতে চুম্বক শক্তির বিকাশ হয়, যেমন এক পদার্থ হইতে অপর পদার্থে উত্তাপ গমন করে, তেমনি জীব, জীবনবিশিষ্ট জীব হইতে জীবনীশক্তি লাভ করিয়া থাকে। পিতা মাতার যে ব্যাধি থাকে, সন্তানে কিরূপে তাহা প্রকাশ পায়? সন্তানে যেমন ব্যাধি গমন করে, জীবনীশক্তিও তেমনি গমন করিয়া থাকে। মৃত ব্যক্তির জীবনী-শক্তি থাকে না, সুতরাং তাহা হইতে জীবনীশক্তি বাহির হওয়াও অসম্ভব।

শোণিত এবং বায়ু যদিও জীবনলাভ এবং রক্ষার কারণ বটে, কিন্তু জীবনীশক্তি না থাকিলে ইহারা কেহই কোন কার্য্য করিতে পারে না। যখন কোন অঙ্গ বা প্রত্যঙ্গ পচিয়া যায়, তখন সে স্থানে শোণিতের অভাব হয় এ কথা বলা যায় না, পূর্ব্ববৎ থাকে। সেই ব ক্তির অপরাপর অঙ্গাদি তখন স্বভাবে থাকিতে দেখা যায়। যে স্থানের জীবনীশক্তি কমিয়া যায়, তথায় শোণিত নিষ্ক্রীয় হইয়া পড়ে। এই নিমিত্ত জীবনীশক্তিই জীবনযাত্রা নির্ব্বাহের এক মাত্র উপায়স্বরূপ। স্বাভাবিক নিয়মে যেমন পদার্থ সকল জন্মায়, কিয়ৎকাল থাকে এবং কালে বিলয় প্রাপ্ত হয়, মনুষ্যজীবনও তদ্রূপ জ্ঞান করিয়া অনেকে আপনার সুখ স্বচ্ছন্দতার দিকে একমাত্র দৃষ্টি রাখিয়া দিনযাপন করিতে চাহেন। এই শ্রেণীর ব্যক্তিরাও আত্মা বিশ্বাস করেন না।

যাঁহারা আত্মা বিশ্বাস না করেন, তাঁহারা পরজন্ম মানেন না, সুতরাং তাঁহাদের আত্মার উন্নতি অবনতির দিকে দৃষ্টি রাখিবার আবশ্যকতা থাকে না। যাঁহাদের এই প্রকার ধারণা এবং বিশ্বাস, তাঁহারা সংসারের পক্ষে অতি ভয়ানক ব্যক্তি। তাঁহাদের নিকট সম্বন্ধ বিচার থাকে না, তাঁহারা অবাধে যথেচ্ছাচারিতার পরিচয় দিয়া যাইতে পারেন।

আজ কাল এই শ্রেণীর লোকই অধিক। আমি বার বার বলিয়া থাকি যে, আমিও ঠিক এই শ্রেণীর একজন ছিলাম। আত্মা বিশ্বাস করিতাম না, সুতরাং সৃষ্টিকর্ত্তাকে বিশ্বাস করিবারও প্রয়োজন বুঝিতাম না। স্বভাবে আপনি হয়, আপনি থাকে, আপনি অদৃশ্য হইয়া যায়, তাহাতে সৃষ্টিকর্ত্তা বিশ্বাস করিবার আবশ্যকতা কি? সৃষ্টিকর্ত্তা বিশ্বাস করিতে হইলে সাক্ষাৎ সম্বন্ধে পিতা মাতাকেই বিশ্বাস করা উচিত। কিন্তু তাঁহাদিগকে ঈশ্বর ঈশ্বরী বলিয়া ধারণা হয় না।

হিন্দুমতে আত্মা বিশ্বাস করিবার কথাও আছে, বিশ্বাস না করিবারও কথা আছে। একপক্ষে বলেন যে, কর্ম্মফলের দ্বারা আত্মার উন্নতি এবং অবনতি হইয়া থাকে। যিনি যেমন কর্ম্ম করেন, পরজন্মে তিনি তেমনি অবস্থা লাভ করিয়া থাকেন। এই নিমিত্ত কর্ম্মকাণ্ডের বহুল ব্যবস্থা আছে।

জ্ঞানকাণ্ডের মতে বাহ্যজগৎ মায়াবিশেষ, সুতরাং তাহার কার্য্যকলাপ সমুদয় অলীক। যেমন যাদুকর সত্য এবং তাহার ক্রীড়া ভেল্কীবিশেষ। এক অদ্বিতীয় পরমাত্মাই সত্য, তিনি যাদুকরবিশেষ, ব্রহ্মাণ্ড তাঁহার রঙ্গস্থল। প্রত্যেক পদার্থ সেই পরমাত্মার পরিচয়; আত্মা ও পরমাত্মা বলিয়া যে ভ্রম হয়, তাহা বাস্তবিক ভ্রমের কথা। এই নিমিত্ত জ্ঞানীরা সোহং বলিয়া পরিচয় দিয়া থাকেন। এই মতের বিশ্বাসীরা যাহা বলেন, তাহা সাধক রামপ্রসাদের মৃত্যুকালীন গীতে প্রকাশ আছে।

বল্ দেখি ভাই কি হয় ম'লে, এই বাদানুবাদ করে সকলে।
কেউ বলে ভূত প্রেত হবি, কেউ বলে তুই স্বর্গে যাবি,
কেউ বলে সালোক্য পাবি, কেউ বলে সাযুজ্য মেলে॥
বেদের আভাস তুই ঘটাকাশ ঘটের নাশকে মরণ বলে।
শূন্যেতে পাপ পুণ্য মান্য গণ্য ক'রে সব খোয়ালে॥
এক ঘরেতে বাস করি'ছ পঞ্চ জনে মিলে জুলে।
সে যে সময় হ'লে আপনা আপনি যে যার স্থানে যাবে চলে॥
প্রসাদ বলে যা ছিলি ভাই, হবি রে তাই নিদানকালে।
যেমন জলের বিম্ব, জলে উদয়, জলে হয় সে মিশায় জলে॥

পরম সাধক রামপ্রসাদ মৃত্যুকালে দেহেরপরিণাম সম্বন্ধে যাহাবলিয়া গিয়াছেন, তাহা দ্বারা আত্মাবিবাদীদিগের মতই সমর্থন হইয়া থাকে।

জীবজীবন হয় অর্থাৎ ব্রহ্মরূপ জলে জীবরূপ বিম্ব জন্মায়। তাহা হইলে পাপ পুণ্য কিম্বা আত্মার উন্নতি অবনতি প্রসঙ্গ লইয়া অনর্থক আলোচনায় সময় ক্ষেপ হইয়া থাকে, তাহার সন্দেহ নাই। রামপ্রসাদ এই ভাবটী অতিশয় স্পষ্ট করিয়া বুঝাইবার নিমিত্ত বলিয়া গিয়াছেন যে, পাঞ্চভৌতিক দেহ বিনষ্ট হইয়া যাইলে মৃত্যু কহে এবং তাহারা আপনাপন স্থানে চলিয়া যায়। যাঁহারা বর্ত্তমানকালে বৈজ্ঞানিক শিক্ষার দ্বারা স্পষ্ট দেখিতে পান যে,—পদার্থদিগের সংযোগে দেহ জন্মায় এবং তাহাদের রাসায়নিক পরিবর্ত্তন দ্বারা দেহ রক্ষা ও বিনষ্ট হয়; বায়ুর দ্বারা শোণিত বিশুদ্ধ হওয়াও রাসায়নিক শক্তির কার্য্য, ভোজ্য সামগ্রী প্রস্তুত হওয়া এবং শরীরে পরিপাক পাওয়া ও তাহা শোণিতে পরিণত হওয়া রাসায়নিক পরিবর্ত্তনের ফলস্বরূপ; ফলে শরীর হওয়া, থাকা এবং যাওয়া রাসায়নিক প্রক্রিয়ার অন্তর্গত;—এরূপ স্থলে, তাঁহারা বলেন, আত্মা বিশ্বাস করিয়া অনর্থক সাংসারিক সুখ হইতে বঞ্চিত থাকা নিতান্ত পাগলামীর কথা ব্যতীত আর কিছুই নহে।

আত্মা লইয়া বিচার করিতে যাইলে আমাদিগকে এইরূপ নানাপ্রকার বিভ্রাটে পতিত হইতে হয়। কেহ জোর করিয়া আত্মা বিশ্বাস করেন, কেহ নিজ দৌর্ব্বল্যতার নিমিত্ত ভয়ে আত্মা বিশ্বাস করেন, এবং কেহ একেবারে বিশ্বাস করেন না। যিনি বিশ্বাস করেন, তিনি বিশেষ প্রমাণ বা যুক্তি দিতে পারেন না, কিন্তু যিনি বিশ্বাস না করেন, তাঁহার পক্ষে প্রচুর প্রমাণ আছে। এই নিমিত্ত ধর্ম্মজগতে অবিরত গোলযোগ ঘটিয়া থাকে।

যদিও আত্মবাদীরা শাস্ত্রের প্রমাণ দিয়া তাঁহাদের পক্ষ পোষণ করিতে পারেন বটে, কিন্তু যাঁহারা শাস্ত্র মানিতে চাহেন না, তাঁহাদিগকে প্রত্যক্ষ প্রমাণ না দেখাইলে কখন বিশ্বাস করিবেন না, কিন্তু

সেরূপ প্রামাণাভাব। শুনিতে অতি সুমধুর এবং সহজে বুঝাও যায় বটে যে, যেমন জীর্ণ বস্ত্র ত্যাগ করিয়া নব বস্ত্র পরিধাণ করা যায়, অথবা এক গৃহ ত্যাগ করিয়া অন্য গৃহে প্রবেশ করা যায়, তেমনি এক দেহ হইতে আত্মা দেহান্তরে গমন করিয়া থাকে, কিন্তু যদ্যপি কেহ এইরূপ প্রশ্ন করেন যে, সাক্ষাৎ সম্বন্ধে জীবগণ যেরূপে জন্মিয়া থাকে, তাহার কোন্ অবস্থাতে আত্মা প্রবেশ করিয়া থাকে? জীবের জন্ম-বৃত্তান্ত আলোচনা করিলে জ্ঞাত হওয়া যায় যে. নর হইতে চৈতন্য-বিশিষ্ট কীটপ্রমাণ পদার্থবিশেষ নারীর ডিম্ববৎ পদার্থের সহিত একী-করণ না হইলে জীব জন্মাইতে পারে না। অবতারদিগের কথা দৃষ্টান্তের যোগ্য নহে। এইরূপ সংযোগ হইলে উহা দশমাসে আকারবিশেষ ধারণ করিয়া সময়ে পৃথিবীর ক্রোড়ে নিপতিত হয় এবং কালসহকারে বর্দ্ধিত হইয়া থাকে। জীবের উৎপত্তির কাল হইতে মৃত্যু পর্য্যন্ত এমন কোন সময় দেখা যায় না, যে সময়ে তাঁহার দেহে অপরের আত্মা প্রবেশ করে। একথা প্রকাশ আছে যে, যখন অপর আত্মা দেহ-বিশেষের আশ্রয় লয়, তথায় ভাবান্তরের লক্ষণ প্রকাশ পাইয়া থাকে। প্রেতাত্মা কর্ত্তৃক বিকারগ্রস্ত হওয়া চিরপ্রসিদ্ধ কথা। অথবা দেবতা-দিগের আত্মা যখন কাহাকে আশ্রয় করেন, তখন তাহার ভাবান্তর হইয়া থাকে। এই নিমিত্ত কথা হইয়া থাকে যে, জীব মরিয়া যাইলে তাহার আত্মা কিরূপে অপর দেহে প্রবেশ করিয়া থাকে? এই প্রশ্নের মীমাংসা করিতে কেহ অদ্যাপি চেষ্টা করিয়াছেন কি না, আমি জানি না। কিন্তু আত্মার পুনর্জন্ম স্বীকার করিতে যাইলে তাহা কিরূপে সম্পন্ন হয়, ইহা না বুঝিতে পারিলে পরজন্ম বা আত্মা, হয় অন্ধবিশ্বাসে, না হয় জোর করিয়া তাহা বুঝিতে হইবে। সুতরাং রামপ্রসাদ যাহা কহিয়া গিয়াছেন যে,—শূন্যেতে পাপ পুণ্য গণ্য মান্য ক'রে সব

খোয়ালে—এই মীমাংসাই শেষে শিরোধার্য্য করিয়া লইতে হয়। সংসার এইরূপ নানা প্রকার ভাবে পূর্ণ হইয়া চলিয়া আসিতেছে। রামকৃষ্ণদেব অবতীর্ণ হইয়া অন্যান্য বিষয়ের ন্যায় আত্মা সম্বন্ধেও নিগূঢ় তাৎপর্য্য বাহির করিয়া দিয়া গিয়াছেন। কিন্তু সে কথা অতি গভীর, যারপরনাই বৈজ্ঞানিক, আমার বিষয়াক্রান্ত মস্তিষ্ক তাহা ধারণা করিতে পারে নাই। বামনের চাঁদ ধরিবার যেমন সাধ হয়, রামকৃষ্ণচরিত ও তাঁহার শ্রীমুখের তত্বকথা লইয়া আলোচনা করাও আমার পক্ষে তেমনি হইতেছে। তাহা বুঝি, তথাপি কেন যে বাতুলতা করিতে আসি, তাহা বলিতে পারি না। আমিও যেমন পাগল, আপনারাও তেমনি এই পাগলামীর পৃষ্ঠপোষক হইয়া অনলে অনিলবৎ কার্য্য করিতেছেন। যাহা হউক, যখন সংসারের সকলই পাগলামী, আমরাও সাংসারিক জীব, সুতরাং এ পাগলামী নিতান্ত রীতিবিরুদ্ধ হইবে বলিয়া মনে হয় না।

প্রভু বলিয়া গিয়াছেন, যেমন কুলমহিলারা চিক্ আশ্রয় করিয়া বিষয় কার্য্যাদি সম্পন্ন করেন, তেমনি আত্মা এই পাঞ্চভৌতিক দেহরূপ চিক্ আশ্রয় করিয়া পৃথিবীতে বিহার করিতেছেন। যতক্ষণ কুলবধু চিকের পার্শ্বে উপস্থিত থাকেন, ততক্ষণ চিকের অপর দিকে মনুষ্যের কথা শুনা যায়। কিন্তু তিনি যখন তথা হইতে প্রস্থান করেন, তখন শত সহস্রবার কোন কথা জিজ্ঞাসা করিলে তাহার প্রত্যুত্তর আসিতে পারে না। সেই প্রকার আত্মা চলিয়া যাইলে সেই দেহের কার্য্য তখনি স্থগিত হইয়া যায়।

রামকৃষ্ণদেবের উপদেশ মতে, আত্মা এবং দেহ স্বতন্ত্র পদার্থ বলিয়া বুঝা যাইতেছে। শোণিত কিম্বা বায়ু অথবা দৈহিক সমুদয় অঙ্গপ্রত্যঙ্গাদির সমষ্টিকে স্বাভাবিক ঘটনাপ্রসূত ব্যাপার বলিয়া তিনি

স্বীকার করিতেন না। যদিও স্থূল দেহের কার্য্য নির্ব্বাহের নিমিত্ত শোণিত, বায়ু এবং অন্যান্য স্থূল পদার্থের বিশেষ প্রয়োজন দেখা যায় বটে, যদিও এই সকল পদার্থ ব্যতীত জীবজীবন জীবিত থাকিতে পারে না বটে, কিন্তু তাহাই চূড়ান্ত কথা কহে। যোগীরা সমাধিস্থ হইয়া যুগযুগান্তর কাল জীবিত থাকিতে পারেন। সে সময়ে তাঁহাদের শোণিত, ফুস্‌ফুসে বায়ুস্থিত অক্‌সিজেন কর্ত্তৃক বিশুদ্ধতা লাভ করে না, তথাপি তাঁহারা মরিয়া যান না কেন? আমরা এক মুহূর্ত্তকাল বায়ু-বিরহিত স্থানে স্থির থাকিতে পারি না, কিন্তু রামকৃষ্ণদেব সমাধিস্থ হইয়া দীর্ঘকাল বসিয়া থাকিতেন, তথাপি কোনপ্রকার ক্লেশানুভব করিতেন না। সে সময়ে তাঁহার শ্বাস প্রশ্বাস একেবারে বন্ধ থাকিত এবং ধমনীতে শোণিতের গতিবিধি স্থগিত হইয়া যাইত। যোগের এই ঘটনার দ্বারা শোণিত এবং বায়ুকে জীবন সম্বন্ধে আদি কারণ বলিয়া কখন স্বীকার করা যায় না। স্বাভাবিক অবস্থায় জীবনীশক্তি সম্বন্ধে কথা এই যে, উহা নামান্তর মাত্র। যদ্যপি কোন কারণে শরীরে অস্বাভাবিক ঘটনার উত্তেজনা হয়, তাহা হইলে ক্রমে অবসাদন আসিয়া সময়ে দুর্ব্বল করিয়া ফেলে। যেমন হস্ত কিম্বা পদে বন্ধন প্রদান করিলে নিম্নস্থিত অঙ্গ স্ফীত হইয়া উঠে এবং দীর্ঘকাল ঐরূপ ভাবে থাকিলে নিম্নাঙ্গ ক্ষত বিক্ষত হইয়া পরিশেষে পচিয়া যাইতে পারে। এই নিমিত্ত জীবনীশক্তি শারীরিক স্বাভাবিক অবস্থাকে কহে। শরীরের স্বাভাবিক অবস্থা বলিলে তাহা বিবিধ কারণের ফল বলিয়া জ্ঞাত হইতে হইবে। সুতরাং তাহাকে কখন আদিকারণ বলা যায় না।

যাঁহারা দেহকে স্বাভাবিক ঘটনার কলস্বরূপ বলিয়া স্বভাবকেই কারণ জ্ঞান করেন এবং কলের উপমার দ্বারা দেহকে ভিন্ন ভিন্ন

পদার্থের সংযোগসম্ভূত কার্য্যবিশেষ বলিয়া উল্লেখ করেন, তাঁহারা রামকৃষ্ণদেবের কলের দৃষ্টান্তে আত্মার প্রয়োজনীয়তা বুঝিতে পারিবেন। কলের অঙ্গ প্রত্যঙ্গাদি এরূপ কৌশলে নির্ম্মিত হয় যে, কল চলিলে তাহারা আপনিই সকল কার্য্য সম্পন্ন করিতে পারে। সচল কলের বহির্দ্দিক্ দেখিলে যেন কল আপনিই চলিতেছে বলিয়া সকলেরই ভ্রম জন্মায়। যে ব্যক্তি কল চলিবার কারণ অনুসন্ধান করিতে যান, তিনি জলীয় বাষ্পকে কারণস্বরূপ জ্ঞান করিতে পারেন। যেহেতু, জলীয় বাষ্পই কল চালাইবার কারণ। বাষ্প ব্যতীত অন্য পদার্থের দ্বারা সে কার্য্য সম্পন্ন করা যায় না। কিন্তু বাষ্পও আপনি জন্মায় না। কেবল বাষ্প কেন, কল এবং বাষ্প ব্যক্তিবিশেষ দ্বারা প্রস্তুত করা হয় এবং ব্যক্তিবিশেষ দ্বারা পরিচালিত হইয়া থাকে। তাঁহার ইচ্ছামত কল চলে, তাঁহার ইচ্ছামত কল বন্ধ থাকে। সেই কলপরিচালক এবং কল ও বাষ্প এক পদার্থ নহে। কলপরিচালক কখন কল নহে এবং বাষ্পও নহে। সেইরূপ দেহ-কলের বাষ্পরূপ শোণিত সত্ত্বেও কল-পরিচালক আত্মাও আছেন। তিনি যতক্ষণ কলে থাকেন, ততক্ষণ কল চলে, তিনি চলিয়া গেলে আর কল চলিতে পারে না। এই নিমিত্ত কহা যায় যে, দৈহিক কার্য্য সম্পাদনের নিমিত্ত পদার্থবিশেষ ব্যতীত একজন কর্ত্তা উপস্থিত আছেন, তাঁহাকে আত্মা কহে।

যদ্যপি কল লইয়া কিঞ্চিৎ সূক্ষ্মভাবে বিচার করিয়া দেখা যায়, তাহা হইলে আমরা আরও কিঞ্চিৎ নিগূঢ় তত্ত্ব জ্ঞাত হইতে পারিব। কল মনুষ্য কর্তৃক গঠিত হয়, মনুষ্য কর্তৃক সংরক্ষিত হয় এবং মনুষ্য কর্তৃক পরিচালিত হয়; এবং তাহা থাকা না থাকা মনুষ্যের ইচ্ছায় নির্ভর করিয়া থাকে। অর্থাৎ কলের সর্ব্বকালই মনুষ্যের ইচ্ছাধীন।

পূর্ব্ব বক্তৃতায় বলিয়াছি যে, পরমাত্মা সঙ্কল্পযুক্ত হইয়া জীবরূপে

প্রকটিত হইয়া থাকেন। যতদিন সঙ্কল্প থাকে, ততদিন জৈবলীলায় অভিভূত হইয়া থাকেন। জীব বলিলে সঙ্কল্পযুক্ত পরমাত্মাকেই বুঝায়। এই অবস্থায় পরমাত্মার সঙ্কল্প প্রবল থাকে, তন্নিমিত্ত জীবের ভিতরে যে পরমাত্মা বসতি করেন, তাঁহাকে জীবাত্মা কহা যায়। ঠাকুর বলিতেন, যখন কেহ গান করে তাহাকে তখন গায়ক কহে, সেই ব্যক্তি হাকিমের সম্মুখে উকীল, সেই ব্যক্তি মদ খাইলে মাতাল, আবার সেই ব্যক্তি ভগবৎভক্ত হইলে সাধু নামে উল্লিখিত হয়। যেমন কার্য্যবিভিন্নতায় উপাধি লাভ হয়, পরমাত্মাও উপাধিগ্রস্ত হইলে উপাধিহিসাবে জীবাত্মা বলিয়া পরীকীর্ত্তিত হইয়া থাকেন।

কল যেমন মনুষ্যসঙ্কল্পিত, দেহ-কলও তেমনি পরমাত্মা কর্ত্তৃক কল্পিত হইয়া থাকে। কল যেমন মনুষ্যের দ্বারা চলে এবং মনুষ্যই তাহাই চালাইতে জানে, দেহ-কল তেমনি পরমাত্মার দ্বারা চলে এবং তিনিই চালাইতে জানেন। মনুষ্যের যতদিন কল চালাইবার সাধ থাকে, ততদিন সে উহা চালাইতে পারে এবং কল জীর্ণ হইয়া অচল হইলে নূতন কল নির্ম্মাণ করিতে পারে, পরমাত্মাও ইচ্ছামত দেহ-কল চালাইতে পারেন এবং যতদিন সাধ থাকে, পুরাতন কল পরিবর্ত্তন করিয়া নূতন দেহরূপ কল লইয়া কার্য্য করিয়া থাকেন। সাধ অর্থাৎ সঙ্কল্প ফুরাইয়া যাইলে জৈবখেলার শেষ হইয়া আইসে।

কলের উপমার দ্বারা আত্মা বুঝা গেল বটে, কিন্তু ইহা হইতে নানাবিধ প্রশ্ন উঠিতে পারে। যথা, পরমাত্মা বা ঈশ্বর স্বয়ং কি জীব জন্তু হইয়া থাকেন? অথবা তাহারা তাঁহার সৃজিত বস্তু? রামকৃষ্ণদেব এই প্রশ্নের উত্তরে বলিয়াছেন যে, ইহা হিন্দুমত বটে। জ্ঞানমতে সকলই "আমি এবং আমার", লীলা বা ভক্তি মতে "তুমি এবং তোমার", অর্থাৎ হে ঈশ্বর এই সৃষ্টির কর্ত্তা তুমি এবং ইহা তোমারই

স্থজিত। স্থতরাং এই শেষোক্ত মতে সৃষ্টিকর্ত্তা এবং স্থজিতভাব আছে। যাঁহারা "আমি এবং আমার" বলেন, তাঁহারা সত্য কথা কহিয়া থাকেন, যাঁহারা "তুমি এবং তোমার" মতের পোষকতা করেন, তাহাও তাঁহাদের ভ্রম নহে। কারণ বৈশ্লেষিক এবং সাংশ্লেষিক বিচার দ্বারা অদ্বৈত এবং দ্বৈতভাব প্রাপ্ত হওয়া যায়। স্থূলে বহু এবং মহাকারণে এক, একথা পদার্থবিজ্ঞান আমাদিগকে শিক্ষা দিয়াছে। মহাকারণ অর্থাৎ পরমাত্মায় বহুভাব থাকে না, সেই অবস্থার নিকটবর্ত্তী হইলে এক জ্ঞানই লাভ করা যায়। জ্ঞানীরা সেইজন্য সর্ব্বত্রে পরামাত্মাকে অনুভব করিয়া থাকেন। যাঁহারা পদার্থবিজ্ঞান পড়িয়াছেন, তাঁহারা কি একথা বলিতে পারেন না যে, সমুদয় পদার্থ ব্যোম বা ইথারপ্রসূত? অথবা সমুদয় ইথার বলিলে অবশ্য তাহার অবস্থান্তর বুঝিতে হইবে। যদ্যপি একথা বলা যায় যে, পৃথিবী H_2O দ্বারা পরিপূর্ণ। H_2O বলিলে কি বুঝাইবে? আমরা কি কেবল জলীয় বাষ্প বুঝিব, না জল বুঝিব? না বরফখণ্ড বুঝিব? এই ত্রিবিধ অবস্থাই বুঝায়। ইহা বুঝে কে? যাঁহার H_2O জ্ঞান আছে, জল এবং বাষ্প বলিলে যাঁহার ভাব ধারণা করিবার যোগ্যতা আছে, তাঁহার নিকট এ প্রকার কথার অর্থবোধ হইবার সম্ভাবনা। কিন্তু অন্যের পক্ষে বাস্তবিক অসম্ভব জ্ঞান হইবে, সে বিষয়ে সন্দেহ কি? পরমাত্মা এবং জীবাত্মা সম্বন্ধে সেই প্রকার বুঝিতে হইবে।

পূর্ব্বে বলা হইয়াছে যে, ভগবান্ সঙ্কল্পের বশবর্ত্তী হইয়া জীব পদে অভিহিত হইয়া থাকেন। তিনি যত সঙ্কল্প করেন, স্বরূপভাব হইতে ততই দূরে নিপতিত হন। যেমন কোন ব্যক্তি চোরের অভিনয়-কালীন আপনাকে ভুলিয়া যায়, সে আপনাকে সাময়িক বিস্মৃত হয় বলিয়া তাহার স্বরূপের চূড়ান্ত ব্যতিক্রম হয় না। সেইরূপ

পরমাত্মা সঙ্কল্পানুসারে যদিও জীব উপাধি পাইয়া কিয়ৎকাল আত্ম-বিস্মৃত হইয়া পৃথিবীমণ্ডলে বিহার করেন বটে, কিন্তু তাহাতে তত্ত্ব পক্ষের কোন দোষ হয় না।

লীলায় একের বহু বিকাশ হওয়া লীলাময়ের উদ্দেশ্য, এ সম্বন্ধে পূর্ব্ব বক্তৃতাদিতে অনেক কথা বলিয়াছি। লীলার পদার্থগত ভাবান্তর থাকিলেও নিত্যে সেরূপ থাকে না। এই নিমিত্ত জড় এবং চৈতন্য বা সৃষ্টি এবং সৃষ্টিকর্ত্তা সম্বন্ধীয় বিচারে লিপ্ত হইতে হইলে, এক পক্ষে আবদ্ধ থাকা কর্ত্তব্য নহে। স্থূল, সূক্ষ্ম, কারণ এবং মহাকারণ অবধি ক্রমান্বয়ে আরোহন এবং অবরোহন ব্যতীত কস্মিন্‌কালে আত্মা-সম্বন্ধে জ্ঞান লাভ করা যাইতে পারে না। এই বিষয়টী সহজ দৃষ্টান্ত দ্বারা রামকৃষ্ণদেব কহিয়াছেন, যেমন বেলের বিচি হইতে গাছ হয়। গাছের কাণ্ড, প্রকাণ্ড, শাখা, প্রশাখা, পল্লব, প্রপল্লব, ফুল, ফল ইত্যাদি সমুদায় এক সত্তা হইতে জন্মায়। বেল পাকিলে তাহার খোসা অতিশয় কঠিন, শাঁস সুমিষ্ট বলিয়া তাহা আমরা ভক্ষণ করিয়া থাকি, কিন্তু খোসা অথবা বিচি কিম্বা আঠা আমরা ফেলিয়া দিয়া থাকি। যদিও বেলের শাঁস গ্রহণীয় বটে কিন্তু তাহা বলিয়া খোসা, বিচি বা শাঁস হইতে স্বতন্ত্র নহে; যেহেতু, এক সত্তা হইতে সকলেই জন্মিয়াছে। সেইপ্রকার ব্রহ্মাত্মা হইতে ব্রহ্মাণ্ড রচনা হইয়া নানাভাবে পরিদৃশ্যমান রহিয়াছে। যেমন স্থূলদর্শী বেলের শাঁস এবং বেলকাষ্ঠকে এক বলিতে পারেন না, কারণ, উহাদের ধর্ম্মের একেবারেই সামঞ্জস্য নাই, তেমনি জীবগণ সর্ব্বপ্রথমে স্থূল ঘটনা দেখিয়া জড় এবং চৈতন্যকে পৃথক্ বলিয়া জ্ঞান করিয়া থাকেন। এ প্রকার মীমাংসাও ভ্রমাবৃত নহে। কারণ রামকৃষ্ণদেব বলিয়া গিয়াছেন যে, কাঁচা সুপারি বা নারিকেল শুষ্ক না হইলে খোসা হইতে শাঁস পৃথক্ হইয়া পড়ে না।

কাঁচা সুপারি বা নারিকেল কর্ত্তন করিয়া সুপারি এবং নারিকেল স্বতন্ত্রভাবে প্রাপ্ত হওয়া যায় না, উহারা খোসার সহিত জড়িত থাকে। যাঁহাদের দর্শন এবং বিচার এই স্থানেই স্থগিত হইয়া যায়, সুপারি এবং নারিকেল খোসা হইতে বিমুক্ত হইতে পারে না, এই জ্ঞান তাঁহাদের চিরকাল বদ্ধমূল হইয়া থাকিবে।

সকল বিষয়েরই কার্য্য চাই। বিনা কার্য্যে কেহ কস্মিন্‌কালে কোন ফল প্রাপ্ত হইতে পারেন না। আত্মা বুঝিতে হইলে তাহার সাধনার প্রয়োজন। যদ্যপি কেহ আত্মার দর্শন করিবার সাধনা করেন, তিনি নিশ্চয় সময়ে আত্মার সাক্ষাৎ পাইয়া থাকেন। যেমন সুপারি বা নারিকেল রসবিহীন না হইলে খোসা হইতে বিমুক্ত হইতে পারে না, রসবিহীন হইতে হইলে উত্তাপের সহায়তাই একমাত্র উপায়, তেমনি কামিনীকাঞ্চন-রসের দ্বারা আত্মা দেহরূপ খোসার সহিত জড়ীভূতাবস্থায় অবস্থিতি করে, জ্ঞানাগ্নির প্রখর উত্তাপ শরীরে প্রবিষ্ট হইলে কামিনীকাঞ্চন-রস ক্রমে ক্রমে শুষ্কপ্রায় হইয়া আইসে। যখন জীবাত্মা কামিনীকাঞ্চন-রস হইতে এককালে সম্বন্ধবিহীন হন, তখন আর তাঁহাকে দেহে জড়িত থাকিতে দেখা যায় না। তিনি সেই সময়ে স্বতন্ত্র হইয়া পড়েন। কামিনীকাঞ্চনই জীবাত্মার প্রধান সঙ্কল্প। এই সঙ্কল্পেই তিনি ক্রমান্বয়ে বিস্তীর্ণ হইয়া থাকেন। যত কামিনীকাঞ্চন সঙ্কল্প কমিয়া আইসে, তিনি ততই স্ব স্বরূপের দিকে আকৃষ্ট হইতে থাকেন, যে মুহূর্ত্তে সঙ্কল্পবিবর্জ্জিত হইয়া পড়েন, সেই মুহূর্ত্তে তিনি পরমাত্মার সহিত একাকার হইয়া যান। রামকৃষ্ণদেব বলিতেন যে, চুম্বকের সন্নিধানে লৌহ আসিবামাত্র উহা আকৃষ্ট হইয়া থাকে, কিন্তু লৌহের উপরে কর্দ্দমাবৃত করিয়া চুম্বকের সহিত সংস্পর্শ করিলেও আকর্ষণ করিবার কোনও লক্ষণ দেখা যায় না। এই দৃষ্টান্তে কর্দ্দম

সঙ্কল্পবিশেষ। এই সঙ্কল্পই চুম্বক এবং লৌহের সম্মিলন ভঙ্গ করিবার মূল কারণ। যদ্যপি এই কর্দ্দম ধৌত করিয়া দেওয়া যায়, তাহা হইলে বিনা যত্নে—বিনা প্রয়াসে—লৌহ চুম্বক কর্ত্তৃক আকৃষ্ট হইয়া যাইবে। আমরা কামিনীকাঞ্চন সঙ্কল্পে জীবাত্মাকে আবৃত করিয়া রাখিয়াছি, অথবা তিনি আবৃত হইয়া আছেন, সেই সঙ্কল্পের বিরাম হইলেই তিনি স্বপ্রকাশ হইয়া পড়েন। যেমন গঙ্গার জল ঘটরূপ সঙ্কল্পে আবদ্ধ হইলে গঙ্গা হইতে বিচ্ছিন্নভাব দেখায়, কিন্তু ঘট ভাঙ্গিয়া দিলে গঙ্গার জল গঙ্গায়ই মিশাইয়া যায়। রামপ্রসাদ সেন সঙ্কল্পবিহীন হইয়াছিলেন বলিয়া মৃত্যুকালে জীবাত্মার পরিণাম পরমাত্মার বিলীন হওয়া জ্ঞান করিয়া বলিয়াছিলেন যে, "জলের বিম্ব জলে উদয়, জলে হয় সে মিশায় জলে।"

এই নিমিত্ত বলিতেছি যে, আত্মা লইয়া আলোচনা করিলে তাহার কোন ফল ফলিতে পারে না। আত্মা স্থূল চক্ষুর আয়ত্তাধীন নহে যে, আমরা তাহার সিদ্ধান্ত করিতে পারিব। আত্মা বুঝিতে হইলে অন্যের কথা শুনিয়া নিশ্চিন্ত হইয়া যাইলে কস্মিন্‌কালে বাসনা সিদ্ধ হয় না। আত্মা বুঝিতে হইলে আত্মদর্শী ব্যক্তির উপদেশ অবলম্বন পূর্ব্বক স্থির হইয়া অপেক্ষা করিলে কালে আত্মাই আপনি দেখা দিয়া থাকেন। রামকৃষ্ণদেব বলিতেন যে, যে চতুর ব্যক্তি হয়, সে কোন পুষ্করিণীতে মাছ ধরিতে যাইলে যাহারা তাহাতে মাছ ধরিয়াছে, তাহাদের নিকট জিজ্ঞাসা করিয়া লয় যে, কিসের টোপে, কি চারে, মাছ ধরা যায়। এইরূপে মৎস্য ধরিবার নানাবিধ বিষয় অবগত হইয়া সে ছিপ ফেলিয়া চুপ্‌ করিয়া বসিয়া থাকে। সে কখন ঘাই কখন ফুট্ দেখিতে পায়। কখন বা চারে মাছ বেড়াইলে ফাত্‌না নড়িতে থাকে এবং টানের মুখে হয়ত একখানা আঁস উঠিতে পারে। পরে সময়ক্রমে মাছ

ধরা পড়িয়া থাকে। আত্মাদর্শনেচ্ছুক হইয়া নামরূপ টোপ, এবং ভক্তিরূপ চার ফেলিয়া বসিয়া থাকিলে একদিন আত্মারূপ মাছ ধরা পড়িবে, সে বিষয়ের সন্দেহ নাই।

আমরা আত্মা লইয়া বিচার দ্বারা এই বুঝিলাম যে, পরমাত্মা সঙ্কল্পাবদ্ধ হইলে তাঁহাকে আত্মা কহে। প্রত্যেক জীব জন্তু, কীট পতঙ্গ, স্থাবর জঙ্গম পরমাত্মার সঙ্কল্পপ্রসূত পদার্থ। প্রত্যেক বস্তুই আত্মা। অতএব পুনরায় বলিতেছি যে, পরমাত্মা এবং আত্মা বলিলে সঙ্কল্পবিহীন এবং সঙ্কল্পযুক্ত পরমাত্মাকেই বুঝায়। যে সময়ে তাঁহার সঙ্কল্প না থাকে, সে সময়ে তিনি পরমাত্মা, সঙ্কল্পযুক্ত হইলেই তাঁহাকে আত্মা কহা যায়।

এক্ষণে আমাদের একটী প্রশ্ন মীমাংসা করিলেই অদ্যকার বিষয় সমাপ্ত হইয়া আইসে। আমি বলিয়াছি যে, আত্মা সঙ্কল্পিত মৃত্যুর পর কিরূপে নরদেহ ধারণ করিয়া সঙ্কল্পের সাধনা করিয়া থাকেন। এই প্রস্তাবটী হইতে আত্মাবিশ্বাস করা, বা না করিবার ভাব আসিবে। যদ্যপি আত্মার পারলৌকিক স্বাতন্ত্র্য থাকে, তাহা হইলে সুখ দুঃখ ভোগ সম্বন্ধে তিনিই দায়ী হইয়া থাকেন। অতএব এই গুরুতর বিষয়ে প্রভু যে প্রকার মীমাংসা করিয়াছেন, তাহা এক্ষণে বলিতেছি।

জীবগণ স্থূলে দুই ভাগে বিভক্ত; যথা, দেহ এবং দেহী। যখন কোন জীব মরিয়া যায়, তখন তাহার দেহ পূর্ব্ব সঙ্কল্পানুযায়ী অবস্থালাভ করিয়া থাকে। কেহ সঙ্কল্প করেন যে, তাঁহার দেহ ভস্মীভূত হইবে, জীবনান্তে প্রায় তাহাই হইয়া থাকে। কেহ সঙ্কল্প করেন যে, তাঁহার দেহ দীর্ঘকাল তদবস্থায় থাকিবে, তাঁহার মৃত্যু হইলে সেই দেহ সংরক্ষিত হয়। যে দেহ পঞ্চীকৃত করা হয়, তাহার ভূতসকল হয় স্বীয় স্বীয় ভূতে যাইয়া মিলিত হয়, না হয় কোন প্রকার যোগে অবস্থিতি করে। এই ভূত সকল জীবদেহ গঠনোপযোগী হইয়া পুনরায় জীবদেহে

সমাগত হইয়া জীবদেহ রক্ষা এবং পরিবর্দ্ধন করিয়া থাকে। ভূতশব্দ প্রয়োগ না করিলে যদ্যপি রূঢ়পদার্থবৃন্দের যৌগিক বলিয়া দেহকে উল্লেখ করা যায়, তাহা হইলে উহা পঞ্চীকৃত অর্থাৎ বিশ্লিষ্ট করিলে জলীয়াংশ হয়, তদাকারে থাকিতে পারে, না হয় উহা রূঢ়াবস্থা প্রাপ্ত হইয়া মুক্ত অথবা অন্য কোন যৌগিক ভাবে পর্য্যবসিত হইতে পারে। অঙ্গার এবং অন্যান্য পদার্থেরা প্রায় যৌগিকরূপে অন্যান্য পদার্থের দ্বারা আকৃষ্ট হইয়া থাকে। এই পদার্থনিচয় কিয়দ্‌পরিমাণে উদ্ভিদ্‌রাজ্যে, কিয়দ্‌পরিমাণে পার্থিবপদার্থের সংযোগে এবং কিয়দ্‌পরিমাণে বায়ু বা অন্য কোন ভাবে থাকিয়া যায়। বায়ু এবং পার্থিবভাব হইতে এই পদার্থ সকল উদ্ভিজ্জে শোষিত হয়। উদ্ভিদ্ এবং সাধারণ জান্তবরাজ্য হইতে উহা মনুষ্যদেহে প্রবেশ করিয়া থাকে। আমাদের যখন প্রথম সূত্রপাত হয়, তখন হইতে মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত দেহের অবস্থা ভাবিয়া দেখিলে বুঝা যায় যে, আহার্য্য পদার্থ হইতেই শরীর গঠিত হইয়া থাকে। আমরা যাহা আহার করিয়া থাকি, তাহা হইতেই শরীর সংগঠিত হইয়া থাকে এবং সেই সকল পদার্থ উদ্ভিদ্ এবং সাধারণ জান্তব বস্তু হইতে প্রাপ্ত হওয়া যায়। এক্ষণে বিচার করিয়া দেখিলে স্পষ্ট জ্ঞাত হওয়া যায় যে, এক প্রকার পদার্থ সকল দেহের নিদান-স্বরূপ। অঙ্গার বলিয়া যে বস্তুটী আমার দেহে আছে, সেই অদ্বিতীয় পদার্থটী কি তোমার দেহে নাই? অথবা মুসলমানের দেহে কিম্বা অন্য কোন জীব জন্তু বা উদ্ভিদ্ ও পার্থিব পদার্থে নাই? এক অঙ্গার সর্ব্বত্রে পরিলক্ষিত হইতেছে। তেমনি অন্যান্য পদার্থ সকলও একভাবে সর্ব্বত্রে বিরাজ করিতেছে। এক্ষণে আমি কি বলিতে পারি না যে, আমার দেহও যাহা, তোমার দেহও তাহা, অপরের দেহও তাহা? সকলের শোণিত এক, সকলের অস্থি এক, সকলের যন্ত্রাদি এক, শরীর

তত্ত্ব সকলের পৃথক্ হয় না। অতএব বিজ্ঞানচক্ষে সর্ব্বত্রে আমার দেহই দেখিতে পাই।

যদিও দেহ সম্বন্ধে সর্ব্বত্রে একভাবে কার্য্য হইতেছে বলিয়া কথিত হইল, কিন্তু এক্ষেত্রে সঙ্কল্পানুসারে দৈহিক কার্য্যের তারতম্য ঘটিয়া থাকে। সঙ্কল্পের নিমিত্ত কেহ মাংসাশী, সঙ্কল্পের নিমিত্ত কেহ হবিস্যভোজী, সঙ্কল্পের নিমিত্ত কেহ ফলাহারী, সঙ্কল্পের নিমিত্ত কেহ বাতাহারী হইয়া রহিয়াছেন। যাঁহার যেরূপ সঙ্কল্প, তাঁহার কার্য্যও তদ্রূপে সম্পাদিত হয়, সুতরাং তাহার ফল একজাতীয় হয় না। তাহা না হউক, কিন্তু এই ভিন্ন ভিন্ন সঙ্কল্পিত শ্রেণীর ব্যক্তিদিগের অবস্থা এক জাতীয়, তাহার সন্দেহ নাই। অর্থাৎ মাংসাশীদিগের শরীর, স্বভাব ও কার্য্য প্রায় একজাতীয় হয়, হবিষ্যভোজীদিগের সহিত মাংসাশীদিগের সাদৃশ্য থাকে না বটে, কিন্তু যাঁহারা হবিষ্যভোজী, তাঁহারা সকলে এক শ্রেণীর হইয়া থাকেন, অর্থাৎ একক্ষেত্রে তমোগুণী, অপরক্ষেত্রে সত্ত্বগুণী হইয়া থাকেন। তমোগুণী এক শ্রেণীর, সত্ত্বগুণী অপর শ্রেণীর।

কথিত হইল যে, সঙ্কল্পানুসারে দেহের পরিণাম নিরূপিত হইয়া থাকে। দেহ যখন শীঘ্র বিশ্লিষ্ট হয়, তখন উহা শীঘ্র দেহবিশেষে গমন করিতে পারে। যদ্যপি সঙ্কল্পসূত্রে শীঘ্র বিশ্লিষ্ট না হয়, তাহা হইলে উহা তদবস্থায় থাকিতে বাধ্য হইয়া থাকে। স্থূল দেহের যেরূপাবস্থা কথিত হইল, আত্মা সম্বন্ধেও সেইরূপ বুঝিতে হইবে। সঙ্কল্প থাকিতে আত্মা কখন পরমাত্মাতে মিলিত হইতে পারেন না। সঙ্কল্পযুক্ত আত্মা দেহবিহীন হইলে সেই প্রকার সঙ্কল্পবিশিষ্ট দেহে প্রবেশ করিয়া থাকেন। যেমন কাহার চুরি করিবার সঙ্কল্প আছে, তাহার আত্মা চোরের দেহ আশ্রয় করিয়া সঙ্কল্পানুসারে কার্য্য করিয়া লয়। এইরূপে আত্মাসকল নিজ নিজ সঙ্কল্পবিশেষে দেহবিশেষ অবলম্বন পূর্ব্বক

থাকেন। সেই দেহে এবং তাহার ঔরসজাত পুত্র কন্যাদিরূপে কার্য্যের ফলভোগ করিয়া থাকেন।

ইতিপূর্ব্বে বলিয়াছি যে, আত্মাবিশেষে আত্মা মিলিত হইলে ভাবান্তর উপস্থিত হয়। কিন্তু এক্ষণে আমি পুনরায় সেই কথাই বলিতেছি। যদ্যপি কিঞ্চিৎ ভাবিয়া দেখা যায় তাহা হইলে বুঝা যাইবে যে, আমার এই কথার ভিতরে অন্য অর্থ আছে। স্বজাতীয় এবং বিজাতীয় আত্মা বলিয়া আত্মাদিগকে দুই শ্রেণীতে বিভাগ করা যায়। স্বজাতীয় আত্মা স্বজাতীয় আত্মা পাইলে মিলিতে পারে কিন্তু বিজাতীয় হইলে সুতরাং গোলযোগ বাধিয়া থাকে। যেমন, সাধু সাধুর সহিত বাস করিতে পারেন, অসাধু কখন সাধুর নিকটে থাকিতে পারে না। মাতাল মাতালকে চাহে, গেঁজেল গেঁজেলকে চাহে, সতী সতীকে চাহে, বেশ্যা বেশ্যাকে চাহে। সতীতে বেশ্যাতে কখন সদ্ভাব স্থাপন হইয়া একআত্মা হইতে পারে না। সেইরূপ আত্মাসকল আপনাপন অনুকূল আত্মাবিশিষ্ট দেহে প্রবেশ করিয়া সঙ্কল্প সাধন করেন।

আমরা স্পষ্ট দেখিতে পাই যে, জরায়ুনিহিত আত্মার যে অবস্থা ভূপৃষ্ঠস্থিত আত্মার সেরূপাবস্থা নহে। বাল্যকালে তাহার আত্মা যে প্রকার, যুবাকালে সে প্রকার থাকে না, প্রৌঢ় এবং বৃদ্ধ কালের কথাও তদ্রূপ বলিয়া প্রতীয়মান হইয়া থাকে। এ কথা মিথ্যা নহে যে, শিশু মাতৃগর্ভ হইতে বাহির হইয়া জীবনের পূর্ণভাব লাভ করিয়া থাকে। কালসহকারে পাঞ্চভৌতিক দেহ যেমন বর্দ্ধিত হয়, তেমনি আত্মার কার্য্যও দিন দিন বাড়িয়া থাকে। বাহিরের পদার্থ সকল শরীরে প্রবেশ করিয়া শরীরের পুষ্টি এবং পরিবর্দ্ধন সাধন করিলে তাহার শক্তি বৃদ্ধি হয় কিন্তু যদ্যপি বিজাতীয় পদার্থ কোনরূপে শরীরে প্রবেশপথ পায়, তাহাহইলে তৎক্ষণাৎ বিপরীত কার্য্য হইতে থাকে। যেমন নাইড্রোজেন

ঘটিত অঙ্গারের যৌগিকবৃন্দ দ্বারা শরীর বলাধান লাভ করে। যদ্যপি হাইড্রোসিয়ানিক অ্যাসিড প্রয়োগ করা যায়, তাহা হইলে শরীরের বলাধান হওয়া দূরে থাকুক, তাহার পঞ্চত্বলাভ হইবে। স্বজাতীয় পদার্থ সকল যেমন শরীরে বলবিধান করিয়া তাহাকে কার্য্যক্ষম করিয়া থাকে, স্বজাতীয় আত্মা সকলও সেইরূপে দেহবিশেষে ক্রমে ক্রমে প্রবেশ করিয়া থাকে এবং তদ্দ্বারা সঙ্কল্পিত কার্য্য সাধন পূর্ব্বক ফলাফল ভোগ করিয়া থাকে। দৈহিক পদার্থ সকল বিজ্ঞান শাস্ত্রমতে রূঢ় পদার্থের যৌগিকবিশেষ। এই যৌগিকসমূহ অবস্থাবিশেষে তদবস্থায় থাকিয়া পুনরায় দেহে প্রবেশ করে এবং অবস্থা বা সঙ্কল্পবিশেষে উহারা যোগভ্রষ্ট হইয়া রূঢ়াবস্থা লাভ করিয়া কিয়ৎকাল স্বতন্ত্রভাবে থাকিতে পারে। সেইরূপ আত্মা সঙ্কল্পের দ্বারা দেহবিশেষে প্রবেশ করে, এবং সঙ্কল্পের হ্রাস হইলে মুক্তাবস্থায় পরমাত্মাতে বিলীন হইয়া যায়। অতএব সঙ্কল্পই আত্মার বদ্ধ এবং মুক্তির কারণ।

আত্মাসম্বন্ধে যাহা কথিত হইল, তাহার তাৎপর্য্য এই যে, আত্মা শরীর হইতে বাহির হইয়া কখন তৎক্ষণাৎ কোন দেহে প্রবেশ করেন, কখন বা কিয়ৎকাল কোন দেহাশ্রয় করেন না। যেমন কোন রূঢ় পদার্থ যোগভ্রষ্ট হইবার সময় স্বসম্বন্ধীয় পদার্থ প্রাপ্ত হইলে তৎক্ষণাৎ যৌগিকাবস্থায় গমন করে এবং কখন মুক্তভাবেই থাকিয়া যায়, আত্মা সম্বন্ধেও তেমনি বুঝিতে হইবে।

আত্মা বিষয়টী অতিশয় কঠিন এবং নীরস। আমি নিতান্ত অনিচ্ছার বশবর্ত্তী হইয়া এই প্রস্তাবটী লইয়া আলোচনা করিতে আসিয়াছি। এক সময়ে আমি আত্মার অস্তিত্ব লইয়া অনেক আন্দোলন করিয়াছি, কিন্তু ইহা বিচার দ্বারা কস্মিন্‌কালে মীমাংসা করা যায় না। যখন যাহার সময় হয়, তখন তাহার চক্ষের সম্মুখে আত্মা প্রতীয়-

মান হইয়া থাকেন। যেমন বায়ুর কত ভার কাহাকেও বুঝাইয়া দেওয়া যায় না, দুগ্ধে মাখন আছে কি না, তাহা কথায় কাহাকেও বুঝাইয়া দেওয়া যায় না, সন্দেশের আস্বাদন কখন বর্ণনা করিয়া অপরকে জ্ঞাত করা যায় না, রমণ-সুখ কখন শব্দের দ্বারা তদ্‌ভাবানভিজ্ঞকে উপলব্ধি করান যায় না, সেইরূপ স্থূল দৃষ্টান্ত অবলম্বন পূর্ব্বক আত্মা প্রমাণ করিতে যাওয়া বিড়ম্বনা মাত্র। কেহ বলিতে পারেন, তবে আপনার এ বিড়ম্বনা কেন? আমি পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, আমি যন্ত্রবৎ কার্য্য করিতে বাধ্য। কতিপয় ব্যক্তি এ প্রসঙ্গটী শ্রবণ করিতে ইচ্ছা প্রকাশ করেন, সুতরাং তাঁহাদের মনোরথ পূর্ণ করিবার নিমিত্ত প্রভুর আদেশ পালন করিতে আসিয়াছি। আত্মা কি, কেমন, তাহা সাধন বিনা জ্ঞাত হওয়া যায় না। যোগের অবস্থাবিশেষে উপনীত হইলে আত্মা স্বপ্রকাশ হন; যাহাকে স্বস্বরূপ দর্শন কহে। বর্ত্তমানকালে ধর্ম্ম শাস্ত্রাদিতে আমাদের বিশ্বাস না থাকায় আত্মা বলিয়া কিছুই মানিতে চাহি না। আত্মা মানিলে স্বাধীনভাব বিদূরিত হইয়া যায়, সুতরাং ইচ্ছামত কুক্রিয়াদিপরতন্ত্র হওয়া যায় না। ভগবানের ভয় থাকিলে পরকালের কর্ম্মফল বোধ থাকিলে, কর্ত্তব্য ত্রুটির ভীষণ পরিণাম মানসক্ষেত্রে নিয়ত জাগরূক থাকিলে, কখন কেহ অন্যায় অকর্ত্তব্য কার্য্যপরায়ণ হইতে পারে না। সেইজন্য আত্মা অবিশ্বাস করা বর্ত্তমানকালের যুগধর্ম্ম হইয়া উঠিয়াছে। রামকৃষ্ণদেব আত্মার অস্তিত্ব এবং তাহার কার্য্য প্রদর্শন করাইবার নিমিত্ত অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। তিনি প্রতিমুহূর্ত্তে সমাধিস্থ হইয়া আত্মার পরিচয় দিয়া গিয়াছেন। তিনি যখন যে কোন লীলা কথা শ্রবণ করিতেন, তিনি তখন সমাধিস্থ হইতেন, অর্থাৎ তাঁহার আত্মা দেহত্যাগ করিয়া বাহির হইয়া চলিয়া যাইতেন। তিনি একদিন সমাধিভঙ্গের পর বলিয়াছিলেন যে, "আমি সরয়ূ তীরে চলিয়া গিয়া-

ছিলাম। তথায় রাম, লক্ষণ এবং সীতাকে দেখিয়া আসিলাম।" আর একদিন সমাধিভঙ্গের পর বলিয়াছিলেন যে, "আমি বৃন্দাবনে গিয়াছিলাম। তথায় যাইয়া দেখি যে, শ্রীকৃষ্ণ রাসলীলা করিতেছেন, আমি একজন সখী হইয়া আনন্দে বিহার করিয়া আসিলাম। শরীরের নিকট আসিয়া একবার ইচ্ছা হইল যে, আর খাঁচার ভিতর প্রবেশ করিব না। আবার মনে হইল, দিনকয়েক উহা লইয়া লীলারহস্য দেখিয়া বেড়াই। এই ভাবিয়া শরীরের ভিতরে পুনরায় প্রবেশ করিলাম।" আমরা দেখিয়াছি যে, তিনি সমাধিভঙ্গের সময়ে আপনাপনি বলিতেন যে, "এই ঘর, এই ঘরে আমি থাকি", সম্মুখে কেহ থাকিলে কহিতেন যে, "ইহারা কলিকাতা হইতে আসিয়াছে।" এইরূপে ক্রমে ক্রমে সমুদয় পদার্থ স্মৃতিপথে আনিতে চেষ্টা করিতেন, পরে সহসা হাসিয়া বলিতেন, "দেখ আমার কেমন এক রকম হইয়াছে, কিছুই স্মরণ থাকে না।"

প্রভু রামকৃষ্ণদেব যে শরীর ত্যাগ করিয়া আত্মার স্থানান্তরে গমনাগমন করিতেন, তাহার একটী দৃষ্টান্ত প্রদান করিতেছি। প্রভু যখন পীড়ার চিকিৎসা করাইবার নিমিত্ত কলিকাতার উত্তর বিভাগস্থিত শ্যামপুকুরষ্ট্রীটে অবস্থিতি করিয়াছিলেন, সেই সময়ে একদিন রজনীকালে পরম প্রেমিক বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী মহাশয় ঢাকায় চলিয়া যাইবেন বলিয়া বিদায় প্রার্থনা করিলে প্রভু কহিয়াছিলেন যে, "তুমি দিন কয়েক আমার নিকটে থাকিলে আমি বিশেষ আনন্দিত হইব। আমি তোমাকে দেখিতে বড় ভালবাসি।" গোস্বামীজী প্রেমপূর্ণভাবে গদগদস্বরে কহিলেন, "প্রভু! একি নূতন লীলা আপনার? আপনার এই কথা বলিবার অর্থ আপনিই জানেন। আপনি কোন্ দিন দর্শন না দিয়া দাসকে কৃতার্থ করেন?" প্রভু তাঁহার স্বাভাবিক অমিয় হাস্য করিয়া বলিয়া উঠিলেন, তোমার বিশ্বাস যেরূপ, সেইরূপই বল, তুমি

হয়ত ভ্রম দর্শন করিয়া থাক।" প্রভুর এই রহস্যরঞ্জিত রঙ্গ দেখিয়া গোস্বামীজী কহিলেন, "প্রভু! কেন আমায় বঞ্চনা করেন?" যাহা দেখি তাহা ভ্রম! আমি যে আপনার পদসেবা করিয়া থাকি!" এই বলিয়া তিনি প্রভুর উরুদেশে হস্তার্পণ পূর্ব্বক বলিলেন, "এখন যেমন আপনাকে উপলব্ধি করিতে পারিতেছি, তখনও এইরূপ উপলব্ধি করিয়া থাকি।" প্রভু আপনি এইরূপে নানাস্থানে ভক্তদিগের মনোসাধ পূর্ণ এবং বর্ত্তমানকালের অবিশ্বাসীদিগের বিশ্বাস স্থাপন করিবার জন্য আত্মারূপে পরিভ্রমণ করিয়াছিলেন। একথা যে কেবল আমি একাকী জানি, তাহা নহে। রামকৃষ্ণদেবের প্রত্যেক ভক্তের মুখে এই কথা শুনা যায়।

স্থূলে যদিও আত্মা এবং দেহ স্বতন্ত্র বলিয়া জ্ঞাত হওয়া যায় এবং প্রভুর লীলা হইতে তাহার দৃষ্টান্ত দেওয়া গেল, কিন্তু বাস্তবিক দেহ এবং আত্মার পার্থক্য নাই। এক পরমাত্মাই আত্মা, দেহ এবং সকল প্রকার দৃশ্য ও অদৃশ্য পদার্থের একমাত্র নিদানস্বরূপ; একথাটী যেন কেহ বিস্মৃত না হন। যেমন জল, বরফ এবং বাষ্প তিনটীই এক পদার্থের রূপান্তর হইলেও জল ও বরফ হইতে বাষ্প বাহির হইয়া একাকার থাকে; সেইরূপ পরমাত্মা, আত্মা এবং জড় পদার্থাদির স্বাতন্ত্র্য সত্ত্বেও এই ত্রিবিধাবস্থায় পরমাত্মা একভাবে অবস্থিতি করিয়া থাকেন। এই নিমিত্ত জড় বস্তু বলিয়া কাহাকে স্বীকার করা যায় না।

সর্ব্বত্রে চৈতন্য বা পরমাত্মা বিরাজ করেন, ইহাও বিশ্বাস করিবার কথা নহে। কারণ, জড়পদার্থ বলিয়া আমাদের বিলক্ষণ জ্ঞান আছে, সেই চিরাভ্যস্ত সংস্কার বিনা বিজ্ঞানে কখন বিদূরিত হইতে পারে না। প্রভুর শ্রীমুখে আমি শুনিয়াছি যে, সর্ব্বত্রেই পরমাত্মা বিরাজ করিয়া থাকেন। এমন স্থল নাই, যেস্থানে তাঁহার অস্তিত্ব নাই। দেখিবার

চক্ষু হইলেই তাঁহাকে দেখা যায়। যেমন বায়ু অদৃশ্য বস্তু, চক্ষে দেখা যায় না, কিন্তু বৈজ্ঞানিক চক্ষু ফুটিলে তাহাতে ইহার ছবি দর্শন করা যায়। এই কথা আমার স্মরণ ছিল, কিন্তু পরমাত্মা যে কিরূপে সর্ব্বত্রে পরিব্যাপ্ত হইয়া আছেন, তাহা দর্শন অদৃষ্টক্রমে সংঘটন হয় নাই। একদা পূজার সপ্তমীর দিবস প্রাতঃকালে আমি ট্রাম গাড়ীতে চড়িয়া ধর্ম্মতলায় যাইতেছিলাম, পথে মনে হইল যে, ঠাকুর বলিয়াছিলেন যে, সর্ব্বত্রে পরমাত্মা বিরাজ করিয়া থাকেন, কিন্তু সে কথা কথাই হইয়া রহিল। এইরূপ মনে করিবামাত্র আমার শরীর কণ্টকিত হইয়া উঠিল, প্রাণ ব্যাকুলিত হইয়া উঠিল, তখন যে দিকে চাহিয়া দেখি, সেই দিকেই কি অপূর্ব্ব ছবি দর্শন করিতে লাগিলাম, তাহা বলিতে পারি না। আহা? সে দর্শনের উপমা নাই, বলিবার শব্দ নাই, বাস্তবিক বোবার স্বপ্নবৎ। সে দর্শন রূপবিশেষ নহে, জ্যোতিঃবিশেষও নহে। যে দিকে যাহা ছিল, সে দিকেই তাহা দেখিতেছি এবং তাহাদের অন্তর বাহির সেই অপূর্ব্ব অব্যক্ত দৃশ্য পদার্থের দ্বারা উলুতপ্লুত হইয়া রহিয়াছে। ক্রমে আমি বিহ্বল হইয়া পড়িলাম। নয়নে বারিধারা আসিতে লাগিল, কিন্তু ছার লোকলজ্জা আসিয়া বলিতে লাগিল, সাবধান ট্রামে অপর ভদ্র-লোক রহিয়াছেন, তোমাকে কাঁদিতে দেখিলে তাঁহারা কি মনে করি-বেন? অতএব ভাব সঙ্কোচ করিতে চেষ্টা কর। লজ্জার পরামর্শই বলবতী হইয়া উঠিল, সুতরাং আমি অন্যমনা হইবার চেষ্টা করিতে লাগিলাম, কিন্তু সেত আমার চিত্তবিকারজনিত ঐন্দ্রজালিক ঘটনা নহে যে, অন্যমনা হইলে ভুলিয়া যাইব। সে দৃশ্য কিছুতেই গেল না। নয়ন আর বারিধারা সম্বরণ করিতে পারিল না, আমি কাঁদিতে লাগি-লাম। তখন মনে মনে প্রভুকে জানাইলাম যে, ঠাকুর আমি বুঝি-

য়াছি, আপনি যাহা, তাহা প্রত্যক্ষ করিয়াছি, আর অধিক জানিতে চাহি না। আমি একাকী ট্রামে যাইতেছি, পাছে অজ্ঞান হইয়া পড়ি। অজ্ঞানহই তাহাতে চিন্তা নাই, কিন্তু লোকে কি মনে করিবে? এইরূপ মনে মনে প্রার্থনা করিবামাত্র অমনি সে দৃশ্য অদৃশ্য হইয়া গেল। আমি যাহা দেখিয়াছি, তাহা প্রকাশ করিবার সাধ্যমত চেষ্টা করিলাম. যদ্যপি কাহার এ অবস্থা হইয়া থাকে, তিনি বুঝিতে পারিবেন। আত্মা বা পরমাত্মা বিষয় বুঝাইবার নহে এবং বুঝিবারও নহে; তাহা সময়ের কার্য্য, সময়ে হয় এবং সময়ে আপনি বুঝা যায়। যাহার যখন সময় হইবে, তিনি সেই সময়ে আপনি বুঝিয়া লইবেন।

শেষ কথা হইতেছে যে, যদ্যপি পরমাত্মা সঙ্কল্পিত হইয়া জীবাত্মা বা আত্মার ভাবে জীবাদিরূপে সঙ্কল্পে পরিভ্রমণ করিয়া থাকেন এবং যে পর্য্যন্ত সঙ্কল্প সমূলে বিনষ্ট না হয়, সে পর্য্যন্ত সে আত্মা কখন পরমাত্মায় মিলিত হইতে পারেন না, তাহা হইলে অবতারের প্রয়োজন হয় কেন? অবতার বলিয়া কাহাকে স্বীকার করিবার হেতু কি?

রামকৃষ্ণদেব বলিয়া গিয়াছেন যে, "পঞ্চভূতের ফাঁদে ব্রহ্ম পড়ে কাঁদে।" ইতিপূর্ব্বে অনেক স্থলে বলিয়াছি যে, রামকৃষ্ণদেব সর্ব্বদা বরাহ অবতারের দৃষ্টান্ত প্রয়োগ করিতেন। অতএব ঐ দৃষ্টান্ত দ্বারা আমাদের অদ্যকার প্রস্তাব মীমাংসা করা হউক।

স্বয়ং বিষ্ণুই বরাহরূপে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। অবতারের কার্য্য পরিসমাপ্ত করিয়া তিনি শূকরী ও শাবকাদি লইয়া দুর্গন্ধময় পঙ্কিলস্থানে শয়ন করিয়া দিনযাপন করিতে লাগিলেন। বহুদিবস অতিবাহিত হইয়া গেল, তথাপি তিনি লীলারূপ পরিত্যাগ করিলেন না। ব্রহ্মা, শিব ও অন্যান্য দেবতারা, বরাহরূপী বিষ্ণুর নিকটে আসিয়া প্রার্থনা করিতে লাগিলেন। প্রার্থনায় সন্তুষ্ট হইয়া বরাহরূপী বিষ্ণু কহিলেন যে,

দেবগণ! আমায় তোমরা বিরক্ত করিও না। আমি পরমসুখে আছি। শূকরীর ভালবাসায়, শাবকদিগের পিতৃভক্তিতে, আমি পরমসুখে আছি। তোমরা নিজ নিজ স্থানে গমন কর, আর আমায় বিরক্ত করিও না। এই কথা শ্রবণান্তে মহেশ্বরের সহিত তুমুল সংগ্রাম হয় এবং তাহাতে উভয়েই যারপরনাই শ্রান্তিযুক্ত হইয়া পড়েন। পরে ব্রহ্মার সহিত যুক্তি করিয়া পাঞ্চভৌতিক দেহই সকল বিপত্তির মূলীভূত কারণ স্থির হয় এবং ঐ শূকরদেহ শিব কর্ত্তৃক বিদীর্ণ হইবামাত্র চতুর্ভুজ বিষ্ণু সহাস্যে প্রস্থান করেন। অবতারেরা শিবের ন্যায় কার্য্য করিতে আসিয়া থাকেন। আত্মা যখন ক্রমান্বয়ে সঙ্কল্পের উপর সঙ্কল্প করিয়া একেবারে আবদ্ধ হইয়া পড়েন, তখন সেই সঙ্কল্পাবদ্ধ আত্মার সঙ্কল্পক্ষয় করিয়া বিমুক্ত করিবার জন্য পরামাত্মা সঙ্কল্প করেন। এইরূপ সঙ্কল্পিত পরামাত্মাকে অবতার কহা যায়।

ইতিহাস পাঠ করিয়া দেখিলে বুঝা যায় যে, যে সময়ে আত্মা অর্থাৎ জীবগণ সঙ্কল্পের চরমসীমায় উপস্থিত হন, সেই সময়ে অবতারের আগমন অবশ্যম্ভাবী। শাস্ত্রেও তাহাই কথিত আছে।

বর্ত্তমানকালে আমরা সকলেই কামিনীকাঞ্চন সঙ্কল্পে ডুবিয়া গিয়াছি, আমাদের এমন অবস্থা আসিয়াছে যে, আত্মাকে সঙ্কল্পহীন করা দূরে যাউক, তাহার অস্তিত্ব অস্বীকার করিয়া বেড়াই। সঙ্কল্পক্ষয় না করিয়া প্রতিক্ষণে তাহার সংখ্যা বাড়িয়া যাইতেছে। মন সঙ্কল্প-বিবর্জ্জিত নহে, সুতরাং তাহার কার্য্য আরম্ভ হইলেই ক্রমান্বয়ে সঙ্কল্পাশ্রয় করিতে চাহে। একবার সঙ্কল্পের করগ্রস্ত হইলে অমনি মনকে কোথায় লইয়া যায়, তাহার ইয়ত্তা করা সাধ্যাতীত হইয়া পড়ে। আত্মাকে স্বপ্রকাশ করিবার নিমিত্ত আমরা কি ব্যতিব্যস্ত হইয়া থাকি? অথবা যাহাতে তাহার উপরে উপর্য্যুপরি আবরণ

পতিত হইয়া যায়, তাহার ব্যবস্থা করিতে ধাবিত হই? আত্মা কোথায়, কি উপায়ে তাঁহাকে দেখিব, কেমন করিয়া পরমাত্মার নিকটস্থ হইব, এরূপ সঙ্কল্প কোথায়? সুতরাং আমরা অতি শোচনীয়াবস্থায় পতিত হইয়াছি। আমাদের যেপ্রকার অবস্থা আসিয়াছে, আমাদের আত্মা যেপ্রকার সঙ্কল্লাবৃত হইয়াছে, তাহাতে আমাদের দ্বারা আত্মার কোনপ্রকার কল্যানসাধন হইতে পারে না। বরাহরূপী নারায়ণের শূকরী ও শাবকদিগের সহিত সহবাসের ন্যায় আমরা কামিনী ও সন্তানাদি লইয়া পঙ্কিল সংসারে নিশ্চিন্ত হইয়া শয়ন করিয়া রহিয়াছি। একবার মনে হয় না যে, এ দিনের পরিসমাপ্তি হইলে কি হইবে? যাইব কোথায়? ব্রহ্মাদি দেবতাদিগের ন্যায় শাস্ত্রবাক্যাদি কর্ণবিবরে প্রতিধ্বনিত হইলে যদিও আত্মার দুর্দ্দশাবস্থার কথা স্মরণ হয় বটে, কিন্তু শূকর শাবকদিগের ন্যায় সন্তানসন্ততীর মুখাবলোকন করিবামাত্র সঙ্কল্লাবরণ মনে পতিত হইয়া যায়। অমনি বিস্মৃতি আসিয়া অধিকার করে। প্রকৃতপক্ষে আমাদের তদ্রূপ দশা ঘটিয়াছে। এই অবস্থা হইতে উদ্ধারের আর আমাদের উপায়ন্তর নাই, এই অবস্থায় কল্যাণ বিধান হইবার অন্য ব্যবস্থা নাই। বরাহের যেমন পাঞ্চভৌতিক দেহ বিদারণ হইবামাত্র, বিষ্ণু শূকরীর প্রেমজাল এবং শাবকদিগের মায়াপাশ বিচ্ছিন্ন করিয়াছিলেন, রামকৃষ্ণদেব তেমনি জ্ঞান, বিজ্ঞান এবং ভক্তিরূপ ত্রিশূল দ্বারা আমাদের সঙ্কল্পিত দেহ বিদারণ পূর্ব্বক আত্মা দর্শনের ব্যবস্থা করিয়া গিয়াছেন। রামকৃষ্ণের ত্রিশূলাঘাত ভিন্ন বর্ত্তমান কালে উপায় নাই। জ্ঞান, বিজ্ঞান এবং ভক্তি একত্রে তিনি সামঞ্জস্য করিয়া গিয়াছেন। প্রকৃত তত্ত্বজ্ঞান লাভের রাজপথ তিনিই খুলিয়া দিয়া গিয়াছেন। স্বীকার করি, জ্ঞান-পথ, বিজ্ঞান-পথ ও ভক্তি-পথ ছিল—এখনও আছে, কিন্তু

ইহাদের সামঞ্জস্য করিয়া সর্ব্বত্রে কল্যাণ বিস্তার করিবার তিনিই একমাত্র কারণস্বরূপ হইয়াছেন। জ্ঞানী কখন বিজ্ঞানী এবং ভক্তের সহিত সহানুভূতি করিতে পারিবেন না, বিজ্ঞানী কখন জ্ঞানী এবং ভক্তের সহিত সহানুভূতি করিতে পারিবেন না, ভক্ত কখন জ্ঞানী এবং বিজ্ঞানীর সহিত সহানুভূতি করিতে পারিবেন না, এ কথা প্রত্যেকের প্রাণে প্রাণে নিহিত রহিয়াছে—এ কথা প্রতি শাস্ত্রে পরিচয় দিতেছেন। তাই বলেতেছি যে, যে কেহ সঙ্কল্পযুক্ত হইয়া ভাসিয়া যাইতেছেন, যে কেহ আত্মাকে স্বপ্রকাশ করিতে চাহেন.যে কেহ সর্ব্বত্রে পরমাত্মার সুন্দর ভাতি নিরীক্ষণ করিতে চাহেন, তাঁহারা আসিয়া রামকৃষ্ণ নাম উচ্চারণ করুন, নামের গুণে কি হয় বা না হয় আপনা-আপনি বুঝিতে পারিবেন। এ কথা কাল্পনিক নহে, এ কথা উপকথা নহে. এ কথা উপন্যাস নহে, এ কথা মনতুষ্টির নিমিত্ত নহে, ইহা প্রাণের কথা—প্রত্যক্ষ কথা—প্রাণ জুড়াইবার কথা। আমি বলিতেছি না যে. সাধক,ভক্ত, জ্ঞানী, বিজ্ঞানীরা আপনাপন পথ—সাধনা—পরিত্যাগ পূর্ব্বক রামকৃষ্ণ-সম্প্রদায়ভুক্ত হইয়া যান ; যাঁহারা সাধন ভজনবিহীন. সঙ্কল্পের দ্বারা নাগপাশে আবদ্ধ হইয়া পড়িয়াছেন, যাঁহারা বরাহরূপী নারায়ণের ন্যায় শূকরী ও শূকরশাবকের মায়ায় বিমোহিত হইয়া পতিত রহিয়াছেন, যাঁহাদের নিজের শক্তি নাই, ভক্তি নাই, জ্ঞান নাই, উপায় নাই, অর্থ নাই, সামর্থ্য নাই, যাঁহাদের আশ্রয়দাতা নাই, তাঁহাদের—সেই দীন হীন অজ্ঞান নরনারীদিগের—এক মাত্র উপায় শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ।

গীত।

কৃপা সবে সম বরষে যেথা প্রাণ চাহে
পেয়ে জীবন তব শরণ সদা ফুল্ল রহে॥
করুণা অপার, নাহিক বিচার, যে চাহে তুমি তার হে।
সংযোগী বিরাগী, সংসারী বা ত্যাগী, অবারিত কৃপা-দ্বার হে॥
মিনতি চরণে, ভুলনা এ দীনে, না চাহি তব বিরহে।
সম্পদে বিপদে, হরিষে বিষাদে, মতি পদে চির রহে হে॥

(২)

অজ্ঞানে আশ্রয়হীনে কে রাখে তোমা বিনে।
ওহে দয়াল ঠাকুর বেড়াও খুঁজে কে ডাকে কাতর প্রাণে॥
পাপে সদাই মতি ধায়, তাই রেখেছ রাঙ্গা পায়,
জুড়ালে সকল জ্বালা দেখে নিরুপায় ;—
ঐ নামটী বলে (রামকৃষ্ণ ব'লে) যাব চলে, অবহেলে ঘোর তুফানে
শুনেছি সাগর জলে, ভাসে শীলে একটী নামের গুণে ;—
আমার পাপের ভরা, যুগল ভরা, ভাস্‌ল বিভোর নামের গানে॥

(৩)

তুমি হে দীনের সখা জানি চিরদিন।
মোরা দীন বলে তাই ও চরণ চাই, (তব) কৃপার অধীন॥
তোমার নামটী শুনে কতই প্রাণে আশার উদয়,
ডাকি রামকৃষ্ণ রামকৃষ্ণ রামকৃষ্ণ দয়াময়,
নামে দিয়েছ অভয় ;—
ঐ জীবতারণ মধুর নামে বিভোর থাকি নিশিদিন॥

রামচন্দ্রের বক্তৃতাবলী।

চতুর্দ্দশ বক্তৃতা।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেব কথিত

বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম।

১৩০১—২৪শে বৈশাখ রবিবার,—সিটি থিয়েটারে

প্রদত্ত।

৬০ রামকৃষ্ণাব্দ।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ

শ্রীচরণ ভরসা।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবকথিত

বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম।

ব্রাহ্মণাদি সকলের চরণে প্রণাম।

বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম, এই প্রসঙ্গ লইয়া আমাদের সর্ব্বদা বিবাদ বিগ্রহে লিপ্ত হইতে হয়। যে সময়ে বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম প্রচলিত ছিল, যে সময়ে সকলে বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম প্রতিপালন করিতেন, সে সময়ে আশ্রম-ধর্ম্ম লইয়া কখন বিবাদ বা মতান্তর হইত না। যিনি যে বর্ণের অন্তর্গত হইতেন, তিনি সেই বর্ণের আশ্রম-ধর্ম্মাদি মতে অবশ্যই পরিচালিত হইতে বাধ্য হইতেন। বর্ত্তমান কালে আশ্রমাদি বিভাগ আর নাই বলিলে অত্যুক্তি হয় না। যদিও বর্ণবিভাগ এখনও আছে, কিন্তু তাহা উঠাইয়া দিবার জন্য আজকালকার উন্নত সভ্য মহাশয়দিগের বিশেষ দৃষ্টি পতিত হইয়াছে। অনেকের হৃদয়ের কথা এই যে, বর্ণবিভাগ থাকায় ভারতের বিশেষ ক্ষতি হইয়াছে. যে দিন বর্ণভেদ অপনীত হইবে, সেই দিন হইতে সুখসূর্য্য উদয়াচলে স্বপ্রকাশিত হইয়া ভারতের পূর্ব্ব বিভূতি পরিবর্দ্ধিত করিতে থাকিবে।

আশ্রমধর্ম্ম সম্বন্ধে কোন কথারই উল্লেখ দেখা যায় না। ব্রহ্মচর্য্য, গার্হস্থ্য, বানপ্রস্থ এবং সন্ন্যাস, এই চতুরাশ্রমে অবস্থান করিয়া জীবন অতিবাহিত করিতে হয়, একথা আমরা ভুলিয়া গিয়াছি। এই বর্ণ

বিভাগ এবং আশ্রমধর্ম্ম আমাদের পক্ষে বাস্তবিক হিতকর কি না, অদ্য রামকৃষ্ণদেবের আদেশ মতে তাহার মীমাংসা করিতে আসিয়াছি। দয়াময়! দয়া করিয়া উনবিংশশতাব্দীর অবোধ নরনারীদিগের জ্ঞানচক্ষু উন্মীলন করিবার নিমিত্ত বিজ্ঞানপূরিত উপদেশ-রত্নরাজি যেমন অকাতরে দান করিয়া থাকেন, অদ্য প্রভু! তেমনি করিয়া কৃপাকটাক্ষ করুন, যেন আমরা আশা মিটাইয়া যাইতে পারি।

অদ্যকার প্রস্তাবটী দুই ভাগে বিভক্ত করিয়া আলোচনা করা যাইবে। বর্ণ এবং আশ্রমধর্ম্ম কাহাকে কহে? বর্ণ বলিলে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য এবং শূদ্র বুঝায়। এই বর্ণান্তর্গত নরনারীদিগের বাল্য, যৌবন, প্রৌঢ় এবং বৃদ্ধাদি অবস্থাচতুষ্টয়সঙ্গত কার্য্যবিশেষকে আশ্রমধর্ম্ম বলা যায়। অর্থাৎ জীবনকে চারি ভাগে বিভক্ত করিয়া প্রথমে বিদ্যাদি উপার্জ্জন যাহাকে ব্রহ্মচর্য্য, তৎপরে সংসার বা গৃহাশ্রম, তৃতীয়াবস্থায় সংসার পরিত্যাগ করিলে বানপ্রস্থ এবং সন্ন্যাস বা চতুর্থাশ্রম বলিয়া উল্লিখিত হয়।

যবন এবং ম্লেচ্ছাধিকারের পূর্ব্বে হিন্দুসমাজ উপরোক্ত নিয়মাধীনে থাকিয়া বর্ণাশ্রম-ধর্ম্মমতে পরিচালিত হইত। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় এবং বৈশ্যাদি উৎকৃষ্ট বর্ণত্রয়ের নিমিত্ত আশ্রমধর্ম্ম নিরূপিত ছিল, শূদ্রেরা নিকৃষ্ট বৃত্তি অর্থাৎ ত্রিবর্ণের দাস্যাদি কার্য্যের দ্বারা জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিতেন। যদিও উৎকৃষ্ট বর্ণত্রয়ের ন্যায় শূদ্রের আশ্রমধর্ম্মবিশেষ প্রতিপালন করিবার নিয়ম ছিল না, কিন্তু তাঁহারা ইচ্ছা করিলে তাহাও পারিতেন।

কালসহকারে হিন্দুস্থানে হিন্দুরাজাসনে যবনরাজ আসিয়া উপবেশন করিলেন। ক্রমে হিন্দুর আচারব্যবহার এবং আশ্রমধর্ম্মাদি সঙ্কুচিত হইয়া বর্ত্তমান কালে তাহা একেবারে বিলুপ্তপ্রায় হইয়া

গিয়াছে। যদিও সাক্ষাৎ সম্বন্ধে বর্ণবিভাগ অদ্যাপি আছে, কিন্তু তাহা কার্য্যক্ষেত্রে এত জটিলভাবাপন্ন হইয়া পড়িয়াছে যে, সে বিভাগ থাকা না থাকা সমান বলিলে হয়।

অনেকের অভিপ্রায় এই যে, বর্ণ বিভাগ না থাকাই কর্ত্তব্য। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র প্রভৃতি বর্ণান্তর জ্ঞান থাকায় পরস্পর দ্বেষ ভাব জন্মিয়া থাকে এবং তজ্জন্য ভারতের অধঃপতন ঘটিয়াছে। এই বর্ণসঙ্কর ভাবানুমোদনকারী ব্যক্তিরা নিজ নিজ অভিপ্রায় কার্য্যে পরিণত করিতে সাধ্যমত চেষ্টা করিয়াছেন এবং তাহারা অনেক পরিমাণে কার্য্যেও পরিণত করিয়াছেন। সুতরাং চতুর্ব্বর্ণ স্থানে বর্ত্তমান কালে অসংখ্যক প্রকার বর্ণসঙ্কর বা যৌগিক বর্ণের অভ্যুদয় হইয়া ধরাধাম পরিপূর্ণ হইয়া গিয়াছে।

সৃষ্টির প্রারম্ভে চারিটী বর্ণের উৎপত্তি হয়, এই বর্ণচতুষ্টয় হিন্দুজাতি বলিয়া পরিগণিত। বর্ণচতুষ্টয় আশ্রমধর্ম্মাদি বিবর্জ্জিত হইয়া সঙ্কর অর্থাৎ বর্ণান্তর এবং বর্ণান্তরের সঙ্করত্ব সংঘটিত হইলে আচার ব্যবহারের বিপর্য্যয় হওয়ায় নানা প্রকার যৌগিক বর্ণের উৎপত্তি হয়, এক্ষণে যাহারা জাতিবিশেষ বলিয়া পরিচিত। অতএব আদি হিন্দু চারি বর্ণে বিভক্ত ছিলেন। কার্য্যকরী শক্তি এইরূপ বিভাগের ঔৎপত্তিক কারণ হইলেও বর্ণগত নির্দ্দিষ্ট লক্ষণ ছিল। ব্রাহ্মণ ব্রহ্মবিদ্যায় যতদূর পারদর্শী হইতে পারিতেন, শূদ্র কখন ততদূর কৃতকার্য্য হইতে পারিতেন না। কারণ, ব্রহ্মার সঙ্কল্পানুসারে ভিন্ন ভিন্ন প্রকার কার্য্যের নিমিত্ত চারিটী বর্ণের সৃষ্টি হয়। সুতরাং চারিবর্ণের বিশেষ বিশেষ লক্ষণ অবশ্যই থাকিবে।

একথা স্বীকার করিতে হইবে যে, চারিটী বর্ণ সৃষ্টি হইবার পর যৌগিক বর্ণের উৎপত্তি হইয়াছিল, কিন্তু তাঁহারা বর্ণচতুষ্টয়ের মধ্যেই

পরিগণিত হইতেন। যৌগিক বর্ণের আধিক্যতা হওয়ায় স্থানবিশেষে তাঁহারা বাসস্থান নির্দ্দেশ করেন এবং তাঁহাদের সংখ্যা বৃদ্ধি হওয়ায় ভিন্ন ভিন্ন দেশের ভিন্ন ভিন্ন জাতি বলিয়া এক্ষণে পরিচিত হইতেছেন। যেমন হিন্দুদিগের মতে পাঞ্চভৌতিক পদার্থ হইতে সমুদয় ব্রহ্মাণ্ড স্থজিত হইয়া থাকে বলিয়া উল্লিখিত হয়। পঞ্চভূত ব্যতীত ষষ্ঠ কিম্বা সপ্তম ভূতের আভাস নাই। এই পঞ্চভূত হইতে মহর্ষি, দেবর্ষি, রাজর্ষি প্রভৃতি সাক্ষাৎ ব্রহ্মজ্যোতিঃবিশিষ্ট ব্যক্তিগণ জন্মিয়াছেন। এই পঞ্চভূত হইতে যুধিষ্টির প্রভৃতি ক্ষত্রিয়দিগের উৎপত্তি হইয়াছে। এই পঞ্চভূত হইতে শ্রীমন্তের জন্ম হয়। এই পঞ্চভূত হইতে গোপালক প্রভৃতি শূদ্রদিগের স্থষ্টি হয় এবং এই পঞ্চভূতে বর্ত্তমান কালের যবন, ম্লেচ্ছ, চীন, মগ্, কাফ্রী প্রভৃতি জাতিদিগেরও উৎপত্তি হইয়াছে। এক্ষণে, কিরূপে বর্ণ বিচার করা যায়? হিন্দু শাস্ত্রপ্রমাণ ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য এবং শূদ্রাদি বর্ণদিগকে বর্ত্তমান কালে স্থির করিতে যাইলে হতাশ হইতে হইবে। কারণ, পূর্ব্বকালে এই বর্ণবিভাগ গুণানুসারে সাধিত হইয়াছিল, এক্ষণে সেই প্রণালীমতে বর্ণবিভাগ করা যায় না। কারণ, কালভেদে গুণের প্রভেদ হইয়া গিয়াছে। সুতরাং বর্ত্তমানকালে বর্ণবিভাগ গুণগত না হইয়া কুলগত হইয়া পড়িয়াছে। অতএব শাস্ত্রোক্ত বর্ণ অনুসন্ধান করিতে যাইলে প্রচলিত বর্ণে তাহার আকাঙ্ক্ষা মিটিবে না। এই নিমিত্তই সময়ে সময়ে একাকার হইবার রোল শুনিতে পাওয়া যায়। কারণ কার্য্যক্ষেত্রে বর্ণ বিচার নাই। সকল বর্ণের সকল প্রকার কার্য্যে অধিকার জন্মিয়াছে, সেস্থলে বর্ণবিচার লোপ হইয়াছে বলিয়া অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে। শাস্ত্রের বর্ণ-চতুষ্টয়ের তাৎপর্য্য বাহির করিয়া দেখিলে বুঝা যায় যে, ভগবৎতত্ত্ব লাভ করিবার শ্রেণীকে ব্রাহ্মণ, রাজ্যাদি রক্ষা ও শাসনাদি কার্য্য করিবার শ্রেণীকে

ক্ষত্রিয়, ব্যবসা বাণিজ্য করিবার শ্রেণীকে বৈশ্য এবং ইহাদের অন্যান্য কার্য্য করিবার শ্রেণীকে শূদ্র বলা হইত। এক্ষণে শাস্ত্রোক্ত বর্ণচতুষ্টয় লইয়া যদ্যপি কার্য্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হওয়া যায়, তাহা হইলে সামাজিক বিভাগ একেবারে চূর্ণ বিচূর্ণ হইয়া যাইবে। ভগবদ্ভক্ত শ্রেণীতে ব্রাহ্মণেরাই যে কেবল স্থল পাইবেন, তাহা নহে। যবন ও ম্লেচ্ছদিগ-কেও স্থান দিতে হইবে। ক্ষত্রিয় শ্রেণীতে হিন্দু ক্ষত্রিয়েরা সম্পূর্ণ স্থান পাইবেন না, তথায় যবন ম্লেচ্ছাদিরা শ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার করিবেন। বৈশ্যতেও ঐরূপ ব্যাপার এবং শূদ্র শ্রেণীতে সকল বর্ণের সমাবেশ দেখা যাইবে। শাস্ত্রমতে বর্ণ বিচার করিতে যাইলে প্রচলিত বর্ণ-দিগের লক্ষণের সহিত সাদৃশ্য দেখা যায় না, কিন্তু তাহা বলিয়া যে বর্ণ লোপ হইয়া গিয়াছে, এ কথা রামকৃষ্ণদেব স্বীকার করিতেন না। গুণভেদে বর্ণ বিভাগের কথা যাহা উল্লিখিত হইয়াছে, তিনি তাহাই বলিতেন। যে কেহ ব্রহ্ম চিন্তা করিয়া ব্রহ্মবিদ্ হন, তিনিই ব্রাহ্মণ। অবশ্য এরূপ ব্রাহ্মণকে সামাজিক ব্রাহ্মণ বলা যায় না। যে কেহ রাজ্য-শাসন করেন তিনিই ক্ষত্রিয়, ব্যবসা-বাণিজ্যপরায়ণ ব্যক্তিরা বৈশ্য এবং দাস্যোপজীবীরা শূদ্র বলিয়া পরিকীর্ত্তিত হইয়া থাকেন। গুণভেদে বর্ণবিচার করিলে সে প্রকার বর্ণ চিরকাল থাকিবে, তাহা কস্মিন্‌কালে বিলুপ্ত হইতে পারে না। ব্রাহ্মণেরা যদ্যপি আচারভ্রষ্ট না হইয়া নির্দ্দিষ্ট কার্য্যকলাপপরায়ণ থাকেন, তাহা হইলে তাঁহার ব্রাহ্মণত্ব যাইবে কেন? যেমন ধন থাকিলে ধনী বলে। সেই ধন যাহার নিকটে যায়, তৎকালে সেই ধনী বলিয়া পরিগণিত হয় এবং পূর্ব্বের ধনী দরিদ্র ও পথের ভিখারী হইয়া পড়েন। এক সময় তাঁহার ধন ছিল বলিয়া তাঁহাকে আর ধনী কহা যাইতে পারে না। গুণও তদ্রূপ। যখন যে ব্যক্তিতে প্রবেশ করে, তখন সেই ব্যক্তি গুণী হইয়া থাকেন। সম্রাট্ রাজ্যচ্যুত

হইলে তিনি আর সিংহাসনের অধিকারী বলিয়া পরিচয় দিতে পারেন না। ধনী বা সম্রাটের ধন এবং রাজ্যনাশ হইলে ধনী এবং সম্রাটের নিকট যদিও ধনসাম্রাজ্য চলিয়া গেল, কিন্তু তাহা বলিয়া একথা কেহ মনে করিতে পারেন না যে. সেই ধন ও সাম্রাজ্য একেবারে বিলয়-প্রাপ্ত হইয়া যায়।

সংসারে কোন পদার্থই বিনষ্ট হয় না। যে রৌপ্য ও সুবর্ণ পৃথিবীর প্রারম্ভে হিন্দুগণ ব্যবহার করিয়াছেন, সেই সুবর্ণ এবং রৌপ্য অদ্যাপি স্বর্ণ এবং রৌপ্যরূপেই রহিয়াছে। বিশেষ দৃষ্টান্তস্বরূপ বলিতেছি যে. হস্তিনার রাজভাণ্ডারস্থিত কহিনুর মোগলদিগের করগ্রস্ত হইয়া সুদীর্ঘ কাল সম্রাট্ পরম্পরায় ব্যবহার করিয়া লন। পরে ইংরাজাধিকার কালে উহা ব্রিটিস রাজকোষান্তর্গত হইয়া এক্ষণে ভিক্টোরিয়া মাতার শিরোভূষণ হইয়া রহিয়াছে। কহিনুর যেমন তেমনি আছে, কিন্তু উহা কত নৃপতি দেখিয়াছেন, তাঁহারা কোথায় চলিয়া গিয়াছেন! কিন্তু কহিনুরের কোন পরিবর্ত্তন সাধন হয় নাই। এই নিমিত্ত প্রভু কহিতেন যে, বর্ণবিভাগ কখন যাইবার নহে। পৃথিবীর যে কোন স্থানে হউক, তাহা থাকিবেই থাকিবে। যাহারা তাহা রক্ষা করিতে না পারিবে, তাহারাই তাহাতে বঞ্চিত হইবে।

আমাদের বাঙ্গালা দেশের অবস্থা পরিবর্ত্তন হইয়া গিয়াছে। ব্রাহ্মণ-বর্ণের যদিও লোপ হয় নাই, কিন্তু অপরাপর বর্ণের সম্পূর্ণ নবশ্রী হইয়াছে। ব্রাহ্মণ বর্ণ থাকিলে কি হইবে? গুণের সম্যক্ বিপর্য্যয় ঘটিয়াছে।

বর্ত্তমানকালে মোটের উপর হিন্দুর বর্ণগত বিপ্লব ঘটিয়াছে, ইহা অস্বীকার করা যায় না; সুতরাং, আশ্রমধর্ম্ম সম্বন্ধে সমূহ বিপর্য্যয় সং-ঘটিত হইবে, তদ্বিষয়ে আশ্চর্য্যের বিষয় কি? এই নিমিত্ত শাস্ত্রোক্ত

আশ্রমচতুষ্টয়ের কার্য্য একেবারেই বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে। আর সে ব্রহ্মচর্য্যের ব্যবস্থা নাই, আর সেই গার্হস্থ্যাশ্রমের সৌন্দর্য্য নাই, আর সেই বানপ্রস্থাশ্রমের মধুরতা নাই,আর সেই সন্ন্যাসের অপূর্ব্ব দৃশ্য নাই। আশ্রমচতুষ্টয় সম্পূর্ণরূপে বিকৃত হইয়া অভিনবরূপ ধারণ করিয়াছে। পূর্ব্বকালে অবস্থাবিশেষের নাম আশ্রম ছিল,এক্ষণে তাহা ইচ্ছাবিশেষের ফলস্বরূপ হইয়া দাঁড়াইয়াছে। ব্রহ্মচর্য্য অতি কঠিন কথা, এ অবস্থায় গুরুগৃহে বাস করিয়া বেদাদি অধ্যয়ন করিতে হইত, যে পর্য্যন্ত না কেহ ঈশ্বরতত্ত্বের সম্যক্ জ্ঞান লাভ করিতে পারিতেন, সে পর্য্যন্ত তাঁহাকে অধ্যয়ন কার্য্যে ব্যাপৃত থাকিতে হইত। জ্ঞান লাভ করিলে সেই ব্যক্তিই আপন কর্ত্তব্য বুঝিয়া জীবনযাত্রা সুচারুরূপে নির্ব্বাহ করিতে পারিতেন, সেই ব্যক্তি সংসারাদি আশ্রমের প্রকৃত উপযুক্ত পাত্র বলিয়া সেকালে বিবেচিত হইতেন। ব্রহ্মচারী যখন সংসারের রহস্যভেদ করিতে পারিতেন, তখনই তিনি তাহা পরিত্যাগ পূর্ব্বক আশ্রমান্তরে পদার্পণ করিতেন। ফলে পূর্ব্বকালে উচ্চবর্ণত্রয়ের লক্ষ্য ভগবানের দিকে ছিল, যেরূপে সেই জ্ঞান এবং ভাব লাভের সুবিধা হইত, তাহাই তাঁহাদের একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল এবং তাহা সাধন করিবার নিমিত্ত তাঁহারা সর্ব্বদাই সেইরূপে প্রস্তুত হইতেন।

বর্ত্তমানকালের উদ্দেশ্য পরিবর্ত্তিত হইয়া গিয়াছে। তত্ত্বজ্ঞান কিম্বা ভগবান্ লাভ করিবার নিমিত্ত কাহার জীবন প্রস্তুত করিবার উদ্দেশ্য নাই। বর্ণশ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণদিগের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া দেখুন, তাঁহাদের লক্ষ্য কোন্ দিকে? তাঁহারা ব্রহ্মচর্য্য কথাটা একপ্রকার বিস্মৃত হইয়াছেন বলিলে অন্যায় বলা হয় না। যদিও অদ্যাপি টোলের ব্যবস্থা আছে এবং তথায় ছাত্রেরা অধ্যয়নাদি করেন, কিন্তু তাঁহাদের উদ্দেশ্য বাহির করিয়া দেখিলে চমৎকৃত হইতে হইবে। ভগবৎজ্ঞান লাভ করা

তাঁহাদের উদ্দেশ্য নহে, বেদাধ্যয়ন করা তাঁহাদের জীবনের ব্রত নহে। কেহ ন্যায়, কেহ স্মৃতি এবং কেহ বা পুরাণের অংশবিশেষ আয়ত্ত করণ পূর্ব্বক পণ্ডিতশ্রেণীভুক্ত হইয়া অর্থোপার্জ্জনের নিমিত্ত দাস্যবৃত্তিবিশেষ অবলম্বন করিতেছেন, কিম্বা বিদায় প্রাপ্তির নিমিত্ত সর্ব্বদা ব্যতিব্যস্ত হইয়া থাকেন। ফলে ব্রহ্মচর্য্যাবস্থায় যে বিদ্যাশিক্ষা করা হয়, তাহার উদ্দেশ্য অর্থোপার্জ্জন করা। অতএব হিন্দুশাস্ত্রোক্ত ব্রহ্মচর্য্যাশ্রম বিকৃত হইয়া গিয়াছে। দ্বিতীয়াশ্রমকে গাহস্থ্যাশ্রম বলে।

ব্রাহ্মণেরা ব্রহ্মচর্য্যাশ্রম হইতে কখন সংসারী হইতেন এবং কখন একেবারে চতুর্থাশ্রমের আশ্রয় গ্রহণ করিতেন। ক্ষত্রিয় বৈশ্যেরা প্রায় সকলেই দ্বিতীয়াশ্রমে অবস্থিতি করিয়া শাস্ত্রাদেশ মতে বানপ্রস্থাশ্রমী হইতেন। শূদ্রদিগের যদিও শ্রেষ্ঠ বর্ণদিগের সেবা ব্যতীত অন্য কোন আশ্রমের অধিকার ছিল না, কিন্তু কেহ সাধন ভজনাদি করিতে ইচ্ছা করিলে তাহা শাস্ত্রনিষিদ্ধ বলিয়া উক্ত হইত না।

সুসন্তান লাভ করা তখনকার গার্হস্থ্যাশ্রমের উদ্দেশ্য ছিল। সুতরাং যে রূপে সুসন্তান জন্মিতে পারে, শাস্ত্রকারেরাও সেইরূপ ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। এই নিমিত্ত তাঁহারা ব্রহ্মচর্য্যাশ্রমের পর সংসারাশ্রমে প্রবেশ করিয়া শাস্ত্রবিহিত বিবাহ দ্বারা সংসারী হইতেন। ব্রাহ্মণের দৈব, আর্য্য, প্রাজাপত্য, গান্ধর্ব্ব, আসুর, রাক্ষস এবং পৈশাচ প্রভৃতি অষ্ট প্রকার বিবাহের দ্বারা যে প্রকার সন্তান জন্মিয়া থাকে, শাস্ত্রকারেরা তাহাও উল্লেখ করিতে বিস্মৃত হন নাই। যে যে বিবাহের দ্বারা সুসন্তান জন্মিত, পূর্ব্বকালের হিন্দুরা সেইরূপ বিবাহের পক্ষপাতী ছিলেন। সেইজন্য তাঁহাদের সন্তান সন্ততিরা স্বধর্ম্মাদি প্রতিপালন করিয়া যাইতেন। বর্ত্তমানকালের সংসারের উদ্দেশ্য সুসন্তান নহে। স্বধর্ম্ম রক্ষা করিবে, এমন সন্তানের কামনায় কেহ বিবাহ করেন না।

যে সকল বিবাহ শাস্ত্রানুমোদিত, তাহা বর্ত্তমানকালে কেহ গ্রাহ্য করিতে চাহেন না। হিন্দুদিগের অতি ঘৃণিত আসুর বিবাহ বলিয়া যে বিবাহের উল্লেখ আছে, তাহা বিকৃত হইয়া এক্ষণে দেশবিস্তারিত হইয়াছে। পূর্ব্বকালে বরপক্ষ হইতে ইচ্ছামত অর্থ লইয়া কন্যাদানের নাম আসুর বিবাহ ছিল। এই বিবাহসম্ভূত সন্তানেরা ক্রূরকর্ম্মা, মিথ্যাবাদী ও ধর্ম্মদ্বেষী হইত। বর্ত্তমান কালে পাত্রীপক্ষ হইতে অর্থ আদায় করিবার প্রথা প্রবাহিত হইয়াছে। বিবাহের পূর্ব্বে, কন্যার যে সকল লক্ষণ নিরূপণ করা আর্য্যদিগের নিয়ম ছিল, এক্ষণে তাহা পরিবর্ত্তিত হইয়া কত হাজার টাকা লভ্য হইবে, তাহাই স্থির করা বিবাহের একমাত্র নিয়ম হইয়া দাড়াইয়াছে। ফলে, এরূপ বিবাহের দ্বারা যে সন্তান জন্মিতেছে, মনুসংহিতার তৃতীয়াধ্যায়ের ৪১ শ্লোকের লক্ষণের সহিত তাহাদিগের স্বভাব চরিত্র মিলাইয়া দেখিলে অতি অর্ব্বাচিন অহিন্দুও হিন্দুশাস্ত্রপ্রণেতাদিগের বুদ্ধির পরাক্রমের ভূয়সী প্রশংসা করিতে বাধ্য হইবেন। বর্ত্তমান কালের সংসার সংগঠন করিবার ব্যবস্থারূপ বিবাহ যে রূপে বিকৃত হইয়াছে, তদ্রূপ স্থলে সংসার যে কত সুখের স্থল হইয়াছে, তাহা আমরা প্রত্যেক সংসারী প্রাণে প্রাণে প্রতিমুহূর্ত্তে উপলব্ধি করিতেছি।

বলিয়াছি যে, হিন্দুরা সন্তানদিগকে সর্ব্বপ্রথমে সংস্কারাদি দ্বারা সংস্কৃত করিয়া জ্ঞানশিক্ষা দিবার জন্য ব্রহ্মচর্য্যাবস্থায় রাখিয়া দিতেন। ইহাই পিতা মাতা অথবা কর্ত্তৃপক্ষের একমাত্র কর্ত্তব্য ছিল। সংসারে লিপ্ত করা তাঁহাদের যে ঐকান্তিক উদ্দেশ্য ছিল, শাস্ত্র প্রমাণে তাহ বুঝা যায় না। কারণ, অষ্টবিধ বিবাহের মধ্যে পাত্রের অভিভাবকের সাক্ষাৎ সম্বন্ধে বিবাহ বিষয়ে কোন সংস্রব থাকিত না দেখা যায়। এই জন্য স্পষ্ট বুঝা যায় যে, পাত্র আপন ইচ্ছাক্রমে বিবাহ কার্য্য সম্পা

করিতেন। তাহাতে বর্ত্তমান কালের ন্যায় পিতা মাতার আর্থিক সম্বন্ধ একেবারেই থাকিত না। কোন স্থানে অসবর্ণা, অদুষ্টা, রোগ-বিহীনা, ধর্ম্মশীলা, সদ্বংশজাতা, সর্ব্বসুলক্ষণা, অল্পবয়স্কা কন্যা প্রাপ্ত হইলে তাঁহার পিতার অর্থানাটনের নিমিত্ত কখন বিবাহ ভঙ্গ হইত না। এই জন্যই বলি যে, সেকালের বিবাহে পাত্রের অভিরুচির প্রাধান্য জ্ঞাত হওয়া যায়। অতএব বর্ত্তমান কালের সংসারাশ্রম বলিলে পুরাকালের সংসার বুঝাইতে পারে না।

কথিত হইল যে, পুরাকালের ব্যক্তিরা দার পরিগ্রহ পূর্ব্বক সুসন্তান প্রত্যাশা করিতেন। এই নিমিত্ত বিবাহকালে কন্যার শাস্ত্রপ্রমাণ লক্ষণাদি নিরূপণ করিয়া পাত্রা স্থির হইত এবং স্ত্রীসহবাসাদি সম্বন্ধেও তাঁহারা শাস্ত্রের নিয়ম কখন উল্লঙ্ঘন করিতে সাহসী হইতেন না। যে হেতু, তাঁহারা সুসন্তান ছিলেন, তাঁহারা স্বধর্ম্মপরায়ণ ছিলেন, সুতরাং শাস্ত্রবাক্য প্রতিপালন করা তাঁহাদের প্রাণের কার্য্য ছিল। যাঁহারা শাস্ত্র মানিয়া তদনুষ্ঠিত কার্য্য সম্পাদন করিতেন, তাঁহারা কখন বিপরীত ফললাভ করেন নাই। এই নিমিত্ত সংসারা-শ্রমেও তাঁহারা সুখী হইতেন এবং নির্দ্দিষ্ট কাল সংসারে অবস্থিতি করিয়া তৃতীয়াশ্রমে প্রবেশ করিতে কৃতকার্য্য হইতেন।

পূর্ব্বকালের হিন্দুদিগের ধর্ম্মধক্ষা করিবার উদ্দেশ্য ছিল। ধর্ম্মরক্ষা করিবার অধিকারী হইবার নিমিত্ত ব্রহ্মচর্য্যাশ্রমী হইতেন, ধর্ম্মরক্ষা করিবার নিমিত্ত সংসারী হইয়া সুপুত্র কামনা করিতেন। পুত্র জন্মিলে তাঁহারা সংসার ত্যাগ করিতে পারিতেন।

বর্ত্তমান কালে সে রামও নাই, আর সে অযোধ্যাও নাই। সংসার কামিনীকাঞ্চনের ক্রীড়ার স্থল হইয়া দাঁড়াইয়াছে। পূর্ব্বকালের সংসারে কি কামিনীকাঞ্চন ছিল না? তাহা নহে। পূর্ব্বে ধর্ম্মভিত্তির উপরে

সংসার স্থাপিত হইত এবং ধর্ম্ম রক্ষার নিমিত্তই কামিনীকাঞ্চনের আশ্রয় লওয়া হইত, কিন্তু বর্ত্তমান কালে ধর্ম্ম কোথায়? কে ধর্ম্মের উপরে সংসার স্থাপন করিতেছেন? সুসন্তান, স্বধর্ম্ম রক্ষা করিবে বলিয়া কে সন্তান কামনা করেন? শাস্ত্রের পদলেহন করা পূর্ব্বকালের আত্মগৌরব ছিল; কিন্তু বর্ত্তমান কালে শাস্ত্রের মস্তকমুণ্ডন পূর্ব্বক তক্র ঢালিয়া দেওয়া ব্রতবিশেষ হইয়া দাঁড়াইয়াছে। একথা কল্পিত নহে, অতিরঞ্জিত নহে—অথবা বাচালতাপ্রসূত নহে। সত্য কথা বলিতেছি, প্রত্যক্ষ কথা বলিতেছি, দৈনিক ঘটনা বলিতেছি। কামিনীকাঞ্চনই বর্ত্তমান কালের সংসারাশ্রমের একমাত্র উদ্দেশ্য। এই উদ্দেশ্য চরিতার্থের নিমিত্ত শাস্ত্রের—হিন্দুদিগের পরম পবিত্র শাস্ত্রের—আশ্রয় লইয়া অন্যায় কার্য্যের ভীষণ প্রবাহ চলিতেছে, তাহা কে না দেখিতে পাই-তেছেন? শাস্ত্রাধ্যাপকদিগের উদর পূর্ণ করিয়া কাঞ্চন প্রদান করিলে কে কি না করিতে পারেন? অর্থের পরাক্রমে বেশ্যাসন্তানও সমাজের শিরোভূষণ হইতে পারেন, অর্থের পরাক্রমে ম্লেচ্ছাচারী যবনযুবতীর অধরসুধা পান করিয়াও সংসারাশ্রমের বক্ষে পদাঘাত করিতে পারেন, কাঞ্চনের পরাক্রমে অঘটন সংঘটন হইয়া যাইতেছে। একদা কোন ব্যক্তির বাটীতে দুর্গোৎসবোপলক্ষে ব্রাহ্মণের বাটীতে নৈবেদ্য প্রেরিত হইয়াছিল। ব্রাহ্মণেরা ধর্ম্মঘট করিয়া বলিলেন যে, উহার প্রদত্ত নৈবেদ্য গ্রহণ করা কর্ত্তব্য। কারণ যে ব্যক্তি যবনস্পর্শিত ম্লেচ্ছের ভোজ্য বস্তু ভক্ষণ করে, তাহার দানগ্রহণ করিলে পতিত হইতে হইবে; অর্থাৎ ধর্ম্ম-হানি হইবে। কেহ নৈবেদ্য লইলেন না। এই ভদ্রলোকের বৃদ্ধা জননী নৈবেদ্য ফিরিয়া আসিবার হেতু শ্রবণ করিয়া পুত্রের সমক্ষে আত্মঘাতিনী হইবার উদ্যোগ করায়, তিনি সহাস্যে বলিলেন, "মা! তুমি স্থির হও, কোন চিন্তা নাই। মা! কলিকালের ধর্ম্ম কর্ম্ম বাক্সের

ভিতর রাখিতে হয়। আমি অনেক ধর্ম্ম সংগ্রহ করিয়াছি, সেই ধর্ম্ম-বলে নৈবেদ্য লইতে সকলকে এখনি বাধ্য করিতেছি।" এই বলিয়া নৈবেদ্যের উপকরণের খুরির সহিত আর একখানি খুরিতে পঁচিশ টাকা দিয়া পুনরায় ব্রাহ্মণদিগের বাটীতে প্রেরণ করিলেন। নিমেষমধ্যে সমুদয় নৈবেদ্য নিঃশেষিত হইয়া গেল এবং অতিরিক্ত নৈবেদ্যের জন্য সুপারিশের উপর সুপারিশ আসিতে লাগিল। আর এক সময়ে কোন ভদ্রলোক একখানি বাগান খরিদ করেন। সেই বাগানে একটী শিবের মন্দির ছিল। শিবের নিত্য পূজার, যেরূপ হউক, ব্যবস্থা ছিল। এক সময়ে তাঁহার বৈঠকখানা নির্ম্মাণের প্রয়োজন হয়। যে স্থানে শিবালয় ছিল, সেইদিক ব্যতীত অন্যদিকে বৈঠকখানা নির্ম্মাণ করিবার সুবিধা ছিল না, কিন্তু হিন্দু বিশেষতঃ ব্রাহ্মণ হইয়া নিত্যপূজিত শিবকে কেমন করিয়া স্থানান্তরে লইয়া যাইবেন ভাবিয়া অতিশয় বিষাদিত হইলেন। কিন্তু বলিয়াছি ধর্ম্ম বাক্সে। তিনি এই সহরের তাৎকালিক সুপ্রসিদ্ধ স্মার্ত্ত মহাশয়ের নিকট হইতে অর্থ দিয়া শিবলিঙ্গ স্থানান্তর করিবার ব্যবস্থা পত্র পাইয়াছিলেন। আর প্রায়শ্চিত্ত বিধানের ত সীমা নাই। তাই বলিতেছি যে, বর্ত্তমানকালের সংসারাশ্রমের উদ্দেশ্য কামিনীকাঞ্চন। কামিনীকাঞ্চন বলিবার হেতু এই যে, কামিনীর নিমিত্তই কাঞ্চনের এত প্রাদুর্ভাব হইয়াছে। সংসারের দিকে দৃষ্টিপাত করিলে দেখা যায় যে, যে কোন বর্ণ ই হউন, অথবা যে কোন যৌগিক বর্ণই হউন, সকলে জীবনকে দুইভাগে বিভক্ত করিয়া সংসারাশ্রমে অবস্থিতি করিতেছেন। প্রথমাবস্থায় সংসারে কামিনী অর্থাৎ স্ত্রী-পুত্রাদি ও পরিজন প্রতিপালন করিবার সামর্থ্য লাভের হেতু অর্থকরী বিদ্যোপার্জ্জন করা এবং দ্বিতীয়াবস্থায় মৃত্যুকালাবধি কামিনীর পদ-লেহন ব্যতীত অন্য কোন কার্য্য কর্ত্তব্য বলিয়া জ্ঞান না করা। বিংশতি

বর্ষের পূর্ব্বেই কামিনীর করগ্রস্ত হইয়া কাঞ্চনের সাম্রাজ্যভুক্ত হওয়া বর্ত্তমান কালের বিশেষ লক্ষণ। ইহাকে কামিনীকাঞ্চনের যুগল মিলন কহে। কামিনীকাঞ্চনের যুগল মিলন হইবার সুবিধার নিমিত্তই ইউনিভারসিটির উপাধির জন্য লালায়িত হওয়া। কামিনীর সম্বন্ধ স্থাপিত হইবার পর পুত্র কন্যার মুখদর্শন করিবার জন্য কোন কোন স্থলে এক-বৎসর কালও অপেক্ষা করিতে হয় না। এইরূপে স্বল্পকালে দারাসুত-পরিপূরিত সংসারচক্র নির্ম্মিত হইয়া যায়। একবার সংসার সংগঠিত হইয়া যাইলে ক্রমে তাহা নানাভাবে পরিবর্দ্ধিত হইয়া পড়ে। সুতরাং এই বিস্তীর্ণ সংসার সঞ্চালন করিবার কাঞ্চনই একমাত্র উপায়। সেই জন্য কাঞ্চন কাঞ্চন করিয়া সর্ব্বদাই ঘুরিয়া বেড়াইতে হয়। সেইজন্য সামাজিক ব্যবস্থাপকেরা ধনীর ইচ্ছানুযায়ী অযথা, অন্যায়, অযৌক্তিক ব্যবস্থা দিয়া কাঞ্চন লাভ করিতে অগ্রপশ্চাৎ দৃষ্টি করেন না।

বর্ত্তমানকালের সংসারে কামিনীকাঞ্চন ব্যতীত কথা নাই, ইহা অধিক বলিতে হইবে না। কারণ, আমরা তদ্বিষয়ে ভুক্তভোগী। কামিনী আমাদের চিরসঙ্গিনীবিশেষ হইয়া দাড়াইয়াছে। পুরাকালে কখন বানপ্রস্থাশ্রমী হইবার কাল পর্য্যন্ত কামিনীর সম্বন্ধ থাকিত, কিন্তু বর্ত্তমানকালে সে ভাব আর নাই। যুবা, প্রৌঢ়, বৃদ্ধ, যে কোন কালের ব্যক্তিই হউন, তাঁহার যত বার স্ত্রীবিয়োগ হইবে, ততবার তাঁহাকে দারপরিগ্রহ করিতেই হইবে। কৃত্রিম দন্ত, শুভ্র কেশজালে কলপ এবং ধাতু দৌর্ব্বল্যের ঔষধ সেবন করিয়া যুবার ঢং দেখাইয়া কুমারীর পাণিগ্রহণ পূর্ব্বক বৃদ্ধ জীবনের যেন সার্থকতা করিয়া যান। সংসারাশ্রমের এই প্রকার ঘটনা দেখিয়া কি বুঝিতে হইবে যে, হিন্দুশাস্ত্রোক্ত সংসারাশ্রম অদ্যাপি আছে? যে সংসারাশ্রম আশ্রমের শ্রেষ্ঠ বলিয়া

এক সময়ে পরিকীৰ্ত্তিত হইত, সেই সংসার কি বৰ্ত্তমানকালে দেখা যায়? যে সংসার প্রেমশিক্ষার একমাত্র স্থান বলিয়া কথিত হইত, বৰ্ত্তমান কালের সংসারে কি প্রেমের লেশমাত্র দেখিতে পাওয়া যায়? যে সংসারে মাতা পিতা হইতে শান্ত প্রেমের শিক্ষা লাভ করা হইত, এক্ষণে কি তাহার আভাস প্রাপ্ত হইবার সম্ভাবনা আছে? পিতা মাতার অর্থ থাকিলে সন্তানেরা ভক্তির ভাণ করিয়া থাকে, কিন্তু অর্থহীন পিতা মাতার যে দুর্দ্দশা হইয়া থাকে, তাহা অনুসন্ধান করিয়া দেখিতে হইবে না। সৰ্ব্বস্থলেই এইভাব না হউক, কিন্তু শতকরার হিসাবে আমার বোধ হয় ৯৯ জন হইবে, তাহার সন্দেহ নাই। যে সংসারে ভ্রাতা ভগ্নী হইতে সখ্য প্রেম উদ্ভাসিত হইত, সে সংসার একেবারেই বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে। যে সংসারে গুরুজনের নিকটে অভিমান চূর্ণ করিয়া দাস্য প্রেম শিক্ষা করা যাইত, সে সংসার আর একভাবে পরিণত হইয়াছে। আমরা অভিমানের বাদ্‌সা হইয়া দাস্যবৃত্তি শিক্ষা করিতে বিলক্ষণ পরিপক্ক হইয়াছি। যে সংসারে কামিনীকে সহধৰ্ম্মিণী বলিয়া গ্রহণ করা হইত, সেই সংসারে কামিনী এখন কামবৃত্তির তৃপ্তির স্থল হইয়া দাড়াইয়াছে। পুত্রের নিমিত্ত পরিণয়সূত্রে আবদ্ধ হইবার ভাব আর নাই, তাহা হইলে বিবাহ কালে সুপুত্রপ্রাপ্তির লক্ষণসংযুক্ত কুমারীরই পাণি গ্রহণ করা হইত। চক্ষু, নাসিকা, কর্ণ, ভ্রু, বর্ণ, অঙ্গসৌষ্ঠবাদির দিকে একমাত্র দৃষ্টি থাকিত না। এক ঘর পুত্রাদি সত্ত্বে কখন কেহ উপর্য্যুপরি বিবাহ করিতে পারিত না। পঞ্চাশ বৎসরের ব্যক্তি কখন দশ বৎসরের বালিকা পত্নীর সহিত বিমল মধুর প্রেমের সম্বন্ধ স্থাপন করিবার চেষ্টা পাইত না। বৃদ্ধের সহিত কখন কি বালকের বন্ধুত্ব হইবার কথা? না কখন দশ বৎসরের শিশুর সহিত বৃদ্ধের সখ্যতা হইতে কেহ

দেখিয়াছেন? এক ব্যক্তি এই কথার প্রত্যুত্তরে বলিয়াছিলেন, যেমন বৃদ্ধপিতামহ বা মাতামহের সহিত নাত্নীর সম্বন্ধ দেখা যায়। তাহার সহিত ঠাট্টা তামাসার সঙ্কোচ হয় না, বালিকা স্ত্রীর সহিত তেমনি প্রেম না হইবে কেন? নাতনীর প্রেম এবং নববিবাহিতা বৃদ্ধের স্ত্রীর প্রেম কখন একজাতীয় নহে। নাতনীর সহিত বাস্তবিক প্রেমের সংস্রব আছে, কিন্তু বালিকা স্ত্রীতে প্রেম কোথায়? তবে যে অনুরক্তি দেখা যায়, তাহার আদি কারণ কাম। প্রেম স্বতন্ত্র বস্তু। যে প্রেমিক, তাহার অবস্থা স্বতন্ত্র। প্রেমিকের স্ত্রী বিয়োগ হইলে, সে কখন সেই নূতন স্ত্রীর দ্বারা সে প্রেম চরিতার্থ করিতে পারেন না, পুরাতন প্রেম মনে থাকিলে কখন তথায় আর কেহ স্থান পাইতে পারে না। ভগবান্ রামচন্দ্র জীবশিক্ষার নিমিত্ত তাহার দৃষ্টান্ত রাখিয়া গিয়াছেন। তিনি রাজসূয় যজ্ঞের সময়ে সোণার জানকী নির্ম্মাণ করিয়া তদ্দ্বারা সহধর্ম্মিণীর কার্য্য সম্পন্ন করাইয়াছিলেন। তিনি কি বিবাহ করিতে পারিতেন না? কেন বিবাহ করিবেন? কামবৃত্তি নিবৃত্তি করিতে হইলে, সোণার সীতার দ্বারা তাহা সম্পন্ন হইতে পারে না, সুতরাং অন্য কামিনীর অন্বেষণ করিতেন। প্রেমের অভিনয়ে কামের গন্ধ থাকিতে পারে না এবং কামের অভিনয়ে প্রেম থাকিতে পারে না। প্রেম হৃদয়ের সামগ্রী, প্রেমময়ীর ভাব হৃদয়ে উদয় হইলেই তাঁহার উপস্থিতি উপলব্ধি হইয়া থাকে। তাই সোণার সীতার দ্বারা সহধর্ম্মিণীর কার্য্য সম্পাদন পূর্ব্বক প্রকৃত প্রেমের অভিনয় করিয়া গিয়াছেন। সে ভাব কি আর আছে? সহধর্ম্মিণী বলিয়া স্ত্রীকে কে দেখিয়া থাকেন? প্রেমের জীবন্তমূর্ত্তি বলিয়া কে স্ত্রীকে গণনা করেন? কামের জন্য বিবাহ, কামের জন্য সন্তান, কামের জন্যই সংসার। সেই কামবৃত্তির নিমিত্তই বার বার

কামিনীসঙ্গ লইবার স্পৃহায় আমরা ঘুরিয়া বেড়াই। অতএব বর্ত্তমানকালের সংসার কামে পরিপূর্ণ। সংসারাশ্রমেই আমাদের জীবনাতিবাহিত হইয়া যাইতেছে। সুতরাং অবশিষ্ট আশ্রম দুইটী একেবারে বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে। ধর্ম্মের দিকে লক্ষ্য রাখিয়া কিছু-দিন সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ পূর্ব্বক তাহা তদবস্থায় পরিত্যাগ করিয়া ঈশ্বর-সাধনে নিযুক্ত হওয়া বর্ত্তমানকালের নিয়মাতীত ব্যাপার হইয়া দাঁড়াইয়াছে। পূর্ব্বকালের সংসারী এবং বর্ত্তমান কালের সংসারী একজাতীয় নহেন। পূর্ব্বে বলিয়াছি যে, প্রাচীন হিন্দুদিগের ধর্ম্মই জীবনের অদ্বিতীয় লক্ষ্য ছিল। এই ভাব ব্রহ্মচর্য্যাবস্থায় তাঁহাদের হৃদয়ে,—কেবল হৃদয়ে কেন,—শোণিতে, অস্থি মজ্জায় যাইয়া আশ্রয় লইত; সংসারক্ষেত্রে তাঁহারা সেই ভাব পুষ্টি করিয়া লইতেন। একদিকে প্রেম শিক্ষা এবং অপরদিকে সংসারের অনিশ্চয়তা, এই দ্বিবিধ ভাব লাভপূর্ব্বক আত্মোন্নতি করিয়া লইতেন। বর্ত্তমান সংসারে কামিনীকাঞ্চন ভাবে আমরা শিক্ষিত। ধর্ম্মের কোন সম্বন্ধ নাই। ধর্ম্ম পলায়ন করিয়াছেন, কামিনীকাঞ্চনের দোর্দ্দণ্ড প্রতাপে ধর্ম্ম প্রাণভয়ে অরণ্যে আশ্রয় লইয়াছেন। সংসারে আর তাঁহার স্থান নাই। তাই আমরা অধর্ম্মের একচ্ছত্রী রাজা হইয়া সংসার-রাজ্যে বাস করিতেছি। তাই ধর্ম্মের নাম শুনিলে অঙ্গ জ্বলিয়া উঠে, তাই ধর্ম্মপ্রসঙ্গকে বাতুলতা বলি, তাই ধর্ম্মকর্ম্মকে সংসারীরা অকর্ত্তব্য বলিয়া থাকে, তাই আমাদের সন্তানদিগকে ধর্ম্মের আশ্রয় লইতে দেখিলে তাহাদের তাড়না করি, তাই ধর্ম্ম বলিয়া কোন কার্য্যকে কর্ম্মের শ্রেণীতে স্থান দিতে চাহি না।

আমরা সিদ্ধ হইয়াছি কামিনীতে, সিদ্ধ হইয়াছি কাঞ্চনে, সিদ্ধ হইয়াছি কামিনী-কাঞ্চনযুক্ত স্বার্থ চরিতার্থ করিতে, ধর্ম্ম স্থান পাইবেন

কেন? ধর্ম্মের বিমল ছবি আমরা দেখিতে পাইব কেন? ধর্ম্মের প্রাণজুড়ান ফল আমরা সম্ভোগ করিব কেন? ধর্ম্মের মর্ম্ম জ্ঞাত হইবার আমাদের অধিকার কোথায়? সংসারে ধর্ম্মজ্ঞান লাভ হইবার কথা, সে সংসার আর নাই। সংসারে আমরা সকলেই স্বার্থপর, স্বার্থশূন্য ভাব প্রত্যাশা করিব কেন? আমি তোমার গলায় ছুরি দিবার সুযোগ অন্বেষণ করিতেছি, তুমি আমার গলা না কাটিয়া গলা বাড়াইয়া দিয়া মৃত্যুকে আলিঙ্গন করিবে, এ প্রত্যাশা করা যায় না। আমি আমার স্বার্থ এক পরমাণু কমাইব না, তুমি তোমার ষোল আনা ছাড়িয়া দিবে, এ প্রকার ভাব কখন হইবার নহে। সুতরাং স্বার্থপর সংসারে স্বার্থহীন ধর্ম্মের কোন ভাব স্থান পাইতে পারে না। বর্ত্তমান হিন্দুসমাজ যেরূপ অবস্থায় আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে, তাহাতে আশ্রমধর্ম্মের কার্য্য হইবার কোন সম্ভাবনা নাই। ব্রহ্মচর্য্য, সংসার, বানপ্রস্থ এবং সন্ন্যাস, সংসারেই একাকার হইয়া গিয়াছে। সংসারের পুষ্টিসাধন, সংসারের উন্নতি, সংসারের কল্যাণ কামনা ব্যতীত অন্য কোন ধর্ম্মের প্রসঙ্গ নাই। সংসারের এই ছবি দর্শন করিলে ইহাকে হিন্দুর সংসারাশ্রম কহা যায় না। বর্ত্তমান কালের হিন্দুর সংসার এক অভিনব ব্যাপার হইয়া উঠিয়াছে। না শাস্ত্রসম্মত বর্ণ বিচার, না আশ্রম বিচার দ্বারা কার্য্য হইতেছে। কার্য্য হইবে কি, অধিকারী কোথায়? পূর্ব্বে বলিয়াছি যে, হিন্দু ভাব হিন্দু রাজত্বাবসান কাল হইতে ক্রমে ক্রমে যবন এবং ম্লেচ্ছাদি অর্থাৎ নানাবিধ যৌগিক ভাবের আকার ধারণ করিয়াছে। হিন্দু রাজশাসনের সময়ে সর্ব্বত্রে বিশুদ্ধ হিন্দু ভাবের কার্য্য হইত, কেহ স্বেচ্ছার বশবর্ত্তী হইয়া চলিতে পারিতেন না। তাহা হইলে তিনি রাজদ্বারে দণ্ডনীয় হইতেন। যেমন প্রত্যেক স্বাধীন জাতিরা

জাতি রক্ষা করিবার নিমিত্ত সকলেই নির্দ্দিষ্ট নিয়মে পরিচালিত হইতে বাধ্য হইয়া থাকেন, হিন্দুরাও সেইরূপ নির্দ্দিষ্ট নিয়মে চলিতেন। কিন্তু রাজার অবর্ত্তমানে ধর্ম্ম রক্ষা করিবে কে? সুতরাং উহা ক্রমে ক্রমে সংকোচাবস্থায় পরিণত হইয়া আসিল। বিশেষতঃ যবনদিগের অত্যাচারে হিন্দুধর্ম্ম বিশেষরূপে ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে। যদিও যবন রাজারা হিন্দু ধর্ম্মের সাংঘাতিক শত্রু ছিলেন, কিন্তু বিশেষ চেষ্টা সত্ত্বেও হিন্দু কুল নির্ম্মূল করিতে পারেন নাই। সমগ্র হিন্দু কুল যবন না হউক, কিন্তু যবনের সহবাসে ক্রমে যাবনিক ভাব আসিয়া হিন্দুভাবের সহিত মিশ্রিত হইয়া হিন্দু যবনের যৌগিক ভাবে হিন্দু আধারে কার্য্য করিতে আরম্ভ করে। সুতরাং, যে হিন্দুর কেবল হিন্দু ভাব ছিল, সেই হিন্দু হিন্দু-যবন ভাবে পরিবর্ত্তিত হওয়ায় হিন্দুর ভাবও বিকৃত হইয়া আসিল। যবনের পর ম্লেচ্ছাধিকার। এ সময়ে আমাদের হিন্দু ভাব দিন দিন কিরূপে বিকৃত হইতেছে, তাহা দেখিবার চক্ষু না হইলে বুঝিবার উপায় নাই। সাহেব হওয়া আমাদের বর্ত্তমান কালের একমাত্র আশ্রম ধর্ম্ম হইয়া গিয়াছে বলিলে ভুল হয় না। সাহেবী স্বভাব, সাহেবী চাল, সাহেবী পরিচ্ছদ, সাহেবী আহার, সাহেবী বিহার, সাহেবী চিন্তা, যদ্যপি ধর্ম্ম করিতে হয়, তাহাও সাহেবী ঢংএ। এইরূপ পরিবর্ত্তনের ভাব আসিল কেন? যেমন কোন পাত্রে কোন প্রকার পদার্থ থাকিলে তাহাতে অন্য পদার্থ রাখা যায় না। পূর্ব্ব পদার্থ যে পরিমাণে কমিবে, নূতন পদার্থ সেই পরিমাণে স্থান পাইবে। আমাদের হিন্দুর আশ্রমধর্ম্মাদি ভাব অনেক কাল গিয়াছে, সুতরাং মানস ভাণ্ড শূন্য হইয়া রহিয়াছে।

সাহেবদিগের সুখৈশ্বর্য্য, তাঁহাদের শারীরিক স্বচ্ছন্দতা, তাঁহাদের পারিবারিক আনন্দ সম্ভোগ এবং তাঁহাদের উচ্চপদাদি দেখিয়া লোভ-

পরবশে তদবস্থা লাভ করিবার জন্য তদ্ভাবে সংসার সংগঠন করিবার নিমিত্ত আমরা প্রস্তুত হইয়া থাকি। অদৃষ্ট বৈগুণ্যে সকলের তাহা ঘটিয়া উঠে না, কিন্তু যদ্যপি স্বল্পায়াসসাধ্য হইত, তাহা হইলে বোধ হয় অদ্য একজনও হিন্দুসন্তান হিন্দুভাবের পরিচয় দিতে পারিতেন কি না সন্দেহ। বিলাতে বিদ্যাশিক্ষা করিতে যাওয়া কি হিন্দুর আশ্রম ধর্ম্ম? কখন নহে। কামিনী বা কাঞ্চনের অতি সুবিধাই একমাত্র কারণ।

যদিও আমাদের ধর্ম্ম বিকৃত করিবার জন্য খ্রীশ্চান প্রচারকেরা প্রাণ-পণে বিধিমতে চেষ্টা পাইতেছেন, কিন্তু তাহা বলিয়া ইংরাজ গভর্ণমেণ্ট এ বিষয়ে পোষকতা করেন না। কারণ, গভর্ণমেণ্ট সকল ধর্ম্ম রক্ষা করিবার নিমিত্ত প্রতিশ্রুত হইয়া কার্য্য করিতেছেন। মুসলমানদিগের ন্যায় ইংরাজেরা হইলে, আমাদের যেরূপ অবস্থা হইয়াছে, তাহাতে আর কেহ হিন্দু থাকিত না। ইংরাজেরাই হিন্দু শাস্ত্রাদি অধ্যয়ন পূর্ব্বক তাহা ইংরাজীতে ভাষান্তর করিয়া দিয়া শাস্ত্রাদির বিলক্ষণ গৌরব বিস্তার করিয়াছেন। অনেক স্থলে ইংরাজদিগের মতামতের উপরে আমরা নির্ভর করিয়া থাকি। ইংরাজদিগের মুখে হিন্দুধর্ম্মের গুণকীর্ত্তণ শুনিয়া অনেকে হিন্দুধর্ম্মের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া থাকেন, এ কথা মিথ্যা নহে। কয়জন হিন্দুশাস্ত্রজ্ঞ আছেন? হিন্দুদিগের সহিত পর্য্যালোচনা করিয়া দেখুন, তাঁহাদের জ্ঞান কোথায় নিহিত? বর্ণশ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণদিগের মধ্যে অনুসন্ধান করিলে কয়জন শাস্ত্রবিদ্ বিচক্ষণ অধ্যাপক প্রাপ্ত হওয়া যাইবে? নৈয়ায়িক, স্মৃতিরত্ন, তর্কবাচস্পতির সংখ্যা নাই বটে, কিন্তু প্রকৃত ধর্ম্মশাস্ত্রজ্ঞ তত্ত্বজ্ঞানাপন্ন মহাপুরুষ কোথায়? সংসারে এরূপ ব্যক্তির সম্পূর্ণ অভাব। এই নিমিত্ত বলিতে বাধ্য হইতেছি যে, আশ্রমধর্ম্ম বলিয়া যেনিয়মে পূর্ব্বকালে সংসার চলিত, সে নিয়মাদি আর নাই, সুতরাং সে প্রকার হিন্দুসংসারও আর নাই।

বর্ত্তমানকালের হিন্দুসংসার প্রকৃত হিন্দুসংসারের সহিত তুলনা করিলে আর তুলনা করা যায় না, কিন্তু বর্ণবিভাগ সম্বন্ধে রামকৃষ্ণদেব যে প্রকার উপদেশ দিয়াছেন, আশ্রমধর্ম্ম সম্বন্ধেও সেই প্রকার ভাব ব্যক্ত করিয়া গিয়াছেন। যে বিদ্যা শিক্ষা করিতে যে প্রকার অভ্যাস করিতে হয়, তাহা যে জাতিই হউক, যে বর্ণই হউক, অথবা যে কেহ হউক, তাহা শিক্ষা করিতে সকলকেই একপথ দিয়া যাইতে হইবে। বাঙ্গলা ভাষা শিক্ষা করিতে হইলে বর্ণশিক্ষা বিধেয়। বর্ণমালা শিক্ষা না করিয়া কেহই ভাষা শিখিতে পারে না, সেই প্রকার আশ্রমধর্ম্ম আচরণ না করিলে কোন জাতি জাতিত্ব রক্ষা করিয়া তত্ত্বজ্ঞান লাভ করিতে সমর্থ হইতে পারে না। দৃষ্টান্ত স্বরূপ ইংরাজ জাতিই গৃহীত হউক।

ইংরাজদিগের সামাজিক এবং আধ্যাত্মিক রীতিনীতি কি? তাঁহারা ইচ্ছানুসারে দারপরিগ্রহ করেন। এই বিবাহে পিতা মাতার আর্থিক সম্বন্ধ থাকে না। ইংরাজদিগের যদিও আমাদিগের ন্যায় বর্ণবিচার নাই, কিন্তু গুণবিচার আছে। উচ্চপদস্থ মহামান্বিত ব্যক্তিরা কখন নিম্নপদস্থ অথবা সাধারণ ব্যক্তির গৃহে আদানপ্রদান কার্য্য করেন না। জাতীয় নির্দ্দিষ্ট বিদ্যোপার্জ্জনের কাল পরিসমাপ্তি না হইলে পুত্রকে উদ্বাহশৃঙ্খলে আবদ্ধ করেন না। বিদ্যা শিক্ষার্থে দেশ বিদেশে পাঠাইবার ব্যবস্থা আছে। ব্যায়াম প্রভৃতি নানাপ্রকার প্রক্রিয়ার দ্বারা শারীরিক বলাধান সাধন করেন। ইংরাজদিগের এই কয়েকটী সামাজিক নিয়ম দেখিলেই আমাদিগের আশ্রম বিভাগের তাৎপর্য্য কি বুঝা যায় না? আমাদের ব্রহ্মচর্য্যাশ্রমের ন্যায় ইংরাজদিগের বিদ্যোপার্জ্জনের সময়, ব্রহ্মচর্য্যাশ্রমের পর সংসার, ইংরাজদিগেরও অবিকল তদ্রূপ। আমাদের ব্রাহ্মণেরা যে প্রকার ব্রহ্মচর্য্যাশ্রম হইতে

কখন কখন চতুর্থাশ্রমে গমন করিতেন, ইংরাজ মিসনারীরাও সেই প্রকার। কেহ সংসার করেন, কেহ বা চিরকৌমার্য্য ব্রতাবলম্বী হইয়া তত্ত্বালাপনে জীবনাতিবাহিত করিয়া যান।

সাংসারিক নিয়ম সর্ব্বত্রে একই প্রকার। বাহ্যিক বা স্থূলে পার্থক্য বিশেষ থাকিলেও তাহা হিসাবের অন্তর্গত হইতে পারে না। সংসার সংগঠন করিয়া তাহা রক্ষা এবং উন্নতিসাধন করা সকলেরই অভিপ্রায়। সংসার সুচারুরূপে পরিচালিত করিতে হইলে পরিচালকের প্রয়োজন। এই নিমিত্ত স্বজাতি, স্বধর্ম্ম, স্বদেশের মানমর্য্যাদা রক্ষা করিবার যোগ্যতাবিশিষ্ট পুত্রের অবশ্য প্রয়োজন হইয়া থাকে। যাহাতে এরূপ সুপুত্র প্রাপ্ত হওয়া যায়, তাহারা তাহাই করিয়া থাকেন। স্পার্টা দেশের সংহিতাকর্ত্তা মহমতি লাইকার্গাস স্বজাতি রক্ষা করিবার নিমিত্ত দুর্ব্বল সন্তানদিগকে মারিয়া ফেলিতেন। তিনি এই নিয়ম করিয়াছিলেন যে, পুত্র ভূমিষ্ঠ হইলে তাহাকে সুরায় স্নান করান হইবে। বলিষ্ঠ সন্তান সুরার উগ্রতা সহ্য করিতে পারিত, দুর্ব্বলেরা পঞ্চত্ব লাভ করিত। ইচ্ছাক্রমে স্বদেশের জলবায়ু ত্যাগ করিয়া বিদেশে সন্তানকে ভূমিষ্ঠ হইতে দেওয়া ইংরাজদিগের অভিপ্রায় নহে। কিন্তু কার্য্যগতিকে অনেক সময়ে তাহা ঘটে না। এই নিমিত্ত সংসারে আশ্রমধর্ম্ম অবশ্য প্রয়োজনীয়। তাহা কেহ উল্লঙ্ঘন করিয়া যাইতে পারেন না। অতএব সংসারে স্বধর্ম্ম এবং স্বজাতি রক্ষা করাই একমাত্র উদ্দেশ্য। এই উদ্দেশ্য সাধন করিবার নিমিত্ত দেশ এবং জাতিগত বিভিন্ন প্রকার ব্যবস্থা আছে। যে দেশে যে জাতি যে রূপে স্বভাব রক্ষা করিতে পারেন, তাহাই তাঁহাদের অবশ্য কর্ত্তব্য, তাহাই তাঁহাদের শাস্ত্র। আমাদের দেশেও দেশগত ধর্ম্মানুসারে জাতিগত ধর্ম্ম রক্ষার নিমিত্ত বর্ণ ও আশ্রম ধর্ম্মের ব্যবস্থা হইয়াছিল। কালসহকারে বাহ্যিক কারণ দ্বারা তাহা

বিকৃত হইয়া গিয়াছে। আপাততঃ আমাদের আশ্রম ধর্ম্মের কার্য্য নাই বলিয়া যে তাহা নিষ্প্রয়োজন, এ কথা মনে করা যারপরনাই অন্যায়। অনেকের ধারণা এবং বিশ্বাস এই যে, "আমাদের আশ্রমধর্ম্ম বলিয়া যাহা কথিত হইত, তাহা বর্ত্তমান কালের নিমিত্ত নহে। সংসার ত্যাগ করিয়া বানপ্রস্থাশ্রমী হওয়া অতি কঠোর কথা। বিশেষতঃ, বৃদ্ধাবস্থায় স্ত্রীপুত্র পরিবারবেষ্টিত থাকিয়া জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করা অপেক্ষা বনবাসী হওয়া সুখের কথা, একথা কখন জ্ঞানবান ব্যক্তি স্বীকার করিবেন না। যুবাকালে বনেই হউক, কিম্বা বৃক্ষমূলেই হউক, একবেলা ভোজন করিয়া অথবা উপবাসী থাকিয়াই হউক, স্বচ্ছন্দে দিন যাপন করা যাইতে পারে, কিন্তু বৃদ্ধাবস্থায় কঠোর তপশ্চরণ করিতে যাইলে অচিরাৎ শরীর ভঙ্গ হইয়া আইসে। সেই ব্যক্তি যদ্যপি সংসারে থাকিত, তাহা হইলে যে কয়েক দিন বাঁচিত, বনে তাহার চতুর্থাংশ দিবসও বাঁচিবার সম্ভাবনা নাই।" তাঁহারা বলেন যে, সংসারে থাকিয়া মধ্যে মধ্যে ঈশ্বরের নাম করিলেই যথেষ্ট হইবে।

সংসারাশ্রমের উৎকর্ষতা সম্বন্ধে অনেকের মত, অনেকে এই আশ্রমকে সর্ব্বাপেক্ষা উচ্চ স্থান দিয়াছেন। যদ্যপি সংসারাশ্রমকে অন্যান্য আশ্রম হইতে শ্রেষ্ঠ বলিয়া গণনা করা যায়, তাহা হইলে অবশিষ্ট আশ্রম তিনটীর অপ্রয়োজনীয়তা স্বীকার করিতে হইবে। কিন্তু তাহা বাস্তবিক অসঙ্গত কথা। ব্রহ্মচর্য্য বা প্রথমাশ্রম, সংসারাশ্রমের পূর্ব্বে প্রত্যেককে প্রতিপালন করিতে হইবে এবং প্রকৃতপক্ষে আমরা সকলে অন্যভাবে তাহা করিয়া যাইতেছি। পূর্ব্বকালের সহিত এই প্রভেদ বুঝা যায় যে; সে অবস্থায় জীবনের উদ্দেশ্য এবং পরিণাম বিষয়ে বৈষয়িক চিন্তা ব্যতীত আধ্যাত্মিক চিন্তা করিবার প্রয়োজন হয় না।

যদ্যপি আধ্যাত্মিক চিন্তার পাত্র হইয়া সংসার চিন্তা করা যায়, তাহা

হইলে এই সংসারের আর একছবি মানসক্ষেত্রে প্রকাশ হইয়া পড়ে। যে ব্যক্তি যেমন অধিকারী, সেই ব্যক্তির পক্ষে সংসার তেমনি ব্যবহার করে।

সংসার বাস্তবিক উত্তম স্থান, তাহার সন্দেহ নাই। যিনি সংসারকে চিনিয়া কার্য্য করেন, তিনি কখন বিপদগ্রস্ত হন না। প্রভু বলিতেন যে, সর্প ধরিবার পূর্ব্বে ধূলাপড়া মন্ত্র শিক্ষা করা কর্ত্তব্য।

সর্প ধরা সংসারের ন্যায় এবং ধূলাপড়া শিক্ষা ব্রহ্মচর্য্যের ন্যায় অবস্থাবিশেষ। সংসারের সহিত প্রভু সর্পের তুলনা করিয়াছেন। সর্প বিষাক্ত জীব। তাহাকে সুবিধা দিলেই যে দংশন করিবে, তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই। কিন্তু সর্প লইয়া ক্রীড়াও করিতে হইবে। সাপ লইয়া খেলায় কত চতুরতার আবশ্যক? সর্পকে কখন হস্তে ধারণ করিতে হইবে এবং কখন গলায় জড়াইয়া দর্শকবৃন্দের আশ্চর্য্য সম্পাদন করিতে হইবে। সর্প দংশন হইতে রক্ষা পাইবার জন্য যেমন সর্প ক্রীড়কেরা আপ্তসার করিয়া রাখে, সংসারে ক্রীড়া করিতে হইলে সেইরূপ আত্ম-কল্যাণ মন্ত্র অবগত থাকা কর্ত্তব্য। হিন্দুদিগের ব্রহ্মচর্য্যাবস্থায় তাহাই শিক্ষা দিবার উদ্দেশ্য ছিল। প্রভু সংসারকে সর্পের সহিত তুলনা করিলেন কেন? সংসার যদ্যপি প্রকৃত সুখের স্থান হইত, তাহা হইলে প্রাণান্তক কালভুজঙ্গের সহিত সাদৃশ্য দেখাইতেন না; অবশ্য ইহার নিগূঢ় তাৎপর্য্য আছে। না বুঝিয়া, অজ্ঞাতসারে যে বিষধরের সংস্রবে আইসে, তাহার প্রাণনাশ হওয়া অবশ্যম্ভাবী। বিষধর তাহার পক্ষে সাক্ষাৎ শমন-স্বরূপ। কিন্তু যে সর্প ধরিবে বলিয়া কৌশল এবং মন্ত্রাদি যত্ন সহকারে অভ্যাস করে, সে অনায়াসে তাহাকে আয়ত্তে আনিয়া বিষ ভাঙ্গিয়া ক্রীড়ার সামগ্রী করিয়া ফেলিতে পারে।

সংসার-ভুজঙ্গকে লইয়া যদ্যপি ক্রীড়া করিতে হয়, তাহা হইলে সর্ব্ব প্রথমে তাহার নিদান জ্ঞাত হওয়া কর্ত্তব্য।

সংসারের কি ধর্ম্ম ? স্বার্থপরতা। স্বার্থপরতা-বিষ শরীরে পরিব্যাপ্ত হইয়া পড়িলে আর রক্ষা থাকে না। সংসার-ভুজঙ্গের একটী ফণা নহে। যত নরনারী তত ফণা ; প্রত্যেক নরনারী যখন দংশন করিতে আরম্ভ করে, তখন নিস্তার পাইবার উপায় থাকে না। পিতা নিজের স্বার্থ চরিতার্থ করিবার চেষ্টা পাইতেছেন, মাতা তাঁহার স্বার্থ বিস্মৃত হন না, ভ্রাতা ভগ্নীরা আপন আপন স্বার্থ লইয়া ব্যতিব্যস্ত হইয়া থাকেন, স্ত্রীর স্বার্থের অবধি নাই, পুত্র কন্যাদিগের স্বার্থের স্রোত অতি ভয়ানক। প্রতিবেশী, স্বদেশী, বিদেশীদিগের স্বার্থ সর্ব্বদাই প্রতীক্ষা করিতেছে। এইরূপে প্রত্যেকে প্রত্যেকের নিকট হইতে স্বার্থপূরণের নিমিত্ত ব্যতি-ব্যস্ত হইয়া রহিয়াছেন। সংসারের এই আভ্যন্তরিক ব্যাপার যিনি না অবগত হইয়া কার্য্য করিতে অগ্রসর হন, তাঁহার জীবন সংশয় হইয়া আইসে।

বর্ত্তমানকালে আমরা ব্রহ্মচর্য্যাশ্রম অবলম্বন করিয়া ধূলাপড়া শিক্ষা না করিয়া সংসারে প্রবেশ করিয়া থাকি, তজ্জন্যই সংসারের আভ্যন্তরিক রহস্য অর্থাৎ স্বার্থপরতা-গরল সম্বন্ধে কোন জ্ঞান থাকে না। যিনি যাহা বলেন, আমরা অবাধে তাহাই সম্পন্ন করিতে যত্নবান হইয়া থাকি।

সংসার স্বার্থপরতার বশবর্ত্তী হইয়া আমাদিগকে যাহা করিতে বলেন, তাহা দ্বারা বাস্তবিক আমাদের কল্যাণ হইতে পারে না। আমাদের দ্বারা সংসারের স্বার্থচরিতার্থ হওয়া আত্মকল্যাণের কথা নহে। একটী দৃষ্টান্তের দ্বারা ইহার যথার্থতা স্থির করা হউক। সন্তানের প্রতি পিতা মাতার স্নেহ বলিয়া যাহা আমরা বুঝিয়া থাকি, তাহাতে স্বার্থ-পরতা আছে কি না ? আমরা স্থির হইয়া যদ্যপি তাঁহাদের কার্য্যকলাপ আলোচনা করিয়া দেখি, তাহাহইলে সর্ব্বত্রে স্বার্থপরতাই দেখা যাইবে।

স্বার্থপরতাই সংসারাশ্রমের আদি কারণ। পুত্র লাভের নিমিত্ত যখন সংসারাশ্রম অবলম্বন করিবার কথা, তখন ইহাকে স্বার্থশূন্য ভাব বলা যায় না। পুত্র প্রাপ্তির অপর উদ্দেশ্য পিণ্ডাদি দ্বারা উদ্ধার হওয়া। এস্থানে স্বার্থের ভাব নাই, তাহা কে বলিতে চাহেন? বর্ত্তমান কালেও পিতা মাতার এ প্রকার গৌণ স্বার্থ সত্বেও নানাপ্রকার মুখ্য স্বার্থও সঞ্চারিত হইয়াছে, তাহা আমরা সকলেই জানি। সন্তানদিগকে বিদ্যা শিক্ষা দিয়া থাকি, স্বার্থের অনুরোধে বিবাহ দিয়া থাকি স্বার্থের অনুরোধে, আপন বশে রাখি স্বার্থের অনুরোধে। অনেকে এই কথায় বিরক্ত হইতে পারেন, এই কথা অনেকের নিতান্ত শ্রুতিকটু হইতে পারে, অনেকে আমাদিগকে সমাজের অনিষ্টকারী বলিয়া গঞ্জনা দিতে পারেন, কিন্তু রামকৃষ্ণদেব যাহা স্বার্থপরতা বলিয়া কহিয়া গিয়াছেন, তাহা সত্য কথা। কারণ, বর্ত্তমানকালে যে ভাবে সাংসারিক কার্য্য চলিতেছে, সে ভাবে আত্মকল্যাণ হইবার কোন সংশ্রব নাই। পিতা মাতা সন্তানকে যে শিক্ষা দেন, তদ্দ্বারা আর্থিক সহায়তা হইতে পারে, দশজনের পরামর্শদাতা হইতে পারে, সামাজিক মান মর্য্যাদা হইতে পারে, পণ্ডিত বলিয়া সাধারণের সমক্ষে পরিগণিত হইতে পারে, ম্যাজিষ্ট্রেট, জজ, উকীল, কৌন্সিলী, মহারাণীর সভায় সভ্য হইতে পারে, গাড়ী জুড়ি চড়িতে পারে, দশজনাকে অন্ন দিতে পারে, অথবা সাধারণের উপকারার্থে চাঁদা দিয়া সরকার বাহাদুরের দ্বারে রাজা, মহারাজা, রাজাধিরাজ প্রভৃতি সম্মানসূচক উপাধি পাইতে পারে। পিতা মাতার যত্নে অপ্সরীবিনিন্দিত কামিনী রত্ন লাভ হইতে পারে, তাহার সন্দেহ নাই; কিন্তু ইহাকে কি আত্মকল্যাণ বলা যায়? না আত্ম-অকল্যাণ কহা যাইবে? বাহ্যিক দর্শনে অবশ্যই কল্যাণ শব্দ প্রয়োগ করিতেই হইবে। কিন্তু সূক্ষ্মে দেখিলে প্রাণ কাঁদিয়া উঠিবে। কোন সম্ভ্রান্ত উকীলের,

জজের পদ প্রাপ্তির প্রসঙ্গ হইলে তাঁহার মাতা তাঁহাকে বলিয়াছিলেন যে, বাপু! সরকার বাহাদুর তোমাকে এত উচ্চ পদ দিতে চাহিতেছেন, আর তুমি অবোধ, তাহা পরিত্যাগ করিতে চাহিতেছ? তুমি এমন কর্ম্ম কখন করিও না। আমি যখন নিঃসন্তান ছিলাম, সর্ব্বদা মনে হইত যে, লোকে পুত্রবতী হইয়া কেমন সুখে দিন যাপন করিতেছে। ছেলের বিবাহ দিয়া বধুমাতার মুখ দর্শন করিতেছে, কত সামগ্রী ঘরে আসিতেছে, পৌত্রাদি কোলে লইয়া দিন দিন নূতন নূতন আনন্দে দিন যাপন করিতেছে। তুমি ভূমিষ্ঠ হইলে আমি ভগবানের নিকট সর্ব্বদা তোমার দীর্ঘজীবনের জন্য কামনা করিতাম। তখন অবস্থা ভাল ছিল না, আমায় লোকে হরের মা বলিত। যখন পাস করিয়া জলপানি পাইলে, তখন তোমার বিবাহ দিলাম; লোকে তখন হরির মা বলিতে লাগিল। যখন উকিল হইলে, তখন হরিবাবুর মা বলিয়া সকলে ডাকিতে আরম্ভ করিল। পাঁচজনকে ভাল মন্দ সামগ্রী দিতাম, পাঁচ জনকে ভাল মন্দ খাওয়াইতাম, তখন সকলে আমায় শত ধন্যবাদ দিতে লাগিল, সকলে আমায় রত্নগর্ভা বলিয়া কত মিষ্ট কথা বলিত, হরিবাবুর মা না বলিয়া উকীলবাবুর মা বলিয়া ডাকিত। বাপু! তুমি জজ হইলে আমায় লোকে জজের মা বলিবে। আমি কি ছিলাম কি হইয়াছি, তাহা আমি জানি। যখন হরের মা ছিলাম, তখন কাহার বাড়ীতে নিমন্ত্রণে যাইলে তাহারা দেখিয়াও দেখিত না। যাহারা ধনীর মা, তাহাদের লইয়া সকলে ব্যতিব্যস্ত থাকিত। সকল কুটুম্বের কাছে "ইনি অমুকের মা" বলিয়া পরিচয় দেওয়া, পাখা আনিয়া বাতাস করা, ভাল আসনে বসান, কিন্তু আমি সম্মুখে গিয়া "কিগো মা! সব ভাল আছ?" বলিলেও কথাগুলা কানে প্রবেশ করিত না। সে সকল কথা আমার অন্তরে গাঁথা আছে। যখন হরির মা হইলাম, তখন কাহার

বাড়ীতে যাইলে "এস তোমার হরি ভাল আছে" বলিয়া সম্বোধন করিত। হরিবাবুর মা হইলে কাহার বাড়ীতে যাইবামাত্র পাল্কীর নিকট হইতে আমায় আদর করিয়া লইয়া যাইত। এখন উকীলের মা, আমায় কত অনুরোধ করিয়া তবে কেহ লইয়া যাইতে পারে, জজের মা হইলে আমার সঙ্গে দুটো কথা কহিয়া লোকেরা শুভ দিন মনে করিবে। প্রত্যেক সংসারীর এইরূপ অবস্থা হইয়া থাকে। এই চিত্রে কি মাতার স্বার্থপরতা নাই? ইহাকে মাতৃস্নেহ বলা যাইবে? ইহা সন্তানের পক্ষে কি বাস্তবিক কল্যাণজনক কথা? কখন নহে। আত্মকল্যাণ কাহাকে কহে? আত্মার সঙ্কল্পবিবর্জ্জিত ভাবকে আত্ম-কল্যাণ কহা যায়। সঙ্কল্প বাড়িলে আত্মা বিপদগ্রস্ত হইয়া থাকেন, সঙ্কল্প বাড়িলে আত্মা পরমাত্মা হইতে অনেক দূরে নিপতিত হইয়া থাকেন। সুতরাং এ প্রকার বাহ্যিক আড়ম্বরে অকল্যান হইয়া থাকে। আত্ম জ্ঞান এবং আত্ম-বিজ্ঞানই প্রকৃত কল্যাণজনক কথা।

সংসারের এই স্বার্থপরতা ভাব বর্ত্তমান কালের বিশেষ লক্ষণ। বলা হইয়াছে যে. পুরাকালে সে প্রকার ছিল না। তখন প্রেমে সংসার সংগঠন করা হইত, এক্ষণে কামের সংসার হইয়া আসিয়াছে। সুতরাং, তখনকার ভাবের সহিত এখনকার ভাবের সাদৃশ্য দেখা যায় না।

বর্ত্তমানকালে আমরা সকলে স্বার্থপর হইয়াছি। মাতা পিতা যেমন নিজ নিজ স্বার্থের দিকে সম্পূর্ণ দৃষ্টি করিয়া থাকেন, ভ্রাতা ভগ্নীরা যেমন নিজ নিজ স্বার্থের দিকে দৃষ্টি রাখেন, স্ত্রী পুত্রেরা যেমন নিজ নিজ স্বার্থের দিকে দৃষ্টি রাখে, আমরাও তেমনি নিজ নিজ স্বার্থের প্রতি পাঁচ সিকা পাঁচ আনা দৃষ্টি রাখিয়া থাকি। সুতরাং, এক স্থানে সকল সেয়া-নার সমাবেশ হইয়াছে। মাতা মনে করেন যে, তাঁহার কর্ত্তৃত্বে সংসার

চলিবে, তিনি যাহা মনে করিবেন তাহাই হইবে, পিতা মনে করেন যে সকলে তাঁহার ইচ্ছাধীন থাকিবে, তিনি ক্ষুদ্র ব্রহ্মাণ্ডের ঈশ্বরস্বরূপ বিরাজ করিবেন। পুত্রেরা মনে করে যে, যত ভাগের সংখ্যা কমিয়া যায়, ততই শ্রেয়। পুত্রবধূরা স্বাধীন ভাবে দিন যাপন করিতে চাহেন। এমন কি, বেতনভোগী ভৃত্যেরাও স্বার্থপরতা রূপ স্বাধীন বৃত্তির পরিচয় দিতে সর্ব্বদা প্রস্তুত রহিয়াছে। যে স্থানে স্বার্থপরতার সাম্রাজ্য স্থাপন হয়, সে স্থানে শান্তি কোথায়? শান্তি কি এক অনুপলকাল অবস্থিতি করিতে পারে? এই নিমিত্ত বর্ত্তমানকালের সংসারাশ্রম অশান্তির আলয় হইয়া পড়িয়াছে।

পূর্ব্বকালের হিন্দুগণ ব্রহ্মচর্য্যাশ্রম হইতে আত্ম-জ্ঞান লাভ পূর্ব্বক সংসারে প্রবেশ করিতেন। এই জন্য তাঁহারা প্রেমের সহিত সাংসারিক কার্য্যকলাপ সম্পন্ন করিয়া যাইতে পারিতেন। তাঁহারা মনে বুঝিতেন যে, এক পরমাত্মা সঙ্কল্পপথারূঢ় হইয়া নানারূপে লীলা খেলা করিতেছেন। স্থূলে তিনিই বহু—বহু ভাবব্যঞ্জক। সুতরাং তাঁহারা সংসারে কাহার সহিত স্বার্থ লইয়া বিবাদ বিসম্বাদ করিবেন? অথবা যদিই বিবাদ বিসম্বাদ করিতে হইত, তাহা হইলে তাঁহারা জানিতেন যে, ইহা ভগবানের লীলাবিশেষ। যে সময় কৈকেয়ীর কৌশলে কৌশল্যার হৃদয়মণি রঘুমনি অরণ্যে গমন করেন, সে সময়ে ভরত রাজধানীতে ছিলেন না। ভরত রাজপ্রাসাদে প্রত্যাগমন করিয়া রামচন্দ্রের বনগমনবার্ত্তা শ্রবণ পূর্ব্বক নিজ মাতাকে তিরস্কার করিয়া রাঘবকুলরবিকে স্বদেশে আনয়ন করিবার নিমিত্ত গমন করেন। কথিত আছে যে, কৈকেয়ীও তাঁহার সমভিব্যহারে গমন করিয়াছিলেন। ভরত জ্যেষ্ঠের চরণে নিপতিত হইয়া, অশেষ প্রকার অনুনয় বিনয় করায় রাম কহিয়াছিলেন যে, ভাই! মাতার নিকট পিতা সত্যে

আবদ্ধ হইয়াছেন, সেই পিতৃসত্য পালনের নিমিত্ত আজ রাম বনবাসী। সত্য ভঙ্গ করিলে পিতা পতিত হইবেন। কৈকেয়ী এই কথা শ্রবণান্তর কহিয়াছিলেন, হাঁারে রাম! রামায়ণ কি তোর লীলা দেখিয়া প্রণীত হইয়াছে? না তোর লীলার পূর্ব্বে বাল্মিকী লিখিয়াছেন? তুই নিজ লীলা বিস্তীর্ণ করিবি বলিয়া কৌশল পূর্ব্বক কৌশল্যার গর্ভে স্থান লইয়া কেন দুঃখিনী কৈকেয়ীকে এই লোকলজ্জায় ফেলিলি? তোর নাট্যমন্দিরে তুই নট, তুই নটী, তুই অভিনেতা, তুই অভিনেতৃ, তাহা আমি জানি; কিন্তু অবস্থাবিশেষের কার্য্যবিশেষে ভাল মন্দ কথার চলন আছে! সংসারের মায়ায় আমি যখন মনে করি যে, তুই আমার সপত্নীপুত্র, আমি তোর বিমাতা, তখনি ভরতের দিকে দৃষ্টি পড়ে। যখন মনে করি যে, তুই পরমাত্মা, এ সকল তোর লীলা, তখনই রাম তোকে হৃদয়ে ধারণ করিয়া মানবজন্মের স্বার্থকতা জ্ঞান করিয়া থাকি। তত্ত্ব-জ্ঞান-বিশিষ্ট সাংসারিক নরনারীদিগের বাস্তবিক এইরূপ বিজ্ঞান হইয়া থাকে। তাঁহারা সকলেই স্থূলে নিজ নিজ ভাব বুঝিয়া থাকেন, আবার মূলেও নিজ নিজ ভাব উপলব্ধি করিয়া থাকেন। মূলে এবং স্থূলে যাঁহারা একীকরণ করেন, তাঁহারা প্রেমিক প্রেমিকা না হইয়া কখন কি স্বার্থপর হইতে পারেন? তাই বলিতেছি যে, বর্ত্তমান কালের সংসার প্রেমবিহীন, পূর্ব্বে সংসার প্রেমপূর্ণ ছিল। প্রেমের কার্য্য স্বতন্ত্র। তাই তখন সকল প্রকার প্রেমের কার্য্য দেখা যাইত। তখনকার লোকেরা মাতা পিতাকে শ্রদ্ধা ভক্তি করিতে জানিতেন, ভ্রাতা ও ভগ্নীকে ভালবাসিতে জানিতেন, স্বদেশী বিদেশীর সহিত সদ্ভাব দেখাইতেন, স্ত্রীর সহিত মধুরভাব স্থাপন করিতে পারিতেন, পুত্র কন্যাদিগের ভক্তিভাজন হইতেন। পূর্ব্বে বলিয়াছি যে, তাঁহারা জানিতেন যে, সংসার ব্যতীত প্রেম শিক্ষা করিবার দ্বিতীয় স্থান আর

নাই। মাতার নিকট না থাকিলে, মাতার সস্নেহ বাণী না শুনিলে, মাতৃভাব কাহাকে কহে, কেমন করিয়া শিক্ষা করা যায়? মাতৃভাব অন্যের নিকটে শিক্ষা করা যায় না। মা বলিয়া ডাকিলে তিনি যখন প্রত্যুত্তর দেন, সেই কথা কত সুন্দর, কত মিষ্ট, তাহা বলিয়া প্রকাশ করা যায় না। মাতার নিকট মাতৃভাব শিক্ষা না করিলে ব্রহ্মময়ীকে কখন মা বলিয়া ডাকিতে পারা যায় না। কেবল ডাকিলে কি হইবে? ডাকার সহিত প্রেমের সম্বন্ধ থাকা চাই। সে সম্বন্ধ জগতে কেবল মাতার সহিত আছে এবং মাতা হইতে তাহা শিক্ষা করা যায়। তখন-কার লোকেরা এই তত্ত্ব জানিতেন, সুতরাং মাতৃভক্তি করিতে কখন পরাঙ্মুখ হইতেন না। তাঁহারা জানিতেন যে, মাতা হইতে ভগবতীর সাক্ষাৎ পাওয়া অতি সহজ। মাতার ভাব মাতা হইতে ভগবতীতে প্রদান করিলেই কার্য্যসিদ্ধি হইবার সম্ভাবনা। সুতরাং সংসারে মাতৃ-ভাবের কার্য্যকে সাংসারিক ভাব না বলিয়া মাতৃভাবের সাধন বলিলেও বলা যায়। এমন স্থলে কাম বা স্বার্থপরতা স্থান পাইবে কেন? এই স্থানে কাম এবং প্রেমের অর্থবিভ্রাট ঘটিতে পারে। কারণ প্রেমে স্বার্থ আছে, কামেও স্বার্থ আছে; এমন স্থলে কামকে স্বার্থ বলিয়া প্রেমকে নিঃস্বার্থ বলা কতদূর সঙ্গত? প্রভু বলিয়াছেন যে, কামে নিজের স্পৃহা চরিতার্থ ব্যতীত অন্য কোন দিকে দৃষ্টি থাকে না। প্রেমে তাহা নহে। ভক্তি করিতে হয় করিতেছি—ভাল-বাসিতে হয় ভালবাসিতেছি। কেন হয়, বা না হয়, এরূপ কোন কারণ বাহির করিয়া দেখিবার প্রয়োজন থাকে না।

পুত্র যেমন মাতৃপ্রেম শিক্ষা করিয়া আধ্যাত্মিক উন্নতি সাধন করিতেন, মাতাও পুত্র হইতে আধ্যাত্মিক কল্যাণ লাভ করিতেন। মাতা জানিতেন যে, বাৎসল্য ভাব পুত্র ব্যতীত জন্মে না। সাংসারিক

ভাবে পুত্রের সেবা করিয়া আশ্রম ধর্ম্ম প্রতিপালন করিতেন এবং মনে মনে গোপাল ভাব সঞ্চয় করিয়া লইতেন। আপন পুত্রকে প্রতিপালন করিয়া সময়বিশেষে উহা দ্বারা বাৎসল্য ভাবে ভগবান লাভ ঘটিয়া যাইত। একদা প্রভু কোন হিন্দুমহিলাকে এইরূপ উপদেশ দিয়া কহিয়াছিলেন যে, বাছা! তুমি ভালবাস কাহাকে? তিনি বলিলেন যে, আমার একটী ভ্রাতুষ্পুত্রকে আমি মানুষ করিয়াছি, পৃথিবীতে তাহাকেই প্রাণের রত্ন বলিয়া জানি। ঠাকুর তাঁহাকে বলিয়াছিলেন যে, দেখ বেশি কিছু করিতে হইবে না। তাহাকে যেমন খাওয়াও, পরাও, তেমনি করিও, মনে মনে আমার ভ্রাতুষ্পুত্র এমন ভাব না রাখিয়া গোপাল ভাব রাখিও, তোমার গোপাল লাভ হইবে। বর্ত্তমান কালের অবলা প্রভুর নিকটে বলিয়া অনেক কষ্টে ভাবটী ধারণা করিতে পারিলেন এবং পরদিন গোপাল ভাবে উহাকে দেখিবামাত্র তাঁহার বাৎসল্য-মহাভাব উদয় হইয়া গেল।

পিতা, ভ্রাতা, স্ত্রী প্রভৃতি সকলেরই স্ব স্ব প্রেম শিক্ষার সুবিধার স্থল বলিয়া সংসার প্রেমের আলয় বলিয়া কথিত হইত।

বর্ত্তমান কালের সংসারে প্রেম নাই। বলিয়াছি কাম আসিয়া প্রেমকে স্থানভ্রষ্ট করিয়া আধিপত্য স্থাপন করিয়াছে। কামের দ্বারা আমরা পরিচালিত হই বলিয়া আমাদের সকল কার্য্যেই তাহার সম্বন্ধ দেখা যায়।

ঐহিক স্বার্থ ভিন্ন আমরা একপদ অগ্রসর হইতে চাহি না, ঐহিকের স্বার্থ ব্যতীত কাহারও সহিত আলাপ করিতে চাহি না। কেহ আলাপ করিতে আসিলে আপনার এবং তাহার স্বার্থ খুঁজিয়া বাহির করিতে চেষ্টা করিয়া থাকি। এই প্রসঙ্গে আমার একটী ঘটনা মনে হইল। কয়েক বৎসর অতীত হইল, আমাদের বর্ত্তমানকালের অধিক মূল্যে

বিবাহের পাত্র খরিদ করা প্রথা নিবারণ করিবার জন্য সহরের প্রায় সমুদয় সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির দ্বারে দ্বারে পরিভ্রমণ করিতাম। একদা আমার এক বন্ধুর দ্বারা কোন ভদ্রলোকের নিকটে পরিচিত হইয়া আমার অভিপ্রায় প্রকাশ করি। তিনি মনুসংহিতা লইয়া নানাবিধ কুতর্কের পর বলিয়াছিলেন যে, দেখুন সকলেই দেশহিতৈষী, দেশের কল্যাণের জন্য কাহার নিদ্রা হইতেছে না। আজকাল অনেকে সম্ভ্রান্ত লোকের সহিত আলাপ করিতে চাহেন। তাঁহাদের সহিত আলাপ করিবার অন্য সুবিধা হয় না, দেশহিতৈষীতার দোহাই দেওয়া অতি সহজ উপায়। এইরূপে নিজ নিজ পদোন্নতি করিতে পারেন। ভদ্রলোকের বাটিতে আসা যাওয়া করিলে নিমন্ত্রণাদিও করিতে হয়। সুতরাং তাঁহাদের বাটীর সম্মুখে সর্ব্বদা জুড়ি ফেটিং যাইয়া দাঁড়ায়, পাড়ার লোকেরা তাঁহাকে বড়লোক বলিয়া মান্য করিতে বাধ্য হয়। আমি আশ্চর্য্য হইয়া তাঁহার ভাব দেখিয়া লইলাম এবং মনে মনে ভাবিলাম, আমাদের এমন বিকৃত বুদ্ধি না হইলে এই অবনতি হইবে কেন? সে যাহা হউক, স্বার্থপরতার এতদূর বিক্রম জন্মিয়াছে। এই জন্য আমাদের হৃদয়ে আর সহানুভূতি দেখিতে পাওয়া যায় না, দুঃখীর দুঃখে আর হৃদয় কাঁদে না, দরিদ্রের আর্ত্তনাদে আমাদের হৃদয়তন্ত্রী স্পন্দিত হয় না, ভ্রাতার মুখের গ্রাস কাড়িয়া লইতে প্রাণ কাঁদিয়া উঠে না. প্রতিবেশীর দুর্দ্দশাপন্ন অবস্থা দেখিয়া তাঁহার দুঃখমোচন করিতে প্রাণ চাহে না, কন্যাভারগ্রস্ত অনন্যোপায় ব্যক্তির শোণিত পান করিতে মর্ম্মদেশ প্রপীড়িত হয় না। যে দিকে দেখা যায়, সেই দিকেই স্বার্থপরতা দেদীপ্যমান রহিয়াছে। সামান্য ব্যবসাদার হইতে উচ্চ ব্যবসাদারেরাও স্বার্থ-পরতা-ত্রিশূল হস্তে লইয়া স্বদেশী বিদেশীর শোণিত নির্গত করিবার প্রত্যাশায় অপেক্ষা করিতেছে। ইহাই আমাদের বর্ত্তমান সংসারাশ্রম।

এই স্বার্থপরতাপূর্ণ বিকৃত আশ্রমে বসিয়া আমরা হিন্দু বলিয়া পরিচয় দিয়া থাকি। এই কি হিন্দুর সংসারাশ্রম? হিন্দুর সংসারে দয়া, হিন্দুর সংসারে সমবেদনা, হিন্দুর সংসারে পরকাতরতা, হিন্দুর সংসারে পরোপকারিতা বিদিগন্তে থাকিবে। হিন্দুর গৃহে লক্ষ্মী, হিন্দুর গৃহে সরস্বতী, হিন্দুর গৃহে অন্নপূর্ণা বিরাজিতা থাকিবে, হিন্দুর প্রাণ কখন আপন সংসারে সীমাবদ্ধ থাকিবে না। হিন্দুর প্রাণ পৃথিবী, আকাশ, পাতাল ব্যাপিয়া থাকিবে। সেই হিন্দু কি আমরা? না আমরা স্বার্থপরতামন্ত্রে দীক্ষিত, তাহাতেই সাধক হইয়া সিদ্ধাবস্থা লাভ করিয়াছি? এই নিমিত্ত বর্ত্তমান কালের সংসারাশ্রম পূর্ব্বকালের ন্যায় আধ্যাত্মিক মঙ্গলের সহায়তা না করিয়া ক্রমে অধোগামী করিয়া থাকে। এক্ষণে বুঝা যাইবে যে, সংসারাশ্রম উত্তম কি না? এই কথা সর্ব্বদা আন্দোলনের বিষয় হইয়া থাকে। ভাল এবং মন্দ কোন্ হিসাবে? সংসারে থাকাই যে লোকের উদ্দেশ্য, তাহা নহে। যেমন হাবড়া হইতে কাশীধামে যাইতে হইলে নানাস্থান অতিক্রম করিয়া যাইতে হয়, সেইরূপ আশ্রমগুলি জীবন-পথের ষ্টেসন বিশেষ--এ কথা যেন কাহার ভুল না হয়। যখন দেহের উৎপত্তি হইয়াছে, তখন তাহার পরিসমাপ্তি হইবে, তাহার সন্দেহ নাই। সংসারই জীবনের শেষ স্থান নহে। সংসার ষ্টেসন বিশেষ, কিঞ্চিৎ কালের জন্য পরিভ্রমণ করিতে আসিয়াছি; যখনি ট্রেন ছাড়িবার সময় হইবে, তখনি ছুটিয়া যাইতে হইবে। এমন ক্ষণিক সম্বন্ধযুক্ত স্থানে এত স্বার্থপরতা কেন? এই নিমিত্ত রামকৃষ্ণদেব বলিয়াছেন যে, ধনীর উদ্যানে কেহ বেড়াইতে যাইলে কর্ম্মচারী সকল কথায় "আমার" শব্দ প্রয়োগ করিয়া পরিচয় দিয়া থাকে। আমাদের বাগানে যেমন আম গাছ আছে, এমন আর কোথাও নাই, আমাদের বাগানের লিচুর মত

অমন মিষ্ট লিচু কেহ কখন দেখে নাই, ইত্যাকার প্রত্যেক কথায় আমার এবং আমাদের বলিয়া থাকে। কিন্তু পুকুরের একটা মাছ ধরিয়া খাইলে, কর্ত্তা যদ্যপি সে কথা শুনেন, তাহা হইলে তৎক্ষণাৎ তাহাকে বাগান হইতে বাহির হইয়া যাইতে হয়। তখন এমন কি তাঁহার এঁবো সিন্দুকটাও বিনা অনুমতিতে বাহিরে লইয়া যাইবার অধিকার থাকে না। সংসারে আমারা সেইরূপ "আমার" সম্বন্ধে অবস্থিতি করিয়া থাকি।

এই নিমিত্ত সংসারাশ্রমকে হিন্দুরা দ্বিতীয়াশ্রম বলিয়া কহিয়াছেন। অর্থাৎ ইহাতে জীবনান্ত করা জীবনের কর্ত্তব্য নহে। এই নিমিত্ত প্রত্যেক ব্যক্তি আশ্রম চতুষ্টয় অবলম্বন না করিলে তাঁহারা সকলের নিন্দনীয় হইতেন। কোন দেশে একজন খ্যাতনামা নর্ত্তকী বাস করিত। এই নর্ত্তকী একলক্ষ মুদ্রার কমে কোথাও নৃত্য করিতে যাইত না। একদা সেই দেশের নরনাথ প্রজাদিগের মানসিকভাব অবগত হইবার জন্য রজনীযোগে ছদ্মবেশে পরিভ্রমন করিতে যাইলেন। নানাস্থান পর্য্যটন করিয়া ঐ নর্ত্তকীর বাটীর সন্নিধানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। নর্ত্তকী বারাণ্ডায় বসিয়া আক্ষেপ করিয়া বলিতেছিল যে, "এমন দেশে আসিয়া বাস করিয়াছি যে, আমার নৃত্য দেখে এমম ধনী নাই। অন্য কেহ নাই থাকুক, রাজাই বা কি ? তাঁহার কি ইহাতে লজ্জা হয় না। যাহাই হউক, অতি ত্বরায় এস্থান পরিত্যাগ করাই বিধেয়।" নর্ত্তকীর কথাগুলি রাজা যত্নপূর্ব্বক শ্রবণ করিলেন। তিনি পরদিবস প্রাতঃকালে দূত দ্বারা নর্ত্তকীকে আহ্বান করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন,—"তুমি নর্ত্তকী ?" নর্ত্তকী কৃতাঞ্জলিপুটে মস্তকাবনত করিয়া উত্তর দিল। রাজা নর্ত্তকীর সৌজন্যতায় বিশেষ সন্তুষ্ট হইয়া কহিলেন, "দেখ ! আমি শুনিয়াছি যে, তুমি লক্ষ টাকা পণে নৃত্য করিয়া থাক। তাহাতে ক্ষতি

নাই। তোমার সৃষ্টিছাড়া পণেই আমি সম্মত হইলাম। কিন্তু সাবধান! তুমি কিম্বা তোমার দলের কাহারও যেন নিদ্রাকর্ষণ না হয়? তাহা হইলে আমি তোমায় সদলে বিনাশ করিব।" নর্ত্তকী তাহাই স্বীকার করিল।

এই নর্ত্তকীর নৃত্য হইবে শুনিয়া অতিশয় জনতা হইল। সমুদয় রজনী পরমানন্দে অতিবাহিত হইয়া শেষ সময়ে দলস্থিত জনৈক ব্যক্তিকে জৃম্ভন করিতে দেখিয়া নর্ত্তকী কহিল, "বাপু! কি করিতেছ? তোমার কি জ্ঞান নাই যে, দীর্ঘকাল অতিবাহিত হইয়া গিয়াছে, নৃত্য পরিসমাপ্তির আর অধিক বিলম্ব নাই, তবে অকারণ কেন কলঙ্কের ভার মস্তকে লইয়া যাইবে।"

নর্ত্তকীর প্রমুখাৎ এই উপদেশবাণী বহির্গত হইবামাত্র রাজা পরমানন্দে মহামূল্যের হীরকমালা পারিতোষিক প্রদান করিলেন। রাজার গুরু কহিলেন, "বৎসে! আমি আর তোমায় কি দিয়া আনন্দিত করিব, আমার এই হরিনামের মালা গ্রহণ কর।" যুবরাজ নর্ত্তকীর সম্মুখে যাইয়া অঙ্গুরী প্রদান করিলেন এবং উপর হইতে রাজকন্যা মতির মালা ফেলিয়া দিলেন। নর্ত্তকীকে এইরূপে পারিতোষিক প্রদান করিতে দেখিয়া রাজা গুরুকে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'প্রভো! আপনি কি জন্য পারিতোষিক দিলেন?" গুরু কহিলেন, "দেখ মহারাজ! আমি কামিনীকাঞ্চন অসার জানিয়া তাহা পরিত্যাগ পূর্ব্বক বিভুচিন্তায় জীবনাতিবাহিত করিবার মানসে ব্রহ্মচর্য্যাশ্রম হইতে সন্ন্যাসাশ্রম অবলম্বন করিয়াছি। কিন্তু কি পরিতাপ! আমি সন্ন্যাসী, একথা বিস্মৃত হইয়া তোমার দীক্ষা গুরু হইয়াছি এবং রাজপ্রাসাদের রাজভোগে জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিতেছি। কোথায় গেল আমার সাধন, কোথায় গেল আমার ভজন, কোথায় গেল আমার সন্ন্যাস, কোথায় গেল আমার

জীবনের লক্ষ্য। দিন কাটিয়া গেল, আর কতকাল ভবলীলা করিব জানি না, কখন জীবন-রঙ্গভূমির যবনিকা নিপতিত হইবে জানি না। অদ্য নর্ত্তকী আমার গুরুর কার্য্য করিয়াছে। নর্ত্তকীর কথায় আমার ভ্রম বিদূরিত হইয়াছে। দীর্ঘকাল কাটিয়া গিয়াছে, আর সময় নাই। এই বেলা যদি সাবধান হই, তাহা হইলে হয় ত কেহ কলঙ্কারোপ করিতে পারিবে না। অতএব মহারাজ! আমি বিদায় হইলাম।" গুরুর কথা পরিসমাপ্তি হইবামাত্র রাজা কহিলেন, "প্রভো! কিঞ্চিৎ অপেক্ষা করুন, যুবরাজ এবং রাজকুমারী কি কারণে পারিতোষিক দিয়াছে, তাহা অবগত হইবার নিমিত্ত কুতূহল জন্মিয়াছে।" যুবরাজ কৃতাঞ্জলিপুটে কহিলেন, "মহারাজ! অপরাধ গ্রহণ করিবেন না। শাস্ত্রমতে পঞ্চাশ বৎসরের পর বানপ্রস্থাশ্রম অবলম্বন করা আমাদের কুলপ্রথা। আপনি তাহা অমান্য করিয়াছেন। আমি এইজন্য মনে মনে স্থির করিয়াছিলাম যে, নৃত্যাদি পরিসমাপ্ত হইলে আপনি যখন অন্তঃপুরে গমন করিবেন, সেই সময়ে গুপ্ত ঘাতক দ্বারা আপনার জীবন নাশ করিবার ব্যবস্থা করিয়া রাখিয়াছিলাম। নর্ত্তকীর কথায় আমি বুঝিলাম যে, এতদিন কাটিয়া গিয়াছে, আর অল্প সময়ের জন্য কেন পিতৃঘাতী হইয়া কলঙ্কিত হইব।" রাজকুমারী কহিলেন, "মহারাজ! আমার বিবাহের নিমিত্ত অদ্যাপি কোন ব্যবস্থা হয় নাই। তাই মনে করিয়াছিলাম যে, অদ্য যথায় ইচ্ছা চলিয়া যাইব এবং যাহাকে ইচ্ছা বিবাহ করিব। নর্ত্তকীর উপদেশে আমার জ্ঞান হইল যে, বিবাহ না হইয়া এতদিন কাটিয়া গিয়াছে, তাহাতে কোন ক্ষতি হয় নাই। অনর্থক অভিমানের বশবর্ত্তিনী হইয়া কেন কলঙ্ক-সাগরে ঝাঁপ দিব।" রাজা তখন গাত্রোত্থান পূর্ব্বক আপনার পরিচ্ছদাদি সমুদয় ।পরিত্যাগ পূর্ব্বক রাজমুকুট এবং অসি যুবরাজকে প্রদান করিয়া গুরুকে কহিলেন,

"প্রভো! অগ্রসর হউন, আমি আপনার পশ্চাৎগামী হই। নর্ত্তকীর উপদেশ সম্বন্ধে যাহা শুনিলাম, আমিও তাহা বুঝিয়াছি। উহার কথায় বাস্তবিক আমার জ্ঞানচক্ষু খুলিয়া গিয়াছে। আমি নরাধম কুলাঙ্গার, কামিনীকাঞ্চনের লোভে শাস্ত্রবাক্য অবজ্ঞা করিয়াছি। এ পাপের প্রায়শ্চিত্তের নিমিত্ত প্রভু আপনার শরণাগত হইলাম।" এই বলিয়া রাজা প্রস্থান করিলেন।

সংসারে বাস করিতে হইলে বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম প্রতিপালন করা সর্ব্বো-তোভাবে বিধেয়। মনুষ্যগণ যেমন কালসহকারে ভিন্ন ভিন্ন অবস্থায় পতিত হয় এবং অবস্থাবিশেষে কার্য্যবিশেষ সম্পন্ন করিতে বাধ্য হয়, তেমনি বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম জানিতে হইবে। মনুষ্যদিগের জীবনের প্রথমা-বস্থাকে শূদ্রবর্ণ বলিয়া কহা যাইতে পারে। এ অবস্থায় বালকবুদ্ধি নিবন্ধন কার্য্যের হিসাব জ্ঞান থাকে না, কার্য্যবিধি বিবর্জ্জিত বুদ্ধিবিশিষ্ট ব্যক্তিকে শূদ্র বলাই কর্ত্তব্য। দ্বিতীয়াবস্থাকে বৈশ্য কহা যায়। বৈশ্যের লক্ষণ ব্যবসা। এই অবস্থায় বাস্তবিক কার্য্যের বিচার করিতে হয়। এই সময়ে হিসাব করিয়া কার্য্য করিতে পারিলে লাভালাভের সম্ভাবনা। এই সময়ের কার্য্যের উপর জীবনের ভাবী অবস্থা নির্ভর করিয়া থাকে। মনুষ্যের বৈশ্যদশা অতি কঠিন কাল। তৃতীয়াবস্থাকে ক্ষত্রিয় বলিতে পারা যায়। ক্ষত্রিয়ের কার্য্য রাজ্যশাসন, দেহের পক্ষে আত্মশাসন বুঝায়। আত্মশাসন করিবার শক্তি সঞ্চারিত না হইলে তাহার দ্বারা দৈহিক কার্য্য সুচারুরূপে সম্পন্ন হইতে পারে না। যেমন দুর্ব্বল, কার্য্যজ্ঞানবিহীন নরপতির রাজ্যে কখন সুশৃঙ্খলা থাকে না, আত্মশাসন করিবার শক্তি না থাকিলে সে ব্যক্তি সর্ব্বদা সময়ের হিল্লোলে পরিচালিত হইতে বাধ্য হইয়া থাকে। চতুর্থাবস্থাকে ব্রাহ্মণ বলে। আত্মশাসন করিতে পারিলে তবে সেই ব্যক্তি ভগবানের

দ্বারস্থ হইবার উপযুক্ত হইতে পারে ; সুতরাং এরূপ ব্যক্তিরই ব্রহ্মজ্ঞান লাভের সম্ভাবনা। ব্রহ্মবিদ্ ব্যক্তিই প্রকৃতপক্ষে ব্রাহ্মণ শব্দে অভিহিত হইয়া থাকেন।

মনুষ্যজীবন আলোচনা করিলে বর্ণাশ্রম ধর্ম্মের ভাব প্রাপ্ত হওয়া যায়। মনুষ্যদিগের বাসস্থানকে সংসার কহে। সংসারে সুতরাং, চতুর্ব্বর্ণ এবং আশ্রমচতুষ্টয়ের কার্য্য অবশ্যই দেখিতে পাওয়া যাইবে। বালকের কার্য্য এক প্রকার, তাহার স্থান স্বতন্ত্র ; যুবার কার্য্য এবং স্থান স্বতন্ত্র ; প্রৌঢ়ের কার্য্য এবং স্থান স্বতন্ত্র, তাহার সন্দেহ নাই। বালক, যুবা, প্রৌঢ় এবং বৃদ্ধ, এই চারি অবস্থার কার্য্য কখন এক প্রকার হইতে পারে না। সেই প্রকার বর্ণ এবং আশ্রম ধর্ম্ম কখন এক হইবার নহে। বর্ত্তমানকালে সংসারাশ্রমেই আমরা সমুদয় আশ্রম পর্য্যবসিত করিয়াছি, এই নিমিত্ত বলিতেছি যে, হিন্দুর বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম বিকৃত হইয়াছে।

সংসারাশ্রমের দ্বিতীয় উদ্দেশ্য এই যে, ইহাকে কর্ম্মের স্থান কহে। জীবনের সঙ্কল্প দূর করা মনুষ্যের কর্ত্তব্য। সঙ্কল্প ক্ষয় করিতে হইলে কর্ম্মের প্রয়োজন ; সুতরাং, সংসারাশ্রম অবলম্বন ব্যতীত দ্বিতীয় উপায় নাই। সংসার হইতে সঙ্কল্পের উত্তেজনা হয় এবং তাহা হইতে তাহা ক্ষয় পাইয়া থাকে। এই নিমিত্ত প্রভু বলিতেন যে, বিচার বুদ্ধি রাখিয়া সংসারে অবস্থিতি করিবে। বিচার বলিলে এই বুঝিতে হইবে যে, কোন অবস্থায় আত্মবিস্মৃতি না হয়। তিনি এইজন্য আরও বলিতেন, যেমন কূপের সন্নিধানে সাবধানে থাকিতে হয়। অন্যমনা হইলে কূপে নিমগ্ন হওয়া অনিবার্য্য। তিনি আরও বলিয়াছেন, যেমন তন্ত্রমতে শবসাধনা করিতে হইলে সর্ব্বাগ্রে চাল ছোলা ভাজার অনুষ্ঠান করিয়া রাখা কর্ত্তব্য, সংসারে পরিবারদিগকে শবের ন্যায় বুঝিয়া তাঁহাদের প্রয়োজনীয় সামগ্রী সকল প্রদান করিয়া আত্মকল্যাণের উপায় করিয়া লওয়া কর্ত্তব্য।

এইরূপ নানাপ্রকার উপদেশে তিনি বলিয়াছেন যে, সংসারে আধ্যাত্মিক উন্নতি করা যায়। সুতরাং ইহা কর্ম্মের স্থান। সংসারাশ্রম হইতে কর্ম্মের দ্বারা সঙ্কল্প ক্ষয় করিতে পারিলে তাহার তৃতীয়াদি আশ্রমের অধিকার জন্মায়। যেমন প্রৌঢ়াবস্থায় উপনীত হইতে হইলে যৌবনাদি কালত্রয় অতিক্রম করিয়া যাইতে হয়; বাল্যাবস্থার পর প্রৌঢ়াবস্থা হইতে পারে না, তেমনি সংসারাশ্রম অতিক্রম করিয়া সন্ন্যাসী হওয়া যায় না। এইরূপ নানা কারণে সংসারাশ্রমকে সকল আশ্রমের শ্রেষ্ঠ বলিয়া কেহ কেহ উল্লেখ করেন। কিন্তু শ্রেষ্ঠ শব্দ প্রয়োগ করা যুক্তিসঙ্গত কথা নহে। কারণ, আশ্রমের ইতরবিশেষ করা যায় না। আমরা সময়ে সময়ে অনেককে গৃহী না হইয়া সন্ন্যাসী হইতে দেখিয়া থাকি। এরূপ আশ্রমান্তরের ভাব হইবার হেতু কি? যে সকল আত্মা সংসারে থাকিয়া কর্ম্ম দ্বারা সঙ্কল্প ক্ষয় করেন, পরজন্মে তাঁহাদের আশ্রমের পরিবর্ত্তন হইয়া থাকে।

এই কথার দ্বারা কেহ এরূপ মনে না করেন যে, প্রত্যেককে এই নিয়মে পরিচালিত হইতে হইবে। আশ্রমধর্ম্মের দ্বারা কর্ম্মক্ষয় করিতে পারিলে সংসারাশ্রমেই তাহার মুক্তি লাভ হইতে পারে। যদিও সংসারাশ্রম শব্দ ব্যবহৃত হইল, কিন্তু তদ্দ্বারা আশ্রমধর্ম্ম বিশেষ নির্দ্দেশ করিতেছি না। বলিয়াছি যে, আশ্রমবিশেষ কার্য্যবিশেষের লক্ষণ মাত্র। সংসারাশ্রম বলিলে কামিনীকাঞ্চন সম্ভোগের দ্বারা সঙ্কল্প-বিবর্জ্জিত হইয়া ভগবান সাধনার স্পৃহা জন্মান পর্য্যন্ত সংসারাশ্রম কহে, সাধনা করা বানপ্রস্থাশ্রমের উদ্দেশ্য। যদ্যপি সংসারাশ্রমে তাহা প্রতিপালন করা যায়, তাহা হইলে আপত্তির হেতু হইতে পারেনা, কিন্তু কার্য্যে তাহা ঘটিয়া উঠা নিতান্ত অসম্ভব। এই নিমিত্ত সংসারাশ্রমে থাকিলে নরনারী সকল আত্মকল্যাণকামনা বিস্মৃত হইয়া সাংসারিক

কামনায় ব্যতিব্যস্ত থাকেন। দয়াময় ভগবান্ জীবের এইরূপ আত্ম-বিস্মৃতি নিবারণের জন্য সংসারে নানাবিধ বিভীষিকা দিয়াছেন। আত্মচিন্তা, আত্মকল্যাণ লাভের সদুপায়ের জন্য আত্মীয়দিগের পরলোকাদি দেখাইয়া চৈতন্য সম্পাদন করিবার ব্যবস্থা করিয়াছেন, কিন্তু তথাপি আমরা বুঝিয়াও তাহা বুঝিতে চাহিনা—দেখিয়াও দেখিতে ইচ্ছা হয় না। সংসারের আত্মসম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন হইলে কি প্রকার অবস্থা ঘটিয়া থাকে, তাহা প্রতিমুহূর্ত্তে দেখিতেছি—প্রতিমুহূর্ত্তে উপলব্ধি করিতেছি, কিন্তু অচিরাৎ তাহা বিস্মৃতির গর্ভে লীন হইয়া যায়। ইহার কারণ, আত্মজ্ঞান না থাকা, ইহার কারণ ব্রহ্মচর্য্যাশ্রমী হইয়া আত্মতত্ত্ব শিক্ষা না করা। আমাদের এইরূপ অবস্থাপন্ন দেখিয়া—আমাদিগকে বর্ণাশ্রমধর্ম্ম বিবর্জ্জিত দেখিয়া ভগবান্ অবতীর্ণ হইয়া তত্ত্বজ্ঞান প্রদান করিয়া থাকেন। সংসারে সর্ব্বদা বিভীষিকা এবং সময়ে সময়ে প্রভুর অবতরণ হয় বলিয়া বর্ণাশ্রমধর্ম্মবিবর্জ্জিত জীবের কল্যাণ বিধান হইয়া থাকে।

যদিও বর্ণাশ্রমধর্ম্মবিহীন নরনারীরা সময়ে সময়ে প্রভুর অবতরণ কালে এবং তাঁহার উপদেশানুসারে আত্মকল্যাণ লাভ করেন বটে, কিন্তু তাহা বলিয়া বর্ণাশ্রম ধর্ম্মের প্রয়োজন নাই, এ কথা কখনই মনোমধ্যে স্থান দেওয়া কর্ত্তব্য নহে। বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম না থাকিলে জাতি রক্ষা হয় না, বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম না রক্ষা করিলে কখন কোন সমাজ স্বভাবে থাকিতে পারে না, বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম রক্ষা করিবার জন্য ভগবান্ যুগে যুগে তাহা আপনি দেখাইয়া গিয়াছেন। রামচন্দ্র আশ্রমধর্ম্মানুসারে পিতৃসত্য পালন করিয়াছিলেন, আশ্রমধর্ম্ম রক্ষার্থ তিনি মাতার অদর্শনে বনে বনে রোদন করিয়া বেড়াইয়াছিলেন, আশ্রমধর্ম্মের অনুরোধে তিনি সহধর্ম্মিনীকে বনবাসিনী করিয়াছিলেন, আশ্রমধর্ম্মের নিমিত্ত তিনি

হিরণ্ময়ী সীতাকে লইয়া রাজসূয় যজ্ঞ সমাধা করিয়াছিলেন, আশ্রম ধর্ম্মের পুষ্টি সাধনের জন্য শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র নবনীতের জন্য যশোমতী কর্ত্তৃক সর্ব্বদা উৎপীড়িত হইতেন, আশ্রমধর্ম্মের জন্য গুরুকরণ করিয়াছিলেন, আশ্রমধর্ম্মের মধুরতা দেখাইবার জন্য পঞ্চভাবের ক্রীড়া করেন, আশ্রমধর্ম্মের বলাধান করিবার নিমিত্ত শ্রীগৌরাঙ্গদেব অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। তিনি প্রথমাবস্থায় ব্রহ্মচর্য্যাশ্রমী হইয়া শাস্ত্রাদি আলোচনা করেন। তৎপরে গৃহাশ্রমী হইয়া উদ্বাহশৃঙ্খলে আবদ্ধ হইয়া মাতাকে পরিত্যাগ পূর্ব্বক তৃতীয় ও চতুর্থাশ্রমের পরিচয় দিয়া গিয়াছেন। বর্ত্তমানকালে বর্ণাশ্রম ধর্ম্মের বিকৃতাবস্থা দেখিয়া ভগবান্ পুনর্ব্বার রামকৃষ্ণরূপে অবতীর্ণ হইয়া বর্ণাশ্রম ধর্ম্মের পুনরুত্থানের নিমিত্ত শিক্ষা দিয়া গিয়াছেন। বর্ত্তমান কালের ব্রাহ্মণেরা যে সকল শাস্ত্রালোচনা করেন, তাহাকে তাঁহারা জোর করিয়া ব্রহ্মচর্য্যাশ্রম বলিয়া ব্যক্ত করিয়া থাকেন। এই ভ্রম বিদূরিত করিবার জন্য তাঁহাকে পাঠশালায় পাঠাইবার সময় তিনি বলিয়াছিলেন, "তোমরা আমায় কি বিদ্যা শিক্ষা দিবে? যে বিদ্যায় চাল কলা উপার্জ্জন হয়, যে বিদ্যায় শ্রাদ্ধের বিদায় পাইবার অধিকারী হওয়া যায়, সে বিদ্যা আমি শিখিব না।" তিনি এই নিমিত্ত বলিতেন যে, আকাশের দিকে চাহিয়া দেখ, শুকুনি হাড়গিলারা কত উচ্চে উড়িয়া বেড়ায়, কিন্তু তাহাদের দৃষ্টি ভাগাড়ের দিকে থাকে! বর্ত্তমানকালের বিদ্যাশিক্ষার দ্বারা যদিও মহামহোপাধ্যায় হওয়া যায় বটে, কিন্তু তাঁহার সম্পূর্ণ দৃষ্টি কামিনীকাঞ্চনরূপ ভাগাড়ে। যে বিদ্যা কামিনীকাঞ্চনের দিকে আকৃষ্ট করিয়া রাখে, সে বিদ্যা ব্রহ্মবিদ্যা নহে, সে বিদ্যায় আত্মকল্যাণ হয় না, সুতরাং সে বিদ্যা লাভ করিবার অবস্থাকে ব্রহ্মচর্য্যাশ্রম কহা যায় না। তিনি বিদ্যালয়ে যাইলেন না, ব্যাকরণ, সাহিত্য, স্মৃতি, ন্যায় পাঠ করিলেন না। কিন্তু

তিনি ব্রহ্মচর্য্য ভাবে বাল্যাবস্থা অতিবাহিত করিয়াছিলেন। তিনি সর্ব্বদা ভগবানের লীলাকাহিনী লইয়া বিভোর থাকিতেন। অকপট সাধু সন্ন্যাসী পাইলে তাঁহাদের নিকট অবস্থিতি করিতেন এবং তাঁহাদের সহিত তত্ত্বপ্রসঙ্গে দিন যাপন করিতেন। এইরূপে বাল্যাবস্থা অতিবাহিত করিয়া তিনি সংসারাশ্রমে প্রবেশ করিয়া কামিনীকাঞ্চনের সম্বন্ধ স্থাপন করিয়াছিলেন। কিন্তু তিনি কামিনীকাঞ্চনের ভাব বর্ত্তমান কালের ন্যায় দেখান নাই। কামিনীকাঞ্চনই যেমন আমাদের ধ্যান জ্ঞান, কামিনীকাঞ্চনই যেমন আমাদের সর্ব্বস্বধন, তিনি তাহা দেখান নাই। তিনি কিয়দ্দিবস কামিনীকাঞ্চনের সম্বন্ধ রাখিয়াছিলেন বটে, কিন্তু আমাদের ন্যায় কামবৃত্তি নিবৃত্তির নিমিত্ত কামিনী গ্রহণ করেন নাই। তাঁহার সহিত তিনি প্রেমের সম্বন্ধ স্থাপন করিয়াছিলেন। যতদিন তিনি সংসারাশ্রমে ছিলেন, এই আশ্রমধর্ম্ম কিরূপে প্রতিপালন করিতে হয়, তাহা বিলক্ষণরূপে দেখাইয়াছেন। তিনি তাঁহার মাতাকে ভক্তি করিতেন, ভ্রাতা ভগ্নীর সহিত সদ্ভাব করিয়াছিলেন, প্রতিবেশী কুটুম্বাদির মান মর্য্যাদা রাখিতেন। তিনি তদনন্তর বানপ্রস্থাশ্রমের কার্য্য দেখান। গুপ্তভাবে কাননের নিভৃতস্থানে বসিয়া সাধনাদি করিতেন। পরে সন্ন্যাসী হইয়াছিলেন। এই কার্য্যের দ্বারা এবং সাধারণকে আপনি শ্রীমুখে আশ্রমধর্ম্মের গুণ গান করিয়া গিয়াছেন। অতএব বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম ব্যতীত উপায় নাই। এই আর্য্যনির্দ্দিষ্ট বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম, আমরা আর্য্য সন্তান হইয়া দুই পদে দলন করিয়া যাইতেছি। হিন্দু সন্তান হইয়া, হিন্দুর পরিচয় দিয়া, হিন্দুশাস্ত্রোক্ত উপদেশ অগ্রাহ্য করিয়া যাইতেছি। এই মহাপাতকের ফলে কি কস্মিন্‌কালে আমাদের কল্যাণ হইবার কোন সম্ভাবনা আছে? বর্ত্তমানকালে আমরা বর্ণাশ্রম ধর্ম্মের মূলোৎপাটন করিতে কৃতসঙ্কল্প হইয়াছি। যথেচ্ছাচারী তাই

আমাদের বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম হইয়া দাঁড়াইয়াছে। কামিনীকাঞ্চনই আমাদের বর্ণাশ্রম ধর্ম্মের নিদান হইয়া আসিয়াছে। কাঞ্চনের জোরে আমরা শ্রেষ্ঠ বর্ণ হইতে পারি, কাঞ্চনের জোরে আমরা ইচ্ছামত সকল কার্য্যই শাস্ত্রসঙ্গত করিয়া লইতে পারি, কাঞ্চনের জোরে অহিন্দু হিন্দু হয়, এবং কাঞ্চনের অভাবে ব্রাহ্মণও অহিন্দু হইয়া যাইতেছেন। এই অবস্থায় আর কতদিন হিন্দু জাতি চলিতে পারে? আমরা বর্ণাশ্রম ধর্ম্মের অভাবে কি হইয়াছি, তাহা পূর্ব্বকালের সহিত তুলনা করিলে কি বুঝা যায় না যে, যে হিন্দুদিগের উদ্দেশ্য ধর্ম্ম ছিল, সেই হিন্দু সন্তান আমরা শিশ্নোদরপরায়ণ হইয়াছি? যে হিন্দুরা ধর্ম্ম লাভের নিমিত্ত, ধর্ম্ম রক্ষার নিমিত্ত বর্ণাশ্রম ধর্ম্মের অনুগত ছিলেন, সেই কুলের আমরা কুলাঙ্গার হইয়া ধর্ম্মলোপ করিতে বদ্ধপরিকর হইয়াছি। তাঁহারা যে সকল কার্য্য বার বার নিষেধ করিয়া গিয়াছেন, আমরা তাহাই যত্নপূর্ব্বক পালন করিতেছি,সুতরাং আমাদের দুর্দ্দশার একশেষ হইয়া আসিয়াছে। স্বীকার করি, আমাদের বড় বড় বাড়ী হইয়াছে, বড় বড় গাড়ী জুড়ী চড়িয়া বেড়াইতেছি, রাজদ্বারে সমাদৃত হইতেছি, কিন্তু অন্দরে যাইয়া একবার দেখা হউক যে, তথায় ধর্ম্ম আছেন কি না? ধর্ম্ম নাই, ধর্ম্মের মোহন-মূরতী আমরা দেখিতে পাই না। আর কি সেইরূপ মাতৃভক্তি আছে, আর কি সেইরূপ পিতৃভক্তি আছে? আর কি সেইরূপ বাৎসল্য প্রেম আছে, আর কি সেইরূপ সখ্য প্রেম আছে? আর কি সেইরূপ স্বামীভক্তি আছে? আর কি সেইরূপ স্ত্রীর ভালবাসা আছে? আর কি দেশহিতৈষীতা আছে, আর কি দুঃখীর দুঃখে দুঃখিত হওয়া আছে? থাকিবে কেন? আমরা যে বর্ণাশ্রম ধর্ম্মের মস্তক চূর্ণবিচূর্ণ করিয়া ফেলিয়াছি। ধর্ম্ম নাই, তাহার কার্য্য হইবে কিরূপে? আমরা বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম বিবর্জ্জিত হইয়া কিম্ভূতকিমাকার হইয়া গিয়াছি। সেই

জন্য ইহার মধুমাখা ভাব ধারণা করিতে অসমর্থ হইয়া পড়ি। কিন্তু যিনি আশ্রমধর্ম্ম প্রতিপালন করেন, তিনি শ্রেষ্ঠ, তিনি সর্ব্বজনপূজিত, ধর্ম্মই তাঁহাকে রক্ষা করিয়া থাকেন। আমরা চিরকাল শুনিয়া আসিতেছি যে, সংসারের বলই ধর্ম্ম। অন্য বল ধর্ম্মবলের নিকট দণ্ডায়মান হইতে পারে না। বর্ণাশ্রম ধর্ম্মের যে কোন ভাবে যে কেহ অবস্থিতি করেন, যে কেহ প্রাণপণে তাহা প্রতিপালন করেন, ভাবময় শ্রীহরি তাঁহাকে রক্ষা করিয়া পরিণামে পরমধর্ম্ম প্রদান করিয়া থাকেন। দুর্জ্জয় দুর্য্যোধন সভাস্থলে যখন দ্রৌপদীকে বিবস্ত্রা করিতে চেষ্টা করেন, তখন কোন্ বলে মহারাজার রাজবল বিচূর্ণ হইয়াছিল ? দ্রৌপদীর লজ্জা নিবারণ করিতে কে আসিয়াছিল ? স্ত্রীলোকরা একটা স্বামীর বলে বলী করিয়া থাকেন কি ? কিন্তু দ্রৌপদীর পঞ্চস্বামী সত্ত্বেও সভাস্থলে বিবস্ত্রা হওন কালে কাহারও দ্বারা সতীত্বধর্ম্ম রক্ষা হইবার সুবিধা হয় নাই। আশ্রমধর্ম্মের ভিতরে সতীত্ব একটা ধর্ম্ম বিশেষ। দ্রৌপদীর এই ধর্ম্মজ্ঞান ছিল। না থাকিলে তাঁহার বিষম লজ্জার সময় লজ্জানিবারণ মধুসূদন বস্ত্ররূপে পরিণত হইয়াছিলেন কেন ? সতীত্ব ধর্ম্ম আশ্রমধর্ম্মবিশেষ। দ্রৌপদী এই আশ্রমধর্ম্ম হৃদয়ে সযত্নে সংস্থাপন করিয়াছিলেন, তজ্জন্য তিনি মহাবিপদ হইতে ধর্ম্ম কর্ত্তৃক সংরক্ষিতা হইয়াছিলেন।

ধর্ম্ম চিরকালই এক। দ্রৌপদী সতীত্ব ধর্ম্ম রক্ষা করিয়া আপনি যেমন বিপদ হইতে পরিত্রাণ পাইয়াছিলেন, এখনও যিনি এই আশ্রমধর্ম্ম প্রতিপালন করেন, তিনিও সময়ে সময়ে ধর্ম্মের সাক্ষাৎকার লাভ করিয়া থাকেন। এই সহরের অন্তঃপাতী কোন পল্লীতে জনৈক দীন ব্রাহ্মণের বাস ছিল। এই ব্রাহ্মণের একটী যোড়শ বর্ষের পরমা সুন্দরী বিধবা কন্যা ছিল। ব্রাহ্মণ ভিক্ষা করিয়া আনিলে কন্যাটী পাক শাক করিয়া দিতেন। ব্রাহ্মণের সেবা হইলে তনয়া প্রসাদ পাইতেন।

এইরূপে দিন কাটিয়া যায়। সংসার পরীক্ষার স্থল, সেইজন্য সমভাবে দিন কাটিয়া যায় না। দুর্ভাগ্যক্রমে এই ব্রাহ্মণকন্যার রূপলাবণ্যের কথা কোন ধনীর পুত্রের কর্ণগোচর হইল। এই যুবক সর্ব্বপ্রথমে দূতী পাঠাইয়া প্রলোভন দেখাইল, সতী সে কথায় কর্ণপাত করিল না। যুবক পরদিন নানাপ্রকার স্বর্ণালঙ্কার পাঠাইয়া দিল, তিনি সেদিকে দৃষ্টিপাতও করিলেন না। পরদিবস হীরকের অলঙ্কার পাঠাইয়া দিল, তেজস্বিনী বামপদের দ্বারা তাহা ফেলিয়া দিয়া দূতীকে কহিলেন, "বাছা! দীনহীনা পতিবিহীনা আমার প্রতি তোমার বাবুর এত অত্যাচার কেন? আমি আমার প্রেমময়ের ছবি হৃদয়ে দেখিতেছি, কেমন করিয়া তাঁহাকে সরাইয়া তোমার বাবুকে তথায় উপবেশন করাইব। পতিই আমাদের সর্ব্বস্ব। আমি পতির সেবিকা, তাঁহার ক্রীতদাসী। এ দেহ তাঁহার, আমি আমার নহি; তোমার বাবুকে বলিবে আমি তাঁহার কন্যা, আমি তাঁহার ভগ্নী, আমি তাঁহার জননী।" দূতিমুখে যুবক এই কথা শ্রবণ পূর্ব্বক তোষামোদকারীদিগকে আজ্ঞা দিলেন যে, "দরিদ্র কন্যার এতদূর স্পর্দ্ধা! অথবা তাহার দুরদৃষ্ট বলিতে হইবে। যাহা হউক, তোমরা কি কেহ দুষ্টার দর্পচূর্ণ করিতে পারিবে না?" সকলে আস্ফালন করিয়া কহিল, "মহাশয়! আপনার অন্নে প্রতিপালিত, আমরা না পারি কি? অনুমতি করুন, সেই দুষ্টার কেশা-কর্ষণ পূর্ব্বক এই মুহূর্ত্তে আনিয়া উপস্থিত করি।" যুবক হৃষ্টমনে কহিল যে, "যদি তোমরা তাহাকে আমার নিকট আনিয়া দিতে পার, তাহা হইলে তোমাদের প্রত্যেককে পাঁচ হাজার টাকা পারিতোষিক দিব।" পাষণ্ডপ্রতিপালক যুবকের কথা শ্রবণমাত্রে পাষণ্ডগণ তাঁহার বাটীর নিকট যাইয়া দেখিল যে, ব্রাহ্মণ ভিক্ষার্থ বাহির হইয়া যাইল। অদৃষ্টগুণে সেদিন তাঁহার তনয়া নিতান্ত অসুস্থা ছিলেন, তজ্জন্য ব্রাহ্মণের পশ্চাৎ

আসিয়া দ্বারবদ্ধ করিতে পারেন নাই। পাষণ্ডেরা বাটীতে প্রবেশ করিবামাত্র ব্রাহ্মণতনয়ার সাক্ষাৎ পাইল। নিরুপায়া আত্মজনবিহীনা ভয়ে বাবা ! বাবা ! বলিয়া চীৎকার করিলেন, কিন্তু তাহা বৃথা হইয়া গেল। পাষণ্ডেরা তাঁহাকে বলপূর্ব্বক গাড়ীর ভিতরে পূরিয়া যুবকের উদ্যানে লইয়া গেল।

যুবক ইতিপূর্ব্বেই তথায় পৌঁছিয়াছিলেন। তিনি আর্সির নিকট ঘন ঘন যাইয়া আপনার বদনকান্তি সন্দর্শন করিতেছিলেন। আপনার রূপে আপনি গর্ব্বিত হইয়া মনে মনে চিন্তা করিতেছিলেন যে, আমার কৃপা পাইবার জন্য কত স্ত্রীলোক মা কালীর পূজা মানিয়া থাকে, আর এই ব্রাহ্মণকন্যা আমার রূপ দেখিয়া ভুলিয়া যাইবে না ? সে আমায় দেখে নাই বলিয়া আমার অনুরাগিনী হয় নাই। এমন সময় গাড়ী যাইয়া উপস্থিত হইল। যুবকের আনন্দ উথলিয়া উঠিল। যুবক কহিল, "পিঞ্জরাবদ্ধ বিহঙ্গিনীকে মুক্ত করিয়া দাও, প্রেমোদ্যানে উড়িয়া বেড়াক।" গাড়ীর দ্বারোদ্ঘাটন করিবামাত্র তেজস্বিনী কহিল, "তুমি আমার পিতা, তুমি আমার পুত্র, আমায় রক্ষা কর। আমি ব্রাহ্মণকন্যা, আমার প্রতি অত্যাচার করিও না। আমি ভগবানের কাছে তোমার কল্যাণ প্রার্থনা করিতেছি, তুমি অপ্সরীর ন্যায় কত রমণী পাইবে। তাহারা তোমায় পাইয়া কৃতার্থ হইবে। অনুমতি কর, আমায় রাখিয়া আসুক।" পাষণ্ডদিগকে ইঙ্গিত করিয়া যুবক গৃহবিশেষে চলিয়া গেল। পাষণ্ডেরা বলপূর্ব্বক তাহাকে গাড়ী হইতে সেই গৃহে প্রবেশ করাইয়া বাহির হইতে দ্বার রুদ্ধ করিয়া দিল। ব্রাহ্মণ কন্যা গলবস্ত্রে কৃতাঞ্জলি-পুটে কহিতে লাগিলেন, "মহাশয় ! আমরা আপনাদের আশ্রিতা, আপনারা আমাদের প্রতিপালক। আমার প্রতি অত্যাচার করিবেন না, আমি আজ সাতদিন জ্বর ভোগ করিতেছি। পিতার অর্থ নাই,

সামর্থ নাই যে চিকিৎসা করাইবেন। তিনি বলিয়া দিয়াছেন যে, নারায়ণের চরণামৃতই মহৌষধ। আমি তাহাই সেবন করিয়া অদ্য কিঞ্চিৎ সুস্থ আছি। নিতান্ত দুর্ব্বল, উঠিলে মাথা ঘুরিয়া উঠে। আমার অতিশয় ক্লেশ হইতেছে, তোমার পায়ে ধরি আমায় পাঠাইয়া দাও।" যুবক আপনার অদৃষ্টকে ধন্যবাদ দিয়া কহিল, 'ভালই হইয়াছে, বল-প্রয়োগ ব্যতীত কার্য্য সিদ্ধি হইবে না।" সেই পামর বাহুপ্রসারণ পূর্ব্বক প্রিয়ে সম্বোধন করিয়া আলিঙ্গন করিতে যাইবামাত্র তিনি সুসুপ্তো-খিত সিংহিনীর ন্যায় চীৎকার করিয়া কহিলেন, "কি! তোর এত বড় স্পর্দ্ধা! ব্রাহ্মণ কন্যায় আকিঞ্চন! কুলবালার ধর্ম্মনষ্ট করিতে প্রয়াস! এখনও বলিতেছি সাবধান হও।" যুবক কহিল, দেখ কেন ক্লেশে দিন-যাপন করিবে? আমি তোমায় ইন্দ্রাণী করিব। তোমার সেবার জন্য দাস দাসী রাখাইয়া দিব, তোমার পিতাকে আর ভিক্ষা করিতে হইবে না। এই নাও লক্ষ টাকার কাগজ লিখিয়া দিতেছি।" ধর্ম্মপরায়ণা ব্রাহ্মণ কন্যা কহিলেন, "বাছা! এই কি তোমাদের শিক্ষা হইয়াছে? সম্ভ্রান্ত লোকের পুত্র তুমি,'তুমি নিজেও পণ্ডিত বলিয়া শুনিতে পাই, একথা কি অদ্যাপি শিক্ষা কর নাই যে,সতীত্ব রত্নের মূল্য কি লক্ষ টাকা? সতীত্ব ধর্ম্মের পরাক্রমে সাবিত্রী সতী শমনরাজকে ব্যতিব্যস্ত করিয়া মৃতস্বামীর জীবন দান করিয়াছিলেন। সতীত্ব রত্ন অমূল্য; বালক তুমি, তাই অর্থের দ্বারা সতীত্বরত্ন ক্রয় করিতে আসিয়াছ। যদ্যপি কল্যাণ প্রত্যাশা থাকে, তাহা হইলে আমায় পাঠাইয়া দাও।" যুবক বিদ্রূপ করিয়া কহিল, "সাবিত্রী! তোমার পতিভক্তির গুণে আমি পুনরায় আসিয়াছি, আমায় আলিঙ্গন কর।" ব্রাহ্মণকন্যা কর্ণে অঙ্গুলি প্রবিষ্ট করিয়া ঊর্দ্ধ দৃষ্টিতে কহিতে লাগিলেন, "কোথায় ধর্ম্ম! কোথায় ভগবান্! কোথায় লজ্জানিবারণ শ্রীহরি! কোথায় জগৎপতি! এই

দুঃখিনী, অনাথিনীর তুমি ব্যতীত আর কেহ নাই। তোমায় দেখি নাই; শুনিয়াছি, যে ধর্ম্মপালন করে তুমি তাহাকে রক্ষা কর। আমি যদ্যপি সতীত্ব ধর্ম্ম রক্ষা করিয়া থাকি, ধর্ম্ম আসিয়া দেখা দাও! আর সহ্য করিতে পারি না।” পাষণ্ড, বর্ব্বর, ধনমদে গর্ব্বিত ধনী পুত্র দুই হস্ত বদ্ধ দেখিয়া যেমন আলিঙ্গন করিতে অগ্রসর হইল, অমনি সজোরে দ্বারোন্মোচন হইয়া গেল। পশ্চাৎ ফিরিয়া দেখে যে, পাষণ্ডসঙ্গীগণ কহিতেছে, “বাবু! কর্ত্তা বাবু আসিয়াছেন।” কর্ত্তার নাম শ্রবণমাত্র যুবক উদ্যানের পশ্চাৎ দ্বার দিয়া পলায়ন করিতে বাধ্য হইল। এইরূপে যিনি যে কোন আশ্রমধর্ম্ম প্রতিপালন করেন, সেই ধর্ম্মের ফলে ধর্ম্মই উপার্জ্জন হইয়া থাকে। অতএব বর্ণাশ্রমধর্ম্ম পুনরুত্থিত হওয়া বিশেষ প্রয়োজন হইয়াছে। বলিয়াছি যে, বর্ণাশ্রম ধর্ম্মের উদ্দেশ্য ধর্ম্ম। বর্ত্তমানকালে তাহা বিকৃত হইয়াছে, সুতরাং, আমরা ধর্ম্মবিহীন হইয়া পড়িয়াছি। ধর্ম্ম বিহীনাবস্থায় মনুষ্য কতদিন বাঁচিতে পারে? তাই বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম সংস্থাপনের নিমিত্ত রামকৃষ্ণদেব অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। যে ভাবে আমাদের সমাজ চলিতেছে, যদ্যপি বর্ণাশ্রম ধর্ম্মের পুনরুত্থান না হয়, তাহা হইলে হিন্দুজাতি বলিয়া আর কিছুই থাকিবে না। ম্লেচ্ছ হইয়া যখন অর্থের জোরে সমাজে চলা যায়, ম্লেচ্ছের আহার,—ম্লেচ্ছ ভাবে বিহার করিয়া হিন্দুর আশ্রম চলিতে পারে, তখন তাহাকে কি হিন্দুর বর্ণাশ্রম কহিতে হইবে? তাই বলিতেছি যে, আমাদের দেশের লোকেরা অন্ধ হইয়া আর কতদিন অপেক্ষা করিবেন, বধির হইয়া আর কতদিন নিশ্চিন্ত থাকিবেন? শাস্ত্রের মর্য্যাদা অর্থের জন্য একেবারে উৎসন্নে যাইতে বসিয়াছে। তাই পণ্ডিত মহাশয়েরা অর্থ পাইলেই ইচ্ছামত বিধান দিয়া কার্য্য করিয়া থাকেন। রামকৃষ্ণদেব এই কুরীতি বিনাশের জন্য অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। এই নিমিত্ত তিনি বর্ণাশ্রম

ধর্ম্মের পুনরুত্থানের জন্য সর্ব্বদা উপদেশ দিতেন। আশ্রমধর্ম্মের অভ্যুদয় হইলে আমরা বাস্তবিক শান্তিলাভ করিব, তাহার সন্দেহ নাই।

যদিও বর্ণাশ্রম ধর্ম্মের পুনরুত্থানের কথা বলা হইল বটে, কিন্তু তাহা বর্ত্তমানকালে কিরূপে সম্ভব? যদ্যপি কাহাকে বলা যায় যে, পুত্রের পাঠদ্দশায় বিবাহ দিয়া অশাস্ত্রীয় কার্য্য করিও না। কারণ, বিবাহের দান গ্রহণ সিদ্ধ হওয়া কর্ত্তব্য। নাবালক পুত্রের গ্রহণ করা সম্ভব হয় কিরূপে? নাবালকগণ যখন আইনানুসারে বিষয় কর্ম্মের অধিকারী হইতে পারে না, একটা জীবনের ভার লইবার অধিকারী হইবে? একথা শুনিবে কে? পুত্রের পিতারা প্রাণপণে তাহাতে প্রতিবন্ধক জন্মাইবে। কারণ, পুত্রের বিবাহ এখন ব্যবসাবিশেষ হইয়াছে। বর্ত্তমানকালে যখন অর্থই হইল ব্রহ্মস্বরূপ, তখন অর্থের স্বার্থ ত্যাগ করিতে কে পারিবে? সুতরাং সহসা এরূপ পরিবর্ত্তন নিতান্ত দূরের কথা। রামকৃষ্ণদেব সেই জন্য তাঁহাতে বকলমা দিতে বলিয়া গিয়াছেন। তাঁহাতে বকলমা দিতে পারিলে বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম আপনি প্রস্ফুটিত হইবে। আমার এই কথার প্রমাণ দিবার জন্য সাধারণকে রামকৃষ্ণের সেবকদিগের দৈনিকাবস্থা পর্য্যবেক্ষণ করিতে অনুরোধ করিতেছি; মুখে আর অধিক কি বলিব। কেবল বলায় কার্য্য হয় না, দৃষ্টান্তই গ্রাহ্যনীয়। এই যে রামকৃষ্ণের কয়েকটী সেবক দেখিতেছেন, ইঁহারা বাস্তবিক বর্ণাশ্রম ধর্ম্মে দীক্ষিত হইতেছেন। ইঁহারা ঠাকুরের সেবাও করেন, বিদ্যালয়ে পাঠও করেন, পিতা মাতার প্রতি শ্রদ্ধা ভক্তিও করেন, সমাজের প্রতি সমূহ ভক্তি রাখেন, ইঁহারা অদ্যাপি কুমার। বাজার চলন হিসাবে ইঁহাদের পিতামাতারা উদ্বাহ শৃঙ্খলে আবদ্ধ করিতে চেষ্টা করিতেছেন, কিন্তু ইঁহারা রামকৃষ্ণের উপদেশ মতে সর্প ধরিবার ধূলাপড়া এখনও শিক্ষা করেন নাই বলিয়া, সে বিষয়ে বিরত

থাকিয়া প্রকৃত বর্ণাশ্রম ধর্ম্মের পরিচয় দিয়াছেন। ইঁহারা সন্ন্যাসী নহেন, ব্রহ্মচারী।

তাই করযোড়ে গলবস্ত্র হইয়া আপনাদিগকে বলিতেছি, রামকৃষ্ণদেবকে জানিতে চেষ্টা করুন, তাঁহাকে জানিলে,—কেবল পারলৌকিক কেন,—ইহলোকের সুখ শান্তি লাভ করিয়া পরমানন্দে দিনযাপন করিয়া যাইবেন।

গীত।

জগজ্জীবন সৃজন তোমারি।
ব্যোম অনিল অনল বারি॥
মোহন মুরলীধারী, ব্রজবিহারী,
তপন-তনয়-ভয়-হারী॥
জয় জগতপিতা, জগতমাতা,
জগবন্ধু জগদীশ্বরী;—
রঘুপতি রাবণান্তকারী,
শিবশম্ভু ত্রিপুরারি॥
তুমি মতি গতি, পুরুষ প্রকৃতি,
রামকৃষ্ণ রূপধারী;—
পতিত চিন্তিত, ভীত অবিরত, চরণভিখারী॥

খেলতে কি এসেছি ভবে, মিছে খেলায় কেন থাকি।
খেলি যদি তারি খেলা, তারে কেন নাহি ডাকি॥
তার খেলা সে খেলে ব'লে, খেলি সবাই তারি কলে,
খেলার ছলে তারেই ভুলে, খেলাঘরের ধূলা মাখি॥

জন্মাবধি খেলা খেলি, গেলনাত মনের কালি,
তাই বলি ভাই বেলাবেলি, এস বুড়ি ছুঁয়ে রাখি ।।
খেলেছে যে তার সনে, খেলার মজা সেইত জানে,
শয়নে স্বপনে ধ্যানে খেলে একা মুদি আঁখি ।।
ঘুচেছে তার ছেলে খেলা, বিদায় দেছে সকল জ্বালা,
গেছে ধুয়ে মনে মলা, হৃদ্‌মাঝে যার কমল আঁখি ।।

নাম নিতে যে মন সরে না তাই ভবে দিয়েছ জ্বালা ।
বিনা জ্বালা, হরিবলা, বল্‌বেনা মন এতই ভোলা ॥
সুখ-সাগরে দিয়ে সাঁতার, বোঝেনা মন আপন কে তার,
হ'লে বিপদ, তবেই ওপদ, ক্ষণের তরে সার ;—
বিপদ ফুরায় ফিরে না চায়, খেল্‌তে সে ধায় সাধের খেলা ॥
সংসার মাঝারে থাকি, হলে বিপদ তবেই ডাকি,
যে বোঝে এ মনের ফাঁকি, রয়না তার আর মনের মলা ;—
প্রাণ সঁপে সে অভয়পদে দিবানিশি রয় বিভোলা ॥

ফুরাবে এ সুখের স্বপন ।
মায়াঘোরে রয়ে অচেতন ॥
দিবানিশি আপনহারা মন,
লয়ে কামিনীকাঞ্চন, দারা সুত পরিজন,
তারা নয় কারো আপন ;—
যবে দিন ফুরাবে, চলে যাবে, ফিরে না চা'বে তখন ॥

দয়াময় ব'লে ডাকনা।
কত করুণা, জ্বালা রবেনা,
হবে সফল সকল বাসনা॥
মায়াঘোরে ঘুমায়োনা,
পেয়ে তুচ্ছধন, পরমরতন ভুলে থেকনা
সে বিনে কেউ আপন হবে না,
(তাই) ত্যজে অসার, নাম কর সার,
রামকৃষ্ণ নামে মজনা—
বল রামকৃষ্ণ রামকৃষ্ণ বদন ভরে বলনা

রামচন্দ্রের বক্তৃতাবলী।

পঞ্চদশ বক্তৃতা।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেব কথিত

ঈশ্বর লাভ।

১৩০১—২৮শে জ্যৈষ্ঠ রবিবার,—সিটি থিয়েটারে

প্রদত্ত।

---

৬০ রামকৃষ্ণাব্দ।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ
শ্রীচরণ ভরসা।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেব কথিত

ঈশ্বরলাভ।

ব্রাহ্মণাদি সকলের চরণে প্রণাম।

বিগত চতুর্দ্দশ বক্তৃতায় যে সকল বিষয় আলোচনা করিয়াছি, অদ্যকার আলোচ্য বিষয়টী উহাদিগের সহিত তুলনা করিলে সর্ব্বাপেক্ষা প্রয়োজনীয় এবং কঠিনতম বলিয়া বুঝা যাইবে।

বর্ত্তমান কালের সংস্কার হিসাবে ঈশ্বর লাভ কথাটা২ বিদ্রূপাত্মক হইয়া দাঁড়াইয়াছে। ঈশ্বরেরই নিজের অবস্থার স্থিরতা নাই, তিনি সাকার কি নিরাকার, আছেন কি নাই, এ সম্বন্ধে অনেকেই অন্ধ হইয়া রহিয়াছেন। যাঁহার যেরূপ অভিরুচি, যাঁহার যেরূপ সংস্কার, যাঁহার যেরূপ ধারণা, তাঁহার পক্ষে সেইরূপই ঈশ্বর জ্ঞান হইয়া থাকে।

ঈশ্বর জ্ঞান যেরূপই হউক, মোটের উপরে আজকাল ঈশ্বর লাভ করিবার বাসনা দূরে থাকুক, তিনি আছেন কি না—এ বিষয়ে অনেকের সন্দেহ আছে। সন্দেহ জন্মিবার কারণ নানা প্রকার। প্রথমতঃ আমাদের দেশের শাস্ত্রজ্ঞেরা যদিও শাস্ত্র ব্যাখ্যা করিতে বিলক্ষণ পারদর্শিতা লাভ করেন বটে, কিন্তু সীমাবিশিষ্ট জ্ঞানে এবং সাধনাদিবিরহিত ভাবে তাঁহারা অবস্থিতি করেন বলিয়া, প্রকৃত ঐশ্বরিক তত্ত্ব অনুধাবন করিতে অসক্ত হইয়া থাকেন। সুতরাং, এ প্রকার পণ্ডিতেরা নিজ মর্য্যাদা বজায় রাখিবার অভিপ্রায়ে অবস্থা

বিশেষে কার্য্য করিয়া যান। এ প্রকার ঘটনা বোধ হয় প্রত্যেকের প্রত্যহই ঘটিয়া থাকে। আমাদের দেশের ধর্ম্ম প্রচারকগণ যে যে সাম্প্রদায়িক ধর্ম্ম প্রচার করেন, তাঁহারা পরস্পরকে বিদ্বেষ করায় সকলে তাঁহাদের কথায় আস্থা স্থাপন করিতে পারেন না। সুতরাং, ঈশ্বর সম্বন্ধে যখন প্রকৃত জ্ঞান লাভের উপায় অপ্রতুল, তখন তাঁহাকে লাভ করা যায়, এ কথা বলিলে বাস্তবিক কাহার বিশ্বাস হইবে ? এ সকল কারণে সকলেই নাস্তিকতার দিকে গমন করিতে বাধ্য হইয়া থাকেন। ঈশ্বর সম্বন্ধে যদিও অনেকের বিশ্বাস আছে বটে, কিন্তু তাঁহাকে লাভ করা কাহারও উদ্দেশ্য নহে। কিরূপে ধনৈশ্বর্য্যের অধিপতি হওয়া যায়, কোন্ দেবতাকে সন্তুষ্ট করিতে পারিলে গণ্যমান্য হওয়া যায়, কোন্ দেবীর প্রসন্নতায় সন্তান-রত্নের মুখাবলোকন করা যায়, কোন্ দেবতার অর্চ্চনা করিলে রোগোন্মুক্ত হওয়া যায়, কোন্ দেবীকে জোড়া মেষ মহিষ দ্বারা পূজা করিলে মোকদ্দমায় জয়ী হওয়া যায়—এইরূপ কার্য্যেরই প্রবাহ চলিতেছে। ভগবান্ লাভ করিয়া তাঁহার প্রেমময় কান্তি দর্শন পূর্ব্বক মানবজন্মের সার্থকতা সম্পাদন করিতে কয় জন লালায়িত হইয়া থাকেন ? সুতরাং, কার্য্যক্ষেত্রে ঈশ্বর লাভ করিবার উপায় সম্বন্ধে কোন কথা বা দৃষ্টান্ত যারপরনাই অপ্রতুল।

বর্ত্তমান কালে ঈশ্বর বিশ্বাস না করাই সভ্যতার লক্ষণ বলিয়া অনেক স্থলে বিবেচিত হইয়া থাকে এবং যে স্থানে বিশ্বাস আছে, সে স্থানে নিজ নিজ রুচি, ইচ্ছা, এবং সখ—সঙ্গত না হইলে সে ঈশ্বর ঈশ্বর বলিয়া গ্রাহ্য হইতে পারেন না। এই সকল ভাবের তাৎপর্য্য বাহির করিলে এক কথায় এই বলা যায় যে, আমাদের যেমন ইচ্ছা, ঈশ্বরকে তেমনি হইতে হইবে। ঈশ্বরের স্বরূপের নিয়মানুযায়ী আমরা পরিচালিত হইতে বাধ্য হইতে চাহি না। সে যাহা হউক, ঈশ্বর লাভ

সম্বন্ধে রামকৃষ্ণদেব যে অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়াছেন, অদ্য তাহাই বলিবার জন্য আকিঞ্চন করিয়াছি। যদ্যপি প্রভুর ইচ্ছা হইয়া থাকে, তাহা হইলে অদ্য আমায় যন্ত্রবৎ কার্য্য করাইয়া লইবেন।

ঈশ্বর লাভ প্রসঙ্গটীতে মনোনিবেশ করিবার পূর্ব্বে একটী প্রশ্ন মীমাংসা করা যুক্তিসঙ্গত। ঈশ্বরের অস্তিত্ব বিষয়ে সময়ে সময়ে অনেকেরই সন্দেহ উপস্থিত হয়। অনেকে ঈশ্বরকে একেবারেই বিশ্বাস করেন না এবং তাঁহার অস্তিত্ব বিষয় মীমাংসার অতীত বলিয়া অনেকে নিশ্চিন্ত হইয়া থাকেন। আমি এই নিমিত্ত ঈশ্বরের অস্তিত্বতা সম্বন্ধে দুই একটী কথা বলিয়া তাঁহাকে লাভ করিবার উপায় বর্ণনা করিব।

ঈশ্বর আছেন কিনা,—এই কথা স্থির করিবার নিমিত্ত যদিও ভূরি ভূরি শাস্ত্র আছে, সাধু সিদ্ধদিগের নানা প্রকার উপদেশ আছে, কিন্তু সে সকল বাকবিতণ্ডায় বিশেষ কোন উপকারের সম্ভাবনা নাই। রামকৃষ্ণদেব বলিতেন যে, কার্য্য থাকিলে অবশ্যই তাহার কারণ থাকিবে। বিনা কারণে কোন কার্য্য হয় না। কারণের দ্বারা কার্য্য-বিশেষ সম্পন্ন হয় এবং কারণেই তাহার বিপরীত ফল ফলিয়া থাকে। এই নিমিত্ত তিনি সংক্ষেপে স্থূলের কারণকে সূক্ষ্ম, সূক্ষ্মের কারণকে কারণ এবং কারণের কারণকে মহাকারণ কহিয়া গিয়াছেন। কার্য্য-কারণ প্রণালী মতে যে কেহ ঈশ্বরের অস্তিত্ব মীমাংসা করিবার জন্য গমন করিবেন, মহাকারণ পর্য্যন্ত উপনীত হইতে পারিলে আর তাঁহার সন্দেহ থাকিবে না। স্থূলে ঘুরিয়া বেড়াইলে, অথবা স্থূল দৃষ্টান্ত লইয়া মহাকারণ সাব্যস্থ করিতে প্রাণপণে প্রয়াস পাইলে কখন সন্দেহ বিরহিত মীমাংসা হয় না, একথা বিজ্ঞানবিদ্ পণ্ডিতেরা জানেন এবং এ সম্বন্ধে আমি পূর্ব্ব বক্তৃতাদিতে অনেক কথা বলিয়াছি। এ ক্ষেত্রে আর সেই বৈজ্ঞানিক আন্দোলন করিবার প্রয়োজন নাই। সহজে

যাহাতে সকলে বুঝিতে পারেন, এমন কৌশলে, এই সর্ব্বোচ্চ অতি কঠিন ঈশ্বরের অস্তিত্ব বিচার বিষয়ে প্রভু বলিয়াছেন যে, পিতা মাতা ব্যতীত সন্তান জন্মায় না, ইহা জগতের সাধারণ নিয়ম। এই দৃষ্টান্তে পিতা মাতা সন্তান রূপ ফল বা কার্য্যের কারণ স্বরূপ। যেহেতু, পিতা মাতা না থাকিলে সন্তান জন্মায় না। পিতা মাতার দ্বারা সন্তান জন্মায় বটে, কিন্তু সে কথা কি সে সন্তানের স্মরণ থাকে? না অদ্যাপি কেহ নিজ জন্মবৃত্তান্ত বুঝিতে সক্ষম হইয়াছে? যদ্যপি কোন জ্ঞানবান ব্যক্তিকে জিজ্ঞাসা করা যায় যে, আপনার পিতা মাতা কে? তিনি তৎক্ষণাৎ তাঁহার পিতাকে দেখাইতে পারেন, অথবা মাতাকে স্থির-নিশ্চয় করিয়া দিতে পারেন। কিন্তু যদ্যপি তাঁহাকে পুনরায় জিজ্ঞাসা করা যায় যে, ইনি আপনার পিতা, তাহার প্রমাণ কি? নিতান্ত মূর্খ না হইলে এ প্রশ্নের উত্তর করিতে কেহ অগ্রসর হইবেন না। তিনি বলিতে বাধ্য হইবেন যে, আমার বিশ্বাস অমুক আমার পিতা, এ কথা বাল্যকাল হইতে শুনিয়া আসিতেছি। এই স্থানে বিশ্বাস ব্যতীত আর দ্বিতীয় শব্দ প্রয়োগ করিবার অধিকার নাই। কিন্তু এই বিশ্বাস অনেক স্থলে ভ্রমাত্মক হইতে পারে। মাতা যদ্যপি ভ্রষ্টাচারিণী হয়, তাহা হইলে হয় ত সেই সন্তান অপর ব্যক্তি কর্ত্তৃক জন্মিয়াছে কিন্তু লোক সমাজে আর এক ব্যক্তি তাহার পিতৃপদে উল্লিখিত হইয়া যাইতেছে। এক্ষেত্রে সেই সন্তান যদিও এক জনকে চিরঅভ্যাসে পিতা বলিতেছেন, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তাঁহার পিতৃজ্ঞান সম্পূর্ণ ভ্রমাবৃত। সাক্ষাৎ সম্বন্ধে স্থূল পদার্থের মধ্যে যখন কার্য্যের কারণ প্রমাণ করা যারপরনাই দুঃসাধ্য, তখন ভগবান্‌কে প্রমাণ করিতে যাওয়া নিতান্ত বালকের কার্য্য।

যদিও মাতার কথায় বিশ্বাস করিয়া পিতাকে জ্ঞাত হওয়া যায় এবং

সে কথা বিশ্বাস করাও অসঙ্গত নহে, কিন্তু মাতার কথাই বা কতদূর প্রামাণ্য হইবার সম্ভাবনা, তাহা আর একটী দৃষ্টান্তের দ্বারা স্থির করা হউক। বারাঙ্গনার গর্ভজাত সন্তানের পিতা স্থির করা যারপরনাই কঠিন কথা। কঠিন কেন, একেবারেই অসাধ্য ব্যাপার। কারণ একজন বা দুইজন নায়কের স্থল না হউক, কিন্তু বহু নায়কের সম্বন্ধ থাকিলে সন্তানের পিতা নিরূপণ হইতে পারে না। শারীরিক গঠনাদির দ্বারা যদিও অনেক সময়ে অনুমান করা যাইতে পারে বটে, কিন্তু তাহা অনুমান মাত্র,—প্রমানসিদ্ধ নহে। এই ক্ষেত্রে যাঁহার কথা বিশ্বাস করিতে হইবে, তিনি নিজে তাহা অবগত নহেন, সুতরাং, পিতা প্রমাণ করিতে যাওয়া বাস্তবিক বিড়ম্বনার বিষয়। পিতাকে প্রমাণ করিতে হইলে যেরূপ প্রত্যক্ষ প্রমাণের একেবারে অভাব হইয়া পড়ে, পিতা নিজে সেক্ষেত্রে সাক্ষ্য দিতে অসক্ত; মাতা সাধ্বী না হইলে তাঁহার দ্বারাও প্রমাণ হয় না, ফলে পিতা প্রমাণ করিতে যাইলে বিভীষিকার গ্রাসে নিপতিত হইতে হয়। পিতা প্রমাণ করিতে না পারিলে এ কথা বলা যায় না, পিতা ব্যতীত সন্তান জন্মিতে পারে। সন্তান রূপ কার্য্য হইলে তথায় পিতারূপ কারণ অবশ্যই থাকিবে, ইহা স্থির নিশ্চয়। পিতা আছেন বা ছিলেন, তাহা প্রমাণ করা যায়। সন্তানই জাজ্বল্যমান প্রত্যক্ষ প্রমাণ। কিন্তু পিতার নির্দ্দিষ্ট প্রমাণ একেবারেই দেওয়া যায় না। রোম্যান সাম্রাজ্য সংস্থাপক বীর চূড়ামণি রোমিউলাস্ ও রিমাস এবং আমাদের দেশের পরম জ্যোতিষী মিহির পিতা মাতার ক্রোড়চ্যুত হইয়া পশু কর্ত্তৃক পালিত হইয়াছিলেন। কখন মাতৃমুখে শুনেন নাই যে, তাঁহাদের পিতা কে? কখন পিতাকে চক্ষেও সন্দর্শন করেন নাই। তাঁহারা যদিও পিতা মাতার সম্বন্ধহীন হইয়া বয়োবৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, যদিও তাঁহারা

সে কথা বিশ্বাস করাও অসঙ্গত নহে, কিন্তু মাতার কথাই বা কতদূর প্রামাণ্য হইবার সম্ভাবনা, তাহা আর একটী দৃষ্টান্তের দ্বারা স্থির করা হউক। বারাঙ্গনার গর্ভজাত সন্তানের পিতা স্থির করা যারপরনাই কঠিন কথা। কঠিন কেন, একেবারেই অসাধ্য ব্যাপার। কারণ একজন বা দুইজন নায়কের স্থল না হউক, কিন্তু বহু নায়কের সম্বন্ধ থাকিলে সন্তানের পিতা নিরূপণ হইতে পারে না। শারীরিক গঠনাদির দ্বারা যদিও অনেক সময়ে অনুমান করা যাইতে পারে বটে, কিন্তু তাহা অনুমান মাত্র,—প্রমানসিদ্ধ নহে। এই ক্ষেত্রে যাঁহার কথা বিশ্বাস করিতে হইবে, তিনি নিজে তাহা অবগত নহেন, সুতরাং, পিতা প্রমাণ করিতে যাওয়া বাস্তবিক বিড়ম্বনার বিষয়। পিতাকে প্রমাণ করিতে হইলে যেরূপ প্রত্যক্ষ প্রমাণের একেবারে অভাব হইয়া পড়ে, পিতা নিজে সেক্ষেত্রে সাক্ষ্য দিতে অসক্ত; মাতা সাধ্বী না হইলে তাঁহার দ্বারাও প্রমাণ হয় না, ফলে পিতা প্রমাণ করিতে যাইলে বিভীষিকার গ্রাসে নিপতিত হইতে হয়। পিতা প্রমাণ করিতে না পারিলে এ কথা বলা যায় না, পিতা ব্যতীত সন্তান জন্মিতে পারে। সন্তান রূপ কার্য্য হইলে তথায় পিতারূপ কারণ অবশ্যই থাকিবে, ইহা স্থির নিশ্চয়। পিতা আছেন বা ছিলেন, তাহা প্রমাণ করা যায়। সন্তানই জাজ্জ্বল্যমান প্রত্যক্ষ প্রমাণ। কিন্তু পিতার নির্দ্দিষ্ট প্রমাণ একেবারেই দেওয়া যায় না। রোম্যান সাম্রাজ্য সংস্থাপক বীর চূড়ামণি রোমিউলাস ও রিমাস এবং আমাদের দেশের পরম জ্যোতিষী মিহির পিতা মাতার ক্রোড়চ্যুত হইয়া পশু কর্ত্তৃক পালিত হইয়াছিলেন। কখন মাতৃমুখে শুনেন নাই যে, তাঁহাদের পিতা কে? কখন পিতাকে চক্ষেও সন্দর্শন করেন নাই। তাঁহারা যদিও পিতা মাতার সম্বন্ধহীন হইয়া বয়োবৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, যদিও তাঁহারা

পিতা মাতা জানিতেন না, কিন্তু তাঁহারা যে পিতা মাতার দ্বারা জন্মিয়াছিলেন, তাঁহাদের কারণ স্বরূপ স্বরূপা পিতা মাতা যে ছিল, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই।

এইজন্য প্রভু বলিতেন যে, যদ্যপি ঈশ্বরের অস্তিত্ব সম্বন্ধে কাহারও সন্দেহ উপস্থিত হয়, তাহার আপনার অস্তিত্ব বিষয় স্থির করা কর্ত্তব্য। আমি আছি, আমার পিতা মাতা আছেন বা ছিলেন। যেমন পিতা মাতার প্রমাণ দেওয়া যায় না। ঈশ্বরের অস্তিত্ব সম্বন্ধেও সেই রূপ কোন প্রমাণ দেওয়া সাধ্যতীত কথা। কিন্তু যেরূপ পিতা মাতার দ্বারা সন্তান সৃজিত হয়, সে কথায় কাহার দ্বিরুক্তি করিবার অধিকার নাই, সেইরূপ ব্রহ্মাণ্ডেশ্বর কর্ত্তৃক ব্রহ্মাণ্ড সৃজিত হইয়াছে বলিয়া অনায়াসে বুঝিয়া লওয়া যাইতে পারে। অতএব সৃষ্টি দেখিয়া সৃষ্টিকর্ত্তাকে অনুমান করিয়া লওয়া কর্ত্তব্য।

প্রভু বলিয়াছেন যে, ঈশ্বর লাভ করিতে হইলে বিশ্বাসই তাহার একমাত্র উপায়। তিনি বলিতেন, যেমন সুতার গুলি বা দড়ির তাল খুলিতে হইলে 'খে' ধরিয়া যাইতে হয়। 'খে' ছাড়িয়া সুতা ধরিয়া টানাটানি করিলে জড়িয়া যায়; তেমনি ঈশ্বর লাভের 'খে' বিশ্বাস। বিশ্বাস ব্যতীত ঈশ্বর লাভ করিতে কেহ পারেন নাই এবং কেহ পারিবেনও না।

ঈশ্বর লাভ করিতে হইলে তাঁহার অস্তিত্ব সম্বন্ধে বিশ্বাস করিতে শিক্ষা করা প্রথম কার্য্য। যে সাধক যে কোন কঠোর তপস্যাই করুন, ঈশ্বর বিষয়ে স্থির বিশ্বাস না থাকিলে তাঁহাকে কখন লাভ করিবার সম্ভাবনা থাকে না।

বিশ্বাস কাহাকে কহে? প্রত্যক্ষ বিষয়ের ধারণার নাম বিশ্বাস। যেমন আমি গাছ দেখিতেছি। গাছ ইন্দ্রিয় গ্রাহ্য হইলে তৎসম্বন্ধে

আমার একটী ধারণা হয়, সেই ধারণার ফলকে বিশ্বাস কহে। অর্থাৎ উহা গাছ বলিয়া আমার বিশ্বাস, উহা পশু পক্ষী কিম্বা পাহাড় পর্ব্বত নহে। অতএব বিশ্বাস বলিলে প্রত্যক্ষ বিষয়ের ধারণাকেই নির্দ্দেশ করিতে হয়।

বিশ্বাস দ্বিবিধ,—প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষ। নিজের ইন্দ্রিয়াদির দ্বারা যে বস্তুর উপলব্ধি হয়, তাহাকে প্রত্যক্ষ বিশ্বাস কহে। প্রত্যক্ষ বিশ্বাসীর প্রমুখাৎ বিশ্বাসকাহিনী শ্রবণ করিয়া যে বিশ্বাস জন্মায়, তাহাকে পরোক্ষ বিশ্বাস বলা যায়। এই পরোক্ষ বিশ্বাসকে অনেকে অন্ধ বিশ্বাস কহিয়া থাকেন। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তাহাকে অন্ধ বিশ্বাস বলা যায় না। অপ্রাকৃত বিষয়ে প্রকৃত জ্ঞান হওয়া অন্ধ বিশ্বাসের কার্য্য। সাক্ষাৎ সম্বন্ধে প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষ বিষয়ের পার্থক্যতা দৃষ্ট হইলেও প্রকৃতপক্ষে বিশেষ ক্ষতিবৃদ্ধির হেতু নাই। কোন ব্যক্তিকে অহিফেন সেবনে পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইতে দেখা গেল। এই দর্শনের ফলে সেই ব্যক্তির প্রত্যক্ষ বিশ্বাস জন্মিল। যখন সেই ব্যক্তির নিকট হইতে অহিফেনের এই বিষাক্ত ধর্ম্ম সম্বন্ধীয় বিবরণ অপরে শ্রবণ করেন, তাঁহাদের সে বিশ্বাসকে পরোক্ষ বিশ্বাস বলা যায়। প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষ বিশ্বাসীরা অহিফেনের বিষাক্ত ধর্ম্মের কথা বলিয়া থাকেন বটে, কিন্তু এক স্থানে প্রত্যক্ষ ঘটনা এবং দ্বিতীয় স্থানে শোনা কথা মাত্র। যদ্যপি শোনা কথায় বিশ্বাস থাকে, তাহা হইলে যখন অহিফেন সেবনদ্বারা কোথাও বিষাক্ত লক্ষণাদি প্রকাশ পাইবে, সেই সময়ে যাহা শোনা কথা ছিল, তাহা প্রত্যক্ষ হইয়া যাইবে। এইস্থানে প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষের বিভিন্নতা থাকিতেছে না। কিন্তু যদ্যপি শোনা কথায় বিশ্বাস না থাকে, তাহা হইলে কালসহকারে অহিফেনের বিষাক্ত লক্ষণাদি বিস্মৃত হইয়া যাইবার সম্ভাবনা এবং প্রকৃত ঘটনা দর্শন করিলেও তাহা

বুঝিবার উপায় থাকিবে না। সুতরাং, সে ব্যক্তি কার্য্যক্ষেত্রে ঠকিয়া যায়। এই জন্য সত্য বিষয় বিশ্বাস করিলে সময়ে তাহার সত্য লাভ হয়, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই।

ঈশ্বর লাভ করিতে হইলে গুরুবাক্য বিশ্বাস করিতে হইবে। গুরু প্রত্যক্ষ বিশ্বাসী হউন, বা পরোক্ষ বিশ্বাসী হউন, সে কথায় আমাদের ক্ষতি বৃদ্ধি নাই। তিনি যাহা বলেন, সেই কথা যদ্যপি বিশ্বাস করিয়া যত্ন সহকারে হৃদয়ে সঞ্চয় করিয়া রাখি, তাহা হইলে পরমসময়ে পরমেশ্বরকে লাভ পূর্ব্বক পরমানন্দ লাভ করিব, সে পক্ষে সন্দেহ কি ?

গুরুর কথায় বিশ্বাস করিলে বিশ্বাসের নিমিত্ত অবশ্য নিরয়কুণ্ডে যাইতে হয় না, তাহা সহজ জ্ঞানে সহজেই বুঝা যায়। গুরু ভগবানের কথা বলিয়া থাকেন, ভগবান্ সত্যস্বরূপ, সে বিষয়ে সকলেরই এক মত। ভগবান সত্য স্বরূপ, তাঁহাকে ডাকিলে লাভ করা যায়,—একথা সত্যপ্রিয় মহাত্মাকথিত কথা, একথা তাঁহাদের প্রত্যক্ষ কথা, সাধনলব্ধ পরমপুরুষের সাক্ষাৎকারের কথা, তাঁহাদের সম্ভোগের কথা ; সুতরাং শাস্ত্রের কথা। গুরু এই শাস্ত্রের কথা বলিয়া দেন, এই জন্য তাহা মিথ্যা নহে, তাহা বিশ্বাসের কথা, অন্ধ বা স্বকপোলকল্পিত রচনাবিশেষ নহে। যদ্যপি কোন ব্যক্তি ভূগোলের বর্ণনানুসারে লণ্ডনের বৃত্তান্ত অবগত হইয়া থাকেন, তাহা হইলে সেই বিশ্বাসকে কি অন্ধ বিশ্বাস বলা যাইবে ? কখন নহে। কারণ, ভূগোলের আদি প্রণেতা লণ্ডন না দেখিয়া কখন তাহা লিপিবদ্ধ করিতে পারেন নাই। প্রত্যক্ষ দর্শনের দ্বারা শাস্ত্র লিখিত হইয়াছে, যে কেহ সেই কথা বিশ্বাস করেন, তাঁহার তদনুযায়ী ফল ফলিয়া থাকে। অবিশ্বাসীরা পৃথিবীর অদ্ভুত জীব। তাঁহারা যখন প্রত্যক্ষ দর্শনকে মস্তিষ্কের বিকার কহেন এবং প্রত্যক্ষ অনুভবকে স্নায়বীয় বিকার কহেন, তখন তাঁহারা

বিশ্বাস করিবেন কি? কেন না, দেখা স্নায়বীয় কার্য্য, আস্বাদন করা স্নায়বীয় কার্য্য, আঘ্রাণ লওয়া স্নায়বীয় কার্য্য, স্পর্শানুভব করা স্নায়বীয় কার্য্য, চিন্তা করাও স্নায়বীয় কার্য্য। স্নায়ুগণ অবস্থাক্রমে বিপরীত কার্য্য করিয়া থাকে। এই কার্য্যবৈপরীত্য সংঘটন করিবার আদি কারণ সংস্কার। যাহার যে প্রকার সংস্কার জন্মায়, তাহার শরীরে সেই প্রকার কার্য্য প্রকাশ পায়। সংস্কার নানাপ্রকার। সত্য সংস্কারই হউক কিম্বা মিথ্যা সংস্কারই হউক, তাহার কার্য্যে প্রতিবন্ধক জন্মান যায় না।

কেহ ভূত দেখিয়া থাকুন বা নাই থাকুন, যদ্যপি কাহার সংস্কার থাকে যে, অমুক তেঁতুল গাছে একটা পেত্নী আছে; সে ব্যক্তি পেত্নী না দেখিয়া একটা সংস্কার প্রাপ্ত হইল। যদ্যপি কোন সময়ে অন্ধকার রজনীতে তাঁহাকে ঐ স্থান দিয়া একাকী গমন করিতে হয়, তাহা হইলে পেত্নীর সংস্কার উদ্দীপিত হইবে, তাহার সন্দেহ নাই। তখন তাঁহার গাত্র কণ্টকিত হইবে, হৃৎপিণ্ড ঘন ঘন সঞ্চালিত হইবে, মুখ শুখাইয়া যাইবে এবং শৌচ প্রস্রাবাদির উত্তেজনা হইতে থাকিবে। এমন সময়ে যদ্যপি ঐ গাছে একটা পক্ষী পক্ষ সঞ্চালন করে, কিম্বা বায়ুতে ডাল নড়িয়া উঠে, তাহা হইলে ঐ ব্যক্তি তৎক্ষণাৎ মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িবেন। মূর্চ্ছা ভঙ্গের পর পেত্নীর কত বর্ণনাই করিবেন, তাহার সন্দেহ নাই। অনেকে বলেন যে, যাহা সংস্কারবশতঃ সর্ব্বদা চিন্তা করা যায়, তাহার ছবি দর্শনপটে পতিত হওয়া বিচিত্র নহে। স্নায়বীয় বিকারজনিত নানাপ্রকার ব্যাধির উল্লেখ আছে। হিষ্টিরিয়া তাহার দৃষ্টান্তবিশেষ। রোগাগমনকালে অনেকে অনেক প্রকার বিভীষিকা দর্শন করিয়া আতঙ্কে চীৎকার করিয়া উঠে এবং সেই কথাই উপর্য্যুপরি বলিতে থাকে। হিষ্টিরিয়া রোগী যাহা দর্শন করে,

তাহা তাহার পক্ষে সত্যবৎ বোধ হয় বলিয়া অন্যের নিকটে তাহা সম্পূর্ণ অলীক কথা। রোগী বলিল যে,—"দেখ! দেখ! কে আমায় ধরিতে আসিয়াছে," নিকটের ব্যক্তিরা কিছুই দেখিতে পাইল না। তাহারা ভীত হইল না কিন্তু রোগী ভয়ে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িল। এ ক্ষেত্রে রোগীর দর্শনকে বাস্তবিক মিথ্যা বলিতে হইবে। যদ্যপি সেই রোগীর স্নায়বীয় দৌর্ব্বল্য বিদূরিত হয়, তাহা হইলে, সে আর যমদূতও দেখিবে না, অথবা ভূত পেত্নীর বিকটাকৃতি তাহার নয়নপথে পতিত হইবে না। দুর্ব্বল মস্তিষ্কবিশিষ্ট মনুষ্যেরা এইরূপে বিশ্বাসের বশবর্ত্তী হইয়া কুসংস্কারাক্রান্ত হয় এবং তজ্জনিত নানাবিধ ক্লেশ পাইয়া থাকে।

সংস্কারবিশেষের প্রাবল্য হইলে স্নায়বীয় কার্য্য সম্বন্ধে পরিবর্ত্তন ঘটিয়া থাকে, তাহার ভূরি ভূরি দৃষ্টান্ত আছে।

একদা কোন ব্যক্তির স্ত্রী বিয়োগ হইলে তাঁহার শিশু সন্তানকে সান্ত্বনা করিবার নিমিত্ত তিনি সময়ে সময়ে বক্ষের উপরে স্থাপন করিয়া রাখিতেন। শিশু বক্ষে শয়ন করিয়া অভ্যাসবশতঃ স্তন পান করিবার জন্য চঞ্চল হইত। পিতা কিঞ্চিৎ স্থূলকায় ছিলেন, কি করেন, আপন স্তন শিশুর মুখে প্রদান পূর্ব্বক স্ত্রীকে স্মরণ করিয়া নয়ন জলে ভাসিয়া যাইতেন। এইরূপে কিছু কাল গত হইলে ক্রমে সেই ব্যক্তির স্তনে দুগ্ধের সঞ্চার হইয়াছিল। এই ঘটনার হেতু বাহির করা কঠিন নহে। এ স্থলে সংস্কারই মূলীভূত কারণ বলিয়া প্রতীয়মান হইতেছে। সংস্কার দ্বারা যখন এরূপ পরিবর্ত্তন সংঘটিত হয়, তখন ভগবান্ সম্বন্ধে কোন প্রকার সংস্কারগ্রস্থ হইলে তদ্দ্বারা যে কার্য্য হয়, তাহা অস্বাভাবিক বলা যাইবে না কেন? দুষ্ট লোকদিগের দুরভিসন্ধি চরিতার্থের নিমিত্ত সাধারণকে অন্ধ বিশ্বাসী করিতে চেষ্টা পাওয়া মিথ্যা কথা নহে।

একদা কোন বিসূচিকা রোগাক্রান্ত পল্লিতে একজন সরকারী চিকিৎসক গমন করিয়াছিলেন। তথাকার লোকেরা সকলেই মূর্খ। চিকিৎসককে দেখিয়া একদল বলিষ্ঠ ব্যক্তি আসিয়া উপস্থিত হইল। ইহাদের দলপতি একজন কৃষ্টবর্ণ দীর্ঘকায় যুবাপুরুষ, দেখিলে ডাকাতের সর্দ্দার বলিয়া মনে হয়। দলপতি চিকিৎসককে কহিল, মহাশয়! এ গ্রামে কি করিতে আসিয়াছেন ? আমার ঘরে মা ওলাবিবি আছেন, আমার সহিত তিনি কথা কন। এই গ্রামের লোকগুলার প্রতি তিনি রুষ্ট হইয়া ছয় খানি নৌকা ঘাটে বাঁধিয়া রাখিয়াছেন। এই ছয় খানির মধ্যে দুইখানি বোঝাই হইয়াছে এবং চারিখানি নৌকা বোঝাই না হইলে কাহার সাধ্য একটী প্রাণীকে বাচাইতে পারে। এই সকল ব্যক্তিকে জিজ্ঞাসা করুন, সন্ধ্যার পরে আকাশ দিয়া মার দূতেরা যাতায়াত করে। কথা সত্য মিথ্যা আপনি থাকিয়া দেখুন। একজন অমনি বলিয়া উঠিল, তাহা হইলে ডাক্তার বাবুকে আর কেহ কল্য দেখিতে পাইবেন না। চিকিৎসক সহাস্যে কহিলেন, বাবু ! তোমরা গ্রামের এত লোক থাকিতে আমার উপর তোমার ওলাবিবির ক্রোধ হইবে কেন ? আমি এ গ্রামের লোক নহি। দলপতি কহিল, মহাশয় ! এ কথাটা বুঝিতে পারিলেন না ? আপনি মায়ের সহিত যুদ্ধ করিতে আসিয়াছেন, সুতরাং, আপনি শত্রু। শত্রু থাকিতে অপরকে মারিবেন কেন ? চিকিৎসক হাসিয়া কহিলেন, ভাল কথা। যদ্যপি আমার মৃত্যুতে গ্রামের লোকেরা বাঁচিয়া যায়, তাহা অপেক্ষা সুখের কথা আর কি আছে ? দলপতি কিয়ৎকাল মস্তকাবনত থাকিয়া কহিল, মহাশয়! আপনি ভদ্রলোক, কেন ছোটলোকের জন্য প্রাণ হারান ? আপনি এখানে এক রাত্রি থাকিলে নিশ্চয় মরিয়া যাইবেন। চারিখানা নৌকা বোঝাই না

হইলে অন্য উপায় নাই। চিকিৎসক কহিলেন, মাতার ক্রোধের শান্তি হইবার কোন উপায় তোমায় বলিয়াছেন? দলপতি কহিল, আজ্ঞা হাঁ। এত দিন বলেন নাই, সম্প্রতি আমার প্রতি আদেশ হইয়াছে যে, সকলে অবস্থামত তাঁহার পূজা দিলে, তিনি ঘর প্রতি দুই একটী করিয়া ছাড়িয়া দিবেন। চিকিৎসক গ্রামের লোকদিগকে ঔষধ সেবন করাইবার নিমিত্ত বৃথা চেষ্টা করিলেন। সকলের মুখে একই কথা, সকলেই বলে যে, সন্ধ্যার পর আকাশে কড় কড় শব্দে দূতগণ যাতায়াত করে, সকলেই পূজা দিবার জন্য ব্যতিব্যস্ত। এই দৃষ্টান্তে বাস্তবিক অন্ধবিশ্বাসের ছবি দেখা যায়। দুর্জ্জনেরা সময়ে সময়ে দেব দেবীর নামে অদ্ভুত কাহিনী প্রকাশ পূর্ব্বক, লোকের মনে সংস্কার বিশেষ স্থাপন করিয়া আত্মস্বার্থ চরিতার্থ করিয়া থাকে, এ কথা অলীক নহে। আমাদের বাটীর নিকটে একবার মনসা উঠিয়াছিলেন। এই সহরের অনেক ভদ্রলোকেরাও তাহা বিশ্বাস করিয়া পূজাদি পাঠাইতে সঙ্কুচিত হন নাই। বলিতে কি, আমাদের বাটী হইতেও পূজা গিয়াছিল। সে ঘটনাটী এই। আমরা কয়েক জনে মিলিয়া রক্ষাকালী পূজা করিয়াছিলাম। সেই স্থানে তৎপল্লীস্থ গোয়ালা এবং অপর শ্রেণীস্থ ব্যক্তিরা মনসা দেবীর মূর্ত্তি আনিয়া পূজা করে। পূজার পর মূর্ত্তিটীকে বিসর্জ্জন না দিয়া দিন কয়েক তথায় রাখিয়া, এক দিন নিশিথকালে মা! মা! বলিয়া কয়েকজন লোকে চীৎকার করায় আমাদের নিদ্রা ভঙ্গ হয় এবং ছাদের উপরে উঠিয়া দেখি যে, একটী বিংশতি বয়সের বালক ভাবাবেশে বলিতেছে যে, "আমি মনসা, এই স্থানে আমার মন্দির নির্ম্মাণ করিয়া দাও, এখনি আমার পূজা না দিলে মহারাগান্বিত হইব।" যে ব্যক্তি এই ব্যাপারের সূচনাকর্ত্তা, সে কৃতাঞ্জলিপুটে বলিল, মা!

কি পূজা দিব? সেই ভাবগ্রস্থ বালক কহিল, আমি পায়রা বলি খাব। অন্য পায়রা হইলে হইবে না, নিক্কালি পায়রা, অমুকের বাটীতে আছে। তৎক্ষণাৎ পায়রা আনয়ন পূর্ব্বক কাঁসর বাজাইয়া বলিদান হইল। পর দিবস বালক মনসা হইল, আর এক ব্যক্তি তাহার দাসী হইয়া চরণামৃত এবং উৎকট উৎকট ব্যাধি শান্তির নিমিত্ত পুষ্পাদি প্রদান করিতে লাগিল। অতঃপর সাধারণের আশ্চর্য্য সম্পাদনের নিমিত্ত, এক দিন রাত্রে উক্ত বালকের ভর হয় এবং একটী নানা বর্ণে রঞ্জিত সাপ বাহির করিয়া দেখায়। এই সাপ দেখিয়া পল্লীর লোকদিগের বাস্তবিক ভক্তি হইতে লাগিল। আমাদের আত্মীয় বন্ধুরা মনসা সম্বন্ধে সর্ব্বদা জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন। কিন্তু আমরা সত্য বলিতেও পারি নাই এবং মিথ্যা বলিতেও সাহস হয় নাই। ক্রমে সেই স্থানে একখানি গৃহ নির্ম্মাণ হইল, পূজা করিবার এক জন ব্রাহ্মণও জুটিল। সর্ব্বদা ঢোলঢাক বাজাইয়া পূজা হইতে লাগিল। এই পূজারিরও ক্রমে ভর হইতে আরম্ভ হইল। সে এক দিন বলিদানের পর ভাবাবেশে ছুটিয়া আসিয়া ছাগ শোনিত পান করিয়া দর্শকবৃন্দের কুতুহল বাড়াইয়াছিল। এই মনসার বিষয় লইয়া আমাদের বিশেষ জল্পনার বিষয় হইয়া উঠিয়াছিল। সত্য মিথ্যা স্থির করা সম্বন্ধে কার্য্যের সুবিধা হইয়া উঠে নাই। এক দিন আমরা দশ পনের জন বন্ধু বান্ধব একত্রিত হইয়া স্থির করিলাম যে, অদ্য মনসার নিকটে যাইয়া পরীক্ষা করিতে হইবে। এমন সময়ে সম্বাদ আসিল যে, যুবকের ভর হইয়াছে। আমরা সদলে যাইয়া উপস্থিত হইয়া দেখিলাম যে, তথায় জনাকীর্ণ হইয়া গিয়াছে। এক জনের দ্বারা আমি জিজ্ঞাসা করিলাম যে, সাপ দেখাও। ভাবগ্রস্থ বালক কহিল, আমাকে অবিশ্বাস, আমি মনসা, আমার সঙ্গে বাদ! সাবধান হও। আমি

তাহাকে বলিতে বলিলাম যে, কথায় কিছুই হইবে না, তুমি সাপ দেখাইবে কি না? সে অতি ভীষণ স্বরে কহিল, সাপ দেখাইতেছি, কিন্তু সাবধান! আমি কিন্তু তোর বক্ষে দংশন করিব। তোকে আমি নিশ্চয় সংহার করিব। এই কথা বলিতে বলিতে ঘটের নিকটস্থ একখানি গামছার ভিতর হইতে একটী ফণা বাহির হইল। ফণা দেখিয়া সকলে মা! মা! বলিয়া চীৎকার করিতে লাগিল। আমি সর্পটীকে কৃত্রিম মনে করিয়া একজনকে বলিলাম যে, তুমি যাইয়া সর্পটী বাহির করিয়া আন, উহা সোলার সাপ। এই কথা বলিবামাত্র সে যেমন গৃহের ভিতরে প্রবেশ করিল, অমনি সেই ভাবগ্রস্থ বালক এবং মনসার দাসী কোন্ দিকে ছুটিয়া পলাইল, আর দেখিতে পাওয়া গেল না। সূচনাকর্ত্তা বাটীর ভিতর লুকাইল। সহরের ভিতর বলিয়া এই বুজ্‌রুকি দীর্ঘকাল চলিল না। কিন্তু পল্লিগ্রামে এইরূপ অনেক দেব দেবীর আবির্ভাব হয়।

লোকের মনাকর্ষণ করিবার নিমিত্ত অনেকেই অনেক প্রকার ছলনা করিয়া থাকেন। কেহ সিদ্ধাই দেখান, কেহ ছেলে হইবার ঔষধ দেন, কেহ উৎকট ব্যাধির শান্তিকর্ত্তা বলিয়া প্রচারিত হইতে ইচ্ছা করেন, কেহ ফাঁসিকাঠ হইতে কাহারও প্রাণরক্ষা করিয়া লোকের নিকট দেবদেবীর ভাবে প্রচারিত হন। কেহ দেবদেবীর মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত করিয়া আত্মসিদ্ধ ভাবের পরিচয় দিয়া থাকেন। ধর্ম্ম-রাজ্যের এমনি অবস্থা ঘটিয়াছে যে, যে স্থানে অঘটন সংঘটনা হয়, যে স্থানে অন্ধের চক্ষু ফোটে, যে স্থানে বধির শুনিতে পায়, দরিদ্র ধনী হয়, সেই স্থানেই লোকের প্রাণ আপনি ধাবিত হয়। সুতরাং, এইরূপ স্থলে লোকের মনে সংস্কারাবরণ করিতে হইলে অলৌকিক কার্য্যের সংঘটনা করা যেন চিরপ্রথা হইয়া গিয়াছে। এই প্রকার কার্য্যের স্থলে

যে বিশ্বাস করা যায়, তাহাকেই বাস্তবিক অন্ধ বিশ্বাস বলিলে অন্যায় হয় না। কারণ এই বিশ্বাস দ্বারা ভগবান্ লাভের কোন কথাই নাই। কিন্তু আর এক হিসাবে অর্থাৎ যাঁহারা ভগবান্ লাভ করিতে না চাহিয়া অন্য কোন পদার্থ প্রাপ্ত হইবার জন্য অভিলাষ করেন, তাঁহাদের বিশ্বাসকে কখন অন্ধ বলা যায় না। এই নিমিত্ত বিশ্বাস বলিলে তাহা কখন অন্ধ বিশেষণ দ্বারা উল্লিখিত হওয়া উচিত নহে।

স্নায়বীয় বিকারজনিত যে অস্বাভাবিক ঘটনা ঘটিয়া থাকে, তাহাও ঘটনা সম্বন্ধে মিথ্যা বলা যায় না, কিন্তু ঘটনান্তরে প্রয়োগ করিলে অবশ্যই মিলিবে না।

তর্কের অনুরোধে যদ্যপি অস্বাভাবিক ঘটনাকে অস্বাভাবিক বলিয়াই স্বীকার করা যায়, কিন্তু তাহা ভগবান্ বিষয়ে প্রয়োগ হইতে পারে না। এ কথা স্বীকার করিতে হইবে যে, একজন টাকা ভাবিয়া পাগল হইলে, সে তদবস্থায় কাগজখণ্ডকে কোম্পানির কাগজ কিম্বা নোট মনে করিলে তাহা কখন সত্য হয় না, সেইরূপ ঈশ্বর ঈশ্বর করিয়া ভাবিলে আর এক প্রকার' উন্মাদ রোগ জন্মে ; যাহাতে লোকে হাসে কাঁদে গান গায়। এ প্রকার পরিবর্ত্তন হওয়া মনুষ্যের পক্ষে অস্বাভাবিক, অতএব ইহাতে অতিরিক্ত চিন্তার বিকৃত ফল বলা যুক্তিবিরুদ্ধ নহে বলিয়া অনেকের ধারণা।

চিন্তা সম্বন্ধে একটী নিগূঢ় তত্ত্ব আছে। সত্য বস্তুর নিমিত্ত সত্যকে অবলম্বন করিয়া চিন্তা সাগরে ভাসিয়া যাইলে সত্যতেই উপনীত হওয়া যায়, কিন্তু সত্য চিন্তায় অসত্যাবলম্বন করিলে কিরূপে সত্য লাভ হইবে? কালীঘাটে মা কালীর মন্দির আছে সত্য। যে কেহ কালীঘাটের রাস্তায় যাইবে সেই তথায় উপস্থিত হইবে, কিন্তু কালীঘাট মনে করিয়া পেঁড়োর পথে শুভযাত্রা করিলে তাহার ভাগ্যে কি কখন

কালীঘাটের মহামায়ীর দর্শন লাভ ঘটিতে পারে? স্নায়ুমণ্ডলী বিকৃত হইলে অস্বাভাবিক ঘটনা ঘটে। কিন্তু তাহারা স্বভাবে থাকিলে স্বভাবিক কার্য্যই সম্পন্ন করিয়া থাকে। পুরুষ মানুষের স্তনে দুগ্ধের সঞ্চার হওয়া অস্বাভাবিক ঘটনা; কারণ, লক্ষ লক্ষ পুরুষেরা যে লক্ষণ দ্বারা পরিচিত হন, তাহাকেই স্বাভাবিক কহা যায়, কিন্তু বিশলক্ষ জনের মধ্যে এক জনের নূতন রকম দেখিলে কাজেই তাহাকে অস্বাভাবিক না বলিয়া আর থাকা যায় না। কিন্তু স্ত্রীলোকের স্তনে দুগ্ধ বাহির হইলে তাহাকে অস্বাভাবিক বলিতে পারা যায় না। কারণ, উহা স্ত্রীলোকদিগের স্বাভাবিক ঘটনা। যে যে কারণে স্তনে দুগ্ধের সঞ্চার হয়, যগুপি সেই সেই কারণ স্ত্রীলোকে প্রকাশিত না হয়, তাহা হইলেও কি স্ত্রীলোকের স্তনে দুগ্ধ বাহির হয়? সন্তানের জন্য মাতৃস্তনে দুগ্ধের প্রেরণ হয়। ইহা শিশুর জীবন রক্ষার জন্য বিধাতা কর্ত্তৃক ব্যবস্থা হইয়াছে। বন্ধ্যা স্ত্রীলোকের অলাবুপ্রমাণ পয়োধর সত্ত্বেও এক বিন্দু দুগ্ধ প্রাপ্ত হইবার কি প্রত্যাশা আছে? কেন সে ত স্ত্রীলোক, তাঁহার স্তনে দুগ্ধ বাহির হওয়া স্বাভাবিক কার্য্য, তবে তথায় কেন অস্বাভাবিক ঘটনা সংঘটিত হইয়া থাকে? প্রয়োজনবিশেষে কার্য্যের উৎপত্তি হওয়া স্বাভাবিক ঘটনা। রোগীর প্রয়োজনের জন্য ঔষধের সৃষ্টি হইয়াছে। জীব-জীবনের প্রয়োজনের জন্য বায়ুর সৃষ্টি হইয়াছে এবং দেহের প্রয়োজনের জন্য আহারের সৃষ্টি হইয়াছে। প্রয়োজন অর্থাৎ কারণ ভিন্ন কোন কার্য্যই হইতে পারে না। যে স্থানে প্রয়োজন নাই, সে স্থানে কার্য্য হইবে কিরূপে? ক্ষুধারূপ প্রয়োজন বা কারণ না থাকিলে ক্ষীর সর নবনীত প্রভৃতি ভোজন করিতে দিলে কেহ গ্রহণ করিবে না, কিন্তু প্রয়োজন থাকিলে পদার্থের বিচার না করিয়া স্বচ্ছন্দে ক্ষুধা নিবৃত্তি করিয়া লয়। প্রয়োজনই সকল কার্য্যের আদি কারণ।

প্রয়োজনের নিমিত্ত আমরা বিদ্যাভাস করিয়া থাকি, প্রয়োজনের জন্য দেশবিদেশে অর্থোপার্জ্জন করিতে যাই, প্রয়োজনের নিমিত্ত শমনকিঙ্করের সম্মুখীন হইতেও অগ্রপশ্চাৎ ভাবিয়া দেখি না। প্রয়োজন আমাদিগকে কামিনীর ভুজাশ্রয় হইতে টানিয়া লইয়া শত্রুর করাল গ্রাসে নিপতিত করে, প্রয়োজনই কামিনীকাঞ্চন বন্ধন বিছিন্ন করিয়া গিরিগুহা এবং তরুমূলাশ্রয় করিতে বাধ্য করিয়া থাকে, প্রয়োজনই প্রাণাধিক প্রিয় পুত্রাদির প্রতি মায়া মমতাহীন করিতে শিক্ষা দেয়, প্রয়োজনই বাস্তবিক ঈশ্বর লাভ করাইবার একমাত্র উপায়স্বরূপ। রামকৃষ্ণদেব তজ্জন্য বলিতেন যে, ঈশ্বর লাভ করিতে হইলে, তাঁহাকে লাভ করিবার আবশ্যকতা জ্ঞান না হইলে কখন লাভ করা যায় না। ঈশ্বর লাভের প্রয়োজন বোধ হইলে, সুতরাং তাঁহাকে লাভ করিবার জন্য আকাঙ্ক্ষা হইবে এবং সেই অবস্থায় যিনি যাহা বলিয়া দিবেন, তাহাতে বিশ্বাস জন্মিবে। বিশ্বাসী এবং অবিশ্বাসী হওয়া বা না হওয়া, প্রয়োজন এবং অপ্রয়োজনের উপর নির্ভর করিতেছে। এই নিমিত্ত ঈশ্বর লাভের আয়োজন করিবার পূর্ব্বে তাঁহাকে প্রাপ্ত হইবার প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে ভাল করিয়া বিবেচনা করা কর্ত্তব্য। ভগবান্‌কে লাভ করিতে চাহি কেন? তাঁহার অদর্শনে দিন কাটিতেছে না? তাঁহাকে ভোজন না করাইলে প্রাণে তৃপ্তি হইতেছে না? তাঁহার শ্রীমুখের কথা না শুনিলে হৃদয় ধৈর্য্য ধরিতেছে না? তাঁহার পদসেবা না করিলে হস্তের সার্থকতা হইতেছে না? তাঁহার অপূর্ব্ব প্রেমময় শ্রীমূর্ত্তি দর্শন ব্যতীত দর্শনসুখের ইয়ত্তা হইতেছে না? প্রাণনাথের বিরহে প্রাণ দেহ-পিঞ্জরে আবদ্ধ থাকিতেছে না? এ প্রকার প্রয়োজন হইয়াছে কিনা, তাহা আপনাআপনি বিচার করিয়া দেখিতে হইবে। যদ্যপি প্রয়োজন হইয়া থাকে, যদ্যপি বিভুদর্শনের নিমিত্ত আকাঙ্ক্ষা

জন্মিয়া থাকে, যদ্যপি ভগবানের অদর্শনে মহাপ্রলয়বৎ জ্ঞান হয়, যদ্যপি তাঁহার উপস্থিতি ভিন্ন শান্তি লাভের দ্বিতীয় বস্তু না প্রাপ্ত হওয়া যায়, তাহা হইলে তাঁহারই ঈশ্বরলাভ হইবার কথা। প্রয়োজনবিহীন হইয়া আমরা ঈশ্বরান্বেষণ করিতে যাই, আমাদের অন্য প্রয়োজন চরিতার্থ করিবার নিমিত্ত ঈশ্বরের শরণাপন্ন হইতে যাই, আমাদের সঙ্কল্পরাশি পরিপূরণের নিমিত্ত ভগবানের উপাসনা করিয়া থাকি, ভগবান্ লাভ হইবে কেন ? যে প্রয়োজন সাধন করিবার জন্য আকিঞ্চন করা যায়, তাহাই সম্পূর্ণ হইবার কথা। রুক্মিণীর বিবাহের সংবাদ দিবার জন্য শ্রীকৃষ্ণের নিকটে এক দরিদ্র ব্রাহ্মণ গমন করিয়াছিলেন। সাক্ষাৎ সম্বন্ধে শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র ব্রাহ্মণকে অর্থাদি কিছুই প্রদান করেন নাই, তজ্জন্য বিপ্র মহাশয় মনে মনে নিতান্ত বিরক্ত হইয়া কিঞ্চিৎ অর্থপ্রাপ্তির নিমিত্ত বার বার সঙ্কল্প করেন, কিন্তু লজ্জার অনুরোধে কিছু বলিতে পারেন নাই। ভগবান্ যখন রথারোহন করিয়া শুভযাত্রা করেন, তখন সেই ব্রাহ্মণের উত্তরীয় বসন প্রভৃতি একে একে উপসর্গবর্গ বিহীন করিয়া দেন। ব্রাহ্মণ আপন সমূহ দুরদৃষ্টের প্রবল কার্য্য দেখিয়া একেবারে অধৈর্য্য হইয়া পড়েন। কিন্তু তখনও ভগ্ন হৃদয়ে একটী আশা উপস্থিত থাকিয়া তাঁহার ধৈর্য্যচ্যুতি হইতে দেয় নাই। তিনি মনে মনে স্থির করিয়া রাখিয়াছিলেন, যদিও কৃষ্ণচন্দ্রের নিকটে কোন সুবিধা হইল না বটে, কিন্তু রুক্মিণী দেবীর দ্বারা সে দুঃখ দূর হইয়া যাইবে। কিন্তু কি পরিতাপ! ব্রাহ্মণের নিকটে রুক্মিণী দেবী শ্রীকৃষ্ণের আগমনবার্ত্তা শ্রবণ করিয়াও কিছুই না দিয়া মস্তকাবনত পূর্ব্বক প্রণাম করিলেন। ব্রাহ্মণ তথা হইতে প্রত্যাগমন পূর্ব্বক মনে মনে স্থির করিলেন যে, বড় লোকের কথাই স্বতন্ত্র। মাথা হেঁট করিতে অর্থক্ষয় হয় না, তাই বার বার প্রণাম করিতে বিশেষ পটু। যাহা

হউক, আমার মনের কথা তাঁহাকে খুলিয়া বলা উচিত, কিন্তু ব্রাহ্মণ বার বার রুক্মিণীর সমক্ষে গমন করিয়াও আত্মদৌর্ব্বল্য প্রকাশ করিতে পারিলেন না।

তদনন্তর ক্ষুন্নমনে অতি ক্লেশে নিজ কুটিরে প্রত্যাগমন করিয়া দেখিলেন যে, তথায় অট্টালিকা হইয়া গিয়াছে এবং ব্রাহ্মণী হীরকাদি অলঙ্কারে বিভূষিতা হইয়া রহিয়াছেন। প্রথমে ব্রাহ্মণের ভ্রম হয়, পরে সহসা অবস্থা পরিবর্ত্তনের কারণ ব্রাহ্মণীকে জিজ্ঞাসা করায় ব্রাহ্মণী কহিলেন, তুমি চলিয়া যাইলে পর একদিন রাত্রে আমি সহসা নিদ্রোথিত হইয়া দেখিলাম, যে গৃহটী জ্যোতিঃতে পরিপূর্ণ হইয়াছে। কত অপূর্ব্ব মূর্ত্তি দেখিলাম, একজন নবীন-নীরদ-শ্যাম-কলেবর তরুণবয়স্ক বালক আমার দিকে চাহিয়া বলিল, "দেখ! চেয়ে দেখ মা! আমি তোমার পুত্র। পুত্রের সাধ কি পূর্ণ হইল?" জন্মাবধি আমায় মা বলিয়া কেহ ডাকে নাই। মা বলিলে মাতার প্রাণে কি হয়, আমি জানিতাম না। যখন আমায় মা! মা! বলিয়া বার বার ডাকিল, তোমায় সত্য বলিতেছি, আমার শুষ্ক পয়োধরে পয়োনিধি আবির্ভূত হইয়া ফোয়ারার ন্যায় উহা বালকের মুখে পতিত হইতে লাগিল। আমি আনন্দে বিহ্বল হইয়া বাহুপ্রসারণ পূর্ব্বক গোপাল! গোপাল! বলিয়া তাহাকে ক্রোড়ে লইয়া কত স্তন্যসুধা যে পান করাইলাম, তাহা আর কি বলিব! এইরূপে আমি পরমানন্দে গোপালকে ক্রোড়ে লইয়া পরমানন্দ সম্ভোগ করিতেছিলাম, কিন্তু জানি না, বালক সহসা দণ্ডায়মান হইয়া বলিল, "মা! আমি মনে করিয়াছিলাম যে, দিন কতক থাকিব, কিন্তু পিতা থাকিতে দিলেন না।" এই বলিয়া কোথায় অদৃশ্য হইয়া গেল। আমি তাহাকে কত অনুসন্ধান করিলাম, কিন্তু আর দেখিতে পাইলাম না। কিন্তু সেইদিন হইতে এই ঐশ্বর্য্য সকল আপনি

হইয়া গিয়াছে। তুমি পণ্ডিত, প্রকৃত ঘটনা বলিলাম, ইহার তাৎপর্য্য বাহির করিয়া দেখ। ব্রাহ্মণ বলিলেন, ব্রাহ্মণী! তুমি ধন্যা, তুমি মানব জন্মের সার্থকতা লাভ করিয়াছ। কিন্তু জানিনা আমার ভাগ্যে এমন হইল কেন? এই বলিয়া তিনি পুনরায় শ্রীকৃষ্ণের নিকটে প্রত্যাগমন করিয়া অতি দীনভাবে জিজ্ঞাসা করিলেন, প্রভু এতক্ষণে আমার চৈতন্য হইয়াছে। আমি বুঝিয়াছি, আপনি কে? আপনি না দয়াময় নাম ধারন করেন? কিন্তু প্রভু! আমার প্রতি এত নির্দ্দয় কেন? আমাকে কেন মায়াবরণ দিয়া রাখিয়াছিলেন? এক্ষণে দয়া করিয়া শ্রীচরণে স্থান দিন। আর আমি গৃহে প্রত্যাগমন করিতে চাহিনা, আর আমি ব্রাহ্মণীর প্রেমে আবদ্ধ থাকিতে ইচ্ছা করি না, অতুল ঐশ্বর্য্য দিয়াছেন দেখিয়া আসিয়াছি, কিন্তু তাহাতে আমার স্পৃহা নাই। শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র তখন সহাস্যে কহিলেন, ব্রাহ্মণ! আমাকে দোষী করিতেছ কেন? তুমি স্মরণ করিয়া দেখ, আমি তোমার কল্যাণার্থ কি করিয়াছি। তুমি সর্ব্বপ্রথমে আসিয়াই অবস্থা পরিবর্ত্তন করিবার জন্য অর্থ প্রার্থনা করিয়াছ, কিন্তু আমি সে কথায় কর্ণপাত না করিয়া তোমায় বৈরাগ্য শিক্ষা দিবার জন্য নানাপ্রকার চেষ্টা করিয়াছি, কিন্তু স্মরণ করিয়া দেখ, তুমি জড় পদার্থের নিমিত্ত কত প্রার্থনা করিয়াছ। তোমার ব্রাহ্মণীর পুত্রের সাধ ছিল, আমি স্বয়ং তাঁহাকে মা বলিয়া স্তন্যসুধা পান করিতেছিলাম। কিন্তু কি করিব, তথায় দীর্ঘকাল থাকিতে দিলে না। তুমি স্বয়ং লক্ষ্মী রুক্মিণীর নিকটে যাইয়া ঐশ্বর্য্য কামনা করিয়াছ। লক্ষ্মী কোনমতে তোমাকে ঐশ্বর্য্যে নিমগ্ন করিতে চান নাই, কিন্তু কি করিবেন? তুমি একবার নহে, দুইবার নহে, তিনবার নহে, উপর্য্যুপরি অর্থ কামনা করিতে লাগিলে, সুতরাং, তিনি অতুল ঐশ্বর্য্য প্রদান করিতে বাধ্য হইয়াছেন। এতক্ষণ আমি তোমার

কুটীরে অবস্থিতি করিতেছিলাম, কিন্তু ঐশ্বর্য্য যাইবামাত্র আর আমি তথায় থাকিতে পারিলাম না, এই জন্য সহসা অতি ক্লেশে চলিয়া আসিতে বাধ্য হইয়াছি। ব্রাহ্মণ আমার অপরাধ কি? আমায় তোমার প্রয়োজন হয় নাই, আমি কিরূপে তোমার হইব? তোমার হইলেও তুমি লইতে পারিবে না। আমি তোমার হইয়াছিলাম, রুক্মিণী তোমার হইয়াছিলেন, কিন্তু আমাদের পরিত্যাগ পূর্ব্বক ঐশ্বর্য্য চাহিয়া লইলে। আমরা দিতে চাহি নাই, তুমি স্বইচ্ছায় তাহা লইয়াছ। আর কেন? যাহার প্রয়োজন ছিল, তাহা পাইয়াছ। এক্ষণে তাহা সম্ভোগ কর, যখন প্রয়োজন মিটিয়া যাইবে, তখন অবশ্যই আমায় প্রাপ্ত হইবে। এই বলিয়া শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র ব্রাহ্মণের নয়নপথ হইতে অদৃশ্য হইয়া যাইলেন। বাস্তবিক এইরূপই আমাদের অবস্থা। আমরা স্বইচ্ছায় প্রয়োজনানুসারে কার্য্য করিতে প্রবৃত্ত হইয়া যখন তাহার বিষময় ফলপ্রাপ্ত হই, তখন সে দোষ ভগবানের স্কন্ধেই নিক্ষেপ করিতে চেষ্টা করিয়া থাকি।

ভগবান্ লাভ সম্বন্ধে যাহা রামকৃষ্ণদেব বলিয়াছিলেন, তাহার সূক্ষ্ম মর্ম্ম এই যে, ভগবানের প্রয়োজন এবং তৎসহ বিশ্বাস থাকিবে। প্রয়োজন এবং বিশ্বাস যাহার থাকিবে, তাহারই ভগবান্ লাভ হইবে।

অনেকে বলেন যে, যাহারা ঈশ্বরারাধনা করেন, তাঁহাকে লাভ করা কি তাঁহাদের উদ্দেশ্য নহে? একবার মনে মনে বিচার করিয়া দেখিলে আপনি ইহার মীমাংসা হইয়া যাইবে। গৃহাশ্রমের দিকে চাহিয়া দেখিলে কাহাকেও ঈশ্বর লাভ করিবার জন্য ব্যতিব্যস্ত দেখা যায় না। আহ্নিক পূজা বা নিত্য নৈমিত্তিক ধর্ম্মকর্ম্মের উদ্দেশ্য স্বতন্ত্র প্রকার। আহ্নিক পূজার দ্বারা পারলৌকিক এবং নিত্য নৈমিত্তিক কার্য্যের দ্বারা ইহলোকের মঙ্গল সাধন হয়। ষষ্ঠী, মাকাল, মনসা পূজাই হউক, কিম্বা দুর্গা, কালী, সরস্বতী পূজাই হউক, সাংসারিক সুখের নিমিত্ত

তাহার ব্যবস্থা হইয়াছে। তীর্থাদি পর্য্যটন করিলে মানসিক উন্নতি হয়, বহুদর্শিতা লাভ হয় এবং তদ্দারা আত্মোন্নতি হইবার সুরাহা হইতে পারে। সাক্ষাৎ সম্বন্ধে ইহার দ্বারা ঈশ্বর লাভ হয় না। হরিসভাদি কিম্বা নামসঙ্কীর্ত্তনাদি মানসিক কল্যাণের হেতুস্বরূপ হইতে পারে। এই জন্য সামাজিক ভাবে যে সকল ধর্ম্ম কর্ম্ম অনুষ্ঠিত হয়, তদ্দারা ঈশ্বর লাভ করা যায় না। পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, প্রয়োজনবিশেষে বস্তু লাভ হয়। সংসারে সচরাচর এইরূপ কার্য্য হয় না, সুতরাং তথায় ঈশ্বর লাভ হইবার সর্ব্বদা সুবিধা হইতে পারে না।

ঈশ্বর লাভের প্রয়োজন হইলে তবে তাঁহাকে প্রাপ্ত হওয়া যায়। এইরূপ প্রয়োজন বৃদ্ধি হইলে তাহাকে অনুরাগ কহে। অনুরাগ বলিলে কোন বস্তুর অতি-প্রয়োজন ভাব হৃদয়ে বদ্ধমূল হইলে তাহা সম্পূর্ণ করিবার নিমিত্ত যে আগ্রহ জন্মায়, তাহাকে অনুরাগ বলা যায়। ভগবান্‌কে লাভ করিবার জন্য যাহার অতি প্রয়োজন হইবে, তাহার ভিতরে অনুরাগও উপস্থিত হইবে।

অতি প্রয়োজনকে অনুরাগ কহে, ইহা আমরা বুঝিয়া থাকি। যখন আমাদের পরীক্ষা দিবার সময় উপস্থিত হয়, তখন আমরা দিবারাত্রের পার্থকতা বিস্মৃত হইয়া যাই। বাঁচিব কি মরিব, সেদিকে একেবারে ভুল হইয়া যায়। কেন আমাদের অবস্থা পরিবর্ত্তন হয়? অতি প্রয়োজনই তাহার কারণ। এই অতি-প্রয়োজন সিদ্ধ করিবার কার্য্যকে অনুরাগ কহা যায়।

পরীক্ষা দিবার সময় আহার নিদ্রা ত্যাগ করিয়া জীবন পণ পূর্ব্বক পরীক্ষোত্তীর্ণ হইবার চেষ্টা করা যায়। সেইরূপ যখন ঈশ্বর লাভ করিবার নিমিত্ত যাঁহার অতি প্রয়োজন হয়, তখন তাঁহার অন্য কার্য্যে আর মন ধাবিত হইতে চাহে না—যাইতে পারে না। তিনি প্রাণপণ

করিয়া সাধন কার্য্যে নিযুক্ত হইয়া থাকেন। যেমন বালকেরা রীতি-মত না পড়িয়া আমোদ আহ্লাদে দিনযাপন করিলে কখন পরীক্ষোত্তীর্ণ হইতে পারে না, সেইরূপ সংসারের সুখে সর্ব্বদা লিপ্ত থাকিয়া দিনান্তে একবার হরিনাম করিলে কি কখন তাঁহার ভাগ্যে ঈশ্বর লাভ হইতে পারে? যিনি ঈশ্বর দর্শনের জন্য প্রাণপণ করিতে পারেন, যিনি ঈশ্বর দর্শনের নিমিত্ত অনুরাগের চরম সীমায় উপনীত হন, তিনিই একদিন ঈশ্বর লাভ করিতে পারেন। অতএব অনুরাগই ঈশ্বর লাভের মূল মন্ত্র।

ঈশ্বর লাভ করিতে হইলে বিশ্বাস এবং অনুরাগ, অগ্রে এই দুইটী ভাব লাভ করা কর্ত্তব্য। যাঁহার বিশ্বাস এবং অনুরাগ সঞ্চারিত হইয়াছে, রামকৃষ্ণদেব বলিতেন, ভগবান্ তাঁহার হইয়া গিয়াছেন। তিনি বলিতেন, যেমন হাতী বন্ধন করিতে রজ্জুর প্রয়োজন হয়, তেমনি বিশ্বাস এবং অনুরাগ ভগবান্‌কে বন্ধন করিবার রজ্জুবিশেষ। বিশ্বাসী এবং অনুরাগীর নিকট ভগবানের নিস্তার নাই। প্রভু বলিতেন যে, বিশ্বাসী এবং অনুরাগী ভগবানের দর্শনাকাঙ্ক্ষী হইয়া থাকেন। তিনি অন্য কোন ঐশ্বর্য্য চাহেন না, অষ্ট সিদ্ধাই চাহেন না, মানবসমাজে গণ্য মান্য হইতে ইচ্ছা করেন না, যাহাতে ভগবানের দর্শন প্রাপ্ত হন, তাহাই তাঁহার একমাত্র মনের কামনা, জীবনের লক্ষ্য এবং প্রাণের কথা।

ঈশ্বর লাভ করিতে হইলে কেবল প্রাণপণ নহে, বাস্তবিক প্রাণের প্রত্যাশা একেবারে পরিত্যাগ করিতে হইবে। এই নিমিত্ত চলিত কথায় ঈশ্বর লাভ বলিলে মৃত্যু বুঝায়: অর্থাৎ মরিয়া যাইলে ঈশ্বর প্রাপ্তি কহা যায়। ঈশ্বর লাভ করা সেইজন্য ইহজীবনে অর্থাৎ সাংসারিক জীবনে কখন সম্ভাবনা নহে। মরা বলিলে কি বুঝায়? জীবের

জৈবভাব বিদূরিত হওয়ার নাম মৃত্যু। যে মুহূর্ত্তে জৈবভাব অদৃশ্য হয়, সেই মুহূর্ত্তে তাঁহার মৃত্যু হইয়া থাকে; অর্থাৎ সাধনপথে তদবস্থাকে সমাধি শব্দে উল্লেখ করা যায়। প্রভু সর্ব্বদা বলিতেন যে, "পাশবদ্ধ জীব, পাশমুক্ত শিব।" সাধারণ নরনারীগণ লজ্জা, ঘৃণা, ভয় প্রভৃতি নানাবিধ পাশে আবদ্ধ হইয়া রহিয়াছেন। এই পাশ উচ্ছেদ না হইলে ভগবান্ লাভ করা যায় না। তন্নিমিত্ত তিনি বলিতেন যে, "লজ্জা, ঘৃণা, ভয়, তিন থাকিতে নয়।" লজ্জা, ঘৃণা এবং ভয় বিবর্জ্জিত নর নারীকে শিব কহে। কারণ, পাশ দ্বারা আবদ্ধ নরনারীর সংসারচক্র ব্যতীত স্থানান্তরে একপদ অগ্রসর হইবার শক্তি থাকে না। তজ্জন্য তাহারা সংসারকেই স্বর্ব্বস্ব জ্ঞান করিতে বাধ্য হয়। পাশোচ্ছেদ হইলে তাহার নূতন নূতন জ্ঞান সঞ্চার হয়। প্রভু বলিতেন যে, সাধুদিগের মধ্যে এই রীতি আছে যে, নূতন শিষ্য হইলে তাহাকে চারিধাম দর্শন করিবার নিমিত্ত গমন করিতে হয়। চারিধাম বলিলে উত্তরে হরিদ্বার, দক্ষিণে সেতুবন্ধ রামেশ্বর, পূর্ব্বে জগন্নাথ এবং পশ্চিমে দ্বারকা। এই চারিধাম পর্য্যটন করিলে বহুদর্শিতা জন্মে; মন বিস্তীর্ণ হয় এবং বিধাতার অপূর্ব্ব সৃষ্টিকৌশল দর্শন করিতে করিতে মহান্ ভাবের উদ্রেক হইয়া যায়। প্রভু বলিয়াছেন যে, গৃহে বসিয়া স্ত্রীপুত্র কুটুম্বাদি এবং ধনৈশ্বর্য্যের জ্ঞান ব্যতীত ভগবানের কোন কার্য্য দেখা যায় না। এই কলিকাতা নগরে প্রকৃতিপ্রসূত দৃশ্য কি কোথাও বিশিষ্টরূপে দেখিবার সম্ভাবনা আছে? সকলই কৃত্রিম, মনুষ্যশক্তির পরিচয়। গঙ্গার সেতু আশ্চর্য্য ঘটনা বটে, কিন্তু তাহা দর্শন করিলে ইংরাজদিগের দিকে মনাকর্ষণ হইয়া যায়। গ্যাস ইলেক্‌ট্রিকালোকে ভগবানের প্রতি মন যায় না। রাজপ্রাসাদ, রাজপথ, গাড়ী পাল্কি, বিবাহের আড়ম্বর, তোপের শব্দ প্রভৃতি মনুষ্যের অভিনয় দেখিয়া ভগবানের প্রতি কি মন

লাবিত হইতে পারে? লোকালয়ে লোকের ব্যাপার সন্দর্শন করিলে ব্যক্তিগত ভাবোদ্দীপিত হয়, এই জন্য তথায় ভগবানের বিশেষ পরিচয় প্রাপ্তির সুবিধা হয় না। সাধুরা ভগবান্ লাভ করিতে চাহেন, সুতরাং, লোকালয় পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হইয়া চারিধামে গমন করিয়া থাকেন। চারিধাম অর্থাৎ সমগ্র ভারতবর্ষ পর্য্যটন করিলে প্রকৃতির অদ্ভুত কার্য্যকলাপ দর্শন করিয়া লোকালয়ের সঙ্কীর্ণ জ্ঞান বিদূরিত হইয়া যায়। লোকালয়ে কোন মতে অর্থোপার্জ্জন না করিলে জঠরানল নিবারণের দ্বিতীয় উপায় নাই, প্রকৃতিবিপিনে তাহার চিন্তা নাই। ঋতু পরিবর্ত্তনে সময়োপযোগী নানাবিধ ফলমূলে পরিপূরিত হইয়া যায়। কে কত ভক্ষণ করিবে? লোকালয়ে এক গণ্ডুষ পবিত্র জল পান করিবার উপায় নাই, তথায় মন্দাকিনী অবিরাম গতিতে প্রবাহিত হইয়া আছেন। অঞ্জলি পূরিয়া উদর পূর্ণ করিয়া লইতে টেক্স খাজনা দিতে হয় না। বলিয়াছি, লোকালয়ে সকলই কৃত্রিম: অরণ্যে সকলই স্বাভাবিক। কোথাও অত্যুচ্চ গিরিবর, কোথাও কাননের ফলপুষ্পশোভিত বৃক্ষরাজি, কোথাও মন্দাকিনী, কোথাও অতলস্পর্শ অতিবিস্তীর্ণ সাগর দেখিয়া মন প্রাণ বিমোহিত, চমৎকৃত এবং লোকালয়ের সঙ্কীর্ণ জ্ঞান বিজিত হইয়া যায়। রামকৃষ্ণদেব এই জন্য বলিতেন যে, মনুষ্যজীবনে অন্ততঃ তিনটী বস্তু দর্শন করা কর্ত্তব্য, পর্ব্বত, বন এবং সমুদ্র। এই তিনটী পদার্থ দেখিলে বাস্তবিক মনের সঙ্কীর্ণতা দূর হইয়া যায়।

মনুষ্যেরা পাশবিচ্ছিন্ন হইলে শিব শব্দে কথিত হইয়া থাকে। রামকৃষ্ণদেব বলিয়াছেন, এই শিব যখন শবত্ব লাভ করে, তখনই ঈশ্বর লাভ হইবার সময় উপস্থিত হয়। তিনি কালীর মূর্ত্তি দেখাইয়া জীবের ঈশ্বর লাভ করিবার কাল নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিয়াছেন।

লোকালয়ে কৃত্রিম কৌশলে লোকদিগকে অভিভূত করিয়া রাখে।

তথায় ভগবানের কার্য্য সহজ ভাবে হৃদয়ঙ্গম হইতে দেয় না। যাহা দর্শন করি তাহা কৃত্রিম, যাহা শ্রবণ করি তাহাও কৃত্রিম, যাহাদের সহিত সহবাস করি তাহারাও কৃত্রিম। লোকালয়ে আমাদের সুবিধামত সুখৈশ্বর্য্যের পুষ্টি বিধানের নিমিত্ত সকল বস্তু প্রায় সংস্থাপিত হইয়াছে, সুতরাং, অকৃত্রিম ভাব কিরূপে লাভ হইবে? যখন লোকালয় পরি-ত্যাগ পূর্ব্বক সমুদ্রের অতি বিশাল ভাব মনে ধারণা হইয়া যায়, তখন সংকীর্ণ মন অতি বিস্তীর্ণ হইয়া পড়ে, নয়ন যতদূর পারে দেখে, কিন্তু অধিক দূরে যাইতে পারে না। নয়ন পরাজিত হয় বলিয়া মন পরাজিত হয় না। মনের ধারণা শক্তি বাড়িয়া যায়, মন বুঝিতে পারে যে, নয়ন যাহা দেখাইল তাহা শেষ নহে, আরও আছে। মনের এইরূপ বিস্তীর্ণতা সংসারের কোন বস্তু দেখিয়া লাভ করা যায় না। যদিও আকাশের বিস্তীর্ণ ভাব আমাদের সমক্ষে দেদীপ্যমান আছে বটে, কিন্তু ঊর্দ্ধে দৃষ্টি নাই, ঊর্দ্ধে চাহিতে শিক্ষা করি নাই। প্রাচীর দিয়া প্রকৃতিকে সীমাবদ্ধ করিয়া তন্মধ্যে বাদসা হইয়া আনন্দ করিতে শিখিয়াছি, আকাশের মহান্ ভাব ধারণা করিবার স্থান কোথায়? লোকা-লয়ে কৃত্রিম সঙ্কীর্ণ মনে কৃত্রিম সঙ্কীর্ণ ভাব ব্যতাত অকৃত্রিম বিস্তীর্ণ ভাব লাভ করিবার যোগ্যতা হয় না, সুতরাং, মহান্ মহিমার্ণব ভগবানের বিশ্বরূপ কেমন করিয়া অনুধাবন করা যাইবে? লোকালয়ে সঙ্কীর্ণ প্রয়োজন, সঙ্কীর্ণ মনের দ্বারা তাহা সাধিত হইতে পারে, সে মনে অতি-প্রয়োজন বোধ হইবে কিরূপে? অতিপ্রয়োজন না হইলে ভগবান্ লাভ করিবার উপায় নাই, এই জন্য যাহাতে সেই অবস্থা লাভ হয়, সাধুরা তাহার ব্যবস্থা করিয়া থাকেন। যখন কেহ গিরিশৃঙ্গের উপরে দণ্ডায়মান হইয়া সংসারের দিকে দৃষ্টিপাত করেন, তখন তিনি বুঝিতে পারেন, তাঁহার

নগরের অন্তঃপাতী কোন পল্লির অতি ক্ষুদ্র অংশবিশেষ মাত্র। অতি যত্নে, অতি আয়াসে মনকে অতিশয় সঙ্কুচিত করিলে তবে তাঁহার সংসারের ছবি একবার উপলব্ধি হইবে। গিরিশৃঙ্গে মন বিস্তীর্ণ হয়, সংসারে মন সঙ্কুচিত হইয়া থাকে। সুতরাং, মনরূপ আধার ক্ষুদ্রাকৃতি হইলে তাহাতে ভগবানের মহান্ ভাব স্থান পাইতে পারে না। ক্ষুদ্রাধারের ক্ষুদ্র প্রয়োজন, তাহার অতি-প্রয়োজন হইবার প্রয়োজন হয় না, তাহা হইলেও স্থায়ী হইতে পারে না। যদ্যপি কাহারও মন বিস্তীর্ণ হয়, যদ্যপি কাহার মনে ভগবানের ভাব স্থান পাইবার স্থান পায়, যদ্যপি কাহার তাঁহাকে লাভ করিবার অতি-প্রয়োজন হয়, তবে সেই ভাগ্যবান ভগবান্‌কে লাভ করিয়া পরমানন্দে দিন যাপন করিয়া যাইতে পারেন।

অতি-প্রয়োজনের কার্য্য বা অনুরাগ নানাপ্রকার। যাহার যে প্রকার ভাবে মন সংগঠিত হইয়াছে, তাহার সেই ভাবের পূর্ণ পরিমাণে কার্য্য হইলেই যথেষ্ট হয়। এইরূপ অনুরাগ শিক্ষা দিবার নিমিত্ত শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র বৃন্দাবনে লীলা বিস্তার করিয়াছিলেন। প্রেমের ব্যাপার, প্রেমহীন আমরা, ঈশ্বরের স্বরূপতত্ত্বেই বিশ্বাস নাই, তাঁহাকে প্রেমানুরাগে লাভ করিয়া প্রেমময়ের সহিত প্রেমের খেলায় জীবন সার্থক করা আমাদের স্বপ্নের অতীত কথা। আমরা তাহা বিশ্বাস করি বা নাই করি, কিন্তু যে প্রেমিক প্রেমের সহিত তাঁহাকে আহ্বান করেন, প্রেমময় তাঁহারই হইয়া থাকেন। প্রেমের হরি, প্রেমের ভগবান্, যিনি প্রেম দিতে শিখিয়াছেন, তিনি তাঁহাকে বাঁধিয়া রাখিতে পারেন। প্রেমময় প্রেমেই বাধা দেন। এই গুহ্যতম প্রেমের রহস্য ভেদ করাই ব্রজলীলার অভি-প্রায়। জীবগণ কেমন করিয়া তাঁহাকে প্রেম দিবে, প্রেমদান করিলে কি ফল হয় এবং প্রেমবিহীন হইলে কি প্রকার বিভীষিকা হয়, তাহার

চূড়ান্ত অভিনয় করিয়া গিয়াছেন। সংসারে শান্ত দাস্য ভাবাদি লইয় নরনারীগণ অবস্থিতি করেন। সেই ভাব তাঁহাদের স্বভাবসিদ্ধ। যাঁহার যে ভাব প্রবল, তাঁহার সেই ভাবই উত্তম। তদ্দ্বারা নিজ নিজ অভিলাষ চরিতার্থ হইয়া থাকে। ভগবান্ প্রেমে নন্দের পাদুকা বহন করিয়াছেন, গরু চরাইয়াছেন, যশোমতীর তাড়না সহিয়াছেন, রাখাল বালক দিগের সহিত বালক ভাবের ক্রীড়া করিয়াছেন এবং গোপিকাদিগের মধুর প্রেম-সরোবরে সন্তরণ দিয়া গিয়াছেন। জীব যেমন আপনার প্রেমেরসম্বন্ধ স্থাপন পূর্ব্বক সংসার সংগঠন করিয়া থাকে এবং তাহা অতি অপূর্ব্ব, অতিশয় প্রীতিকর বলিয়া বুঝিয়া থাকে, ভগবানের সহিত প্রেমের সম্বন্ধ হইলে ঐ প্রেমের যে কি অত্যাশ্চর্য্য অভূতপূর্ব্ব মধুরতা জন্মিয়া থাকে, তাহা প্রেমিকেরাই সম্ভোগ করিয়া আপনাপনি বিমুগ্ধ হইয়া থাকেন।

বৃন্দাবনের প্রেমকাহিনী পর্য্যালোচনা করিয়া দেখিলে পঞ্চবিধ প্রেমের মধ্যে মধুর প্রেমেতে মধুরতা অধিক। শ্রীরাধাঠাকুরাণী মধুর প্রেম শিক্ষার আদর্শস্বরূপা। নন্দ, যশোদা, গোপগোপিকা প্রভৃতি নরনারীদিগের প্রেমের সহিত রাধা ঠাকুরাণীর প্রেম তুলনা হয় না কারণ, শ্রীকৃষ্ণ এই প্রেমই সম্ভোগ করিবার জন্য অধিক যত্ন করিতেন।

গোপিকাপ্রধানা বৃকভানুসুতা প্রেমময়ী শ্রীরাধাঠাকুরাণী যে প্রেমে শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রকে অস্থির করিয়া রাখিয়াছিলেন,সেই প্রেমই বাস্তবিক ভগবান লাভের চূড়ান্ত কৌশল এবং উপায়। সংসারের ভিতরে কিরূপে ভগবান্‌কে লাভ করা যায়,এই প্রেমে তাহারই নিদান প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন। গিরিগুহায় বসতি করিয়া পূর্ণ ধ্যানে পূর্ণ ব্রহ্মের প্রকাশ অসম্ভব নহে, নিবিড় বনে বৃক্ষমূলে উপবেশন পূর্ব্বক গলিত ফলফুল ভোজনের দ্বারা একান্তমনা হইয়া নারায়ণের দর্শন লাভ করা সুদুর্ল্লভ নহে, কিন্তু

সংসারে স্বার্থযুক্ত প্রেম বা কামের ক্রীড়ার বস্তু হইয়া কেমন করিয়া প্রেমময়কে লাভ করা যায়, তাহাই কৃষ্ণাবতারে লীলা করিয়া গিয়াছেন। সাধারণ স্ত্রীলোকেরা যে প্রকার সংসার ধর্ম্মানুসারে পরিচালিত হইয়া থাকেন, শ্রীমতিও তদ্রূপভাবে কার্য্য করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। তিনি আয়ানের সহিত উদ্বাহশৃঙ্খলে আবদ্ধ হইয়া কুটিলপ্রাণা ননদিনী প্রভৃতি পতির পরিজনবর্গের সহিত সংসারচক্রে বিঘূর্ণিতা হইয়াছিলেন। তিনি পতিকে পতিভক্তিও করিতেন। আয়ানের সহিত মধুরপ্রেমের সম্বন্ধ স্থাপন হইবার পরেই শ্রীকৃষ্ণের প্রতি শ্রীমতি অনুরাগিনী হইয়া পড়েন। যেমন কুলবালা স্বামী সত্ত্বে অন্য পুরুষের অনুবর্ত্তিনী হইয়া আপন গৃহ-কার্য্য সম্পন্ন করিয়াও নায়ককে বিস্মৃতা হন না, শ্রীমতি তাহাপেক্ষা অধিক কিছুই করেন নাই। এই কথা সর্ব্বদা সন্দেহ হয় যে, হ্লাদিনী-শক্তিরূপা রাধিকার কুলবালাদিগের বিমল পাতিব্রত্য ধর্ম্ম বিকৃত করিয়া স্বৈচারিণী হইবার সুপ্রণালী যত্নসহকারে প্রকটিত করিবার নিমিত্ত মহাবৈকুণ্ঠ পরিত্যাগ পূর্ব্বক নরলীলা করিতে আসিবার এত প্রয়োজন হইয়াছিল? আমরা সংসারে ভ্রষ্টাচারিণীদিগের জ্বালায় জ্বলিয়া মরিতেছি, জগৎজননীর একি অদ্ভুত লীলা? লীলাময় শ্রীহরির লীলায় প্রবেশ করিবার অধিকার আপনি না প্রদান করিলে আর কাহারও দ্বারা তাহা হয় না। প্রভু আমার, দয়াপরবশে এই লীলা রহস্য সম্বন্ধে বলিয়া গিয়াছেন যে, যে নরনারী ভগবান্ লাভ করিয়া প্রেমানন্দ সম্ভোগ করিবে, তাহাকে শ্রীমতির ন্যায় অনুরাগিনী হইতে হইবে। শ্রীমতি আয়ানকে পতি জানিয়াও তাঁহাকে পরিত্যাগ পূর্ব্বক শ্রীকৃষ্ণের সহিত পতিভাবে মধুর প্রেমবিহার করিয়াছিলেন, জীবগণ তাহাই শিক্ষা করিবে। শ্রীমতির পতি ত্যাগ করায় ব্যভিচারিণীর ভাব প্রকাশ পায় নাই। কারণ, জড় পতি ত্যাগ করিয়া অন্য জড় পতির অনুরাগিনী হইলে

ব্যভিচারেরকার্য্য হয়। কারণ, জড় পতির সহিত যে সম্বন্ধ, অপর উপপতির সহিতও সেই সম্বন্ধ, সুতরাং পতির সম্বন্ধে, ব্যভিচারের ভাব প্রকাশ পায়। সাধারণ মনুষ্য শ্রীমতির জড় পতি ছিলেন, কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ মনুষ্য নহেন, তিনি পূর্ণব্রহ্ম হরি। তাঁহার সহিত জড় সম্বন্ধ স্থাপন করা যায় না। তাঁহার সহিত কুক্কুর শৃগালের সম্বন্ধ স্থাপিত হইতে পারে না। যাঁহার বদনবিনিঃসৃত মুরলীর ধ্বনিতেই রমণীরা কুলশীল গুরুগঞ্জনা বিস্মৃতা হইয়া সেই শব্দের পশ্চাদ্ধাবিতা হইতেন, তাঁহারা সেই মদনমোহন ত্রিভুবনচিত্তবিনোদন রসিকশেখর রূপ দর্শন করিয়া আত্মহারা কাষ্ঠপুত্তলিকাবৎ দণ্ডায়মান থাকিতেন; তাঁহার নয়নের দিকে চাহিবামাত্র চুম্বকাকৃষ্ট লৌহের ন্যায় প্রাণ তাহাতে স্থির হইয়া যাইত। তাঁহার সহিত কে জড় সম্বন্ধ স্থাপন করিবে? তাই রাম-কৃষ্ণদেব বলিতেন যে, গোপিকাপ্রধানা শ্রীমতির অনুরাগ কৃষ্ণ প্রাপ্তির একমাত্র উপায়; যেহেতু তিনিই বিধিমতে কৃষ্ণের সহিত সহবাসসুখ লাভ করিয়াছিলেন। ভগবান্‌কে লাভ করিবার নানাবিধ উপায় আছে, কিন্তু প্রেমবিহারের পূর্ণতা শ্রীমতির অনুরাগেই দেখা যায়।

শ্রীমতি কৃষ্ণকে লাভ করিবার নিমিত্ত কি করিতেন? তাঁহার প্রাণ শ্রীকৃষ্ণেই থাকিত, তিনি প্রাণহীন হইয়া ছায়া-দেহ লইয়া থাকিতেন। তিনি থাকিয়া থাকিয়া চৈতন্যহীনা হইয়া ভূমিতে পড়িয়া যাইতেন; তিনি প্রতি পলকে প্রলয় জ্ঞান করিতেন। মীনের জীবন, জীবন ব্যতীত যেমন দীর্ঘকাল জীবিত থাকিতে পারে না, যদ্যপি তাহাকে জীবিত রাখিতে হয়, তাহা হইলে মধ্যে মধ্যে জলের ছিটা দেওয়া আবশ্যক, কৃষ্ণপ্রেম-সরোবরস্থিত মীনরূপা শ্রীমতির কর্ণবিবরে কৃষ্ণনামরূপ জীবনধারা ঢালিয়া না দিলে তিনি মৃতবৎ অবস্থায় থাকিয়া যাইতেন। শ্রীমতির এইরূপ ভাবান্তর হইলে জটিলা কুটিলা প্রভৃতি কৃষ্ণবিদ্বেষিণীরা

কত কথাই বলিয়া তিরস্কার করিত। শ্রীমতির লাঞ্ছনার অবধি ছিল না! তিনি যে কোন অবস্থায় থাকিতেন, যে কোন কার্য্য করিতেন, যে কোন স্থানে যাইতেন, প্রতি পদে পদে নিগ্রহ পাইতেন। অনুরাগিনী, জীবকে কৃষ্ণানুরাগ শিক্ষা দিবার জন্য কত ক্লেশ পাইয়াছেন, তাহার অবধি করিতে কাহার শক্তিতে সঙ্কুলান হইবে? ঈশ্বরানুরাগ জন্মিলে লোকালয়ে সহসা তাহার আদর হয় না, লোকালয়ে ঈশ্বরানুরাগীকে বাতুল বলে, কলঙ্কিনী বলে, ভ্রষ্টাচারিণী বলে। ঈশ্বরানুরাগীর প্রত্যেক কার্য্যে জটিলাকুটিলাস্বভাবস্বরূপ লোকেরা দোষারোপ করিয়া বেড়ায়। ইহাই তাহাদের কার্য্য। শ্রীমতি শ্রীকৃষ্ণের অনুগামিনী হইয়াছিলেন বলিয়া তাঁহার কি পরিমাণে ক্লেশ হইত এবং সেই ক্লেশের জন্য তাঁহার প্রাণের কি প্রকার অবস্থা হইত, প্রভু আমার একটী গীতের দ্বারা তাহা প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন।

শ্রীমতি একদিন যমুনাতে জল আনয়ন করিতে যাইয়া সঙ্গিনীদিগকে সম্বোধন করিয়া কহিয়াছিলেন,—

সখি! ঘরে যাবইনা গো। (আর),
যে ঘরে কৃষ্ণ নামটী করা দা'ব।
যেতে হয়তো তোরাই যা, গিয়ে বলবি—
যার রাধা তার সঙ্গে গেল
(যমুনায় রাই ডুবে ম'ল, হা কৃষ্ণ হা কৃষ্ণ ব'লে গো)।
আমি যদি পরি নীল বসন, বলে ঐ শ্যামের উদ্দীপন।
যদি চাই মেঘ পানে, বলে কৃষ্ণকে পড়েছে মনে।
যদি কা'র বাড়ী যাই, বলে এল কলঙ্কিনী রাই।
যখন থাকি রন্ধনশালে, কৃষ্ণরূপ মনে হ'লে,
আমি কাঁদি সখি ধূঁয়ার ছলে।

অনুরাগ ইহাকেই বলে। এ অনুরাগ কোথায়? আমরা কি ভগবানের জন্য এক মুহূর্ত্তকাল শ্রীমতির ন্যায় অবস্থানুভব করিয়া থাকি? এক মুহূর্ত্তকাল কি জীবনের জীবন বলিয়া তাঁহাকে মনে করি? এক মুহূর্ত্তকাল কি ভগবানের বিরহে চক্ষের জল ফেলিয়া থাকি? এক মুহূর্ত্তকালের নিমিত্ত কি তাঁহাকে প্রাণেশ্বর বলিয়া মনে করি? এক মুহূর্ত্তকালের জন্যও কি তাঁহাকে আমার সর্ব্বস্বধন বলিয়া জ্ঞান হয়? কেমন করিয়া তবে ভগবান্‌কে লাভ করিব? কেমন করিয়া তাঁহার নবনটবর বেশ দর্শন করিব? কেমন করিয়া তাঁহার মুরলীরঞ্জিত বদনকান্তি দর্শন করিব? কেমন করিয়া তাঁহার ললিত রূপমাধুরি দর্শন করিব? কেমন করিয়া মদনমোহনকে লাভ করিব? কোথায় রাই রসময়ী! কোথায় শ্যামসুন্দরী! কোথায় প্রেমময়ী! কোথায় রাসরসেশ্বরী! কোথায় চৈতন্যানুরাগদায়িনী বৃন্দাবনেশ্বরী! কোথায় মহাভাব প্রসবিনী শ্রীরাধে! একবার দয়া কর। এই দীনহীন প্রেম-হীন অনুরাগবিহীনের প্রতি একবার কৃপাবলোকন কর। তোমার মহিমা তুমি না বলিলে কে তাহা বুঝিবে, কে তাহা বুঝাইবে? প্রভু! যেমন করিয়া ব্রজেশ্বরী ভাবে ভাবরূপ দেখাইয়াছিলেন, অদ্য সেইরূপে একবার উদয় হউন, একবার সেই ভুবনমোহিনী রূপ প্রত্যেকের হৃদয়ে উদ্ভাসিত হউক, প্রেমময়ীর প্রেমপূর্ণ ছবি দেখিয়া প্রেমশিক্ষা করিবার উপায় হউক। সকলেই কামে জর্জ্জরীভূত, কামমূর্ত্তি ব্যতীত আর কিছু দেখিতে পায় না, কামবৃত্তি তৃপ্তি ব্যতীত অন্য কার্য্য জানে না, প্রেম শিক্ষা করিবে কোথায়? হৃদয়ে প্রেমের সঞ্চার না হইলে অনুরাগ জন্মিবে কিরূপে? প্রভু! যদ্যপি জীবের প্রতি এতই দয়া হইয়া থাকে, যদ্যপি জীবের কল্যাণের জন্যই আকিঞ্চন হইয়া থাকে, তবে আজ, হে দীনবন্ধো রামকৃষ্ণ! প্রত্যেকের অন্তরে প্রেমময়ীর ছবি দেখাইয়া

দিন। প্রেমময়ীর কৃপায় প্রেমময় লাভ হইবে। আপনার শ্রীমুখে শুনিয়াছি যে, প্রেমের হরি কিরূপে জীবের সহিত প্রেমলীলা করিয়া থাকেন, তাহা বৃন্দাবনে আপনি প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন। রাধা জৈবভাবে কৃষ্ণানুরাগিনী হইয়াছিলেন, আপনি গোলকবিহারী শ্রীহরি রাধা ! রাধা ! বলিয়া রাধার জন্য বিপিনে, কাননে, প্রাসাদে, প্রাঙ্গনে, মাঠে, ঘাটে, গোঠে উন্মাদের ন্যায় ভ্রমণ করিয়াছেন। জীব শিক্ষা পাইল, যে ভগবানের অনুরাগী অনুরাগিনী হন, স্বয়ং ভগবান্‌ই তাঁহাদের পশ্চাৎ পশ্চাৎ ঘুরিয়া বেড়ান। শ্রীমতির সহিত কেমন করিয়া মিলিত হইবেন, সে ভাবনা শ্রীকৃষ্ণের ছিল। তাই তিনি সুবলকে শ্রীমতি সাজাইয়া শ্রীমতিকে সুবলবেশে অন্তঃপুর হইতে পরিজনের চক্ষের উপর দিয়া বাহির করিয়াছিলেন। কৃষ্ণের নিকট যাইবার জন্য শ্রীমতিকে ব্যবস্থা করিতে হইত না। যখন তিনি শ্রীকৃষ্ণকে স্মরণ করিয়া ধূঁয়ার ছলে কাঁদিতেন, সেই ক্রন্দনধ্বনি শ্রীকৃষ্ণের হৃদয়ে যাইয়া বাজিত। তিনি তৎক্ষণাৎ অধৈর্য্য হইয়া রাধার সহিত সম্মিলিত হইতেন। এই নিমিত্ত রামকৃষ্ণদেব বলিতেন যে, প্রেমের সহিত একবার কাঁদ, ভগবানের নামে একবিন্দু চক্ষের জল নিপতিত কর, প্রেমময় তৎক্ষণাৎ দর্শন দিবেন। শ্রীকৃষ্ণ বার বার বলিয়াছেন যে, রাধার প্রেমের দায়ে বাশরীতে রাধা বলিয়া গান করিয়া বেড়াই। আমি প্রেমের দাস। যে প্রেমে আমায় ডাকে, আমি তাহার হইয়া যাই। প্রেমে কেহ আমার পিতা, কেহ আমার মাতা, প্রেমে কেহ আমার সখী, কেহ আমার সখা, প্রেমে বলির দ্বারে দ্বারবান হইয়াছি। প্রেমময় জীবে রাধাপ্রেম প্রদান করিবার জন্য প্রেমঘন গৌরবরণ রূপ ধারণ পূর্ব্বক দেশে দেশে দ্বারে দ্বারে ঘরে ঘরে দীন-হীনের ন্যায় পরিভ্রমণ করিয়া গিয়াছেন। তিনি কেঁদে কেঁদে বলিয়া-

ছেন, জীবগণ! আয় কৃষ্ণপ্রেম নিয়ে যা। দেবতাদুর্ল্লভ মধুর প্রেম জীবের কল্যাণের জন্য আনিয়াছি। এই প্রেমে শিব শ্মশানে পরমানন্দে বিভোর থাকেন, নারদ প্রেমোন্মত্ততায় অহর্নিশি গুণ গান করিয়া বেড়ায়। আয়, তোরা সংসারে বসিয়া প্রেমময়ের প্রেমরূপ দর্শন পূর্ব্বক জীবন সার্থক করিয়া লইয়া যা! শ্রীগৌরাঙ্গদেব ভাবাবেশে শ্রীকৃষ্ণের প্রেমরহস্য ভেদ করিয়া গিয়াছেন। তিনি প্রেমের ভিখারী, অন্য কোন বস্তুর দ্বারা তাঁহাকে লাভ করা যায় না। কঠোর তপস্যাবলে তাঁহাকে লাভ করা যায় বটে, কিন্তু সে লাভ ক্ষণিক মাত্র, চপলা চকিতের ন্যায় দর্শন দিয়া অদৃশ্য হইয়া যান। শাস্ত্রে তাহার ভূরি ভূরি দৃষ্টান্ত আছে। ভগবান্ প্রত্যক্ষ হইয়া বরদান পূর্ব্বক অন্তর্দ্ধান হইয়া যান। কিন্তু প্রেমের সম্বন্ধ হইলে আর তিনি পলাইতে পারেন না। পলাইবেন কোথায়? তিনি যে অস্থির লইয়া প্রেমিকের নিকট আসিয়া উপস্থিত হন।

রামকৃষ্ণদেব বলিতেন যে, শ্রীমতির অনুরাগের অনুকরণ করিতে পারিলে তবে ভগবানের দর্শনসুখ চরিতার্থ হইতে পারে। রাধাভাব যে কেবল স্ত্রীলোকদিগের পক্ষে বিধি, তাহা নহে, নরনারী উভয়েরই অবলম্বনীয়। আয়ানকে ক্লীব করিয়া এই ভাব প্রকাশ করিয়াছেন। যে সংসারে কৃষ্ণের সম্বন্ধ স্থাপিত হয়, সেই সংসারে নর ক্লীব হইবে অর্থাৎ তাহার জড়পুরুষত্ব ভাব একেবারে যাইবে। তাহার পুরুষভাব বিদূরিত হইলে স্ত্রীর সহিত জড় সম্বন্ধ আর থাকিবে না। তখন উভয়ে শ্রীকৃষ্ণের দাসী হইয়া প্রেমে সংসার করিতে থাকিবে। প্রেমে ঈশ্বর লাভের এই পরিণাম। কামের লেশমাত্র থাকিতে প্রেমের সঞ্চার হইতে পারে না, যখন কাম সমূলে মূলোৎপাটিত হয়, তখন প্রেম ব্যতীত আর কিছুই থাকিতে পারে না। প্রেম উপস্থিত হইলে

প্রেমময় আসিয়া আবির্ভূত হন। প্রেমের অন্যান্য ভাবে ভগবানের সম্বন্ধ আছে। কিন্তু মধুরভাব সর্ব্বাপেক্ষা উচ্চ বলিয়া কথিত আছে। নরনারীদিগের পক্ষে রামকৃষ্ণদেব বলিয়াছেন যে, সাধকের অবস্থা-বিশেষে ভাবের ব্যবস্থা হওয়া কর্ত্তব্য। বালক বালিকার পক্ষে শান্ত অর্থাৎ মাতা পিতা, কিম্বা সখ্য অর্থাৎ ভ্রাতা বা ভগ্নীর প্রেমই প্রশস্ত। যুবক যুবতীর পক্ষে মধুর প্রেম। যুবকেরা এই অবস্থায় প্রায় মধুর প্রেম বিকৃত করিয়া বসেন। অনেক সম্প্রদায় আছে, যথায় মধুর প্রক্রিয়ার আয়ান ঘোষ না হইয়া শ্রীকৃষ্ণ হইয়া যান। রামকৃষ্ণদেব যদিও এই সকল সম্প্রদায়ের চরম অবস্থা দেখাইয়া নিন্দা করেন নাই, কিন্তু তিনি সাধারণকে এই ভাব অবলম্বন করিতে নিষেধ করিয়াছেন। যে যুবক আয়ান হইতে না পারেন, তাঁহার পক্ষে মাতৃভাব বিধেয়। প্রৌঢ় প্রৌঢ়ার পক্ষে বাৎসল্য ভাবই শ্রেষ্ঠ; বৃদ্ধ বৃদ্ধার আর ভাব শিক্ষার সময় নাই।

ঈশ্বর লাভের দ্বিতীয় অনুরাগকে সত্ত্বমুখ চৈতন্য কহিয়াছেন। সত্ত্বমুখ চৈতন্যের ভাব এই যে, আপনাকে দীনহীন জ্ঞানপূর্ব্বক ঈশ্বরের কৃপায় আত্মসমর্পণ করিয়া নিশ্চিন্ত হইতে পারিলে সময়ে ভগবান্ লাভ হইয়া থাকে। সত্ত্বমুখ ভাবাপন্ন ব্যক্তিরা অতিশয় সাবধানে থাকিতে চেষ্টা করেন। তাঁহারা লোকালয়ে থাকিলে ঈশ্বরানুরাগী বলিয়া পরিচিত হইতে চাহেন না। যাহাতে কেহ কোনরূপে তাঁহার ভাব জানিতে না পারেন, এমন সতর্কতার সহিত আত্মভাব গোপন করিয়া রাখেন। বাহিরে সকল কার্য্যই করেন, কিন্তু মন প্রাণ বিভুচরণে উৎসর্গ করিয়া রাখেন। তাঁহারা লোক দেখাইয়া সাধন ভজন করেন না।

কোন গ্রামে দুই ব্রাহ্মণসহোদর বাস করিতেন। জ্যেষ্ঠ চলিত শাস্ত্রাদিতে পণ্ডিত ছিলেন এবং তজ্জন্য সমাজে তাঁহার বিশেষ সম্মান ছিল।

তিনি প্রাতঃকালে নানাস্থান হইতে নানাবিধ পুষ্প চয়ন করিয়া আনিতেন এবং যথাসময়ে পূজার যাবতীয় উপকরণ আয়োজনপূর্ব্বক গৃহের দ্বার রুদ্ধ করিয়া পূজায় উপবেশন করিতেন। এই ব্যক্তি নায়িকাসিদ্ধ ছিলেন। তিনি প্রত্যহ দেব-দাসীকে প্রত্যক্ষ করিয়া পূজা করিতেন। এই কথা ক্রমে প্রচার হইয়া গেল। সকলেই ব্রাহ্মণের অসাধারণ পূজার ভূরি ভূরি প্রশংসা করিতে লাগিল। সাধারণের তাহা দোষ বলা যায় না। কারণ, আমরা কোন ব্যক্তিকে এক ঘণ্টা পূজা করিতে দেখিলে তাঁহার সুখ্যাতি করিতে অজ্ঞান হইয়া পড়ি। যে ব্যক্তি ত্রিসন্ধ্যা বা মালা জপ করেন, তিনিও ঋষিতপস্বীবিশেষ বলিয়া সাধারণর চক্ষে প্রতীয়মান হইয়া থাকেন। এ ব্যক্তি তাহাপেক্ষা উচ্চাবস্থায় আরোহণ করিয়া ছিলেন, সুতরাং তাঁহার গুণগ্রামে গ্রাম পরিব্যাপ্ত হইয়াছিল। কনিষ্ঠ ভ্রাতা লেখা পড়া শিক্ষা করেন নাই, সুতরাং, বিদায়ের নিমন্ত্রণ হইত না এবং ব্রাহ্মণের ঘরে মূর্খ হইলে অন্ততঃ দশকর্ম্মান্বিত হওয়াও কর্ত্তব্য, দুর্ভাগ্যবশতঃ তিনি তাহাতেও অশক্ত ছিলেন। গৃহের কার্য্যাদির ভার দিলে তাহার সমূহ বিশৃঙ্খলা ঘটাইয়া দিতেন। বাজার করিতে পাঠাইলে টাকা পয়সা বিলাইয়া দিয়া আসিতেন। ঘরের কোন দ্রব্যাদি তাঁহার চক্ষে পড়িলে, তিনি তৎক্ষণাৎ তাহা আর একজনকে না দিয়া নিশ্চিন্ত থাকিতে পারিতেন না। ভোজন করিতে দিলে, তিনি অপেক্ষা করিয়া অতিথি না আসিলে তবে আপনি ভোজন করিতেন। আচার বিচারের কোন সংস্রব রাখিতেন না। কখন স্নানাদি করিতেন, কখন বস্ত্র ত্যাগ করিতেন, কখন মুখ প্রক্ষালন করিতেন এবং কখন তাহা করিতেন না। কখন প্রাতঃকালেই বালকদিগের সহিত জলপান ভক্ষণ করিতেন এবং কখন তিন দিনের পরেও কেহ কিছুই খাওয়াইতে পারিত না। তাঁহাকে কেহ নিমন্ত্রণ করিলে কখন একত্রে বসাইয়া

এক দিনও ভোজন করাইতে পারেন নাই। এই প্রকার কদাকার ভাব দেখিয়া একদিন পাড়ার ভদ্রলোকেরা তাঁহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাকে কহিলেন, তর্কবাগিশ মহাশয়! আপনি এমন সর্ব্বগুণালঙ্কৃত সিদ্ধপুরুষ, আপনাকে যে দিন দর্শন করা যায়, সেই দিন আমরা শুভদিন বলিয়া মনে করি। কিন্তু আপনার কনিষ্ঠ ভ্রাতাকে দেখিলে আপনার সহোদর বলিয়া কখন বুঝা যায় না। বলিতে কি, যেন সাক্ষাৎ বায়ুরোগগ্রস্থ ব্যক্তি বলিয়া জ্ঞান হইয়া থাকে। আপনি উহার জন্য না করিয়াছেন কি? আপনার পুত্র অপেক্ষা অধিক যত্ন করেন, কিন্তু সকলই অদৃষ্টের ফলে পরিচালিত হয়, আপনি করিবেন কি? তথাপি বলিতে হয় তাই বলিতেছি, আপনি একেবারে উহার প্রতি উদাসীন হইবেন না। যে প্রকার ভাবগতিক দেখা যাইতেছে, তাহাতে ছোট ভট্টাচার্য্যের আর অধিক বিলম্ব নাই। কোন্ দিন চন্দন বিষ্ঠা একাকার করিবেন। প্রতিবেশীদিগের এইরূপ শ্লেষবাক্যবাণে জর্জ্জরীভূত হইয়া মহা অভিমানী সিদ্ধ ব্রাহ্মণ গৃহে প্রত্যাগমন পূর্ব্বক কনিষ্ঠ ভ্রাতাকে ডাকিয়া কহিলেন যে, দেখ্! তোর জ্বালায় লোকালয়ে আর আমার মুখ দেখান ভার হইরা উঠিল। যেখানে যাই, যাহার সহিত সাক্ষাৎ হয়, সেই আমার প্রশংসা করিয়া তোর নিন্দা করে। তোর এই নিন্দনীয় স্বভাব সংস্কার করিবার জন্য আমি কতবার তিরস্কার করিয়াছি, কত বার প্রহার করিয়াছি, কিন্তু কি করিব, তুই তাহা প্রতিপালন করিতে চেষ্টা করিলি না। তুই কি জানিস্ না যে, পিতা স্বর্গারোহণকালে বিষয় সম্পত্তি কিছুই রাখিয়া যান নাই। আমি নিজে উপার্জ্জন করিয়া সমুদয় করিয়াছি। সহোদর বলিয়া তোকে অদ্যাপি তাহাতে বঞ্চিত করি নাই। আমি সংসারের ব্যয়ের নিমিত্ত অর্থোপার্জ্জন করিব, সাংসারিক সমুদয় কার্য্য আমিই করিব, লোকলৌকিকতা আমিই দেখিব এবং তোর

জন্য আমায় দশজনের নিকটে গঞ্জনা শুনিতে হইবে। বিবাহ দিতে চাহিলাম, সকল আয়োজন করিলাম, কিছুতেই কথা রহিল না। বিবাহ করিলেও বুঝিতাম যে, তুই না পারিস্, তোর পরিবর্ত্তে একজন ব্রাহ্মণী সহায়তা করিতেছে। তোর কোন জ্ঞান হইল না, কি বলিব? ব্রাহ্মণী, আহা! অতি সজ্জনের কন্যা, তাই সংসারের কার্য্য আপনি আনন্দমনে সম্পন্ন করিয়া তোকে দুইবেলা অন্ন দান করিতেছেন। তোর স্ত্রী থাকিলে অন্ততঃ পরিচারিকার ব্যয় বাঁচিয়া যাইত। তুই নিজে কোন প্রকার সহায়তা করিবি না, বরং আমার অনিষ্ট করিবার সুযোগ পাইলে তাহা যত্নপূর্ব্বক সমাধা করিয়া থাকিস্। যাহা সহ্য করিবার নয়, ভাই বলিয়া, তাহাও এতদিন সহিয়া আসিলাম। এক্ষণে একটী কথা বলি শোন্। হয় কল্য প্রাতঃকালে উঠিয়া স্নানাদিপূর্ব্বক ব্রাহ্মণের অবশ্যকর্ত্তব্য সন্ধ্যা গায়ত্রী জপ করিয়া সাংসারিক কার্য্যাদি দেখিতে হইবে, না হয় আমার সহিত তোর এই শেষ সম্বন্ধ। আমি যদ্যপি ব্রাহ্মণ হই, তাহা হইলে এ কথা কখনও খণ্ডন হইবে না। এই কথা বলিয়া ব্রাহ্মণ কার্য্যান্তরে চলিয়া যাইলে কনিষ্ঠ বাটীর ভিতরে গমন করিয়া জ্যেষ্ঠের পত্নিকে সম্মুখে দেখিতে পাইয়া কহিলেন, দাদা আজ আমায় অতিশয় তিরস্কার করিয়াছেন, সংসারের সমুদয় কার্য্য করিতে বলিয়াছেন। আমি কল্যাবধি সমুদয় কার্য্য করিব। বসু ঠাকুরাণী দেবরের কথা শুনিয়া সহাস্যে কহিলেন, বটে? আমার কপাল ফিরিয়াছে। তুমি অন্য কিছু কর আর নাই কর, খাইতে দিলে ভাল করিয়া পেট ভরিয়া খাইও, তাহা হইলে আমি অতিশয় আহ্লাদিত হইব। অতঃপর কনিষ্ঠ ভট্টাচার্য্য অতি বৃহৎ বৃহৎ তুলসী গাছ আনিয়া তাহা খণ্ড খণ্ড করিয়া একছড়া বিস্তীর্ণ মালা প্রস্তুত করিয়া রাখিলেন। পরদিন সূর্য্যোদয় হইবার পূর্ব্বে তিনি পুষ্করিণীতে স্নান করিয়া তথাকার

মৃত্তিকার দ্বারা নাসার উপরে তিলক এবং সর্ব্বাঙ্গে নামাঙ্কিত করিবার ভাবে ভক্ত সাজ সাজিয়া বাটী ফিরিয়া আসিলেন এবং জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা দ্বার রুদ্ধ করিয়া পূজায় উপবেশন করিলে পর স্বকৃত তুলসীর মালা লইয়া গৃহের দ্বারে জপ করিতে বসিলেন। জপ করিবার সময় চক্ষু মুদিত করিয়া বলিতে লাগিলেন, আজ দাদা আমায় জপ করিতে বলিয়াছেন। ভক্ত সেজে না জপ করিলে তিনি অতিশয় রাগ করেন, তিলক ছাপ না থাকিলে লোকে নিন্দা করে, আমি তাই দাদার আজ্ঞায় এই মালা প্রস্তুত করিয়াছি, মালা জপিতে বসিয়াছি, দাদাও পূজা করিতেছেন। লোকে দেখিয়া যাক্ যে, আমরা পূজা জপ করিয়া থাকি। এইরূপে তিনি নানাপ্রকার প্রলাপের ন্যায় বলিতে লাগিলেন। তিনি একবার নয়ন মুদিয়া রাখেন, আবার তৎক্ষণাৎ চক্ষু মেলিয়া দ্বারের দিকে চাহিয়া দেখেন। ওদিকে জ্যেষ্ঠ পূজা করিতে বসিয়া উপর্য্যুপরি তাঁহার ইষ্টদেবীর ধ্যান করিলেন, কিন্তু কোন মতে তিনি প্রত্যক্ষ হইলেন না। ব্রাহ্মণ বার বার আসনশুদ্ধি করিলেন, বার বার পুষ্পাদি ও উপকরণাদিতে কোন প্রকার অপবিত্রতা ঘটিয়াছে কিনা ভাবিয়া যৎপরোনাস্তি অনুসন্ধান করিলেন, কিন্তু কোন কারণ নির্দ্দেশ করিতে পারিলেন না। অতঃপর অতি বিষাদিত হইয়া ভাবিতে ভাবিতে কনিষ্ঠের প্রলাপকাহিনী তাঁহার শ্রুতিগোচর হইল। তিনি ক্রোধে দ্বারোদ্ঘাটন পূর্ব্বক কনিষ্ঠের পৃষ্ঠে পদাঘাত করিয়া কহিলেন, পাপিষ্ঠ! দূর হও। তোর সংসর্গ এতই ঘৃণিত হইয়াছে, তাহা বুঝিয়াও যেমন বুঝি নাই, তেমনি তাহার উপযুক্ত শিক্ষা পাইলাম। ব্রাহ্মণকুলগ্লানি! তোর মুখাবলোকন করিলে অথবা তোর গাত্রস্পর্শিত বায়ু গাত্রে লাগিলে অপবিত্র হইয়া যাইতে হয়। কনিষ্ঠ কি করিবেন, সহাস্যবদনে অপর স্থানে বসিয়া পুনরায় মালা জপ করিতে আরম্ভ করিলেন। জ্যেষ্ঠ

নিরস্ত হইয়া পুনরায় দ্বার রুদ্ধ করিয়া পূজায় নিযুক্ত হইলেন। এবারে ধ্যানাবলম্বন করিবামাত্র অমনি নায়িকা আসিয়া দর্শন দিলেন। ব্রাহ্মণ অতি দীনভাবে কহিতে লাগিলেন, মা! আজ এত নির্দ্দয়া হইয়াছিলে কেন মা? দেবী কহিলেন, বৎস! কি করিব আমার অপরাধ কি? আমার ধ্যান করিবামাত্র আমি আসিয়াছিলাম, কিন্তু কি করিব তোমার কনিষ্ঠ ভ্রাতার জন্য আসিতে পারি নাই। ব্রাহ্মণ অতিশয় বিরক্ত হইয়া বলিলেন, মা আমি অগ্রে তাহা জানিতে পারি নাই, সে জন্য তোমার ক্লেশ হইয়াছে। মা! তুমি আমার মা, ও বর্ব্বর আমার সহোদর, তোমার পায়ে ধরি, উহার প্রতি কিঞ্চিৎ কৃপা কর মা। মাগো! উহার জন্য আমি অতি-ক্লেশে দিনযাপন করিতেছি। ব্রাহ্মণকুলে এমন পাষণ্ড শূদ্রাধম চণ্ডাল অপেক্ষা নীচ প্রকৃতি কিরূপে হইল? এই কথা পরিসমাপ্তি হইবার পূর্ব্ব হইতে দেবীর রোষান্বিতার ভাব দর্শন করিয়া ব্রাহ্মণ কহিলেন, মা ক্ষমা কর, আর ঐ পিশাচের কথা মুখে আনিব না। দেবীকে গমনোদ্যতা দেখিয়া ব্রাহ্মণ কহিলেন, মা! অপরাধ করিয়াছি, ক্ষমা কর। অবোধ শিশুর কথায় কি জননী কখন বিরক্ত হন? মা! পুনরায় বলিতেছি, তোমার নিকটে প্রতিশ্রুত হইতেছি, আর এমন কর্ম্ম কখন করিব না। অদ্যই উহার সহিত জন্মের মত বিচ্ছিন্ন হইব। দেবী কহিতে লাগিলেন, নির্ব্বোধ ব্রাহ্মণ! নিরস্ত হও। তোমার কথা শুনিয়া একবার হাসি পায়, একবার ইচ্ছা হয় যে, শরীর হইতে মুণ্ড পৃথক্ করিয়া ফেলি। আমি ভগবতীর পরিচারিকা, তোমার নিকটে আমি কেন আসি, তাহা তুমি অদ্যাপি কি জানিয়াছ? ভগবতী প্রত্যহ তোমার বাটীতে আগমন করেন, সুতরাং আমরা অষ্টনায়িকা সকলেই আসিতে বাধ্য হই। সৌভাগ্যক্রমে তুমি নায়িকাসিদ্ধির জন্য

কার্য্য করিতেছিলে, তাই সহজে আমায় লাভ করিয়াছ। ব্রাহ্মণ আশ্চর্য্য হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, ভগবতী কিজন্য এ অধমের বাটীতে নিত্যনিত্য আগমন করেন? একথা এতদিন তোমার মুখে শুনি নাই কেন? নায়িকা কহিলেন, তোমার ভ্রাতা ভগবতীর প্রিয় ভক্ত। অমন বিমল শুদ্ধসত্ব ভাবের ভক্ত দ্বিতীয় আর নাই। ব্রাহ্মণ অত্যাশ্চর্য্য হইয়া কহিলেন, বটে? শুদ্ধ ভক্ত কিরূপে মা? অমন কদাচারী—দেবী কহিলেন, তুমি যদ্যপি পুনরায় গ্লানিসূচক কথা বল, তাহা হইলে আমি তোমায় অভিশাপ দিয়া এখনি চলিয়া যাইব। শুদ্ধসত্ব ভাব কাহাকে কহে, বিপ্রবর! অগ্রে বুঝিয়া লও। শুদ্ধসত্বে বাহ্যিক আড়ম্বর নাই। যাহাতে অন্তরের ভাব কোনরূপে কেহ না বুঝিতে পারে, ইহাই বিশেষ লক্ষণ জানিবে। তোমার ভ্রাতাকে দেখিলে ভক্ত বলিয়া কি কেহ মনে করিতে পারে? ব্রাহ্মণ বলিয়া উঠিলেন, কখন না, কখন না। দেবী কহিতে লাগিলেন, তোমার ভ্রাতার কথা শ্রবণ কর। ঐ ভক্তকেশরী সাধকচূড়ামনি প্রত্যহ রজনীতে সকলে নিদ্রিত হইলে, এই পল্লির প্রান্তভাগে যে শিবকালীর মূর্ত্তি আছে, তথায় গমনপূর্ব্বক তাঁহাকে প্রত্যক্ষ করিয়া পূজা করিয়া থাকেন। তোমার ভ্রাতাকে ভোজন করাইবার নিমিত্ত স্বয়ং ভগবতীই ভার লইয়াছেন। বিপ্র! তোমার ভ্রাতার বৃত্তান্ত শ্রবণ করিলে? বাহ্যিক লক্ষণের দ্বারা উনি ভক্ত বলিয়া পরিচিত নহেন। কারণ, লোকের নিকট পরিচিত হইলে ভগবানের নিকটবর্ত্তী হওয়া যায় না। বাহিরেই তাহার তৃপ্তিসাধন হইয়া যায়। তোমরা দুই ভাই তাহার দৃষ্টান্ত। তুমি লোকমান্য হইয়াছ, লোকে তোমায় শ্রদ্ধা ভক্তি করিতেছে। তাহাতেই তোমার আনন্দ উথলিয়া উঠে। আমাকে পাইয়া তোমার কিঞ্চিৎ সিদ্ধাই জন্মিয়াছে। লোকের

ঐহিক বিপদ আপদ উপশম করিয়া দিতে পার। আমাদের ইহার অতীত শক্তি নাই। ভগবতীর দাসদাসীর শক্তি কতদুর, তাহা বুঝিয়া দেখ। তুমি আরও বুঝিয়া লও। তুমি লোকের ভাল মন্দ করিয়া যাইতেছ, তোমার পূজার উদ্দেশ্যই সেই প্রকার দাঁড়াইয়াছে। আমার পূজা করিয়া থাক, ভগবতীর সহিত অদ্যাপি দেখা সাক্ষাৎ নাই। তোমার সাধনভজন লোকের শুভাশুভ কার্য্যেই পর্য্যবসিত হইয়াছে। তুমি কাহাকে গ্রহ বিগ্রহ হইতে মুক্ত করিতেছ, কাহাকে ধনৈশ্বর্য্যের অধিকারী করিতেছ, কাহাকে মারিয়া ফেলিবার কৌশল করিতেছ, কাহাকে উচাটন মন্ত্রের দ্বারা উন্মত্ত করিয়া দিতেছ। বিপ্র! তোমার কি হইতেছে? তুমি কি করিতেছ, হিসাব করিয়া দেখ দেখি! পরকালে তোমার কি গতি হইবে? লোকের ঐহিক শুভাশুভের তুমি কারণস্বরূপ হইতেছ বলিয়া তোমাকে তাহার পাপ ভোগ করিতে হইবে। স্মরণ রাখিও, পরিত্রাণের ভার আমাদের নাই। ভগবতীর পরিচারিকা বলিয়া ঐহিক সুখ সম্পত্তি দিবার আমাদের শক্তি আছে। তোমার কনিষ্ঠের বিষয় একবার ভাবিয়া দেখ। তিনি লোকসমাজে পূজিত বা সম্মানিত হইতে চাহেন না, যাহাতে লোকে তাঁহাকে মনুষ্য বলিয়া চিনিতে না পারে, এমন সাবধানে বাস করেন। অধিক বলিব কি? তোমার আদেশমতে উনি যদিও মালা জপ করিতেছেন, কিন্তু ইহাতেও আত্মভাব গোপন করিয়া রাখিয়াছেন। শুদ্ধসত্ত্ব ভাবের সাধকেরা অন্তরে আদ্যাশক্তি কালীরূপ চিন্তা করেন, ললাটে চিতা-ভস্মের রেখার দ্বারা শৈব ভাবের পরিচয় দিয়া মুখে হরিনাম উচ্চারণ করিয়া থাকেন। তোমার ভ্রাতার দিকে চাহিয়া দেখ, অবিকল সেই ভাব প্রকাশ পাইতেছে কি না? দেখ তুলসী মালা জপ করিতেছেন, ললাটে ত্রিপুণ্ড্র রেখা, উহা বৈষ্ণবের লক্ষণ নহে, কিন্তু হৃদয়ে আনন্দময়ী

বিরাজ করিয়া থাকেন। আপাততঃ আনন্দময়ীর ক্রোড়ে শয়ন করিয়া স্তন্যসুধা পান করিতেছেন। জগন্মাতা তোমার সহোদরের জন্য সদাই চিন্তিত। বলিতে কি, কোন কোন দিন একেবারেই কৈলাসে প্রত্যাগমন করেন না। শিব আসিয়া কত বলিয়া কহিয়া দেবীকে লইয়া যান। তোমরা স্থূলদ্রষ্টা, বিষয়রসাভিষিক্ত কলুষিত চিত্তে এই পবিত্র ভক্তচরিত কি সহজে অনুধাবন করিতে পারিবে? কালকামিনীর বসিবার স্থানে কামিনীকে যত্নপূর্ব্বক স্থান দিয়া তাহার সহবাসে অবিভূত হইয়া রহিয়াছ. বিশ্বজননীর ভাব বুঝিবার শক্তি জন্মিবে কিরূপে? সে যাহা হউক, বিপ্র! তুমি অদ্য ভক্তাপরাধে অপবিত্র হইয়াছ, আমায় আর তোমার অধিকার নাই। তবে তোমার কল্যাণের একটী উপায় বলিয়া যাই, যদ্যপি তোমার কনিষ্ঠের পদরজ ধারণ করিতে পার, তাহা হইলে ভক্তাপরাধের মার্জ্জনা হইবে।

শুদ্ধসত্ত্ব অর্থাৎ সত্ত্বমুখ-চৈতন্য ভাবাশ্রয়ের সাধকেরা আত্মভাব অতি সাবধানে গোপন করিয়া রাখিয়া লোকসমাজে সাধারণ লোকের ন্যায় বসতি করেন। তাঁহাদের বাহ্যিক কার্য্যে চারি আনা মনের সম্বন্ধ থাকে এবং বারো আনা মন ও ষোল আনা প্রাণ ভগবানের দিকে সংলগ্ন থাকে। প্রভু বলিতেন, যেমন চাকরাণীরা গৃহস্থের সমুদয় কর্ম্ম কার্য্য করে, কাহারও পীড়া হইলে সেবা করে এবং কেহ মরিয়া যাইলে ক্রন্দনও করে, কিন্তু তাহারা মনে মনে জানে যে, ইহারা কেহ আপনার নহে; সত্ত্বমুখভাবাশ্রয় সাধকেরাও তদ্রূপ। তাহারা আপন পরিবারবর্গের সহিত কখন আধ্যাত্মিক সম্বন্ধ স্থাপন করেন না। সংসার করিতে হয় করিয়া যান, কিন্তু ভগবানের দিকে পূর্ণভাব রাখিয়া থাকেন। এইরূপ ভাবাশ্রয়ভূত সাধকেরা ঈশ্বর লাভ করিয়া তাঁহার সহিত আনন্দে দিনযাপন করিয়া যান। কিন্তু সে ভাব কাহার

জানিবার শক্তি থাকে না। শুদ্ধসত্ব ভাবের আর একটী দৃষ্টান্ত প্রদান করিতেছি।

একদা নারায়ণের সহিত নারদের নানাবিধ কথোপকথন হইতেছিল। নারদ জিজ্ঞাসা করিলেন যে, প্রভু! আপনার প্রিয় ভক্ত কে? তিনি কহিলেন, সহসা এ কথা জিজ্ঞাসা করিবার উদ্দেশ্য কি? নারদ কহিলেন, প্রভু! অন্য এমন কোন উদ্দেশ্য নাই, তবে মনে হইল, কে এমন সৌভাগ্যবান হইয়াছেন, যাঁহাকে আপনি সর্ব্বশ্রেষ্ঠ জ্ঞান করেন, তাহা জানিয়া থাকা কি কর্ত্তব্য নহে? নারদের মনে অভিমান হইয়াছিল যে, পৃথিবীতে তাঁহার ন্যায় ভক্ত আর কেহ ছিলেন না; নারায়ণ তাঁহার নামই উল্লেখ করিবেন। নারায়ণকে দ্বিতীয়বার অনুরোধ করায় বলিলেন যে, অমুক নগরে আমার একটী বিশুদ্ধ ভক্ত আছে। তুমি তাহাকে একবার দেখিয়া আইস। নারদ নগর শব্দ শুনিয়া মনে মনে উপহাস করিয়া কহিলেন, সৃষ্টিছাড়া বেদপুরাণছাড়া কথা শুনিলে না হাসিয়া আর কি করিব? কত রাজর্ষী, মহর্ষী, দেবর্ষী রহিয়াছেন, তাঁহাদিগকে ভক্ত মনে করিলেন না, কত সন্ন্যাসী সাধক গিরিগুহায় শরীর পতন করিতেছেন, তাঁহাদিগকে ভক্ত মনে করিলেন না, কত সাধক সিদ্ধ মহাত্মারা রহিয়াছেন, তাঁহাদিগকে ভক্ত মনে করিলেন না, প্রভুর শ্রেষ্ঠভক্ত হইল কিনা একজন নগরনিবাসী! অবশ্যই কামিনীকাঞ্চন লিপ্ত গৃহীই হইবেন। যাহা হউক, রহস্যটী দেখা কর্ত্তব্য। নারদ এইরূপ চিন্তা করিতেছেন, এমন সময়ে শ্রীকৃষ্ণ কহিলেন, নারদ! কি ভাবিতেছ, আমার কথা বিশ্বাস হইতেছে না? নারদ অপ্রতিভ হইয়া তৎক্ষণাৎ হরিগুণ গান করিতে করিতে যাত্রা করিলেন। নানাস্থান অতিক্রম করিয়া অবশেষে সেই গৃহস্থের বাটীতে বৃদ্ধ ব্রাহ্মণের বেশে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। গৃহস্থ ছদ্মবেশী

নারদকে যত্নসহকারে বসাইয়া শিষ্টাচারের দুই চারিটী কথা কহিয়া আপন কার্য্যে নিযুক্ত হইলেন। ক্রমে দশটা বাজিল। বাবু স্নানাদি সমাপন করিয়া কর্ম্মস্থানে চলিয়া গেলেন। কর্ত্তা বাহির হইয়া যাইলে কর্ত্রী ঠাকুরাণী পরিচারিকার দ্বারা নারদ ঠাকুরকে ভোজন করাইবার জন্য বলিয়া পাঠাইলেন। নারদ পরিচারিকার সহিত বাটীর ভিতরে গমন করিয়া ভোজন করিতে বসিলেন। ভোজন প্রায় পরিসমাপ্তি কালে রোদনের ধ্বনি উঠিল। নারদ শশব্যস্তে পাত্রত্যাগপূর্ব্বক গৃহের বাহিরে আসিয়া দেখিলেন যে, একটী দ্বাদশ বৎসরের বালক মৃত্যুশয্যায় শয়ন করিয়াছে এবং আর একটী পঞ্চম বৎসরের বালক মৃত্যুমুখে পতিতপ্রায় হইয়াছে। বালকের মৃত্যুযন্ত্রণা দর্শন করিয়া নারদের হৃদয়ও বেদনাপ্রাপ্ত হইল। ইতিমধ্যে বাবু আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তথায় নারদকে দেখিয়া বিনীতভাবে জিজ্ঞাসা করিলেন, মহাশয়ের ভোজনাদির কোন ব্যাঘাত হয় নাই ত? নারদ কহিলেন, সে বিষয়ে কোন ত্রুটি হয় নাই, কিন্তু তোমায় জিজ্ঞাসা করি, এই বালক দুইটী কাহার? বাবু কহিলেন, মহাশয় আমি কিরূপে বলিব? লৌকিক হিসাবে আমার বলিয়া পরিচিত। নারদ আশ্চর্য্য হইয়া বলিলেন, তোমার পুত্র? আহা! অতিশয় দুঃখের বিষয়। আমি অদ্য তোমাদের বাটিতে আসিয়া ভাল করি নাই। তোমার আর পুত্রাদি আছে? বাবু কহিল, আজ্ঞা না। নারদ বিস্ময়াপন্ন হইয়া কহিতে লাগিলেন, বাপু! তোমার দুরদৃষ্টের অবধি নাই। দুইটী রত্ন এককালে হারাইলে? এই সময়ে যদ্যপি ঈশ্বরকৃপায় কোন সাধু মহাত্মা আসিয়া আশীর্ব্বাদ করেন, তাহা হইলে হয়ত সন্তানদিগের কল্যাণ হইতে পারে। বাবু এই কথা শ্রবণপূর্ব্বক বিরক্তভাবে কহিলেন, মহাশয়! আপনি বৃদ্ধ হইয়া এমন অন্যায় কথা কিরূপে বলিতে সাহস

করিলেন ? ঠাকুরের ইচ্ছায় সকলই হইতেছে। তিনি সকলের কর্ত্তা। তাঁহার ইচ্ছার বিরুদ্ধে আমি কার্য্য করিতে চেষ্টা করিব ! তিনি সন্তান দিয়াছিলেন, তিনি দিনকয়েক রাখিয়াছিলেন, আবার তিনি গ্রহণ করিলেন। আমি গোলাম, তাঁহার কার্য্যে আমার কি অভিপ্রায় প্রদান করা সাজে ? দ্বিতীয় বালকটীর মৃত্যু হইল। বালকদ্বয়ের জননীর হৃদয়ভেদী বিপদপূর্ণ রোদনে নারদ অস্থির হইয়া পড়িলেন, এমন কি তাঁহারও নয়নে বারিধারা পড়িতে লাগিল। বাবু বস্ত্রাদি ত্যাগ করিয়া হস্তপদ প্রক্ষালন-পূর্ব্বক মৃত সন্তানদিগের অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়ার নিমিত্ত ব্যবস্থা করিয়া স্ত্রীকে রোদন সম্বরণ করিতে অনুরোধ করিলেন। সাধ্বী স্বামীর কথায় নিস্তব্ধ হইয়া কহিলেন, প্রাণে প্রাণে সকলই বুঝিতেছি, কি জানি মনকে কোন মতে বুঝাইতে পারি নাই। ঠাকুর কি ইহাতে রাগ করিবেন ? স্বামী কহিলেন, আমরা দুর্ব্বল গৃহী, আমাদের পদে পদে অপরাধ হইয়া যায়, প্রভু দয়াল ঠাকুর, কবে তাঁহার নিকটে সাধু ছিলাম যে, অদ্য ভয় করিতেছ ? আমরা তাঁহার সংসারে দাস দাসী। ইত্যবসরে নারদ অদৃশ্য হইয়া পড়িলেন এবং অনতিবিলম্বে নারায়ণের সন্নিধানে উপনীত হইয়া আনুপূর্ব্বিক সমুদয় ঘটনা নিবেদন পূর্ব্বক কহিলেন, প্রভু ! আপনার কার্য্য আপনিই বুঝিতে পারেন। অন্যকে তাহা বুঝিতে দেওয়া আপনার উচিত নহে। আপনার ভক্ত অভক্ত আপনিই জানেন, অন্যে তাহা জ্ঞাত হইবে কিরূপে ? নারায়ণ কহিলেন, এ প্রকার কথার হেতু কি ? তোমার চক্ষে সে ভক্ত বলিয়া জ্ঞান হইল না ? নারদ কহিলেন, ঐরূপ ব্যক্তিকে যদ্যপি ভক্ত কহা যায়, তাহা হইলে অভক্ত বলিবার নূতন লক্ষণ প্রকাশ করা উচিত। লোকটা ঘোর বিষয়ী। কামিনীকাঞ্চনের পূর্ণ দাস। প্রভু ! বলিব কি, দুইটী পুত্র মৃত্যুমুখে

পতিতপ্রায় দেখিয়াও সে কিনা কর্ম্মস্থলে গমন করিল? দেখুন কাঞ্চনের আসক্তি কতদূর। হৃদয়শূন্য পাষণ্ডের ব্যবহার শুনুন, বাটীতে ফিরিয়া একবার জন্মের মত পুত্রের মুখদর্শন করিল না। সে স্বচ্ছন্দে আমার সহিত কতকগুলি বাজে কথা কহিয়া ঈশ্বরানুরাগের পরিচয় দিল। সংসারের কীটগণ যেমন হইয়া থাকে, ইহাকে তাহাই দেখিলাম, অধিকন্তু কিঞ্চিৎ চতুর। সহজ কথায় যাহাকে জ্যেঠা কহে। প্রভু! দুই একটা তত্বকথাও বলিয়াছে। নারায়ণ কহিলেন, নারদ! আমারই ভুল হইয়াছে। উহাকে ভক্ত বলিয়া স্বীকার করিবার পূর্ব্বে একবার তোমার দ্বারা পরীক্ষা করিয়া লইলে ভাল হইত। আমি এইরূপে হয়ত সর্ব্বদাই প্রতারিত হইয়া থাকি। সে যাহা হউক, তোমাকে একটী কথা জিজ্ঞাসা করি বল দেখি, তুমি কাহার? নারদ কহিলেন প্রভু! এ কথা আর জিজ্ঞাসা করিতেছেন কেন? আপনার অগোচর কি আছে? আমি আপনার পাদপদ্মে জীবন উৎসর্গ করিয়া নিশিদিন হরিগুণ গান করিয়া বেড়াইতেছি। প্রভু! আপনি আমার মন প্রাণ দেহ, আপনিই আমার ধ্যান জ্ঞান কার্য্য, আপনার এবং আপনি ব্যতীত কিছুই জানি না, কিছুই দেখি না। নারায়ণ কহিলেন, ভাল কথা! নারদ! আজ আমায় কি মনে করিয়াছিলে? নারদ কহিলেন, মনে হয় না, বোধ হয় আপনাকে মনে করি নাই। কারণ, প্রথমে নগর ভাবিতে ভাবিতে আপনার নিকট হইতে বিদায় হইয়া যাই, পরে সেই ব্যক্তিকে এবং তাহার পারিবারিক দুর্ঘটনা ভাবিয়াছি, সে সময়েও আপনাকে স্মরণ হয় নাই। নারায়ণ কহিতে লাগিলেন, নারদ ভাবিয়া দেখ, তুমি হেন দেবর্ষী সংসারের নামে আমায় বিস্মৃত হইয়া গিয়াছিলে, আর সেই বীরচূড়ামনি ভক্তকেশরী গৃহী আমায় বিস্মৃত হয় নাই। তুমি স্বাধীন, তোমার কোন বন্ধন নাই, তথাপি সংসারের মায়ায় বিস্মৃত

হইয়া নয়নজল ফেলিয়াছ, আর সেই ভক্তপ্রবর আপন সন্তানরত্ন, একটী নহে, এককালে দুইটীকে মৃত্যুশয্যায় শায়িত দেখিয়া আক্ষেপ করে নাই। যখন তুমি দৈববলের কথা বলিয়াছিলে, সে তোমায় অনুরোধ করিলে তৎক্ষণাৎ তুমি তাহার সন্তান দুইটী বাচাইয়া দিবে বলিয়া মনে করিয়াছিলে। নারদ এই স্থানে তোমার এবং তাহার ভাব মিলাইয়া দেখ। তুমি আমার সৃষ্টিতে বাহু প্রসারণ করিতে অভিলাষ করিয়াছিলে, কিন্তু সে কামিনীকাঞ্চনাবদ্ধ হইয়া মহামায়ার করগ্রস্ত থাকিয়া সংসাররূপ বিশ মণ প্রস্তরখণ্ড মস্তকে ধারণ করিয়াও আমায় বিস্মৃত হয় নাই। সে আমায় ভুলিয়া তোমার দ্বারা সন্তান বাঁচাইতে প্রয়াস পায় নাই। প্রয়াস পাওয়া দূরের কথা, তোমার প্রস্তাবে উপেক্ষা করিয়া 'ঠাকুরের ইচ্ছা' কহিয়াছে। ইহার দ্বারাও কি তুমি ইতর বিশেষ বুঝিতে পারিতেছ না? যে আমার প্রতি মন প্রাণ অর্পণ করিয়া দেয়, তাহারই আমি, তাহার জন্যই আমি সর্ব্বদা ব্যতিব্যস্ত হইয়া থাকি। যোগীরা আমার সদৃশ হইতে চায়, আমায় চাহে না, সুতরাং আমায় স্বতন্ত্র ভাবে প্রাপ্ত হইতে পারে না। যোগীরা সিদ্ধাই প্রাপ্তির নিমিত্ত আমার উপাসনা করে, আমায় চাহে না, যোগীরা আমার কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিতে অগ্রপশ্চাৎ চিন্তা করে না, সুতরাং তাহারা আত্মাভিমানে ঘুরিয়া বেড়ায়। আমার সহিত দ্বৈত সম্বন্ধ স্থাপন হইতে পারে না। কিন্তু যে গৃহী আমায় সর্ব্বস্ব জানিয়া সর্ব্বস্ব সমর্পন করিতে পারে, আমি তাহার। সেই ভাগ্যবান আমার লীলারূপ দর্শন, স্পর্শন, প্রসাদ ভক্ষণ করিতে পায়। এই নিমিত্ত তাহারাই আমার শ্রেষ্ঠ ভক্ত।

তৃতীয় প্রণালীকে তমো-মুখ চৈতন্য কহে। প্রভু বলিতেন, যেমন সত্ত্ব মুখ চৈতন্যে দীনতার ভাব দেখা যায়, তমো-মুখে তেমন নহে। যেমন কোন ধনীর নিকটে কেহ উপাসনা করিয়া কিঞ্চিৎ ভিক্ষাস্বরূপ

অর্থ লাভ করে, ইহা সত্বমুখের লক্ষণ, কিন্তু কেহ তাহা না করিয়া দল বলে উপস্থিত হইয়া ধন সম্পত্তি ডাকাতি করিয়া লইয়া যায়। ডাকাতি করাকে তমো-মুখ চৈতন্য কহে। রামকৃষ্ণদেব কহিয়াছেন যে,কলিকালে তমো মুখ চৈতন্যের ভাবেই সহজে ঈশ্বর লাভ করা যায়। ডাকাতেরা ডাকাতি করিবার পূর্ব্বে সুরাদি দ্বারা কালী পূজা করে। পূজান্তে তাহারা জয় কালী বলিয়া উহা পানপূর্ব্বক একখানি বস্ত্র ছিন্ন করিয়া বুঝিয়া দেখে যে, তাহারা কৃতকার্য্য হইবে কি না? পরে তাহারা জয় কালী! জয় কালী! বলিতে বলিতে উন্মত্ত হইয়া উঠে এবং তদবস্থায় ঢেকি কুড়ুল দ্বারা গড়াগুম গড়াগুম করিয়া সিন্দুক ভাঙ্গিয়া সর্ব্বস্ব আত্ম-সাৎ করিয়া প্রস্থান করে। তমো-মুখের ভাবেও তদ্রূপ। ইহা দুই প্রকার। তান্ত্রিক মতে কারণানুসারে কালী মন্ত্র জপ করিতে পারিলে অচিরাৎ ভগবতীর সাক্ষাৎ হয় এবং দ্বিতীয় মতে হরিনামামৃত-মদিরা পান করিয়া হরি হরি বোল বলিতে বলিতে করতালী দিয়া নৃত্য করিতে পারিলে ভাবাবেশ হয়। ভগবানের এই ভাবরূপের সাক্ষাৎ প্রাপ্ত হওয়া তমো-মুখ চৈতন্য সাধনের প্রথমাবস্থার ফল। ভাবরূপ ধারণা করিতে পারিলে ক্রমে লীলারূপ দর্শন করিবার অধিকারী হইয়া একদিন তাঁহাকে লাভ করা যায়।

চতুর্থ ভাব, সাধু ভক্তের কৃপা। এই মতে কার্য্যের বিধি ব্যবস্থা না থাকিলেও সদনুষ্ঠানের প্রয়োজন হইয়া থাকে। সদনুষ্ঠান বলিলে যে সাধন ভজন বুঝায়, তাহা নহে। সাংসারিক ভাবে অবস্থিতি করিয়া ভগবানের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া, সাধু ভক্তের কৃপানয়নে পতিত হইতে পারিলে পতিত পতিতারাও ভগবান্ লাভ করিতে পারে। এই ক্ষেত্রে প্রয়োজনই একমাত্র কারণ দেখা যায়। দক্ষিণ দেশে এক অতি ধন-শালিনী বারাঙ্গনা ছিল। একদা কয়েকজন সাধু রৌদ্রাহত হইয়া ঐ

বারাঙ্গনার সুরম্য উদ্যান দেখিয়া তাঁহারা সরোবরতীরস্থিত বৃক্ষচ্ছায়ায় উপবেশনপূর্ব্বক বিশ্রাম করিতেছিলেন। বারাঙ্গনা অট্টালিকা হইতে সাধুদিগের আগমন দেখিয়া আপনাকে ভাগ্যবতী জ্ঞানপূর্ব্বক রৌপ্য-পাত্র পূরিয়া স্বর্ণমুদ্রা লইয়া তাঁহাদের নিকটে উপস্থিত হইলেন এবং গলবাসে প্রণামপূর্ব্বক স্বর্ণমুদ্রাগুলি দয়া করিয়া লইবার জন্য বিনীত ভাবে প্রার্থনা করিলেন। সাধুরা সহসা কামিনীকাঞ্চনের যুগলমূর্ত্তি দর্শন করিয়া যারপরনাই বিস্ময়াপন্ন হইলেন। তাঁহারা মনে মনে আত্মধিক্কার দিয়া বলিতে লাগিলেন যে, আমরা অরণ্যবাসী হইয়া যখন নগরে প্রবেশ করিয়া কৃত্রিম উদ্যানে বিশ্রাম করিতে অভিলাষী হইয়াছি, তখন কামিনীকাঞ্চনের করকবলিত হওয়া আশ্চর্য্যের বিষয় আর কি? আমরা যাহার সঙ্কল্প করিয়াছি, তাহার ফল না ফলিবে কেন? যাহা হউক, কার্য্যের ফল ফলিয়াছে, আর কেন? এই ভাবিয়া তাঁহারা গাত্রোত্থান করিলেন। বারাঙ্গনা কৃতাঞ্জলিপুটে দণ্ডায়মান ছিলেন। সাধুদিগকে প্রস্থানোদ্যত দেখিয়া অতি বিনীতবচনে কহিতে লাগিলেন, সাধু মহাশয়গণ! যদ্যপি বুঝিয়াই হউক, আর না বুঝিয়াই হউক, একটা কর্ম্ম করিয়া ফেলিয়া থাকেন, তাহাতে আর কথা কি? কিন্তু প্রভু! আমি পবিত্রা হইয়াছি, তাহাতে সন্দেহ নাই। আমি শুনিয়াছি, যে স্থানে সাধুর চরণধূলি পতিত হয়, সে স্থান পবিত্র হয় এবং যে সাধুকে দর্শন করে, তাহার ভগবান্ দর্শন হয়। কারণ, সেই আধারে ভগবান্ বাস করিয়া থাকেন। আমি সেই জন্য বলিতেছি যে, যদিও আমি বারা-ঙ্গনা, যদিও আমি কুৎসিৎ ভাবে জীবনভার বহন করিয়াছি, কিন্তু প্রভু! আপনাদের কৃপায় আমি পবিত্রা হইয়াছি। অতএব যেমন দয়া করিয়া এই পতিতার উদ্ধার জন্য নিরয়কুণ্ডে উদয় হইতে সন্দেহ করেন নাই, তেমনি কৃপাবলোকনে মৎপ্রদত্ত গুরুদক্ষিণা গ্রহণ করিয়া আমার সকল

আশা পূর্ণ করিয়া যান। সাধুরা বারাঙ্গণার কথা শুনিয়া অবাক্ হইয়া রহিলেন। তাঁহারা অগ্রে মনে করিয়াছিলেন যে, কোন ভদ্রলোকের উদ্যান হইবে এবং ঐ কামিনীটী কুলমহিলা হইবেন। বারাঙ্গনা এবং তৎপ্রদত্ত কাঞ্চন উপহার দর্শন করিয়া সাধুদিগের আত্মারাম উড়িয়া গেল। একজন বলিয়া ফেলিলেন, উহার কথা শ্রবণ করিবার আর প্রয়োজন নাই, উপবেশনের ফলে বারাঙ্গনা এবং কাঞ্চনের সম্বন্ধ হইয়া গিয়াছে, কিঞ্চিৎ অবস্থিতি করিলে না জানি কি বিভীষিকা উপস্থিত হইবে। সাধুদিগের গুরু কহিলেন, ঐ রমণী যাহা বলিয়াছে তাহা সত্য, যখন আসিয়াছি, তখন আর কথাই নাই। ঐ স্ত্রীলোক বারাঙ্গনাই হউক, আর কুলমহিলাই হউক, আমাদের পক্ষে আনন্দময়ী জননী। জননীর মনে ক্লেশ দিয়া যাওয়া কর্ত্তব্য নহে। এই বলিয়া তিনি বারাঙ্গনাকে কহিলেন, মা! তোমার কথায় আমরা বিশেষ প্রীতি লাভ করিয়াছি। আমরা অন্তরের সহিত প্রার্থনা করিতেছি, ভগবান্ তোমার কল্যাণ বিধান করিলে আমরা আরও আনন্দিত হইব। আমরা সন্ন্যাসী, কাঞ্চনের কোন প্রয়োজন নাই। গৃহীর কাঞ্চন ব্যতীত চলে না, আমাদের বাসস্থান তরুমূল, তথায় কাঞ্চন প্রয়োজন হয় না। বনের ফল মূল ভোজন করি, তাহাতে কাঞ্চন প্রয়োজন হয়না, পরিধান করি বৃক্ষের বল্কল, তাহাতেও কাঞ্চনের প্রয়েজন হয় না, স্থানান্তরে যাইতে প্রয়োজন হয় না যে, কাঞ্চনের আবশ্যক হইবে এবং কোথাও গমন করিলেও ভগবান্‌প্রদত্ত পদযুগলের সাহায্যে তাহা সম্পূর্ণ হইয়া যায়। অতএব কাঞ্চন লইবার আমাদের কোন প্রয়োজন নাই। বারাঙ্গনা সরোদনে বলিতে লাগিল, প্রভু! এত দয়া প্রকাশ করিয়া আবার তাহাতে কৃপণতা করিতেছেন কেন? দাসীর মনোবাসনা পূর্ণ করুন। গুরু কহিলেন, মা! আমাদের

কাঞ্চনের কোন প্রয়োজন নাই। জলে ফেলিয়া দিলে যেরূপ কাঞ্চনের ব্যবহার হইবার সম্ভাবনা, আমাদের প্রদান করিলেও তদ্রূপ ফল ফলিবে। অতএব ইহার ব্যবহার করিবার পাত্র দেখিয়া দান করিও। এই বলিয়া সাধুরা অগ্রসর হইতে লাগিলেন। বারাঙ্গনা দ্বারদেশে ভূমিতে নিপতিত হইয়া কহিতে লাগিল, প্রভু! আপনাদের যাইতে দিব না। যে কাঞ্চনগুলি দিয়াছি, তাহা আমি আর কিরূপে ফিরিয়া লইব? উহার একটা ব্যবস্থা করিয়া যান। সাধুরা পরস্পর কহিতে লাগিলেন যে, কামিনীকাঞ্চনের বিপদ দেখ। কোথায় শীতল হইব বলিয়া বৃক্ষচ্ছায়ায় উপবেশন করিতে আসিলাম, শীতল হওয়া দূরে যাক্, এখন অস্থির হইয়া পড়িয়াছি। আর একজন কহিলেন, প্রভু! আর কেন, আমরা কামিনীকাঞ্চনের বিলক্ষণ জ্ঞান লাভ করিলাম। একদিন এই কথা লইয়া বিচার হয়, প্রভু আমাদের সেই ভ্রম চূর্ণ করিবার নিমিত্ত কৌশল করিয়া বারাঙ্গনার উদ্যানে আনিয়া এই সঙ্কটে ফেলিয়া দিয়াছেন। কামিনীকাঞ্চন কি বস্তু, প্রভু! আমরা বুঝিয়াছি, এখন আমাদের পরিত্রাণ করুন। গুরু সহাস্যে কহিলেন, তোমরা সাবধান! অতি সাবধানে কামিনীকাঞ্চনের দূরে থাকিতে চেষ্টা করিবে। অতঃপর বারাঙ্গনাকে কহিলেন, মা! এক কাজ কর, রঙ্গনাথজীকে এই স্বর্ণ মুদ্রাগুলি দিয়া আইস, তাঁহার সেবা হইবে।

সাধুগণ প্রস্থান করিলে পর, বারাঙ্গনা পুলকিতান্তঃকরণে সাধুপদরজে বিলুণ্ঠিতা হইয়া সেই দিবসেই রঙ্গনাথজীউ দর্শনার্থে যাত্রা করিল। তথায় পৌঁছিয়া শ্রীমূর্ত্তি দর্শনান্তে এক সহস্র স্বর্ণ মুদ্রা প্রতিমার সম্মুখে ঢালিয়া দিল। পূজারিগণ বারাঙ্গনার বৃত্তান্ত জানিতে পারিয়া মহান্তের নিকটে সম্বাদ পাঠাইলেন। মহান্ত বারাঙ্গনাপ্রদত্ত স্বর্ণ মুদ্রা গ্রহণ করিতে অসম্মত হইয়া কহিলেন যে, সে যদ্যপি সহজে ফিরিয়া

যাইতে না চাহে, তাহা হইলে রঙ্গনাথজীউর জন্য অলঙ্কার প্রস্তুত করিয়া আনিতে বলিয়া দিবে। পূজারিরা বারাঙ্গনাকে অনেক বৃথা বুঝাইয়া পরিশেষে অলঙ্কারের কথা বলায় সে অতি কষ্টে অনুপায় দেখিয়া স্বীকার করিল।

বারাঙ্গনা যদিও অলঙ্কারের নিমিত্ত স্বর্ণ মুদ্রাগুলি ফিরাইয়া লইল, কিন্তু মনের ক্লেশ নিবারণ হইল না। তাহার মনে বড়ই ভয় রহিল যে, পাপিনীর ভাগ্যে কি এমন দিন হইবে যে, রঙ্গনাথজীউ অলঙ্কার পরিবেন। যদিও মুহুর্মুহু হতাশ আসিয়া তাহার মন প্রাণ অবিভূত করিতেছিল, কিন্তু তথাপি সে একেবারে নিরাশ হয় নাই। কিয়-দ্দিবসের মধ্যে সমুদয় অলঙ্কার প্রস্তুত করিয়া রঙ্গনাথের সমক্ষে উপস্থিত হইল। পূজারিরা বারাঙ্গনাকে দেখিয়া কহিলেন, আরে পাগ্‌লী! আবার আসিয়াছিস্? বারাঙ্গনা কহিল, আপনারা যেরূপ আজ্ঞা করিয়াছিলেন, আমি সেইরূপ করিয়াছি। এই অলঙ্কার লউন। প্রভুকে পরাইয়া দিন, আমার মনোবাসনা পূর্ণ হউক। পূজারিরা মহান্তের নিকটে বারাঙ্গনার প্রত্যাগমনবার্ত্তা প্রদান করায় তিনি বিরক্ত হইয়া কহিলেন যে, তাহাকে স্পষ্ট করিয়া বল যে, বেশ্যাপ্রদত্ত অলঙ্কার কখন শ্রীমূর্ত্তির ব্যবহার্য্য হইতে পারে না। দুষ্টার স্পর্দ্ধা দেখ! যখন কাঞ্চন মুদ্রা পরিত্যাগ করা হয়, তখনি তাহার বুঝিয়া লওয়া উচিত ছিল। বারাঙ্গনা পূর্ব্ব হইতেই অকূল চিন্তা-সাগরে ভাসিতেছিল। সে মনে মনে বুঝিয়াছিল যে, মহান্ত কখনই অলঙ্কারগুলি লইবেন না। তথাপি একেবারে ভগ্নহৃদয়া হয় নাই। পূজারিদিগকে চিন্তাযুক্ত ভাবে আসিতে দেখিয়া বারাঙ্গনার কণ্ঠাগত প্রাণ হইয়া আসিল, তথাপি নিরাশ না হইয়া সতৃষ্ণ নয়নে তাঁহাদের সন্নিহিত হওয়া প্রতীক্ষা করিতে লাগিল। পূজারিরা সম্মুখে আসিবামাত্র বারাঙ্গনা কহিল, মহাশয়!

দাসীর প্রতি কি মহান্ত ঠাকুর প্রসন্ন হইয়াছেন? পূজারিয়া কহিলেন, না বাছা! তোমার অলঙ্কার ঠাকুরের ব্যবহারের উপযুক্ত নহে। তুমি অন্য কোন দেবালয়ে যাও, তাহারা পরম পুলকে গ্রহণ করিবে। বারাঙ্গনা স্থির চিত্তে আদ্যোপান্ত শ্রবণ করিয়া রঙ্গনাথজীকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিতে লাগিল, প্রভু! তোমার মনে কি এই ছিল? আমি জানিতাম ঠাকুর, যে বারাঙ্গনার ন্যায় অপবিত্রা, ঘৃণিতা, পৃথিবীর হেয় জীব জীবশ্রেণীতে আর নাই। আমি জানি যে, বারাঙ্গনাদিগের কোন কার্য্যে অধিকার নাই। আমি জানি যে, বারাঙ্গনারা অপঘাতে মরিয়া থাকে, আমি জানি যে, বারাঙ্গনাদিগের পৃথিবীতে আপনার বলিবার কেহ নাই। আমি জানি যে, আমাদের জন্য যমপুরিতে স্বতন্ত্র মহানরক আছে, কিন্তু প্রভু! সত্য করিয়া বল দেখি, আমি কি কখন তোমার নিকটে আসিতে চাহিয়াছিলাম? তোমার নাম পর্য্যন্ত কখন শুনি নাই। আমি কি কখন তোমার ভক্ত সাধুদিগকে নিমন্ত্রণ করিয়াছিলাম? আমি কি কখন তাহাদের সেবা করিতে ইচ্ছা করিয়াছিলাম? আমি কি কখন সাধুকে সন্তুষ্ট করিয়া স্বর্গে যাইব বলিয়া মনে মনে বৃথা চিন্তা করিয়াছিলাম? অন্তর্য্যামী তুমি সত্য করিয়া বল। বক্ষে কে ছুরি মারিবে, কে বিষ খাওয়াইবে, তাহাই ভাবিয়াছি; কোন্ ধনীর মাথা খাইব, কাহাকে পথের ভিখারী করিব, এই চিন্তাই করিতাম। বল দেখি, সাধুরা বারাঙ্গনার বাড়ীতে কি জন্য প্রবেশ করিয়াছিল? আমি তাহাদের না দেখিলে কখনই স্বর্ণ মুদ্রা দিতে যাইতাম না। ভাল তাহারা না লইল, পুষ্করিণীতে ফেলিয়া দিল না কেন? তাহারা তোমায় দিতে বলিয়াছিল বলিয়া আমি আসিয়াছিলাম। আমি তোমার ভক্ত নহি, আমি তোমার অনুরাগিনী নহি, আমি তোমায় চাহি নাই। সাধুরা যদ্যপি অন্য ঠাকুরের নাম

করিত, তাহা হইলে তোমার নিকটে কখন আসিতাম না। তুমি আমায় বলিয়া দাও, কোথায় তোমার সেই সাধুরা ? হয় তাহাদের ঠিকানা বলিয়া দাও, না হয় এই অলঙ্কার নাও। ভাল, আমায় পূর্ব্বে বলিলেই হইত, তাহা হইলে আমি অলঙ্কার প্রস্তুত করিয়া আনিতাম না। আমি অলঙ্কার লইয়া কোথায় যাইব ? আর কাহাকে দিব ? বল ঠাকুর বল, আমি যে তোমার চরণ দেখিয়া গিয়া পায়ের মাপে নূপুর গড়াইয়াছি, এ নূপুর আমি কার পায়ে দিব ? প্রভু ! তুমি কি জান না যে, তোমার বাহুর মাপে বলয়াদি প্রস্তুত করিয়াছি ? প্রভু ! অনেক ক্লেশে গজমতিটী সংগ্রহ করিয়াছি ! ঠাকুর ! এ চূড়া লইয়া আমি কাহার মাথায় দিব ? প্রভু ! চূড়ার কথা আমার স্মরণ হয় নাই, তুমি স্বপনে আমায় চূড়ার কথা বলিয়াছিলে। রঙ্গনাথ আর রঙ্গ করো না। আমার প্রাণ যায়, বড় সাধে এসেছি, প্রভু ! সাধে বিষাদ সংঘটনা করিও না। একজন পূজারি রোষান্বিত হইয়া কহিলেন, দেখ্ মাগি ! তোদের ছলনা অপার। তোরা সাক্ষাৎ ডাকিনী রাক্ষসী, মায়ার ঘনীভূত মূর্ত্তিবিশেষ। তোকে সহজ কথায় বলিলাম, তাহা গ্রাহ্য হইল না। যদ্যপি এখনও অলঙ্কার লইয়া প্রস্থান না করিস্, তাহা হইলে অপমান হইয়া যাইতে হইবে। এ দেবালয়, কথাটা যেন স্মরণ থাকে। সাধু সাধ্বীদিগের আবাসের স্থান।

বারাঙ্গনা উচ্চৈঃস্বরে রঙ্গনাথজীকে কহিল, ঠাকুর ! চিরকাল শুনিয়া আসিতেছি যে, তুমি পতিতপাবন। কিন্তু এ অতি অদ্ভুত কথা, নূতন কথা যে, তোমার সে নাম আর নাই। বল ঠাকুর বল, তুমি কত দিন পবিত্রপাবন হইয়াছ ? ঠাকুর ! পবিত্র ব্যক্তিরা আপনাদিগের সাধন ভজনের জোরে পরিত্রাণ পায় জানিতাম, পতিত পতিতা আশ্রয়বিহীন বিহীনা, অনাথ অনাথিনীগণ ভবতরঙ্গের রঙ্গ দেখিয়া নিরাপদে পায়

হইবার জন্য ভবকর্ণধারের শরণাপন্ন হইলে তিনি পার করিয়া দিতেন। কত অসংখ্যক নরনারী এইরূপে চলিয়া গিয়াছে, কিন্তু তুমি আজ আমার ভাগ্যে সে নাম পরিবর্ত্তন করিয়াছ! স্বীকার করি, প্রভু! যে আমি ঘৃণিত বেশ্যা। আমি অতি অপবিত্রা, কিন্তু নাথ! তুমি যে দয়াময় ঈশ্বর। তুমি যে অদ্বিতীয় সৃষ্টিকর্ত্তা, পরিপালক এবং জগৎপাতা। প্রভু! সূর্য্য চন্দ্র কি আমায় পরিত্যাগ করিয়াছে? বায়ু হুতাশন কি আমায় পরিত্যাগ করিয়াছে? তাই বুঝিয়াছিলাম যে, তুমিও আমায় পরিত্যাগ কর নাই। আমি কোথায় যাইব? কে আশ্রয় দিবে? অনাথিনী বলিয়া আর কাহার প্রাণ কাঁদিবে? কে পতিতাকে উদ্ধার করিতে পারিবে? দয়াময়! দয়া কর। দাসীর প্রতি একবার কৃপা-কটাক্ষ কর। প্রভু! বড় আশায় এসেছি। আমায় নৈরাশ কোরো না। আমার প্রাণ যায়। কোথায় প্রাণনাথ রঙ্গনাথজী! কোথায় প্রাণেশ্বর রঙ্গনাথজী! কোথায় জীবনসখা রঙ্গনাথজী! আমি বড় সাধে তোমার জন্য অলঙ্কার আনিয়াছি, যদ্যপি তুমি গ্রহণ না কর, আমি অনশন ব্রত লইলাম, তোমার সম্মুখে জীবনান্ত করিয়া তোমার দয়াময় নামের গৌরব বৃদ্ধি করিব। রহিলাম বসিয়া, দেখি আমার প্রাণবল্লভের সম্মুখ হইতে কে তাড়াইয়া দিতে পারে! প্রভু! যাবনা! যাবনা! যাবনা! হয় শরীর পতন করিব, না হয় প্রভু তোমায় অলঙ্কার পরিতে দেখিব। ঠাকুর! মনুষ্য জন্মিলেই মরিয়া যায়, এ কথা নূতন নহে। হয় ব্যাধি, না হয় অপঘাত, যে কোনরূপে হউক জীবন গিয়া থাকে। কিন্তু অদ্য জীবনান্ত হইবার যে নূতন ব্যবস্থা করিলে, ইহা স্মরণ করিলেও আনন্দ হয়। বোধ হয় অদ্যাপি এমন মৃত্যু কাহার হয় নাই।

পূজারিরা বারাঙ্গনাকে তাড়াইয়া দিবার জন্য সাধ্যমত চেষ্টা করিল, কিন্তু কিছুতেই কৃতকার্য্য হইল না। দীনবল্লভ ভগবান্ রঙ্গনাথজী আর

স্থির থাকিতে পারিলেন না। প্রাণের বেদনা প্রাণপতি ব্যতীত আর কে বুঝিতে পারিবে? গভীর যামিনীযোগে মহান্তের শিরোদেশে রঙ্গনাথজী দণ্ডায়মান হইয়া কহিলেন, মহান্ত! তোকে এতদূর শক্তি দিলে কে? আমার অধিকারের উপরে তোর বাহু প্রসারণ করা কেন? আমি কত যত্নে ঐ বারাঙ্গনাকে আনয়ন করিয়াছি, তাহা তুই কিরূপে জানিতে পারিবি! ও আমার জন্য অলঙ্কার আনিয়াছে, তাহা পরিত্যাগ করিবার তোর অধিকার কি? তুই সাধু মহান্ত তাহা সে জানে, অলঙ্কার তোর জন্য আনে নাই, তুই এমনি মূর্খ অজ্ঞান যে, তাহা বুঝিতে পারিস্ নাই; মহান্ত! বারাঙ্গনা বলিয়া উহাকে ঘৃণা করিয়াছিস্, কিন্তু অজ্ঞান! একবার বুঝিয়া দেখ্ দেখি যে, তোর অপেক্ষা কোটি গুণে শ্রেষ্ঠ। তুই সন্ন্যাসী হইয়া আপনাকে ভুলিয়া গিয়াছিস্। তুই অভিমানের মূর্ত্তিবিশেষ হইয়াছিস্! তুই রিপুপরতন্ত্র হইয়াছিস্। তুই ভোগবিলাসী হইয়া আমায় বিস্মৃত হইয়াছিস্, কিন্তু চাহিয়া দেখ্ পামর! যে বারাঙ্গনাকে দেখিবার জন্য কত সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি উপাসনা করিয়া বেড়ায়, যে বারাঙ্গনা ঐশ্বর্য্যের অধিশ্বরী হইয়া স্বর্ণ-শয্যায় শয়ন করিয়া থাকে, অগণন দাস দাসী যাহার পরিচর্য্যা করে, সেই বারাঙ্গনা ধূলায় বিলুণ্ঠিতা! ভাবিয়া দেখ্, সে কেন হা হুতাশ করিতেছে, কেন শিরে করাঘাত করিতেছে, কেন হৃদয় তাড়না করিতেছে, কেন অনশনে অনাথিনীর ন্যায় আমার দ্বারে পতিতা রহিয়াছে। ও আমায় চায়। অলঙ্কারের বিনিময়ে কিছু প্রার্থনা করে না। ওঠ্ মূর্খ! উহার প্রদত্ত অলঙ্কারগুলি এখনি আনিয়া আমায় পরাইয়া দে। আমি সমুদয় দিবা অনাহারে রহিয়াছি। যে পর্য্যন্ত উহার পানভোজন না হয়, সে পর্য্যন্ত আমি কেমন করিয়া আহার করিব? আরও বলি শোন্। পূজারিরা অতি মূর্খ, তাহারা বেশভূষার কিছুই অর্থ বুঝেনা, যাহা হয় এক প্রকার

সাজাইয়া দেয়। আমার জন্মাবধি বেশ-ভূষার সাধ ছিল, কিন্তু কপাল-ক্রমে তাহা অদ্যাপি হয় নাই। তুই আপনি যাইয়া আমার নিকটে আনাইয়া অলঙ্কারাদি পরাইয়া দিতে বল্। আর শোন্! ও আমার জন্য অঞ্চলে বাঁধিয়া সব আনিয়াছে, আমায় তাহা প্রদান করিতে বলিস্? মহান্ত নিদ্রোত্থিত হইয়া আর পলপ্রমাণ কাল বিলম্ব না করিয়া বারাঙ্গনার নিকটে গমনপূর্ব্বক কহিলেন, মা! গাত্রোত্থান কর। প্রভু আপনার অনুরাগে অস্থির হইয়া পড়িয়াছেন। বারাঙ্গনা কহিল, কোথায় যাব? দয়াময় কি আমার অলঙ্কার লইবেন না? মহান্ত কহিল, অলঙ্কার লইবেন না? তাঁহার আদেশে আমি আপনাকে লইয়া যাইতে আসিয়াছি, তিনি বলিয়াছেন যে, আপনি স্বহস্তে তাঁহাকে অলঙ্কার পরাইয়া দিবেন। বারাঙ্গনা গদগদস্বরে কহিল, মহাশয়! আপনি আমার সহিত কি রঙ্গ করিতেছেন? আমার কি এমন সৌভাগ্য হইবে যে, রঙ্গনাথজীকে আমি আপনি সাজাইয়া শ্রীমূর্ত্তির শোভা দর্শন করিব? মহান্ত কহিলেন, এই আমি অলঙ্কারের বাক্স মস্তকে লইলাম, চলুন আপনি। বারাঙ্গনা মন্দিরে প্রবেশ করিয়া রঙ্গনাথজীর চরণপ্রান্তে আসিয়া মূর্চ্ছিতা হইল। পরে সংজ্ঞালাভ করিয়া চরণ হইতে ক্রমে নাসিকায় গজমতি পর্য্যন্ত পরাইয়া দেওয়া হইলে, সুচতুরা বারাঙ্গনা কহিল, দয়াময়! তোমার অপার করুণা, করুণার অবধি নাই। তোমার দয়াময় পতিতপাবন অনাথতারণ নামই সত্য, দাসীর সকল সাধ মিটিয়াছে। দেখ প্রভু! আমার খর্ব্বাকৃতি, আমি তোমার মস্তকে চূড়া পরাইতে পারিতেছি না, দয়া করিয়া মস্তকাবনত কর। দীনবৎসল ভগবান্ বারাঙ্গনার অনুরাগে, প্রস্তরের মূর্ত্তি রঙ্গনাথজী অমনি মস্তকাবনত করিয়া দিলেন, বারাঙ্গনা পরমানন্দে চূড়া পরাইয়া দিল। এতক্ষণে মহান্তের মোহান্ত হইয়া গেল। তিনি

কৃতাঞ্জলি হইয়া কহিলেন, মা গো! তুমি সাক্ষাৎ গোপিনী। গোপিনী না হইলে রঙ্গনাথজীকে প্রত্যক্ষ করিতে পারে, এমন শক্তি আর কাহার আছে? তুমি আমার মা, আমি অশেষ অপরাধে অপরাধী হইয়াছি, দয়া করিয়া ক্ষমা কর। প্রভু! বলিহারি তোমায়! রঙ্গনাথজী! তোমার যেমন নাম, তেমনি রঙ্গ দেখাইলে।

ঈশ্বরলাভ তিন প্রকার। ভগবানের ভাবরূপ উপলব্ধি করা, তাঁহাকে প্রত্যক্ষ করা এবং তাঁহাতে বিলীন হইয়া যাওয়া। সাধকের প্রথমাবস্থায় ভাবরূপ উপলব্ধি হয়। অনুরাগ বৃদ্ধি হইলে সঙ্কল্পানুসারে রূপ দর্শন অথবা নির্ব্বাণ লাভ করা। প্রভু বলিয়াছেন যে, ভাবের ঘরে চুরি না রাখিয়া সরল বিশ্বাসী হইতে পারিলেই ভাবরূপের সম্বন্ধ স্থাপন হইয়া যায়। রূপ দর্শনেচ্ছা থাকিলে অতি-প্রয়োজন হওয়া চাই। তিনি বলিতেন যে, যত্মপি কাহার ভগবানের রূপ দেখিবার ইচ্ছা হয়, তাহা হইলে প্রাণপণ করা কর্ত্তব্য। যিনি ভগবানের জন্য প্রাণ দিতে পারিবেন, তিঁনিই তাঁহাকে লাভ করিবেন, তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই। রামকৃষ্ণদেব এই নিমিত্ত বলিতেন যে, প্রাণপণ বলিলে কি বুঝিবে? সতীর পতিবিয়োগকালে তাহার যেমন প্রাণের অবস্থা হয়, অন্ধের একমাত্র উপযুক্ত পুত্রবিয়োগকালে যেমন প্রাণের অবস্থা হয়, রাজচক্রবর্ত্তী সাম্রাজ্যচ্যুত হইয়া বন্দী হইলে যেমন তাহার প্রাণের অবস্থা হয়, কেহ জলমগ্ন হইলে তাহার প্রাণ যেরূপ হয়, ভগবানের অদর্শনে প্রাণের ঐ রূপ অবস্থা যখন উপস্থিত হইবে, তখনই ভগবান্‌কে প্রত্যক্ষ করা যাইবে। এইরূপ অনুরাগ ব্যতীত তাঁহার দর্শনলাভ কলিকালে একেবারে অসম্ভব।

ভগবান্ প্রত্যক্ষ করা দ্বিবিধ। লীলা এবং নিত্যরূপ। অবতার-

দিগের লীলার সময়ে লীলারূপ দর্শন করা। লীলান্তে সেই রূপ দর্শন করিলে তাহাকে নিত্যরূপ কহে।

আমরা লীলারূপে ঈশ্বরের সহিত সহবাসসুখ সম্ভোগ করিতে পারি—কিন্তু নিত্যরূপের সহিত সেরূপ হয় না। রামকৃষ্ণদেব বলিয়াছেন যে, জীব নিত্যরূপের নিকট ২১ দিনের অধিক বাঁচিতে পারে না। এই নিমিত্ত ভক্তদিগের সহিত প্রেমবিহার করিবার জন্য আপনি লীলারূপে অবতীর্ণ হইয়া থাকেন! ঈশ্বরপ্রেমাকাঙ্ক্ষীরা সেই রূপে আত্মাভিলাষ পূর্ণ করিয়া লয়েন।

ঈশ্বরলাভের যে কয়েকটী চলিত মত আছে, তাহা কথিত হইল। রামকৃষ্ণদেব বকল্‌মার ভাব নূতন প্রকাশিত করিয়াছেন। রামকৃষ্ণে বকল্‌মা দিলে সহজে ঈশ্বরলাভ হইয়া থাকে।

বকল্‌মা সম্বন্ধে আমি অনেক বার অনেক কথা বলিয়াছি, কিন্তু অনেকে অদ্যাপি তাহার ভাব উপলব্ধি করিতে পারেন নাই। বকল্‌মায় নিজের কোন প্রকার সাধনের ভাব একেবারে থাকিবে না। ঈশ্বর-লাভের যে সকল প্রণালী উল্লিখিত হইয়াছে, তাহাতে কিছু না কিছু কার্য্যের সংস্রব আছে। কার্য্যের ভাব আসিলে বকল্‌মা বলা যাইতে পারে না। বকল্‌মার ভাব সম্বন্ধে প্রভু একটী সাধারণ উপদেশ দিয়া গিয়াছেন। তিনি বলিতেন যে, সাধক দুই প্রকার হয়, বাঁদরের ছানার ভাব এবং বিড়ালছানার ভাব। বাঁদর ছানার ভাবে অহং মিশ্রিত আছে। যদিও বাঁদরীরা শাবককে ক্রোড়ে লইয়া স্থানান্তরে যায় বটে কিন্তু শাবকেরা আপনারা আসিয়া জড়াইয়া ধরে। বিড়াল ছানার সে প্রকার স্বভাব নহে। সে কেবল ম্যাও ম্যাও করিয়া ডাকে। তাহার মা ঘাড় ধরিয়া যেখানে ইচ্ছা লইয়া যায়, যথায় ইচ্ছা রাখিয়া আইসে, ছানার কিছুতেই আপত্তি থাকে না। গৃহস্থের গদির

উপরেও যেমন, ছাইগাদায়ও তেমন। বকলমায় অবিকল ঐরূপ ভাব থাকা কর্ত্তব্য। ঠাকুর! ইহা ভাল নহে, আমার এমন করিলে কেন? আমার প্রতি তুমি বড় নিষ্ঠুর, এরূপ কোন কথা বলিবার অধিকার থাকে না। ঠাকুর কহিতেন যে, বকলমাপ্রদত্ত ভক্তেরা যেরূপে প্রার্থনা করে, তাহা তাঁহার কথিত একটী গীতে প্রকাশ আছে।

"যখন যেরূপে তুমি রাখিবে আমারে।
সেই সে মঙ্গল যদি না ভুলি তোমারে॥
বিভূতি বিভূষণ, রতন মণি কাঞ্চন,
বৃক্ষমূলে বাস কি রতনসিংহাসনোপরে॥"

আজ পঞ্চদশ মাসাবধি রামকৃষ্ণদেব সম্বন্ধে অনেক কথাই বলিলাম। তিনি কে, আমাদের কল্যাণবিধানের নিমিত্ত কিরূপ উপদেশ এবং ব্যবস্থা করিয়া গিয়াছেন, তাহা সংক্ষেপে বলা হইল। যাহা বলা হইয়াছে, যদ্যপি কেহ আনুপূর্ব্বিক বুঝিয়া পাঠ করেন, তাহা হইলে ধর্ম্মের নিদান জ্ঞান লাভ করিবার কখন ক্লেশ হইবে না। আমি জানি, এক দিন ধর্ম্মের নিদান জানিবার জন্য দ্বারে দ্বারে ঘুরিয়াছিলাম, আমার স্মরণ আছে যে, আমাদের অধ্যাপকগণের, শাস্ত্রজ্ঞগণের, উপদেষ্টাগণের সেবা করিতে ত্রুটি করি নাই, আমি খৃষ্টান এবং ব্রাহ্মসমাজ প্রভৃতি ধর্ম্মপ্রচার সম্প্রদায়বিশেষে পরিভ্রমণ করিয়া দেখিয়াছি, নিদান কুত্রাপি নাই। পূর্ব্বে বলিয়াছি যে, আমি ইতি পূর্ব্বে ধর্ম্মের কোন ধারই ধারিতাম না, ধর্ম্মের প্রয়োজন কাহাকে কহে, তাহাও কিছুই বুঝিতাম না, কিন্তু সত্য বলিতেছি যে,ধর্ম্মের তর্ক করিতে কখন পৃষ্ঠদেশ দেখাই নাই। যখন যেরূপ তর্ক উপস্থিত হইত, তখন তাহার বিপরীত দিক লইয়া তর্ক করিতাম। তর্কে জয়লাভ করা

একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল। যে সময়ে ধর্ম্মের প্রয়োজন হইল, সে সময়ে আর পূর্ব্বভাবে তর্ক করিতে যাইতাম না। ধর্ম্মের প্রকৃত তত্ত্বলাভ করাই প্রাণের পিপাসা জন্মিয়াছিল, কিন্তু কি বলিব, সে পিপাসার শান্তি বিধান করিতে কেহ কৃতকার্য্য হন নাই। আমার পিপাসা নিবারণ করিবার জল কুত্রাপি ছিল না। আমার বিশেষ আপত্তি এই ছিল যে, ধর্ম্ম পাঁচটা হইতে পারে না, ছোট বড় হইতে পারে না, কিন্তু যেখানে গিয়াছি, সেইখানেই বিপরীত কথা শুনিয়াছি, যে যে প্রচারকের নিকটে গিয়াছি, তিনিই তাঁহার ধর্ম্মটীকে পরিত্রাণের অদ্বিতীয় পন্থা বলিয়া অপর সমুদয় ধর্ম্মকে অধর্ম্ম বলিয়া অবজ্ঞা করিয়াছেন। একদা জনৈক কর্ত্তাভজার নিকটে গিয়াছিলাম, তাঁহার পাঁচ সাতটী শিক্ষিত শিষ্যও ছিল, অদ্যাপিও আছে। এই শিষ্যদিগকে দেখিয়া মনে করিয়াছিলাম যে, বোধ হয় ঐ ব্যক্তির নিকটে ধর্ম্মের নিদান প্রাপ্ত হওয়া যাইবে। মহাশয়! বলিতে আমার হাসি পাইতেছে, তিনি বলিলেন যে, জগতের লোকেরা এখনও সত্যধর্ম্ম প্রাপ্ত হয় নাই। তাহারা মায়িক ধর্ম্মের অনুগামী হইয়া মায়াময় সংসারে উপর্য্যুপরি ঘুরিয়া মরিতেছে। যে পর্য্যন্ত তাহারা আমার ধর্ম্মাবলম্বন না করিবে, সে পর্য্যন্ত কাহারও গতিমুক্তি হইবে না। আমি তাঁহাকে বলিলাম, আপনি নিশ্চয় পাগল হইয়াছেন। তাহা না হইলে জগতে সংখ্যাতীত নরনারী আছেন ও ছিলেন এবং থাকিবেন, ইঁহারা সকলে আহার করিতেন, করেন এবং করিবেন, আপনিও আহার করেন, আপনার পাঁচটী শিষ্য আহার করেন, স্বীকার করি তৃপ্তিলাভ হয়। কিন্তু এ কথাটা কি বুঝিতে পারেন যে, অন্যান্য সকল নরনারীই অবিকল আপনার ন্যায় আহারে পরিতৃপ্তি লাভ করেন? আপনার আহার যিনি দেন, তাঁহাদের আহারও তিনি দিয়া থাকেন। তেমনি যিনি আপনার

ঈশ্বর, অন্যেরও তিনিই ঈশ্বর। সহজ জ্ঞানে যাহা বুঝা যায়, তাহাতে যুক্তি বিচার কেন? তিনি ক্রোধান্বিত হইয়া উঠিলেন, আমিও প্রস্থান করিলাম। এই কর্ত্তাভজাসম্প্রদায়ের মহাশয় যেরূপ আপনার ভাবকে বিশ্বজনীন ভাব করিতে চাহেন, অন্যান্য প্রত্যেক সম্প্রদায়ে সেই ভাব বদ্ধমূল হইয়া আছে। সুতরাং ধর্ম্মশিক্ষার্থীদিগের পক্ষে দুর্লঙ্ঘ্য প্রাচীরবৎ ব্যবধান পড়িয়া যায়। আমি সেই অবস্থায় পতিত হইয়াছিলাম। যদিও ধর্ম্মের গোঁড়ামী করিতে জানিতাম, তাহা আমাদের কুলগত ভাব, কারণ বৈষ্ণব পরিবারে গোঁড়ামীর বিশেষ পারিপাট্য আছে, কিন্তু বিজ্ঞান শাস্ত্র আমাকে সে পথে যাইতে দেয় নাই। এই অবস্থায় আমি ঘুরিয়া বেড়াইতেছিলাম, এমন সময়ে আমার অদৃষ্ট সুপ্রসন্ন হইল। আমি রামকৃষ্ণদেবের কৃপা লাভ করিলাম। তাঁহার কৃপায় আমার সমুদয় অভাব বিদূরিত হইয়া যাইল। আমি তাঁহার পুত্র হইয়াছি, অভাব কিসের থাকিবে? আমি যে দিন তাঁহার পাদপদ্ম দর্শন করিয়াছি, সেই দিন বিশ্বজনীন ধর্ম্মের আভাস পাইয়াছি, সেই দিন ধর্ম্ম জগতের নিদান শিক্ষা করিবার হাতেখড়ি দিয়াছিলেন। সেই দিন তিনি বিশ্বজনীন ধর্ম্মের মূলমন্ত্র প্রদান করেন। তিনি বলিয়াছিলেন যে, ধর্ম্ম কখন দুই হয় না, ধর্ম্ম এক অদ্বিতীয়। সকল দেশের সকল লোকের এক ধর্ম্ম। যেমন মনুষ্য এক, হিন্দু, মুসলমান, সাহেব, কাফ্রি, চীনেম্যান, রুষ সকলেই মানুষ—এক অদ্বিতীয় মানুষ। শরীরতত্ত্ব (Antomy) এক খানি পুস্তক, সে পুস্তক এক অদ্বিতীয়। যে ভাষায় হউক, মনুষ্যের দুই হাত পার স্থানে অধিক বা কম লেখা থাকে না। এক মুণ্ড, দুই চক্ষু, দুই কর্ণ এবং এক নাসিকার কথা সকলেই বলে। এইরূপ শরীরের বর্ণনা সর্ব্বত্রই এক হইয়া থাকে। রিপু সকলের সর্ব্বত্রে এক বর্ণনা থাকে। ক্ষুধা পিপাসার এক প্রকার বর্ণনা থাকে। জাতি কিম্বা দেশভেদের জন্য

কখন তাহার প্রভেদ হয় না। সেই প্রকার ধর্ম্ম বলিলে একই বুঝিতে হইবে। ধর্ম্মের যে ভাবান্তর দেখা যায়, তাহা মনুষ্যদিগকে দেখিলেই বুঝা যাইবে। বস্তুগত এক হইয়া সকলেই পৃথক্। সহোদরেরা সকলেই পৃথক্। দুই জনকে প্রায় ভ্রম হয় না। যেমন নরনারীগণ মূলে এক হইয়া স্থূলে বিভিন্ন, সেইরূপ মূলে এক ধর্ম্ম থাকিয়া স্থূলকার্য্যে ব্যক্তিগত পার্থক্যভাবের দ্বারা তাহারও পার্থক্য ভাব দেখাইবে। রামকৃষ্ণদেব তদনন্তর জলের দৃষ্টান্ত দিয়া বলেন যে, আকাশের জল সর্ব্বত্রে প্রায় বিশুদ্ধ। কিন্তু সেই জল পৃথিবীতে সমাগত হইয়া স্থানিক কারণবিশেষে নানাবিধ নাম প্রাপ্ত হইয়া থাকে। কোথাও কূপ, কোথাও খাত, কোথাও পুষ্করিণী, কোথাও গঙ্গা, কোথাও নর্দ্দমা এবং কোথাও সমুদ্র ইত্যাদি। যাহার জলের নিদান জ্ঞান জন্মায়, সে স্থূলের এবং মূলের ভাবের একীকরণ করিতে পারে। কূপ, খাত, পুষ্করিণী প্রভৃতির ন্যায় ধর্ম্মরাজ্যের পার্থক্যতা বুঝিতে হইবে এবং মূলে এক জ্ঞানও থাকিবে। যেমন তিনি বলিয়াছেন যে, শিয়ালদহে গ্যাসের মসলার ঘর। উহা এক অদ্বিতীয়। কিন্তু সহরে কোথাও ঝাড়ে, কোথাও লণ্ঠনে, কোথাও পরীতে, কোথাও আলোকবিহীন শিখায় জ্বলিতেছে। স্থূল আবরণ বা দীপের শিখার তারতম্য দেখিলে ভাব বৈচিত্র্যের বিলক্ষণ পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায়। কিন্তু যে গ্যাসের নিদান জানে, সে দিব্যচক্ষে দেখিতে পায় যে, এক গ্যাস সহরের সর্ব্বত্রে জ্বলিতেছে। এইরূপ নানাবিধ উপদেশ দ্বারা ধর্ম্মের নিদান বুঝাইয়া দিয়া তিনি হৃদয় অধিকার করিয়া লন।

যতই তাঁহার শ্রীমূর্ত্তি দেখিলাম, যতই অমিয়বিনিন্দিত উপদেশ-সুধা পান করিলাম, ততই তাঁহাকে চিনিতে পারিলাম। চৈতন্য-চরিতামৃত গ্রন্থ পাঠ করিয়া চৈতন্যদেবের যে সমস্ত লক্ষণ ধারণা ছিল, রামকৃষ্ণদেবে তাহাই দেখিতে লাগিলাম। আমি এই সময়ে বিষম

সমস্যায় পড়িয়াছিলাম। যদিও তাঁহার নিকট যাইয়া শান্তিলাভ করিয়াছিলাম, যদিও ধর্ম্মের নিদান জ্ঞান হইয়াছে বলিয়া আকাঙ্ক্ষা মিটিয়া গিয়াছিল, যদিও তাঁহাকে প্রাণ খুলিয়া শ্রদ্ধা ভক্তি করিতাম, যদিও রামকৃষ্ণদেব ব্যতীত আর কাহাকেও ভাল লাগিত না, কিন্তু তথাপি তাঁহাকে চৈতন্যদেব সদৃশ মনে করিতেও সঙ্কুচিত হইত। মনে হইত, ভগবান্ কি এত সহজ? তিনি কি আমাদের মত মনুষ্য? ঐ চিন্তা আসিলে আমি অন্য বিষয়ে মনোনিবেশ করিবার চেষ্টা পাইতাম। কিন্তু সে ভাব কি যাইবার বস্তু? জিজ্ঞাসা করি কাহাকে, তাহাও বুঝিতে পারিলাম না! এক দিন আপনি চিন্তা করিয়া দেখিলাম যে, আমাদের শাস্ত্রে যে অবতারকাহিনী আছে, তাঁহারা কিরূপ প্রকার। দেখিলাম সকলেই মানুষ। সকলেই সাধারণ মনুষ্যদিগের ন্যায় সময়ে সময়ে হাসিয়াছেন, কাঁদিয়াছেন, পীড়ার ক্লেশ পাইয়াছেন, আবার কাহারও অপঘাত মৃত্যু হইয়াছে। অবতারবাদ লইয়া চিন্তা করিতে তখন সাহস হইল এবং রামকৃষ্ণদেবকে অবতার বলিয়া আমার ধারণা হইয়া গেল। আমার এই ধারণাটী সত্য কি মিথ্যা, তাহা নিরূপণ করিবার জন্য এক দিন তাঁহার শ্রীমূর্ত্তি দর্শন করিতেছিলাম। তিনি বলিলেন, তুমি কি দেখিতেছ? আমি কহিলাম, প্রভুকেই দেখিতেছি। তিনি বলিলেন, তুমি আমায় কি মনে কর? আমি বলিলাম, চৈতন্যচরিতামৃতে গৌরাঙ্গদেবের যে সকল লক্ষণ লিখিত আছে, তদ্দারা, প্রভু! আপনাকে শ্রীগৌরাঙ্গই বলিয়া জ্ঞান হয়। তিনি কিয়ৎকাল চুপ করিয়া থাকিয়া বলিয়াছিলেন, বামনি এই কথা বলিত। সেই দিন হইতে আমি তাঁহাকে ভগবান্ বলিয়া জানিতাম। তাঁহার কার্য্যকলাপ এবং অন্যান্য ভক্তদিগের অবস্থা দেখিয়া আমার এই সংস্কার ক্রমে বৃদ্ধি হইয়াছিল। পরে যে দিন আমার সাধন ভজন ফিরাইয়া

লইয়া তাঁহাকে দেখিবার জন্য আজ্ঞা দেন, সেই দিনই প্রকৃতপক্ষে আমার ঈশ্বর লাভ হইয়াছে।

রামকৃষ্ণ কি জন্য অবতার, তাহা আমার প্রথম বক্তৃতায় কথিত হইয়াছে। তাঁহার বিশ্বজনীন ধর্ম্মের ভাব এবং বকল্‌মা, ইহাই এই অবতরণের বিশেষ লক্ষণ। শ্রীকৃষ্ণকথিত 'যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাংস্তথৈব ভজাম্যহম্', শ্লোকের দ্বারা বিশ্বজনীন ধর্ম্মভাবের বীজ শ্রীকৃষ্ণ কর্ত্তৃক বপন করা হইয়াছিল বলিয়া কথিত আছে। সেই বীজ এত দিনের পর রামকৃষ্ণের দ্বারা বৃক্ষে পরিণত ও ফলফুলে পরিশোভিত হইয়া যাইল। যে যথা মাং শ্লোকে শ্রীকৃষ্ণ সকল ধর্ম্মের আদি কারণ আপনাকে নির্দ্দেশ করিয়া গিয়াছেন। শ্রীকৃষ্ণ যখন লীলারূপ ধারণ করিয়াছিলেন, তখন তাঁহাকে পরিধির বিন্দুবিশেষ জ্ঞান করা কর্ত্তব্য। কারণ, তিনি এক ভাবের পরিচায়ক। কৃষ্ণভাবে, রাম চৈতন্য নৃসিংহ দুর্গা কালী প্রভৃতি কোন ভাবের উত্তেজনা হয় না, সুতরাং তিনি ভাববিশেষ মাত্র। যেমন পরিধির বিন্দুর সহিত অন্যান্য বিন্দুর কোন সম্বন্ধ নাই, যাহা কিছু সম্বন্ধ দেখা যায়, তাহা কেন্দ্রের সহিত হইয়া থাকে, সেইরূপ কৃষ্ণরূপের সহিত অন্যান্য রূপের সম্বন্ধ থাকিতে পারে না। প্রভু কহিয়াছেন যে, রূপ মাত্রেই চিৎশক্তির গর্ভজাত, অতএব আদ্যাশক্তিই সকল রূপের উৎপত্তির কারণ। এই শক্তি, ব্রহ্ম অর্থাৎ সৎএর বিকাশ মাত্র। অতএব ব্রহ্ম শক্তি একত্রে মধ্যবিন্দু হইতে পারেন এবং তাঁহা হইতে রূপেরসৃষ্টি হয়। যদিও সকলই একের বিকাশ বা একের লীলা, কিন্তু ভাববিশেষের পার্থক্যতা থাকে বলিয়া তাহা স্বতন্ত্র বলিয়া স্বীকার করিতে হয়। শ্রীকৃষ্ণ রূপ লইয়া কেন্দ্র হইতে পারেন না। এই নিমিত্ত যে যথা মাং শ্লোকটীকে বিশ্বজনীন ধর্ম্মের বৃক্ষ বলা যায় না। রামকৃষ্ণদেব কি বলিয়াছেন? তিনি পরিধির

সমুদয় বিন্দুবিশেষ বা ভাব অর্থাৎ সাম্প্রদায়িক স্থূল ধর্ম্মাবলম্বন করিয়া কেন্দ্রে গমন পূর্ব্বক বলিয়া গিয়াছেন, যেমন কেন্দ্র এক অদ্বিতীয়, তেমনি ভগবান্ এক অদ্বিতীয়. পরিধির বিন্দু অসীম, সেইরূপ ধর্ম্মভাব অসীম, পরিধির বিন্দু সকল কেন্দ্রের সম্বন্ধে সমান, কেহ ছোট বড় নহে, ধর্ম্মভাব সকল সেইরূপ ছোট বড় হইতে পারে না। এই জন্য বলিতেন, ধর্ম্মরাজ্যে বিবাদ থাকা উচিত নহে। যাহাতে সকলে আপনাপন ভাবে আপনার দিন কাটাইয়া যাওয়া যায়, তাহাই মঙ্গলজনক। এইজন্য বলিতে বাধ্য হইয়াছি যে, বর্ত্তমান কালের সাম্প্রদায়িক ভাব চূর্ণ করিবার নিমিত্ত রামকৃষ্ণদেব অবতীর্ণ হইয়াছিলেন।

রামকৃষ্ণের এই নবভাব, এই সর্ব্বজনীন ভাবের তাৎপর্য্য পুনরায় বলিতেছি। কৃষ্ণ বলিয়া হউক, রাম বলিয়া হউক, কালী বলিয়া হউক, চৈতন্য বলিয়া হউক, মহম্মদ বলিয়া হউক, ঈশ্বর বলিয়া হউক, যে যে কোন ভাবে এক ভগবান্ জানিয়া, প্রেমে হউক, সত্ত্বমুখ কিম্বা তমোমুখ ভাবে হউক, অথবা কৃপায় হউক, কিম্বা রামকৃষ্ণে বকল্‌মা দিয়া হউক, অর্থাৎ যে যে কোন প্রণালী মতে অনুরাগী হইবেন, তাঁহারই ঈশ্বর লাভ হইবে।

অনেকে ভ্রমাবৃত হইয়া বলেন যে, আমরা খৃষ্টানদিগের ন্যায় রামকৃষ্ণ ভজাইতে আসিয়াছি, আমি তাঁহাদের অনুরোধ করি, এ প্রকার মীমাংসা করিবার পূর্ব্বে আমাদের কথাগুলির মর্ম্মোদ্ধার করিয়া লইলে ভাল হয়। আমরা বলিয়া থাকি এই যে, যাহার যাহাতে রুচি, যে ভাবে মন শীতল হয়, যে সাধনায় প্রাণ তৃপ্তি লাভ করে, তাহাই তাহার কর্ত্তব্য। যে কেহ কোন সাধন ভজন না করিতে পারিবেন, যে কেহ আপনাকে দুর্ব্বল মনে করিবেন, যে কেহ সাহায্যাকাঙ্ক্ষী হইবেন, তাহার জন্য রামকৃষ্ণ নাম। সে কোথায় যাইবে, সে কোন দেবতার

শরণাপন্ন হইবে? বকলমা দিবার কথা কোন দেবদেবী, কোন অবতার অদ্যাপি বলেন নাই। অন্যান্য সমুদয় ভাবে এবং রূপে সাধন আছে। সাধনবিহীন হইয়া কখন অন্য কোন ভাবের ফল প্রাপ্ত হইবার উপায় নাই। এই জন্য এইরূপ নিরুপায় নরনারীদিগের রামকৃষ্ণই এক মাত্র আশ্রয়স্থল।

যাহারা এই ভবসাগরে পড়িয়া হাবুডুবু খাইতেছে, রামকৃষ্ণদেব তাহাদের জীবন রক্ষার অবলম্বনবিশেষ। রামকৃষ্ণদেব তিনভাবে কার্য্য করিতেছেন, ভগবান্, গুরু এবং আচার্য্য বা উপগুরু। আমাদের তিনি ভগবান্ এবং গুরু। এ সম্বন্ধ সকলের সহিত স্থাপিত হইতে পারে না। কিন্তু আচার্য্যরূপে তিনি সমগ্র পৃথিবী অধিকার করিবেন। বিশ্বজনীন ধর্ম্মভাব বর্ত্তমান কালের যুগধর্ম্ম। এই যুগধর্ম্মের নিমিত্ত সকলে অপেক্ষা করিতেছেন। বিশ্বজনীন ধর্ম্ম অথবা সকল ধর্ম্মের মূল এক, তাহা কাহার কথায় বিশ্বাস করিবে? এ পর্য্যন্ত কেহ সে কথা জানিতেন না। জানিবেন কি? তাহা মনুষ্যকল্পিত হইতে পারে না। তিনি নিজে সাধন পূর্ব্বক প্রত্যেক ধর্ম্মের সার বাহির করিয়াছিলেন, সেইজন্য সকল ধর্ম্মের সত্য এক, ইহা কেবল রামকৃষ্ণদেবের বলিবার অধিকার আছে। কে বলিল মুষলমানধর্ম্ম সত্য? রামকৃষ্ণদেব। তাঁহার এ কথা বলিবার অধিকার কি? তিনি গোবিন্দ দাসের নিকটে দীক্ষা লইয়া সাধন করিয়াছিলেন। এই নিমিত্ত তাঁহার কথা প্রামাণ্য। কে বলিল যে, বেদান্তের ভাব সত্য? রামকৃষ্ণদেব। তিনি কি পুস্তক পাঠ করিয়া বলিয়াছেন? না। তিনি তোতাপুরি নামক নেংটা সাধুর নিকটে দীক্ষিত হইয়া নির্ব্বিকল্প সমাধি লাভপূর্ব্বক বৈদান্তিক নিরাকার-ভাবের তাৎপর্য্য ব্যক্ত করিয়া গিয়াছেন। কে বলিল যে, পুরাণতন্ত্র সত্য? রামকৃষ্ণদেব। কারণ, তিনি প্রত্যেক দেবতার সাধন করিয়া-

ছিলেন। এইরূপে গোকল ব্রত হইতে পৃথিবীর চলিত প্রায় সকল মতেই সাধক হইয়া এক চূড়ান্ত সত্য বাহির করিয়া দিয়াছেন। এই সত্য লাভ করিবার যাহার প্রয়োজন হইবে, তাঁহাকেই রামকৃষ্ণকে আচার্য্য বলিয়া অবনতমস্তকে তাঁহার চরণধূলি লইতে হইবে। যখন সকলে রামকৃষ্ণদেবের এই নবভাব বুঝিতে পারিবেন, তখন ধর্ম্মের বিবাদ মিটিবে। কিন্তু ধর্ম্মের বিবাদ স্থগিত হওয়া প্রয়োজন হইয়াছে। যে পর্য্যন্ত ধর্ম্মের উত্তমাধম জ্ঞান না যাইবে, সে পর্য্যন্ত কল্যাণ হইবে না। এই নিমিত্ত রামকৃষ্ণ নাম যাহাতে সকলে অবলম্বন পূর্ব্বক আত্ম-কল্যাণ সাধন করিয়া লয়েন, ইহাই আমাদের একান্ত উদ্দেশ্য।

রামকৃষ্ণের ভাব প্রস্ফুটিত হইতে যে কতকাল লাগিবে, তাহা তিনিই বলিতে পারেন। যখন সকল ধর্ম্মসম্প্রদায় নিজ নিজ উন্নতি সাধন করিয়া শান্তিলাভ করিবেন, তখনই রামকৃষ্ণের ধর্ম্মের পূর্ণতা কহা যাইবে। এ কথা কেহ একদিনও না ভাবেন যে, তিনি সকল ধর্ম্ম একাকার করিয়াছেন বা তাঁহাকে উপাসনা করিতে বলিয়াছেন। যে যে চলিত ধর্ম্ম আছে অথবা যিনি যে ধর্ম্মে আছেন, তিনি সেই ধর্ম্মে যাহাতে স্থির হইয়া থাকেন, ইহাই রামকৃষ্ণের ধর্ম্ম। তাঁহার ধর্ম্মকে অপরে নিন্দা করিলে তিনি রামকৃষ্ণদেবের দোহাই দিয়া শত্রুর গর্ব্ব খর্ব্ব করিতে পারিবেন বলিয়া রামকৃষ্ণের সহায়তা আবশ্যক। রাম-কৃষ্ণের সহিত সাধারণের এই সম্বন্ধ মাত্র। এই নিমিত্ত বলিতেছি যে, রামকৃষ্ণ ব্যতীত সমাজের উপায় নাই। গুরু রূপেই হউক, ভগবান্ রূপেই হউক, কিম্বা আচার্য্য রূপেই হউক, ধর্ম্মজগতে রামকৃষ্ণকে আশ্রয় করা সকলের প্রয়োজন হইয়াছে। তাঁহার নামের মহিমা অপার, নাম করিয়া দেখিলেই প্রাণে প্রাণে তাহারই মধুরতা উপলব্ধি হইবে।

আজ আমি মহাশয়দিগের নিকটে আপাততঃ বিদায় প্রার্থনা করিতেছি। বিদায় কথাটা উচ্চারণ করিতে আমার যে ক্লেশ হইতেছে, তাহা আর কি বলিব। প্রভুর নাম লইয়া পনের মাস আনন্দে কাটাইতেছিলাম, কিন্তু কি করিব, গোলাম আমি, যদ্যপি কখন রামকৃষ্ণ-মন্দির স্থাপিত হয়, তাহা হইলে আমি পুনরায় সাধারণ সমক্ষে উপস্থিত হইয়া রামকৃষ্ণলীলা কীর্ত্তন করিব। স্থানের জন্য আমাদের যেরূপ লাঞ্ছনা হইয়াছে, তাহা মনে করা যায় না।

প্রভুর প্রতি যদ্যপি আপনাদের শ্রদ্ধাভক্তি থাকে, তাহা হইলে রামকৃষ্ণমন্দির সম্বন্ধে সহায়তা করিতে পশ্চাৎদৃষ্টি করিবেন না। সাগর লঙ্ঘন করিতে সকলে পারে না, কিন্তু কাষ্ঠবিড়ালীরও প্রয়োজন আছে।

আপনারা প্রভুর বিষয় সম্বন্ধে একবারে সম্পূর্ণ গ্রন্থ পাইয়াছেন। তাহা দ্বারা বিশেষ সুবিধা হইবে। যদ্যপি তাঁহার বিষয় লইয়া আলোচনা করিতে চাহেন, দয়া করিয়া রবিবারে কাঁকুড়গাছী যোগাদ্যানে গমন করিলে বিশেষ আনন্দিত হইব। প্রাতঃকালে যাইয়া প্রভুর পূজায় যোগদান করিতে পারিবেন এবং মহাপ্রসাদ পাইয়া সায়ংকালে গৃহে ফিরিয়া আসিতে পারিবেন। সকলে আশীর্ব্বাদ করুন, যেন অচিরাৎ রামকৃষ্ণ-মন্দির স্থাপিত হইয়া তাঁহার নবলীলা প্রচারিত হয়।

গীত।

—*—

দীন দু'খী জনে, পামর অজ্ঞানে,
প্রভু তোমা বিনে কে বল তারে
শান্তিনিকেতন, অভয় চরণ,
অধমতারণ ভব-পারাবারে ॥
দাও হে সুমতি, অগতির গতি,
দেখ পাপমতি আঁধার করে।
কর নিবারণ, পতিতপাবন,
উদিত হইয়ে হৃদিমাঝারে ॥

আদরে ধরেছে চরণ হৃদয় মাঝারে।
ভোলা ছাড়বেনা দেবেনা সে প্রাণ ধ'রে কারে ;
চায়না রতন ধন, ভুজঙ্গ ভূষণ,
নাই অশন বসন শ্মশানে ভবন ;—
দেখে বিষজয়ী, ব্রহ্মময়ী তার বুকে তাই বিহরে ॥
ছাই মাখে সে গায়, হাড়মালা গলায়,
প্রাণ প'ড়ে তার ব্রহ্মময়ীর পায় ;—
দিয়ে সকল বিদায়, শুধু সে চায়
এলোকেশী প্রাণ ভরে ॥

———

সখি ! ঘরে যাবই না গো (আর),
যে ঘরে কৃষ্ণ নামটী করা দায়।

যেতে হয়ত তোরাই যা, গিয়ে ব'ল্‌বি—
যার রাধা তার সঙ্গে গেল
(যমুনায় রাই ডুবে ম'ল, হা কৃষ্ণ হা কৃষ্ণ বলে গো)।
আমি যদি পরি নীল বসন, বলে ঐ শ্যামের উদ্দীপন
যদি চাই মেঘ পানে, বলে কৃষ্ণকে পড়েছে মনে ॥
যদি কা'র বাড়ী যাই, বলে এল কলঙ্কিনী রাই।
যখন থাকি রন্ধনশালে, কৃষ্ণরূপ মনে হ'লে,
আমি কাঁদি সখি ধূঁয়ার ছলে ॥

মোহন সাজে, ব্রজের মাঝে, প্রেমে বাজাই মোহন বাঁশরী।
প্রেমভিখারী, প্রেম তরে ফিরি, প্রেম ধরি প্রাণ ভরি ॥
প্রেম দিতে যে চায়, সে আমারে পায়,
প্রেম বিনা তা'র আর নাহিত উপায়,
প্রেমেতে ধরেছি গোপিকার পায়,
সাজি সাধে প্রেমের প্রহরী ॥
কোথা ব্রজেশ্বরী, প্রেমের কিশোরী,
রেখে সতী পতি হলেত আমারি,
যে সকল ত্য'জে, প্রাণ দিয়ে পূজে,
সে আমার আমি তারি ॥

যখন যেরূপে তুমি রাখিবে আমারে।
সেই সে মঙ্গল যদি না ভুলি তোমারে ॥
বিভূতি বিভূষণ, রতন মণি কাঞ্চন,
বৃক্ষমূলে বাস কি রতনসিংহাসনোপরে ॥

ছিলনা যতন ঐ চরণ পেতে।
বল কোন গুণে হে দয়াল ঠাকুর দিয়েছ আপন হতে ॥
তোমার ভাব বোঝা না যায়,
যুগে যুগে চায় যে তোমায় তবেই সেত পায়,
এখন চায়না ব'লে সেধে দিলে দেখে নিরুপায়,
খুঁজে পেতে বিধিমতে চরণ দিতে পতিতে ॥

পায় যদি প্রাণ উধাও হয়ে ধায়।
চায়না কারে, শুধুই তারে, আপন প্রাণ বিলায় ॥
যবে মন ষোল আনা চায়,
হৃদয় মাঝে, হৃদয়চাঁদে নেহারে হেলায়,
যেমন স্থির জলে শশী খেলে, পূর্ণ প্রতিমায়,
হিল্লোলে চঞ্চল চলে, সে ছবি লুকায় ॥
যবে সতী প্রাণপতি হারায়,
অনাথিনী পাগলিনী প্রায়,
কিম্বা জলে মগ্ন হ'লে প্রাণ যে করে তায়,
সেই প্রাণে যে ডাকে তারে তখনি সে দেখা পায় ॥

দু'খ তমোরাশি, গিয়েছেরে মিশি,
রামকৃষ্ণ নাম তপনকিরণে।
আয় সবে মিলি, রামকৃষ্ণ বলি,
মনোসাধে খেলি প্রকৃতিবিপিনে ॥
লতিকার কোলে, ফুলবালা দোলে,
এস দুলি মোরা সে কুসুম সনে।
বিপিন মাঝারে, ধরি পিকবরে,
দাও নামসুধা ঢালি তা'র প্রাণে ॥

অটবী উপরি, পুলকেতে পুরি,
গাইবে সে নাম ললিত পঞ্চমে।
কোকিলের ধ্বনি, রামকৃষ্ণ ধ্বনি,
মাতাবে ভুবন রামকৃষ্ণ প্রেমে॥
ধরি চাতকেরে, শিখাইয়া দেরে,
রামকৃষ্ণ নাম কহি কাণে কাণে।
সুনীল অম্বরে, গা'বে উচ্চৈস্বরে,
রামকৃষ্ণ নাম আপনার মনে ;
নবীন নীরদে, লিখেদে লিখেদে,
রামকৃষ্ণ নাম চপলা অক্ষরে।
দামিনী চকিলে, হেরিব সকলে,
রামকৃষ্ণ নাম প্রফুল্ল অন্তরে॥
চল বাতভরে, গগন উপরে,
বিতরিগে নাম তারকা মাঝারে।
আঁক সুধাকরে, সুধার উপরে,
রামকৃষ্ণ ছবি সুধা যাহে ক্ষরে॥
শুক্ল তিথি সাঁঝে, রামকৃষ্ণ সাজে,
উঠিবে চন্দ্রমা গগন মাঝারে।
শশধর কোলে, রামকৃষ্ণ খেলে,
হেরিয়ে মাতিবে সবে চরাচরে॥
জীবের হৃদয়ে, ভক্তি তুলি দিয়ে,
মদনমোহনে লিখ সযতনে।
রামকৃষ্ণ বলি, দিয়ে করতালি,
এস সবে নাচি মাতোয়ারা প্রাণে॥

রামচন্দ্রের বক্তৃতাবলী।

ষোড়শ বক্তৃতা।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণপ্রদর্শিত

বিশ্বজনীন ধর্ম্ম।

১৩০২—২৭শে শ্রাবণ রবিবার, মিনার্ভা থিয়েটারে

প্রদত্ত।

---

৬১ রামকৃষ্ণাব্দ।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-প্রদর্শিত বিশ্বজনীন ধর্ম্ম।

ব্রাহ্মণাদি সকলের চরণে প্রণাম।

যে সময়ে যে প্রকার বাতাস বহিয়া থাকে, সে সময়ে সকলকে তাহাই সম্ভোগ করিতে হয়। সামাজিক, রাজনৈতিক এবং আধ্যাত্মিক রাজ্যে সময়ে সময়ে নানাপ্রকার বাতাস উঠিয়া থাকে, সে সময়ে সেই বাতাস সকলকে ঘুরাইয়া লইয়া বেড়ায়। ধর্ম্ম-জগতে আজ কয়েক বৎসর ধরিয়া এক অভিনব ঝড় উঠিয়া প্রায় পৃথিবীর সর্ব্বস্থানে পরিব্যাপ্ত হইয়া পড়িবার অবস্থায় পতিত হইয়াছে। এইরূপ বাতাস চিরকালই উঠে বটে, কিন্তু বর্ত্তমান সময়ে তাহা ঘূর্ণ ঝড় অর্থাৎ সাইক্লোনরূপে দর্শন দিয়াছে। বাতাস উঠিলে গ্রীষ্মপ্রপীড়িত ব্যক্তিরা শীতল হয়, তাহাদের প্রাণ জুড়ায়, কিন্তু ঘূর্ণঝড়ে শীতল হওয়া দূরে থাক, প্রাণ জুড়ান দূরে থাক,জীবন রক্ষা করা বিষম সঙ্কট হইয়া থাকে। বিশ্বজনীন অর্থাৎ একটী ধর্ম্মসূত্রে সকলকে গ্রথিত করিবার মানসে,এক ধর্ম্ম সর্ব্বত্রে পরিব্যাপ্ত করিবার উদ্দেশ্যে, সর্ব্বধর্ম্মের একাকার করিবার প্রয়াসে, চারিদিক দিয়া বাতাস উঠিয়াছে, সুতরাং চারিদিকের বায়ুর একস্থানে পরস্পর আঘাতপ্রত্যাঘাতে এক ভীষণ ঘূর্ণ ঝড়ের অভিনয় আরম্ভ হইয়াছে। সাইক্লোন হইবার লক্ষণ দেখিলে নাবিকেরা সতর্ক হয়। নৌকা রক্ষা করিবে বলিয়া সুদৃঢ় বন্ধন দিবার নিমিত্ত সুপ্রোথিত কীলক অনুসন্ধান করিয়া তাহার আশ্রয় অবলম্বন করে। আমরাও সেইরূপ, যাহাতে সাইক্লোনের প্রবল বিক্রমে আমাদের জর্জ্জরীভূত জীর্ণ ধর্ম্মভাব-তরী বিচূর্ণিত হইয়া না যায়, তাহার সদুপায় নিরূপণকরণার্থ অদ্য সাধারণ সমক্ষে উপস্থিত হইয়াছি।

বিশ্বজনীন ধর্ম্ম বলিলে সর্ব্বসাধারণের মঙ্গলকারী সনাতন ধর্ম্ম বুঝায়। এই সনাতন ধর্ম্ম প্রকটিত করা প্রত্যেক ব্যক্তিরই উদ্দেশ্য। অতি প্রাচীন কাল হইতে বর্ত্তমান কালাবধি ধর্ম্মরাজ্যের ইতিবৃত্ত পাঠ করিলে এ কথা স্পষ্টাক্ষরে বুঝিতে পারা যায়। বৈদিক মতাবলম্বীরা সর্ব্বত্রে বেদবিহিত কার্য্য দেখিলে সুখী হন, পৌরাণিক মতের উপাসকেরা পুরাণের আধিপত্য স্থাপন হওয়া নিতান্ত আবশ্যক বলিয়া জ্ঞান করেন, তান্ত্রিক সাধকদিগের ধারণা এই যে, তন্ত্রের সাধনাই মানবজাতির মুক্তির একমাত্র উপায়স্বরূপ। হিন্দুদিগের অন্যান্য শাখাপ্রশাখা ধর্ম্ম-সম্প্রদায়ের ব্যক্তিরাও নিজ নিজ উপাস্য দেবতা ও সাধনপ্রণালীকে জগতের উপাস্যদেবতা ও সনাতন ধর্ম্মপ্রণালী বলিয়া মুক্তকণ্ঠে প্রকাশ করেন। মহম্মদীয় ও খ্রীষ্টীয় ধর্ম্মানুষ্ঠান ব্যতীত প্রত্যেক নরনারী কাফের ও হিদেনশ্রেণীভুক্ত, তাহাদের কস্মিন্‌কালে কোন সূত্রে কল্যাণ হইবার সম্ভাবনা নাই, ইহাই মুসলমান ও খ্রীষ্টানদিগের সংস্কার। ফলে, সকলেই আপনাপন ধর্ম্মকেই পরিত্রাণের নিদানস্বরূপ জ্ঞানপূর্ব্বক জগতের কল্যাণার্থ তাহাই প্রচার করিয়া থাকেন। যে সময়ে হিন্দুস্থানে স্বাধীনতা-সূর্য্য উদিত ছিল, সে সময়ে যে যে ভাবের প্রাবল্য হইয়াছিল, সেই সেই ভাবেরই প্রচার হইত। বেদের সময়ে বৈদিক, পুরাণের সময়ে পৌরাণিক, তন্ত্রের সময়ে তান্ত্রিক এবং বুদ্ধাবতারে বৌদ্ধধর্ম্মের কার্য্য হইয়াছে।

মুসলমানদিগের অধিকার কালে মহম্মদীয় ধর্ম্ম প্রচার হয়। এই প্রচারকার্য্যকালে সমূহ বলপ্রয়োগও হইত। বর্ত্তমানকালে খ্রীষ্টমতা-বলম্বী জাতির একাধিপত্য বিধায়, খ্রীষ্টধর্ম্মেরই বহুল প্রচার হইতেছে। এইরূপে যে ধর্ম্মের দিকে দৃষ্টিপাত করা যায়, সেই ধর্ম্মই যেন সনাতন ধর্ম্ম, সেই ধর্ম্মই যেন বিশ্বসংসারকে আলিঙ্গন করিবার জন্য সযত্নে বাহু

প্রসারণ করিয়া রহিয়াছে। সকলেই বলিতেছেন যে, যদ্যপি কাহার এই বিষাদ-পূর্ণ সংসারে দুঃখসঙ্কুল পাঞ্চভৌতিক দেহের স্বচ্ছন্দতা লাভ এবং বিবিধ অলীক কুসংস্কারবিশিষ্ট আত্মার মুক্তিসাধন করিতে ইচ্ছা থাকে, তাহা হইলে আমার ধর্ম্মের আশ্রয় গ্রহণ কর, তুমি এখনই ত্রিতাপ জ্বালার দুর্ব্বিসহ ক্লেশ হইতে পরিত্রাণ পাইবে, স্বর্গীয় শান্তির শীতলতায় সুস্নিগ্ধ হইবে এবং কালকবলিত হইলে প্রেমময়ের প্রেম-নিকেতনে চিরবসতি লাভ করিবে।

এইরূপে সংখ্যাতীত ধর্ম্মপ্রণালী সনাতন ধর্ম্ম বলিয়া পরিচয় দিতে-ছেন, সকলেই সকলকে কখন সমাদরের সহিত এবং কখন বীভৎস-বাক্যে আহ্বান করিতেছেন। তাঁহাদের দেখিলে বোধ হয়, তাঁহারা ধর্ম্মের নিগূঢ় তাৎপর্য্য বুঝিয়াও যেন সম্পূর্ণরূপে বুঝেন নাই, ধর্ম্মের কার্য্যপরম্পরা প্রত্যক্ষ করিয়াও যেন সম্পূর্ণরূপে দেখেন নাই। তাঁহারা নিরন্তর নিজ সনাতন ধর্ম্মের শান্তি নিশান সংস্থাপনের নিমিত্ত সর্ব্বদাই আত্মহারা হইয়া ইতস্ততঃ পরিভ্রমণ করিতেছেন। এই ধর্ম্ম প্রচারক-দিগের অন্তরের ভাব বাহির করিয়া আলোচনা করিয়া দেখিলে তাঁহা-দিগকে কখন নিন্দা করা যায় না। স্বীকার করি বটে, নিজ নিজ ধর্ম্ম সংস্থাপনের জন্য ছল, বল এবং কৌশলের সহায়তা লইতে কেহ কখন বিস্মৃত হন না। আমরা একথা সকলেই জানি যে, কেহ ধর্ম্মপ্রচার-কালে কেবল আপন ধর্ম্মের শ্রেষ্ঠতা এবং অপরের অসারতা প্রতিপাদন করিতে কিছুমাত্র সঙ্কুচিত হন না। আমরা সাম্প্রদায়িক ধর্ম্মানুষ্ঠাতা ও প্রচারকদিগের কলহ হিল্লোলে অশান্তির হস্ত হইতে বিমুক্ত হইতে পারি-তেছি না, বিনা কারণে তাঁহারা সুস্থচিত্তের স্থৈর্য্যভাব চূর্ণ করিতে দক্ষিণ বাম অবলোকন করেন না, তাঁহারা নিজ অভীষ্টসিদ্ধির জন্য ধর্ম্মপ্রচার-কালে কপটতা ও দস্যুবৃত্তির পরিচয় দিতেও কখন লজ্জিত হন না

সাম্প্রদায়িক ধর্ম্ম প্রচারকদিগের এই প্রকার অভিনয় দর্শন করিয়াও তাঁহাদের উদ্দেশ্য বিচারপূর্ব্বক নিন্দা না করিবার হেতু এই যে, যিনি যে ধর্ম্ম অবলম্বন করেন, তিনি সেই ধর্ম্মের ভাবে আপনাকে সংগঠিত করিয়া ফেলেন। তাঁহার মন, বুদ্ধি, বিচার, কল্পনা সেই ভাবানুযায়ী পরিচালিত হইয়া থাকে। তিনি আপন ভাবের মধুরতা প্রাণে প্রাণে সম্ভোগ করেন, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। এই অবস্থায় অন্যের ভাবের সহিত তুলনা করিতে যাইলে পরস্পর অনৈক্যতা দৃষ্টি হয়, সুতরাং, তাহাকে আপন ভাবে পরিবর্ত্তিত করিয়া সুখী করিবার নিমিত্ত প্রাণ-পণে চেষ্টা করিয়া থাকেন। খ্রীষ্টান মিশনারীরা যে বহুল অর্থব্যয়ে ও শারীরিক এবং মানসিক ক্লেশ স্বীকারপূর্ব্বক দেশবিদেশে খ্রীষ্টধর্ম্ম প্রচার করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছেন, তাঁহাদের উদ্দেশ্য কি? তাঁহারা প্রাণে প্রাণে খ্রীষ্টধর্ম্মের রসাস্বাদনপূর্ব্বক সেই রসে পৃথিবীর সমুদয় নরনারীকে অভি-ষিক্ত করিয়া সুখের পারাবার সৃষ্টি করিবার প্রয়াস পাইতেছেন। এই রূপে ধর্ম্ম সম্প্রদায় লইয়া বিচার পূর্ব্বক তাঁহাদের উদ্দেশ্যের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে কাহাকেই দোষারোপ করা যায় না। তাঁহারা যে কেবল অন্যের ধর্ম্ম নষ্ট করিবার জন্য বদ্ধপরিকর হন, একথা কখনই বিশ্বাস করা যায় না।

এই স্থানে জিজ্ঞাস্য হইবে যে, যদ্যপি ধর্ম্মবিশেষের ধর্ম্মবিশেষ বিলুপ্ত করিবার উদ্দেশ্য না হয়, তাহা হইলে ধর্ম্মের গ্লানি, ধর্ম্মের অসারতা, ধর্ম্মের বিবিধ প্রকার ভ্রম বাহির করিয়া দিয়া পরস্পর নিরবচ্ছিন্ন সংগ্রাম করিতেছেন কেন? আমি বলিয়াছি যে, ধর্ম্ম প্রচারের উদ্দেশ্য বুঝিয়া দেখিলে তাহাতে কখনই দোষারোপ করা যায় না। কারণ উদ্দেশ্যেই ধর্ম্মাধর্ম্ম সকলের কল্যাণকর বিধেয়। কল্যাণকর কার্য্যে যাঁহারা লিপ্ত করিতে চাহেন, তাঁহারা কি সাধুবাদের পাত্র নহেন?

মনুষ্যস্বভাব লইয়া যদ্যপি স্থিরভাবে বিচার করা যায়, তাহা হইলে যে কথা কথিত হইল, সে কথায় মতান্তর করিবার কাহারও অধিকার থাকে না। মনুষ্যস্বভাব চায় কি? মনুষ্যস্বভাব কিসের জন্য লালায়িত হইয়া বেড়ায়? মনের সমতা সংস্থাপন করাই একমাত্র উদ্দেশ্য।

মনের সমতা লাভ করা কাহাকে বলে? এই প্রসঙ্গ লইয়া কিঞ্চিৎ আলোচনা করিয়া দেখা কর্ত্তব্য। আমাদের যখন যে বিষয়ের অভাব হয়, সেই বিষয়টী পূর্ণ করিবার নিমিত্ত মন ধাবিত হয় এবং যে পর্য্যন্ত তাহা সম্পূর্ণ না হয়, সে পর্য্যন্ত উহা কোন ক্রমে স্থির হইতে পারে না।

মনুষ্যমাত্রেই যেমন কতিপয় পদার্থ দ্বারা সংগঠিত হয়, যথা অস্থি, শোণিত, মেদ, মাংস ইত্যাদি, মানসিক বৃত্তিগুলি সম্বন্ধেও তেমনি সকলের সম অধিকার আছে। ইহা সকল মনুষ্যেরই সাধারণ সম্পত্তি। অর্থাৎ কাম ক্রোধাদি বৃত্তি মনুষ্যের কোথাও থাকে, কোথাও থাকে না, এ প্রকার ঘটনা বিশ্বপতির ব্রহ্মাণ্ডে একেবারেই অপ্রতুল। দয়া-দাক্ষিণ্যাদি বৃত্তিগুলিও সর্ব্বপ্রকার মনুষ্যে এক ভাবের পরিচয় দেয়। শ্রদ্ধাভক্তিও তদ্রূপ। ফলে, একজন ব্যক্তিতে স্থূলেই হউক, কিম্বা সূক্ষ্মেই হউক, অথবা কারণ ও মহাকারণেই হউক, যাহা আছে, ব্রহ্মাণ্ড-স্থিত সমুদয় মনুষ্যে তাহাই আছে; কোথাও ইহার বিন্দুবিসর্গ প্রভেদ হইতে পারে না। এমন মনুষ্য কি কেহ দেখিয়াছেন, যাহার দেহে শোণিতের পরিবর্ত্তে জল কিম্বা তৈল অথবা দুগ্ধ কার্য্য করিতেছে? স্নায়ু-মণ্ডলীর কার্য্য কি ব্যক্তিবিশেষে সুতার দ্বারা নির্ব্বাহ হয়? কখন নহে। ক্ষুধায় আহার এবং পিপাসায় জলপান করা মনুষ্যদিগের সাধারণ ধর্ম্ম। এ ধর্ম্মের কি ব্যতিক্রম কোথাও হয়? এই নিমিত্ত

মনুষ্যেরা সর্ব্ববিষয়ে সম-ধর্ম্ম-বিশিষ্ট বলিয়া উল্লিখিত হইলে, প্রকৃত কথাই বলা হয়।

আপন দেহের অতি দূরতম স্থানে যদ্যপি সমতাভঙ্গ হয়, তাহা হইলে মনের সমতা-ভঙ্গ হওয়া অনিবার্য্য। যেমন, পাদমূলে কণ্টক বিদ্ধ অথবা অঙ্গুলিপ্রান্তে স্ফোটকাদি হইলে, যে পর্য্যন্ত কণ্টক বাহির হইয়া না যায়, কিম্বা স্ফোটক আরোগ্য না হয়, সে পর্য্যন্ত মনের সমতা স্থাপন হইতে পারে না। কি রূপে কণ্টক বাহির হইবে, কি উপায় অবলম্বন করিলে স্ফোটকের যন্ত্রণা হইতে পরিত্রাণ পাইবে, মনের তাহাই একমাত্র জপমালা হইয়া থাকে। মনের এই প্রকার সমতা ভঙ্গ হওয়া যে কেবল আপন শরীরে আবদ্ধ থাকে, তাহা নহে। আপন পরিবারবর্গের যদ্যপি ঐরূপ কোন প্রকার দৈহিক সমতা বিচ্ছিন্ন হইবার কারণ হয়, তাহা হইলে সেই হিল্লোল সংসারের সর্ব্বত্রে সমভাবে পরিব্যাপ্ত হইয়া থাকে। বাটীর সকল নরনারীই উদ্বিগ্নযুক্ত হইয়া পড়েন। উদ্বিগ্ন হওয়াই মনের সমতাচ্যুতির লক্ষণস্বরূপ। আধি-ভৌতিক উপদ্রব যেরূপ মানসিক সমতা বিচ্ছিন্ন করিবার হেতুবিশেষ হয়, আধিদৈবিক এবং আধ্যাত্মিক কারণেও সেইরূপ মনের সমতা বিনষ্ট হইয়া থাকে। ব্যাঘ্রাক্রমণ, সর্পদংশন, বজ্রাঘাতাদি বিভীষিকায় এবং আপন দেহের অধর্ম্মকার্য্যাদির পরিণাম চিন্তায় মনের কখন স্থৈর্য্যভাব সংরক্ষিত হয় না। পরিবার সম্বন্ধীয় অন্যের তদবস্থা হইলে তাহার নিজের মানসিক চিন্তার ন্যায় অন্যান্য সকলের তদ্রূপই চিন্তা হইয়া থাকে, অর্থাৎ যে বিপন্নাবস্থায় পতিত হইয়াছে, তাহার যেরূপ চিত্তবৈকল্য উপস্থিত হয়, তাহার আত্মীয় সম্বন্ধেও সেইরূপ অবস্থা সংঘটিত হইয়া থাকে।

আত্মীয় সম্বন্ধ বলিলে কি বুঝায়? অর্থাৎ যাহারা আপনার। আপ-

নার বলি কাহাকে? শোণিত শুক্রের সম্বন্ধ বিচারপূর্ব্বক আপনার পর বিচার করা হয়. ইহাই সাধারণ পারিবারিক সম্বন্ধ। এই শোণিত শুক্রের সম্বন্ধ সীমাবিশিষ্ট আপন পরিবারের মধ্যে আবদ্ধ না রাখিয়া অন্তর দৃষ্টিতে অবলোকন করিলে অতি বিস্তীর্ণ ভাবের পরিচয় দেয়। যদিও ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তি ভিন্ন ভিন্ন পরিবার সংগঠন পূর্ব্বক অবস্থিতি করিতেছে, কিন্তু তাহাদের পূর্ব্বপর বংশানুক্রম বিচার করিতে যাইলে, পরিশেষে এক শোণিত শুক্রই সকলের নিদান বলিয়া জ্ঞাত হওয়া যাইবে।

ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টিকালে বর্ত্তমান কালের ন্যায় বহুবিধ জাতি ও পরিবার এককালে ভিন্ন ভিন্ন প্রক্রিয়ায় ভিন্ন ভিন্ন সৃষ্টিকর্ত্তার দ্বারা সৃজিত হয় নাই। অদ্বিতীয় ব্রহ্মাই সৃষ্টিকর্ত্তা, তাঁহা হইতেই হিন্দু, মুসলমান, ম্লেচ্ছ প্রভৃতি সমগ্র পৃথিবীর নরনারী সৃজিত হইয়াছে বলিলে সত্য কথা বলা হয়। সে হিসাবে সমুদয় নরনারী এক পরিবারস্থিত, সুতরাং পরস্পরের আভ্যন্তরিক সম্বন্ধ বিধায় একের শারীরিক বা মানসিক সমতা বিচ্ছিন্ন হইলে তাহা সাধারণকে স্পর্শ করিয়া থাকে। এই নিমিত্ত আধিভৌতিক, আধিদৈবিক এবং আধ্যাত্মিক মঙ্গল-জনক কার্য্যের নিমিত্ত সকলকেই ব্যতিব্যস্ত থাকিতে দেখা যায়।

সমতা সংস্থাপন করা বিশ্বপতির প্রাকৃতিক নিয়ম। সুতরাং তাহার বৈপরীত্য সংঘটনা করা সৃজিত পদার্থের শক্তির অতীত কার্য্য। শরীরের কোন স্থান বিচ্ছিন্ন হইলে তাহা যে পর্য্যন্ত সংস্কৃত না হয়, সে পর্য্যন্ত তথায় সমতা স্থাপন হইতে পারে না এবং সেই কার্য্য স্বয়ং প্রকৃতিই সম্পাদন করিয়া থাকেন, চিকিৎসকেরা প্রকৃতির অভিপ্রায়ানুযায়ী কতিপয় আজ্ঞা পালন করিয়া যান। যখন কোন স্থানে বায়ুর সমতা ভ্রষ্ট হয়, তথাকার সমতা সংস্থাপনের নিমিত্ত বায়ুই আসিয়া উপস্থিত

হয়। ইহা প্রকৃতির অপরিবর্ত্তনীয় বিধান। জলাশয় হইতে এক গণ্ডূষ জল উত্তোলন করাই হউক, কিম্বা কল বসাইয়া প্রচুর পরিমাণে জল আকর্ষণ করাই হউক, জলাশয়ের সমতা বিচ্ছিন্ন হয় না। এতদ্দ্বারা আমরা এই বুঝিতে পারি যে, কঠিন পদার্থের সমতা স্থাপন হওয়া সময়সাপেক্ষ, কিন্তু তরল পদার্থ সম্বন্ধে এক অনুপল সময়ও বিলম্ব হয় না।

প্রকৃতির এই নিয়মানুসারে আমরা সকলেই পরিচালিত হইতে বাধ্য। সুতরাং মনুষ্যজাতির শারীরিক বা মানসিক ভাব সম্বন্ধীয় কোন প্রকার অসমতা উপস্থিত হইলে তথায় পুনঃ সমতা সংস্থাপনের নিমিত্ত সেই প্রকার ভাবের অবশ্যই কার্য্য হইয়া থাকে। এই নিমিত্ত ধর্ম্ম সম্বন্ধে সাম্প্রদায়িক ধর্ম্মের ভাব প্রচার করা প্রাকৃতিক নিয়মাধীন, সুতরাং তাহাতে আপত্তি উত্থাপন করা যায় না।

প্রাকৃতিক নিয়মের চরণে জানিয়াই হউক, বা না জানিয়াই হউক, সকলেই মস্তকাবনত করিয়া থাকিতে বাধ্য হইয়া থাকেন। সাম্প্রদায়িক ধর্ম্ম প্রচার দ্বারা যদ্যপি সমতা স্থাপন করাই প্রকৃতির উদ্দেশ্য হয়, তাহা হইলে তাহাতে কাহারও কোন কথা চলিতে পারে না বটে, কিন্তু কথা হইতেছে যে, যথায় সমতা স্থাপন হয়, তথায় অশান্তি থাকিতে পারে না। সাম্প্রদায়িক ধর্ম্মপ্রচারের দ্বারা সমতা সংস্থাপন হওয়া দূরে থাকুক, অশান্তির বিভীষিকা হইতে পরিত্রাণ পাওয়া যায় না। সমতা স্থাপিত হইবে কোথায়? আমি বলি আমার ধর্ম্মই বিশ্ব-জনীন, ইহার দ্বারা সমতা স্থাপন হইবে; তুমি বল তোমার ধর্ম্মই সমতাস্থাপনের একমাত্র হেতুস্বরূপ। এইরূপে পরস্পর বিবাদবিসম্বাদ সংঘটনা হওয়া ব্যতীত, অবিশ্রাম সমতাভঙ্গের তিক্তরসাস্বাদন ব্যতীত আনন্দের আভাস প্রাপ্ত হইবার সম্ভাবনা নাই।

ধর্ম্মজগতের বিশ্বজনীন ধর্ম্মভাব সম্বন্ধে রামকৃষ্ণদেব আপনি আপনাকে দৃষ্টান্তস্বরূপ যাহা দেখাইয়াছেন, তাহার আশ্রয় লইলে এই চিরাকাঙ্ক্ষিত সর্ব্বজনকল্যানকর বিষয়টীর যথার্থ মীমাংসা প্রাপ্ত হওয়া যাইবে। রামকৃষ্ণদেব বলিয়াছেন যে, "অদ্বৈত জ্ঞান আঁচলে বেঁধে যা ইচ্ছা তাই কর"।

তিনি বলিতেন যে, কাহাকে কোন বিষয় শিখাইয়া না দিলে সে কখন আপনি তাহা শিক্ষা করিতে পারে না। শিক্ষার পরে উহা অভ্যাস করিলে তবে তাহা হইতে সুফল ফলিবার সম্ভাবনা। তিনি দৃষ্টান্ত দিয়া বলিতেন যে, "নাক্ তেরা খেটি" তবলার বোল মুখে শিক্ষা করিতে এক মুহূর্ত্তের অধিক সময় লাগে না, কিন্তু হাতে অভ্যাস করিয়া বাদ্যযন্ত্রে বোল্‌টী স্পষ্ট করিয়া বাহির করিতে ছয় মাস লাগে। অর্থাৎ যে কোন বিষয় হউক, সে বিষয়টীর আদ্যোপান্ত মর্ম্ম অবগত হইয়া আপন শক্তি অনুসারে কার্য্য করিলে কার্য্যানুরূপ ফল ফলে। তিনি আরও বলিতেন যে, পাঁজিতে লেখা থাকে যে, এ বৎসরে ২০ আড়ি জল হইবে। কিন্তু পাঁজি নিংড়াইলে কি এক ফোঁটা জল বাহির হইতে পারে? এই নিমিত্ত সকলকে বিশেষ সতর্ক হইবার জন্য বলিতেন যে, সিদ্ধি খাইলে আনন্দ হয়, কিন্তু সিদ্ধি সিদ্ধি করিয়া যদ্যপি জীবনান্তকাল পর্য্যন্ত কেহ চিৎকার করে, তাহা হইলে সে কখনই সিদ্ধির আনন্দ উপলব্ধি করিতে পারিবে না। যদ্যপি সে অন্যমনস্ক হইয়া যাইবার নিমিত্ত সাময়িক শান্তির আভাস প্রাপ্ত হয়, তাহাকে সিদ্ধির আনন্দ কহা যাইতে পারে না, সিদ্ধির আনন্দ লাভ করিতে হইলে সিদ্ধি আনয়ন করিতে হইবে, কেবল আনয়ন করিলে হইবে না, তাহাকে ঘুঁটিতে হইবে; কেবল মুখের ভিতর রাখিলেও হইবে না, তাহা গিলিয়া ফেলিতে হইবে; তৎক্ষণাৎ উদ্দীরণ

করিলে হইবে না, পেটের ভিতর কিয়ৎকাল থাকিলে তবে নেশা হইবে; তখন সে আনন্দে জয় কালী জয় কালী বলিয়া নৃত্য করিতে থাকিবে।

কোন বিষয় শিক্ষা করিয়া তাহা অভ্যাস অর্থাৎ কার্য্যে পরিণত না করিলে যেরূপ কোন কার্য্যেরই হয় না, শিক্ষাবিহীন কার্য্যেও সেইরূপ প্রতি পদে পদে বিভীষিকা এবং বিড়ম্বনা সমুপস্থিত হইয়া থাকে। ইহার দৃষ্টান্তের অপ্রতুল নাই। আমরা প্রতিদিন প্রত্যেক কার্য্যেই তাহা প্রত্যক্ষ করিতেছি। বিশ্ববিদ্যালয় হইতে পরিক্ষোত্তীর্ণ ছাত্রকে আফিসের একখানি সামান্য চিঠি লিখিতে দিলে সে দশদিক্ অন্ধকার দেখে। তাহার অপরাধ কি? সে আফিসের কার্য্য কার্য্যক্ষেত্রে যাইয়া কখন করে নাই, কেমন করিয়া তাহার দ্বারা তাহা সম্পন্ন হইবার প্রত্যাশা করা যাইতে পারে! একদিন জনৈক ইউরোপীয় বৈজ্ঞানিক অধ্যাপক ছাত্রদিগকে বিজ্ঞান সম্বন্ধে উপদেশ দিবার পূর্ব্বে সঙ্কল্পিত পরীক্ষাগুলি আয়ত্ত করিতেছিলেন। তিনি একটী সোডাওয়াটারের বোতলে অক্সিজেন এবং হাইড্রোজেন বাষ্পদ্বয় পরিপূর্ণ করিয়া ছিপির দ্বারা বোতলের মুখটী আবদ্ধ করণান্তে উহা আপনার দিকে রাখিয়া অপর দিকে উত্তাপ প্রয়োগ করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন।

ইহাপেক্ষা আর একটী রহস্যজনক ঘটনা বলিতেছি তদ্দ্বারা আনুমানিক শিক্ষিত এবং প্রত্যক্ষ শিক্ষিতের বিশেষ পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যাইবে। একদা সংস্কৃতশিক্ষিত একটী ব্রাহ্মণ কোন কায়স্থের বাটীতে নৈমিত্তিক কার্য্যবিশেষ সাধন করিতে আসিয়াছিলেন। গৃহস্থকে প্রণবসংযুক্ত করিয়া সমুদয় মন্ত্র পড়াইলেন এবং মাতুল গোত্রে পিতৃ পক্ষের উল্লেখ ও পিতৃগোত্রে মাতুল পক্ষের উল্লেখ করিয়া কার্য্য সম্পূর্ণ করিয়া যাইলেন। যখন গোত্র লইয়া বিপর্য্যয় করেন, তখন তাঁহার

ভ্রম প্রদর্শন করায় কহিলেন, "উহাতে আর কি দোষ হইয়াছে? মন্ত্র পাঠে যদ্যপি ব্যাকরণের ভুল হইত, তাহা হইলে দোষ স্বীকার করিতাম।" প্রণব সংযোগে মন্ত্র পাঠ করিবার দ্বিজ ব্যতীত অন্যের অধিকার নাই, ইহা সমাজিক ব্যক্তিমাত্রে জানেন। তিনি কি হিসাবে তাহা উল্লঙ্ঘন করিলেন, এই কথা জিজ্ঞাসা করায় ব্রাহ্মণ ক্রুদ্ধ হইয়া কহিলেন যে,"সামাজিক কার্য্যে পটু ব্রাহ্মণেরা সকলেই মূর্খ,শুদ্ধাশুদ্ধের কোন সংশ্রব তাঁহারা রাখেন না।"

এই নিমিত্ত প্রভু বলিতেন যে, চিকিৎসকেরা যেমন কিছু ঔষধ সেবন এবং কিছু মালিশ করিতে দেয়, তেমনি শিক্ষা এবং কার্য্য উভয়েরই প্রয়োজন।

কোন দেশে গমন করিতে হইলে তথায় যাইবার পথ এবং পথের কোথায় কিরূপ অবস্থা বিশেষ তদন্ত করিয়া না লইলে বাস্তবিক পথিকের ক্লেশ হইবার সম্ভাবনা। ধর্ম্মপথে পরিভ্রমণ করিবার পূর্ব্বে ধর্ম্মের মর্ম্ম জ্ঞাত না হইয়া যে ব্যক্তি কার্য্যে প্রবৃত্ত হন, অথবা কার্য্য ত্যাগ করিয়া কেবল মর্ম্ম নিরূপণ করিয়া বেড়ান, উভয়স্থলেই বিড়ম্বনা সংঘটিত হইয়া থাকে।

ধর্ম্মরাজ্যের ইতিহাস পাঠ করিলে দেখা যায় যে, অতি পুরাকাল হইতে বর্ত্তমান কালপর্য্যন্ত যেস্থানে যে কোন ধর্ম্মভাব প্রস্ফুটিত হইয়াছে, তথায় রামকৃষ্ণদেবকথিত "অদ্বৈত জ্ঞান আঁচলে বেঁধে যা ইচ্ছা তাই কর" এরূপ উপদেশ এবং তদনুরূপ কার্য্য করিতে কেহ আদেশ করেন নাই এবং কেহ নিজেও তাহা কার্য্য করিয়া দেখেন নাই, বা দেখান নাই, সুতরাং, এরূপ ভাবের কার্য্যেরও কখন সূচনা হয় নাই।

আমার এই কথা শ্রবণ করিয়া অনেকে চমকিত হইয়া বলিতে পারেন যে, অদ্বৈত জ্ঞানের নিমিত্তই ভারতবর্ষ চিরবিখ্যাত। বেদান্তাদি

শাস্ত্র তাহার ভিত্তিভূমি এবং আমাদের অরণ্য ও গিরিগুহাবাসী ঋষিরা জাজ্বল্যপ্রমাণ সত্ত্বে রামকৃষ্ণদেবকে অদ্বৈত ভাবের কার্য্য করিবার কর্ত্তা বলা কিরূপে ন্যায়সঙ্গত হইল ? আমি অবনতমস্তকে স্বীকার করি যে, অদ্বৈত জ্ঞান সম্বন্ধে রামকৃষ্ণদেব আবিষ্কারক নহেন। তিনি বলিয়াছেন যে, "অদ্বৈত জ্ঞান আঁচলে বাঁধিয়া যাহা ইচ্ছা তাহা কর।" অর্থাৎ অদ্বৈত জ্ঞান যাহাকে বলে, তাহা অগ্রে লাভ করিয়া তদনন্তর যাহা ইচ্ছা অর্থাৎ যে কোন প্রকার সাধন ভজন করিতে হয়, তাহা করিলে তবে সর্ব্বত্রে সমতা স্থাপন হইবে। অদ্বৈত জ্ঞান ব্যতীত সমতা সংস্থাপনের দ্বিতীয় পন্থা নাই। এই কথা ইতিপূর্ব্বে কেহ বলেন নাই, কেহ তাহা করেন নাই, কিম্বা কেহ কাহাকে অনুষ্ঠান করিতে বলেনও নাই।

আমাদের যাবতীয় ধর্ম্মশাস্ত্র সংক্ষেপে দুই শ্রেণীতে বিভক্ত করা যায়। অদ্বৈতজ্ঞান বিষয়ক এবং দ্বৈতজ্ঞান বিষয়ক। অদ্বৈতজ্ঞানে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য সমুদয় কার্য্যকে মায়ার অন্তর্গত বলিয়া পরিত্যক্ত হইয়াছে। অদ্বৈতবাদী পরমহংস কি দশভুজার সম্মুখে মস্তকাবনত করিতে পারেন? না রাম কৃষ্ণ, গৌরাঙ্গ, মহম্মদ এবং খ্রীষ্টকে অবতার, অর্থাৎ অদ্বৈত ব্রহ্মের লীলারূপ বলিয়া স্বীকার করিতে পারিবেন? কখন না। দ্বৈতবাদীদিগের কথাই নাই। ইঁহারাই সাম্প্রদায়িক ধর্ম্মানুষ্ঠান করেন। ইঁহারাই আপনাপন ভাবকে অদ্বৈত জ্ঞান কহিয়া থাকেন। অর্থাৎ যিনি যে ভাবে ধর্ম্ম সাধন বা শিক্ষা করেন, তিনি সেই ভাবকেই অদ্বৈত জ্ঞান বলিয়া উল্লেখ করেন এবং তাহাতে সকলকে আকর্ষণ-পূর্ব্বক সর্ব্বত্রে সমতা সংস্থাপন করিবার অভিপ্রায়ে সর্ব্বদা ব্যতিব্যস্ত হইয়া বেড়ান।

ধর্ম্মরাজ্যের কার্য্যক্ষেত্রের প্রতি নিরীক্ষণ করিলে এই দেখা যায় যে, অদ্বৈতজ্ঞানীরা দ্বৈতজ্ঞানকে পরিত্যাগ করেন এবং দ্বৈত ভাবের

উপাসকেরা তাহাকেই অদ্বৈত জ্ঞান কহেন, সুতরাং, তথায় অসামঞ্জস্য ভাবের পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায়। এই অসামঞ্জস্য ভাব দূরীভূত করিবার নিমিত্ত রামকৃষ্ণদেব 'অদ্বৈত জ্ঞান আঁচলে বেঁধে যা ইচ্ছা তাহা কর' বলিয়া গিয়াছেন। এই সর্ব্বকল্যাণকর উপদেশবাক্যের তাৎপর্য্য কি?

আমরা পৃথিবীর প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে পদার্থদিগের ভাববৈচিত্র্য দেখিতে পাই। এমন কি এক পদার্থেরই ভাবের ইয়ত্তা করা দুরূহ হইয়া উঠে। পেয়ারা একটী পদার্থ, কিন্তু এক প্রকার আস্বাদন ও আকৃতিপ্রকৃতিবিশিষ্ট পেয়ারা হয় না। আঁব, কাঁঠাল প্রভৃতি সকল প্রকার ফলমূল লইয়া বিচার করিলে সর্ব্বত্রে এইরূপ বহুভাব প্রাপ্ত হওয়া যায়। উদ্ভিদ্‌রাজ্যের প্রত্যেক তরু, লতা, গুল্ম, ওষধি ও তৃণাদি বহুভাবব্যঞ্জকরূপে প্রতীয়মান হয়। জান্তবরাজ্য অবলোকন করিলে মনুষ্যবুদ্ধি একেবারে বিকৃত হইয়া যায়। প্রতিগৃহে প্রত্যেক পরিজন পরস্পর পার্থক্যের পূর্ণ পরিচয় দেয়। গৃহ ছাড়িয়া পল্লীতে যাইলে এই পার্থক্য জ্ঞান সম্যকরূপে বর্দ্ধিত হয়। পল্লী অতিক্রম করিয়া যত অগ্রসর হওয়া যায়, ততই পার্থক্যের চূড়ান্ত হইয়া আইসে। আপন গৃহে বংশক্রমানুসারে সম্বন্ধ ও ভাবের ইতরবিশেষ হয়। পিতা, পিতামহ, বৃদ্ধপিতামহ, অতিবৃদ্ধপিতামহ প্রভৃতি কয়েক পুরুষ উর্দ্ধে যাইলে ক্রমেই সম্বন্ধের ব্যবধান বাড়িয়া যায়। পিতার সহিত যে সম্বন্ধ, পিতামহের সহিত সেরূপ হয় না। পিতা কিম্বা পিতৃব্যাদি বিয়োগে পিতামহের যে প্রকার ক্লেশ হয়, পৌত্র বিয়োগে তাঁহার সে প্রকার ক্লেশ হইতে পারে না। পল্লীর কথায় প্রয়োজন নাই. তথায় একেবারে আত্মসম্বন্ধ চ্যুত হইয়া যায়। দেশ দেশান্তরের কথা কথার অতীত বিষয়। জীব জন্তু কীট পতঙ্গের গণনা করিতে

যাইলে মনুষ্যের ধারণাশক্তি পরাজিত হইয়া যায়। খনিজ এবং অন্যান্য পদার্থ লইয়া আর দৃষ্টান্ত বর্দ্ধিত করিবার প্রয়োজন নাই। ফল কথা হইতেছে যে, বহির্জ্জগতের স্থূল পদার্থপুঞ্জের আলোচনায় মানবগণ এতদূর পার্থক্যবোধক জ্ঞান লাভ করে, যে সেই সকল সংস্কার হইতে পরিত্রাণ পাইতে হইলে বিশেষ যত্ন ও অভ্যাসের আবশ্যক হইয়া থাকে।

স্থূল জগতের স্থূল জ্ঞান আপনিই সঞ্চারিত হয়। এই জ্ঞানোপার্জ্জন করিতে বিশেষ চেষ্টা করিতে হয় না। লীলাময়ের বিশ্বরচনার সুব্যবস্থাই উপদেষ্টার কার্য্য করিয়া থাকে। স্থূলের কার্য্য পরস্পর বিরুদ্ধস্বভাবসম্পন্ন। কাহার সহিত কাহারও সামঞ্জস্য বা ঐক্য হওয়া তাহাদের ধর্ম্মবিরুদ্ধ বলিয়া দৃষ্ট হয়। ফলতঃ, বিশ্বসংসার যেন ভালমন্দের সংগ্রামক্ষেত্রবিশেষ। যে দিকে এবং যাহার দিকে দর্শন করা যায়, তাহাকে স্বতন্ত্র ও স্বস্বপ্রধান বলিয়া জ্ঞান হইয়া থাকে। তাহার সহিত কাহার তুলনা হয় না। একটী মনুষ্যের মত ঠিক আর একটী মনুষ্য পাওয়া যায় না, একটী মনুষ্যের বর্ণের ন্যায় আর এক জনের বর্ণ মিলে না, এক জনের প্রকৃতির মত আর একজনের প্রকৃতি হয় না. এক জনের কার্য্যকলাপের সহিত আর এক জনের কার্য্যকলাপের সাদৃশ্য থাকে না। আমি যাহা বুঝি, তুমি তাহা বুঝিবে না, আমি যাহা করি, তুমি তাহা কখন করিবে না, আমি যাহা বলি, তুমি তাহা বলিবে না, ইহাই স্থূলের পরিচয়। দেখিতেছি বিষ, দেখিতেছি অমৃত, দেখিতেছি সাধু, দেখিতেছি অসাধু, দেখিতেছি বিদ্বান, দেখিতেছি মূর্খ, দেখিতেছি রূপবান্, দেখিতেছি কুৎসিত, দেখিতেছি বলিষ্ঠ, দেখিতেছি দুর্ব্বল, দেখিতেছি নিরোগী, দেখিতেছি রোগী, দেখিতেছি ধার্ম্মিক, দেখিতেছি অধার্ম্মিক, দেখিতেছি সতী, দেখিতেছি অসতী, দেখিতেছি দিন, দেখিতেছি রাত্রি। এরূপ পার্থক্যতাপূর্ণ স্থানে অব-

স্থিতি করিলে মনে ইহাদের সংস্কার পতিত হয় এবং তদনুরূপ কার্য্য করিতে সকলেই বাধ্য হইয়া থাকে।

সাধারণ নরনারী এই ভাবাপন্ন হইয়া যতই বয়োবৃদ্ধি লাভ করে, পরবর্ত্তী শিক্ষা এবং অবস্থার প্রসাদে তাহাদের পার্থক্যজ্ঞান ক্রমে বদ্ধমূল হইয়া যায়। তখন আমি অমুক, আমি ধনী, আমি মানী, আমি পণ্ডিত, আমি সাধু, আমি যাহা বুঝি, এমন আর কেহ বুঝিতে পারে না, আমার অমুক, অমুক আমার কেহ নয়, ইত্যাকার ভাবে দিন যাপন করিয়া থাকে। সাধারণ নরনারীর এই অবস্থায় তাঁহারা ধর্ম্ম শিক্ষা করেন, সুতরাং, তাহাও মানসিক ধারণা এবং সংস্কারবশতঃ পার্থক্যভাবে রঞ্জিত হইয়া যায়। সুতরাং, সে অবস্থায় তাহাদের পরস্পর অনৈক্যতা ব্যতীত সমতা উপলব্ধি করিবার শক্তি একবারেই অপনীত হয়। সেই-জন্য সমতা স্থাপনের নিমিত্ত অপরকে আপন ভাবে ও ধর্ম্মে পরিবর্ত্তন করিবার সর্ব্বদা আয়োজন হইয়া থাকে।

স্থূলে থাকিয়া স্থূলের পরাক্রম অতিক্রম করিয়া কখন কার্য্য করা যায় না। এই নিমিত্ত রামকৃষ্ণদেব সর্ব্বাগ্রে অদ্বৈত জ্ঞান লাভ করিতে বলিয়াছেন। অদ্বৈতজ্ঞান লাভ পূর্ব্বক ধর্ম্মাচরণ করিলে কালে সর্ব্বত্রে আকাঙ্ক্ষিত সমতা স্থাপন হইয়া যাইবে।

অদ্বৈতজ্ঞান বলিলে সাধারণ হিন্দুমত যাহা, তাহা রামকৃষ্ণদেবের অভিপ্রায় নহে। সাধারণ হিন্দুমতে অদ্বৈতজ্ঞানকে ব্রহ্মস্বরূপ কহা যায় এবং সেই জ্ঞান লাভ করিতে হইলে স্থূল জগৎকে মায়া বলিয়া পরিত্যাগ করিতে হয়। এমন কি, আপনার শরীর, মন এবং মানসিক বৃত্তি ও তৎপ্রসূত কার্য্যকলাপ সমুদয় মিথ্যা বলিয়া সম্পূর্ণ ধারণা এবং বিশ্বাস না করিতে পারিলে অদ্বৈতজ্ঞানী হওয়া যায় না। এইরূপ অদ্বৈতজ্ঞানে ভাব, প্রেম, শ্রদ্ধা, ভক্তি কিছুই স্থান পায় না, ব্রহ্ম এবং

ব্রহ্মাণ্ডের স্বাতন্ত্র্য থাকে না, নিত্য লীলা একাকার হইয়া যায়। সাকার রূপের মহাপ্রলয় হয়, এমন কি, উপাস্য উপাসকের সম্বন্ধ পর্য্যন্ত বিলুপ্ত হইয়া আইসে।

এইরূপ অদ্বৈতবাদী আপনাকে ব্রহ্ম বলিয়া পরিচয় দেন এবং তাহাই সকলের পরিণাম, এই মর্ম্মে ঘোষণাপত্র প্রচার করিয়া বিশ্ব-জনীন ধর্ম্মের উপসংহার করেন।

যদ্যপি এই অদ্বৈতজ্ঞানকে বিশ্বজনীন ধর্ম্ম বলিয়া স্বীকার করা যায়, তাহা হইলে সর্ব্বত্র সমতা স্থাপিত না হইয়া বরং মহাপ্রলয় উপস্থিত হইবার কথা। এই ভা বকে মহাপ্রলয় ব্যতীত অন্য শব্দে উল্লেখ করা যায় না। মহাপ্রলয়ে স্থূল জগৎ একাকার হইয়া যায়, বিশ্ব জগতের বিবিধ নয়নানন্দপ্রদ বস্তু সকল আকারবিহীন হইয়া অবস্থান্তর লাভ করে, এই নিমিত্ত উহাকে মহাপ্রলয় কহা যায়। অদ্বৈত জ্ঞানে বরং তাহা অপেক্ষা দূরতম স্থানে গমন করিতে হয়, সুতরাং মহাপ্রলয় শব্দের দ্বারা স্থূল ব্রহ্মাণ্ডের চূর্ণবিচূর্ণতা ভাবের পরিচয় দিয়া থাকে।

যদ্যপি অদ্বৈত জ্ঞানকেই বিশ্বজনীন ধর্ম্ম, সত্যধর্ম্ম, নিত্যধর্ম্ম, প্রত্যে-কের অবশ্য প্রতিপাল্যধর্ম্ম বলা হয়, তাহা হইলে হিন্দুধর্ম্মান্তর্গত পৌরা ণিক এবং তান্ত্রিক ভাব আর ধর্ম্ম বলিয়া স্থান পাইতে পারে না, একথা অদ্বৈতবাদীরা মুক্তকণ্ঠে প্রচার করিয়া থাকেন। অতএব পুরাণ এবং তন্ত্রকল্পিত গ্রন্থ মনুষ্যদিগকে নিরয়কুণ্ডে নিক্ষেপ করিবার পন্থা-বিশেষ বলিয়া অবশ্য মানিয়া লইতে হইবে। কিন্তু রামকৃষ্ণদেবের অভিপ্রায়ে তাহা কখনও স্বীকার করা যায় না। তিনি বলিতেন যে, বেদ, পুরাণ, তন্ত্র প্রভৃতি হিন্দুদিগের এবং অন্যান্য সমুদয় জাতির ধর্ম্ম-শাস্ত্রও সত্য। সুতরাং, কেবল অদ্বৈতজ্ঞানকে বিশ্বজনীন ধর্ম্ম বলা যায় না।

এক্ষণে জিজ্ঞাস্য হইতেছে যে, রামকৃষ্ণদেবের কথায় বিশ্বাস করিয়া পুরাণ, তন্ত্র এবং যবন ও ম্লেচ্ছাদির ধর্ম্মশাস্ত্রকে সত্য বলিয়া স্বীকার করিব কেন? বিশেষতঃ অদ্বৈতজ্ঞান হিন্দুশাস্ত্রোক্ত, অতি প্রাচীন কাল হইতে যোগপরায়ণ আর্য্য ঋষিমুনির পরম আদরের সামগ্রী এবং হিন্দু জাতির ইহাই একমাত্র স্পর্দ্ধার বিষয় বলিয়া অদ্যাপি সর্ব্ববুধমণ্ডলীর সমক্ষে প্রতীয়মান হইতেছে। রামকৃষ্ণদেব সেই অদ্বৈতজ্ঞানকে হিন্দুর আধুনিক কল্পিত এবং বিজাতীয় শাস্ত্রাদির ভাবের সহিত সমতা করায় কি অন্যায় কার্য্য করেন নাই? আমি এইরূপ প্রশ্নের উত্তরে অতি বিনীতভাবে বলিতেছি যে, প্রভুর উপদেশের দ্বারা ধর্ম্ম লইয়া তুলনা অর্থাৎ কাহারও ইতরবিশেষ করিবার কোন কথাই দেখা যায় না। তিনি এইমাত্র বলিয়াছেন যে, সকল ধর্ম্মই সত্য। ধর্ম্ম বলিলে অসত্য বা কাল্পনিক মনুষ্য-বুদ্ধিপ্রসূত জ্ঞানগর্ভ রচনাবিশেষ নহে। তিনি এই নিমিত্তই অদ্বৈত জ্ঞান অগ্রে লাভপূর্ব্বক পরিশেষে কার্য্যের কথা উল্লেখ করিয়াছেন। তাঁহার এই উপদেশের তাৎপর্য্য বাহির করিয়া দেখিলে সর্ব্বসংশয় ভঞ্জন হইয়া যাইবে।

অদ্বৈতজ্ঞান অর্থে এক জ্ঞান বুঝায়। যে জ্ঞানে দুইটী ভাব থাকিতে পারে না, এমন জ্ঞানকেই অদ্বিতীয় জ্ঞান বলা যায়। অদ্বৈতজ্ঞান শিক্ষা করিতে হইলে কোথায় যাইতে হইবে? কে তাহার উপদেশ দিবেন এবং কোন্ পুস্তকইবা অধ্যয়ন করা যাইবে? হিন্দুশাস্ত্র, মুসলমানশাস্ত্র, খৃষ্টানশাস্ত্র এই জ্ঞানলাভের সুলভ সোপান? কোন শাস্ত্রই অদ্বৈতজ্ঞান প্রদান করিতে সমর্থ নহে। হিন্দুশাস্ত্র আলোড়ন করিলে যে প্রকার অদ্বৈত জ্ঞান প্রাপ্ত হওয়া যায়, তাহার আভাস ইতি-পূর্ব্বে প্রদত্ত হইয়াছে। খৃষ্ট ও মুসলমানগ্রন্থে সে সম্বন্ধে বিশেষ কোন কথা নাই। তবে অদ্বৈতজ্ঞান লাভের স্থান কোথায়? রামকৃষ্ণদেব

কহিয়াছেন যে, বিশ্বপতির তত্ত্ব জানিতে হইলে তাঁহাকেই জিজ্ঞাসা করিতে হইবে। তিনি এই স্থানে দৃষ্টান্ত দ্বারা বুঝাইতেন, যেমন কাহার কত সম্পত্তি আছে, বাহিরের লোকের আনুমাণিক সিদ্ধান্তের দ্বারা কখন স্থির হইতে পারে না। সেই ব্যক্তি যদ্যপি কাহাকে সিন্দুক খুলিয়া দেখাইয়া দেয়, তাহা হইলে প্রকৃত সমাচার পাওয়া যাইতে পারে। ভগবান্ সম্বন্ধে সে প্রকার কার্য্য কিরূপে হইবে?

যদ্যপি কালীদাসকে কবিকুলচূড়ামণি বলিবার হেতু অন্বেষণ করিতে হয়, তাহা হইলে তাঁহার কার্য্য অর্থাৎ গ্রন্থাদি দেখিতে হয়। মহাপ্রভু অবতারবিশেষ কেন? তিনি অবতার, যেহেতু, তাঁহার কার্য্যকলাপে অমানুষশক্তির পরিচয় পাওয়া যায়। ফলে, কার্য্য দেখিয়া কর্ত্তার শক্তি বা গুণ প্রকাশ পায়।

জ্ঞান লাভ করিতে হইলে বিশ্বরচনা পর্য্যালোচনা করাই কর্ত্তব্য।

বিশ্বসংসারে স্থূলে সমুদয় পদার্থই বহুভাবের পরিচায়ক। কিন্তু স্থূল ভাব হইতে অন্তর্দৃষ্টির দ্বারা উহাদের আভ্যন্তরিক গঠনাদি নিরীক্ষণ করিলে এক পদার্থ ভিন্ন ভিন্ন অবস্থায় ভিন্ন ভিন্ন পদার্থরূপে প্রকাশিত হয়। হীরক, গ্র্যাফাইট, কয়লা, কাষ্ঠ, জীব, জন্তু, বৃক্ষ, লতা, ফল, মূল প্রভৃতি অসংখ্য প্রকার স্বতন্ত্র পদার্থ হইতে অন্তর্দৃষ্টিযোগে অতি সুন্দর অদ্বৈতজ্ঞান লাভ করা যায়। অর্থাৎ এই বহু বিচিত্র আকৃতি, প্রকৃতি ও ব্যবহারের পদার্থনিচয়ে এক অদ্বিতীয় অঙ্গার বিরাজ করে! হীরকে অঙ্গার, একথা প্রক্রিয়াশীল বৈজ্ঞানিক ব্যতীত কাহাকেও কি বুঝান যায়? পার্থিব পদার্থের মধ্যে হীরক অপেক্ষা মহামূল্যের বস্তু আর দ্বিতীয় নাই, ইহা রাজরাজেশ্বরের শিরোদেশে স্থান পায়। ইহা অঙ্গার! কয়লা!! যে হীরকের মূল্যের কথা শ্রবণ করিলে অমূল্য বলিয়া যাহাকে স্বীকার করা হয়, তাহাকে কয়লা বলা হয় কেন? একদা

জনৈক ফরাসীদেশের সৈনিক পুরুষ আমাদের কোন ঠাকুরের একটী হীরকের চক্ষু অপহরণ করিয়া পলায়ন করে। এই হীরকখানি ক্ষুদ্রাকৃতি কপোতের ডিম্বের ন্যায়। ইহা মহারাজ্ঞী ক্যাথারাইন বিক্রেতাকে ৯০,০০ হাজার পাউণ্ড নগদমূল্য, এতদ্ব্যতীত ৪০০০ পাউণ্ড বার্ষিক দিয়াছিলেন। এই হীরকখানির ওজনের এক খানির কয়লার মূল্য কত? কিন্তু স্থূলে উভয়ের পার্থক্যের ইয়ত্তা নাই। চিনি উপাদেয় সামগ্রী, তাহাকে কয়লা বলিলে স্থূলদ্রষ্টা কি উপহাস করিবে না? এইরূপে উদ্ভিজ্জ, জান্তব এবং খনিজ বহুবিধ পদার্থে কয়লা অদ্বিতীয় ভাবে বিরাজ করিতেছে।

কয়লা সম্বন্ধে যাহার এই প্রকার অদ্বিতীয় জ্ঞান সঞ্চারিত হয়, তাহার চক্ষে হীরকও যে বস্তু, কয়লাও সেই বস্তু বলিয়া প্রতীতি না হইবে কেন? যদিও হীরক এবং কয়লা জ্ঞানদৃষ্টিতে এক বলিয়া ধারণা হইল বটে, কিন্তু বৈজ্ঞানিক হীরক এবং কয়লাকে স্থূলে এক পদার্থ বলিবেন না। হীরককে হীরক এবং কয়লাকে কয়লা বলিতে বাধ্য। হীরক এবং কয়লা অবস্থাবিশেষে একাকার হয় এবং অবস্থাবিশেষে পৃথক হইয়া থাকে। যতক্ষণ হীরক ততক্ষণ উহা হীরক, উহা অমূল্য পদার্থ। হীরকের অবস্থান্তর হইলে তখন সে কয়লা, আর তাহাকে হীরক বলা যাইবে না। অতএব এক পদার্থের অবস্থান্তরই বিবিধ পৃথকধর্ম্মযুক্ত পদার্থের সৃষ্টির কারণস্বরূপ বলিয়া জ্ঞান লাভ করা রামকৃষ্ণদেবের অদ্বৈত জ্ঞান আঁচলে বাঁধিবার উদ্দেশ্য বুঝিতে হইবে।

এক পদার্থের অবস্থাগত প্রভেদ প্রদর্শন করাইবার নিমিত্ত রামকৃষ্ণদেব বলিতেন, জল এক বস্তু। গঙ্গার জলও জল, সাগরের জলও জল, পুষ্করিণীর জলও জল, কূপের জলও জল, নর্দ্দামার জলও জল,

প্রস্রাবও জল, মুখের লালও জল, জল সর্ব্বত্রে এক, কিন্তু স্থানবিশেষে তাহার অবস্থান্তর বিধায় নানাপ্রকার নামে কথিত হয়। সর্ব্বত্রে এক প্রকার জল বলিয়া গঙ্গাজলের সহিত অন্য জলের তুলনা হয় না; গঙ্গাজলের পরিবর্ত্তে অন্য জল ব্যবহার করা যায় না। জল হিসাবে সকলকে জল বলা যাইবে, কিন্তু স্থলে তাহাদের ধর্ম্মহিসাবে পৃথক পৃথক ভাবে দৃষ্টি করিতে হইবে।

জড় পদার্থ কিম্বা জড়-চেতন পদার্থ লইয়া বিচার করিলে কয়লা এবং জলের দৃষ্টান্তের ন্যায় এক পদার্থে উপনীত হওয়া যায় এবং তাহা হইতে দৃষ্টিপাত করিলে সেই এক পদার্থের বহুল স্বাতন্ত্র্য বিকাশ দেখিয়া অদ্বৈতজ্ঞানী আনন্দে মাতিয়া উঠেন। এই বৈজ্ঞানিক মীমাংসাবিষয়টী আমি ইতিপূর্ব্বের বক্তৃতাদিতে উপর্য্যুপরি নানাভাবে উল্লেখ করিয়াছি, তন্নিমিত্ত এ স্থলে সংক্ষেপে উহার উপসংহার করিতে বাধ্য হইতেছি। স্থূলে যে সকল পদার্থ দেখা যায়, তাহারা কতিপয় অদ্বিতীয় পদার্থের সংযোগসম্ভূত। ঐ অদ্বিতীয় পদার্থদিগের মধ্যে অঙ্গারও উল্লিখিত হয়। হয়। অঙ্গার যে কোন যৌগিকে হউক, যে কোনরূপে হউক, উহা অঙ্গার। বিশুদ্ধ অঙ্গারের ধর্ম্ম যাহা, রূপান্তর কিম্বা সংযোগে তাহা থাকে না; অর্থাৎ অদ্বিতীয় অঙ্গার এবং রূপান্তরিত অঙ্গারের ধর্ম্ম ও কার্য্য এক প্রকার নহে। যদিও অদ্বিতীয় অঙ্গারের ধর্ম্ম স্বতন্ত্র ও রূপান্তরিত অঙ্গারের ধর্ম্ম স্বতন্ত্র বলা হইল বটে, কিন্তু অদ্বিতীয় অবস্থায় অঙ্গারের যে ধর্ম্ম এবং যৌগিকাবস্থায় যে ধর্ম্ম, তাহাও অঙ্গারের ধর্ম্মই বলিতে হইবে। উভয়ক্ষেত্রে এক পদার্থও কহিতে হইবে, কিন্তু এক ধর্ম্ম বলা যাইতে পারে না।

এক্ষণে মনুষ্য লইয়া বিচার করিয়া দেখা হউক। মনুষ্য উল্লিখিত কতিপয় অদ্বিতীয় পদার্থের যোগে সৃষ্ট হইয়া থাকে। যথা, অক্সিজেন,

হাইড্রোজেন, নাইট্রোজেন, ক্লোরিণ, গন্ধক, ফস্ফরাস্, পোটাসিয়ম্, সোডিয়ম্, ক্যাল্সিয়ম্, লৌহ ইত্যাদি। এই অদ্বিতীয় পদার্থসকলের মধ্যে লৌহ এবং গন্ধক আবালবৃদ্ধবণিতার পরিচিত বস্তু। মনুষ্য শরীরে গন্ধক আছে, লৌহ আছে, একথা কি সাধারণ মনুষ্য ধারণা করিতে পারিবে? লৌহ বলিলে তাহাদের সংস্কার আসিয়া ছুরি, কাঁচি, পেরেক, বঁটি, রাস্তার রেল, গঙ্গার সাঁকো দেখাইয়া দিবে। গঙ্গার সাঁকোতে লৌহ আছে, তাহা মনুষ্য শরীরে কেমন করিয়া প্রবেশ করিল, এই ভাবিয়া সে কূলকিনারা দেখিতে পাইবে না। গন্ধকের ব্যবহার সকলেই জানে, ইহা অগ্নিসংযুক্ত হইলে অমনি জ্বলিয়া উঠে এবং শ্বাসক্লেশোৎপাদক কটু ধূমপুঞ্জ বাহির হয়। মনুষ্যদেহে এমন কোন লক্ষণ দেখা যায় না। গন্ধকে বারুদ হয়, মনুষ্য দেহ দ্বারা বারুদ প্রস্তুত করা যায় না। অদ্বিতীয় লৌহ এবং গন্ধকের ধর্ম্মের সহিত যৌগিকলৌহ এবং গন্ধকের ধর্ম্মের সাদৃশ্য থাকে না, পার্থিব স্থূল পদার্থের রীতি এই, কিন্তু তাহা বলিয়া যে গন্ধক নাই বা লৌহ নাই, তাহা বলা যাইতে পারে না। একটী মনুষ্যশরীর যে সকল পদার্থে গঠিত হয়, ভূমণ্ডলস্থিত সমুদয় মনুষ্য সেই সেই পদার্থের সেই সেই পরিমাণে সৃষ্টি হইয়া থাকে। যখন মনুষ্যশরীর সম্বন্ধে এই জ্ঞান সঞ্চারিত হয়, তখন তাহা একপ্রকার অদ্বৈতজ্ঞান কহা যায়। এই জ্ঞান অবশ্য মনুষ্যশরীর সম্বন্ধে বলিতে হইবে। এই জ্ঞান লাভপূর্ব্বক প্রত্যেক মনুষ্যের কার্য্য মিলাইলে সর্ব্বত্রে একপ্রকারই প্রতীয়মান হয়। শোণিতের কার্য্য সর্ব্বত্রে সমান, অস্থির কার্য্য সর্ব্বত্রে সমান, ইন্দ্রিয়াদির কার্য্য সর্ব্বত্রে সমান, মস্তিষ্কের কার্য্য সর্ব্বত্রে সমান, দুটো হাত, দুটো পা, দুটো চক্ষু সকলেরই হয়। পরে শরীরের ভিন্ন ভিন্ন ভাবের যে প্রকার কার্য্য, তাহাও সর্ব্বত্রে এক প্রকার। ক্ষুধায় আহার, পিপাসায় জলপান,

কাম ক্রোধ লোভ মোহাদি বৃত্তিদিগের উদয়, ক্রমে স্বীয় স্বীয় কার্য্য সম্পাদন হওয়াও সর্ব্বত্রে সমান। দয়াদাক্ষিণ্যাদির কার্য্য কোন ব্যক্তির ইতরবিশেষ হয় না, কিন্তু উল্লিখিত কার্য্যপদ্ধতির স্থিরতা নাই। এক ভাব সর্ব্বত্রে দেখা যায় না।

আহার করা মানুষের সাধারণ ধর্ম্ম। যে জাতি হউক, যে বর্ণ হউক, যেরূপ অবস্থাপন্ন ব্যক্তি হউক, সকলেই আহার করিয়া থাকেন। কিন্তু যাহা তাঁহারা আহার করেন, তাহা কোনমতে সর্ব্বত্রে সমান হইতে পারে না। কেহ হবিষ্যান্ন আহারে তুষ্টি লাভ করেন, কেহ মৎস্যাদির সম্বন্ধ ব্যতীত এক গ্রাস অন্ন গলধঃস্থ করিতে অসমর্থ হন, কেহ মৎস্যাদির আড়ম্বর ভিন্ন পশুর আহার মনে করেন। হিন্দুর সাত্ত্বিকাহারে মাছ মাংসের সম্বন্ধ নিষেধ, রাজসিক ও তামসিক আহারে মৎস্যমাংসের শ্রাদ্ধ হইয়া থাকে। কিন্তু হিন্দুর আহারের সহিত যবন এবং ম্লেচ্ছের আহারের তুলনা হয় না। আহারের স্থূল ভাব দেখিলে কাহারও সহিত কাহারও সামঞ্জস্য রক্ষা করিবার সম্ভাবনা নাই, কিন্তু উদ্দেশ্যে সকলেই এক ভাবের পরিচয় দেয়। মানব প্রকৃতির আর একটী দৃষ্টান্ত গৃহীত হউক। দয়া, এই বৃত্তিটীর দ্বারা পরদুঃখনিবারণ ও পরোপকার কার্য্যে মনুষ্যদিগকে নিয়োজিত করিয়া থাকে। দুঃখ এক জাতীয় নহে। আমাদের জীবনটাই দুঃখময়, যে স্থানে বসতি, তাহাও দুঃখে পরিপূর্ণ, যাহাদের সহিত বাস করা যায়, তাহারাও দুঃখাধারবিশেষ। মনুষ্যদিগের দুঃখ অপার, অনন্ত এবং বচনাতীত বিষয়। মানসিক, শারীরিক, আধ্যাত্মিক, এই ত্রিবিধ সাম্রাজ্যের দুঃখকাহিনী বলিতে গেলে বেদব্যাসের অবতরণ হওয়া আবশ্যক। সে যাহা হউক, মনুষ্যেরা দয়াপরবশে রুচি এবং শক্ত্যনুসারে সর্ব্বদা কার্য্যক্ষেত্রে পরিভ্রমণ করিতেছেন। কেহ মানসিক উন্নতির জন্য

বিজ্ঞান ও দর্শন বিষয় লইয়া জীবনাতিবাহিত করিয়া যাইতেছেন, কেহ শারীরিক স্বচ্ছন্দতা সংরক্ষণ এবং সম্বর্দ্ধনের জন্য প্রাণপণে তাহারই চেষ্টা করিতেছেন, কেহ অন্ন বস্ত্রের ক্লেশ নিবারণের উপায়-স্বরূপ জীবিকানির্ব্বাহের নব নব পন্থা উদ্ভাবন করিবার জন্য জীবনোৎ-সর্গ করিতেছেন। কেহ মুষ্টিভিক্ষা দিয়া, কাহাকে অন্ন বস্ত্র দিয়া, রোগীর রোগযন্ত্রণা বিমুক্ত করিয়া, কন্যাভারের অংশ লইয়া, ঋণীর ঋণ শোধ করিয়া, মুটের মোট তুলিয়া দিয়া, দয়ার কার্য্য করেন। কার্য্য-বিশেষ লইয়া যদ্যপি আমরা তুলনা করিতে যাই, তাহা হইলে বিষম অসামঞ্জস্য ভাব উপস্থিত হইবে। কিন্তু স্থূল কার্য্যের উদ্দেশ্য নিরূপণ করিয়া দেখিলে সর্ব্বস্থলে এক দয়া—এক অদ্বিতীয় দয়াকে—বিরাজ করিতে দেখা যায়।

মনুষ্যদিগকে লইয়া এইরূপে বৈশ্লেষিক প্রক্রিয়ার দ্বারা আলোচনা করিলে প্রত্যেক ভাব সম্বন্ধে এক অদ্বিতীয় জ্ঞানলাভ করা যায় এবং সেই ভাবের কার্য্য ব্যক্তিবিশেষে স্বতন্ত্র হইয়া থাকে।

মানসিক সাধারণবৃত্তিপরম্পরা বিচারপূর্ব্বক ধর্ম্মবৃত্তির দিকে অগ্রসর হইয়া দেখিলে অতি অদ্ভুত কপাট উদ্ঘাটন হইয়া যায়। ধর্ম্মের সহিত ভগবানের সম্বন্ধ, ইহা কেহ অস্বীকার করেন না। ভগবান্‌কে অনন্ত ব্যক্তি অনন্ত ভাবে উপলব্ধি করেন। যাঁহার যে প্রকার ধারণা, যাঁহার যে প্রকার দর্শন, যাঁহার যে প্রকার শিক্ষা, ভগবান্ সম্বন্ধে তাঁহার সেই প্রকার জ্ঞান সঞ্চারিত হয়। অবস্থাবিশেষে, সামর্থ্যবিশেষে এবং সময়বিশেষে লোকে আহার করিতে বাধ্য হয়। যাহার দুই পয়সা ব্যয় করা সাধ্যাতীত, সে কেমন করিয়া চব্যচুষ্য-লেহ্যপেয় সংগ্রহপূর্ব্বক রসনার পরিতৃপ্তি করিতে পারিবে? ধর্ম্মবিশ্বাস, ধর্ম্মানুষ্ঠান এবং ধর্ম্ম-জ্ঞানও সেইরূপ বুঝিতে হইবে।

মনুষ্যদিগের ধারণা অদ্ভুত ব্যাপার, একটী প্রসঙ্গ লইয়া বিচার করিতে হইলে প্রত্যেক ব্যক্তি সে সম্বন্ধে স্বতন্ত্র অভিপ্রায় প্রকাশ করেন। কেহ লুচি, কেহ রুটী, কেহ পরটা খাইতে ভালবাসেন, কিন্তু ময়দা ও ঘৃত এক পদার্থ। ঠাকুর বলিতেন, কেহ মাছ ভাজা, মাছের ঝোল, মাছের চচ্চড়ী, মাছ ভাতে, মাছের কাবাব, মাছের কালিয়া বা পোলাও অথবা মাছ পোড়া খাইতে ভালবাসে। সর্ব্বত্রে মাছ এক পদার্থ। ধর্ম্মবিষয়টীও ব্যক্তিবিশেষে বিশেষ প্রকার দেখা যায়।

একজন নিরক্ষর ব্যক্তি পিপাসান্বিত হইয়া উর্দ্ধশ্বাসে যাইয়া জলাশয় হইতে অঞ্জলি পূরিয়া জলপান করিতে কখনই ইতস্ততঃ করিবে না, একজন নিরক্ষর ব্যক্তি পথশ্রান্ত হইয়া বৃক্ষমূলে কীটকণ্টকাদিসঙ্কুল স্থানে সুখে নিদ্রা যাইতে ভীত হইবে না, একজন নিরক্ষর ব্যক্তি বিকৃত মৎস্য ভোজন করিতে সন্দিহান হইবে না, কিন্তু যিনি পণ্ডিত, যিনি শরীর পালন ও সংরক্ষণ-শাস্ত্রাদি অধ্যয়ন করিয়াছেন, যিনি জলের উত্তমাধমতা বিষয়ে জ্ঞান লাভ করিয়াছেন, যিনি স্থানিক কারণবিশেষে ব্যাধির উৎপত্তিবিষয়ক বিদ্যা লাভ করিয়াছেন, যিনি মৎস্যমাংসবিকৃতি-জনিত বিশেষ প্রকার বিষের (Ptomane), উদ্ভাবন জ্ঞান প্রাপ্ত হইয়াছেন, তিনি কখন নিরক্ষর ব্যক্তির ন্যায় অবাধে যে কোন জলাশয়ের জল পান, যথা ইচ্ছায় শয়ন এবং যে কোন মৎস্য মাংস ভক্ষণ করিতে পারিবেন না। ফলে, যে ব্যক্তি যে প্রকার সংস্কারগ্রস্ত হইয়াছেন, যিনি যেরূপ শিক্ষা পাইয়াছেন, যিনি যেরূপ ভাবে মন সংগঠিত করিয়াছেন, তিনি সেই সংস্কার, সেই ভাব, সেই শিক্ষা অতিক্রম করিয়া কিরূপে কার্য্য করিবেন? এই নিমিত্ত ধর্ম্ম বা ঈশ্বর বিষয়ে প্রত্যেক ব্যক্তির স্বতন্ত্র প্রকার ধারণা হইয়া থাকে। ব্যক্তি-বিশেষে স্বতন্ত্র ধারণা হইলে তাহার ইতরবিশেষ করিবার কাহার শক্তি

নাই। কারণ, যে বস্তু লইয়া ধারণা, তাহা সর্ব্বত্রে এক অদ্বিতীয় এবং পাত্রবিশেষে তাহার কার্য্য স্বতন্ত্র প্রকার হওয়া বিশ্বমণ্ডলের সাধারণ লক্ষণ, তাহা আমরা বিশেষরূপে দেখিয়াছি।

এক্ষণে একটী প্রশ্ন উঠিতেছে যে, যাহার যে বিষয়ে যেরূপ ধারণা, তাহা সর্ব্বত্রে অভ্রান্ত বলিবার হেতু কি? নিরক্ষর ব্যক্তি জলের উত্তমা-ধমতা বিষয়ে অজ্ঞান বলিয়া যাহা ইচ্ছা পান করে, কিন্তু তাহা বলিয়া সেই অজ্ঞানকে কি অভ্রান্ত বলা যাইবে? বৈজ্ঞানিকেরা সে কথা কখন বলিতে দিবেন না। ধর্ম্ম জ্ঞান সম্বন্ধেও সেই প্রকার। অজ্ঞানতাবশতঃ মনুষ্যেরা অধর্ম্মকেও ধর্ম্ম বলিয়া বিশ্বাস করেন, মনুষ্যকে ভগবান্ বলিয়া কৃতার্থ হইতে চাহেন, এ প্রকার অজ্ঞানপ্রসূত কার্য্যকে বিশুদ্ধ ধর্ম্ম বলিয়া স্বীকার করা যাইতে পারে না।

বিশুদ্ধ বিচার এবং কার্য্যক্ষেত্রপ্রসূত জ্ঞান সম্পূর্ণ বিশুদ্ধভাবসম্পন্ন বলিয়া প্রভু অদ্বৈতজ্ঞান লাভপূর্ব্বক কার্য্যক্ষেত্র দেখিতে উপদেশ দিয়াছেন। মানসিক কল্পনায় যাহা স্থির করা যায়, কার্য্যক্ষেত্রে তাহা দেখিতে পাওয়া যায় না। মানসে আকাশ কুসুম ফুটাইয়া তাহার মালা গাঁথিয়া পুষ্পশয্যা রচনা করিতে পারি, কিন্তু কার্য্যে তাহা সমাধা করা যায় না।

বৈজ্ঞানিকেরা যে সকল কারণ নিরূপণপূর্ব্বক পানীয় জলের যোগ্যাযোগ্যতা বিষয় সিদ্ধান্ত করেন, সেই সকল কারণ সত্ত্বেও কোন স্থলে কোন প্রকার ব্যাধির উত্তেজনা হয় এবং কোথাও হয় না। বিসূচিকার বিষ অতি প্রবল, তাহা আমরা দেখিতে পাই। বৈজ্ঞানি-কেরা বলেন যে, জলের দ্বারা ঐ বিষ শরীরে প্রবেশ করে। এই নিমিত্ত বিসূচিকাগ্রস্ত রোগীর মলমূত্র জলে নিক্ষেপ করিলে রাজদণ্ডার্হ হইতে হয়। কিন্তু কার্য্যক্ষেত্রে এই আনুমানিক মীমাংসার বিপরীত

ফল প্রাপ্ত হওয়া যায়। যখন পরিবার মধ্যে কাহারও বিসূচিকা হয়, তাহাকে পরিত্যাগ করিয়া সকলে পলায়ন করে না। সন্তানের রোগ হইলে মাতা দক্ষিণ হস্তে মলাদি পরিষ্কার করেন, স্বামীর পীড়া হইলে স্ত্রী স্বহস্তে সে কার্য্য সম্পন্ন করেন। যদ্যপি মরিতে হয়, তাহা হইলে ইহাদেরই অগ্রে মরা উচিত, কিন্তু কোথায় সে ঘটনা? যাহারা মরিবার, তাহারাই মরে। বিশেষ সুপণ্ডিত যাঁহারা, স্বাস্থরক্ষায় বিধাতাপুরুষ যাঁহারা, তাঁহারাই যখন বিসূচিকাদি রোগে পরাজয় স্বীকার করিতে বাধ্য হইতেছেন, তখন বিজ্ঞানশিক্ষা করা এবং না করায় কি সমানফল নহে। নিরক্ষর ব্যক্তি না জানিয়া জলের সহিত বিসূচিকাবিষ পান করিল, সুপণ্ডিত সর্ব্বদা সতর্ক থাকিয়াও সতর্কতা-পূর্ণ হৃদয়ে আহারাদি করিয়া বিসূচিকার হস্ত হইতে পরিত্রাণ পাইলেন না, এই কার্য্যক্ষেত্র দেখিলে কি মীমাংসা করা যাইবে? কার্য্যক্ষেত্রে সকলেরই এক দশা, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। রামকৃষ্ণদেবের উপদেশ মতে বিচার করিয়া দেখিলে এই বুঝা যায় যে, ধর্ম্মের নিগূঢ় বিজ্ঞান জ্ঞাত হইয়াই হউক অথবা তাহা না জানিয়া হউক, কার্য্যক্ষেত্রে উভয়ে ফললাভ করিয়া থাকেন।

ধর্ম্মভাব যে স্থানে যে ভাবে প্রস্ফুটিত হউক, তাহার কার্য্য একই প্রকার। যেমন, পিতা মাতাকে শ্রদ্ধা ভক্তি করা সর্ব্বব্যক্তির একই ভাব একই কার্য্য। ভগবান্ সম্বন্ধে যদ্যপি বাস্তবিক ভগবানের সম্বন্ধ থাকে, তাহা হইলে সকলেরই একপ্রকার ভাব এবং এক প্রকার কার্য্য হইবেই হইবে, তদ্বিষয়ে তিলার্দ্ধ সন্দেহ নাই।

এই প্রশ্নটী মীমাংসা করিতে হইলে ধর্ম্ম সম্বন্ধে সাধারণের বিশ্বাস কি, তাহা একবার দেখা কর্ত্তব্য। ভগবানের দুইটি ভাব সকলেই বিশ্বাস করেন। যথা নিত্য এবং লীলা, অথবা অপ্রকাশ এবং প্রকাশ

ভাব। নিত্য বা অপ্রকাশ ভাব সমর্থনকারীরা আমাদের বৈদান্তিক সম্প্রদায় বলিয়া উল্লিখিত। বৈদান্তিকমতে প্রকাশ বা লীলাভাব অলীক এবং মিথ্যা, সুতরাং তাহা গ্রাহ্যনীয় নহে। এই ভাবের ভাবুকেরা আপনাকে ভগবান্ মনে করেন এবং তাহাই সকলে মনে করিতে বলেন। ভগবানের পাপ পুণ্য নাই, ধর্ম্মাধর্ম্ম নাই, কর্ম্মাকর্ম্ম নাই। দ্বিতীয়মতে ভগবান্ এবং ভক্তজ্ঞান থাকে। পাপপুণ্য, ধর্ম্মাধর্ম্ম এবং কর্ম্মাকর্ম্ম বোধ বিলক্ষণ থাকে। এই ক্ষেত্রে ভগবান্ লীলারূপধারী বলিয়া ভক্তেরা প্রত্যক্ষ করেন। অর্থাৎ ভগবান্ হওয়া এবং ভগবান্‌কে পাওয়া দুইটী মতের সংক্ষিপ্ত ভাব। এই উভয় ভাবের তাৎপর্য্য বুঝিয়া দেখিলে বিশেষ তারতম্য আছে বলিয়া বোধ হইবে না। ভগবান্ হইয়া যাওয়া, তথায় ভগবান্ ও ভক্তের স্বাতন্ত্র্য থাকে না। এবং ভগবান্ প্রাপ্ত হওয়া পক্ষেও ভগবান্ এবং ভক্তে স্বাতন্ত্র্য থাকে না। যেব্যক্তি ভগবানে বিলীন হন, তাঁহার স্থানে ভগবান্ কর্ত্তা, এই নিমিত্ত তিনিই ভগবান্ বলিয়া পরিকীর্ত্তিত হইয়া থাকেন এবং যে স্থানে ভগবান্ লাভ করা যায়, সে স্থানেও ভগবান্ কর্ত্তারূপে বিরাজ করেন। তাঁহার নিজের কোনও বলবুদ্ধি থাকে না। ভক্তের নিজের কর্ত্তৃত্ব বোধ থাকে না। এই মতে প্রভু বলিতেন যে, একদা কৃষ্ণপ্রিয়া গোপাঙ্গনারা শ্রীকৃষ্ণকে পরিবেষ্টন পূর্ব্বক প্রেম বিহার করিতেছিলেন। ক্রমে ক্রমে গোপাঙ্গনারা শ্রীকৃষ্ণের শ্রীঅঙ্গ দর্শন করিয়া পুলকার্ণবে নিমগ্ন হইয়া যাইলেন। এতক্ষণ যে মন নয়ন-পথদ্বারা দর্শনসুখানুভব করিতেছিলেন, তাহা প্রেম সাগরে নিমজ্জিত হইয়া যাওয়ায় আপন হৃদয়ের অভ্যন্তরে প্রাণবল্লভকে লইয়াই ডুবিলেন। তখন তাঁহারা আর আপনার ভাব সংরক্ষা করিতে অসমর্থ হইয়া পড়িলেন। আপনাকে আপনি বিস্মৃত হইলেন বটে, কিন্তু শ্রীকৃষ্ণকে ভুলিতে পারি-

কহিয়াছেন যে, বিশ্বপতির তত্ত্ব জানিতে হইলে তাঁহাকেই জিজ্ঞাসা করিতে হইবে। তিনি এই স্থানে দৃষ্টান্ত দ্বারা বুঝাইতেন, যেমন কাহার কত সম্পত্তি আছে, বাহিরের লোকের আনুমাণিক সিদ্ধান্তের দ্বারা কখন স্থির হইতে পারে না। সেই ব্যক্তি যদ্যপি কাহাকে সিন্দুক খুলিয়া দেখাইয়া দেয়, তাহা হইলে প্রকৃত সমাচার পাওয়া যাইতে পারে। ভগবান্ সম্বন্ধে সে প্রকার কার্য্য কিরূপে হইবে?

যদ্যপি কালীদাসকে কবিকুলচূড়ামণি বলিবার হেতু অন্বেষণ করিতে হয়, তাহা হইলে তাঁহার কার্য্য অর্থাৎ গ্রন্থাদি দেখিতে হয়। মহাপ্রভু অবতারবিশেষ কেন? তিনি অবতার, যেহেতু, তাঁহার কার্য্যকলাপে অমানুষশক্তির পরিচয় পাওয়া যায়। ফলে, কার্য্য দেখিয়া কর্ত্তার শক্তি বা গুণ প্রকাশ পায়।

জ্ঞান লাভ করিতে হইলে বিশ্বরচনা পর্য্যালোচনা করাই কর্ত্তব্য।

বিশ্বসংসারে স্থূলে সমুদয় পদার্থই বহুভাবের পরিচায়ক। কিন্তু স্থূল ভাব হইতে অন্তর্দৃষ্টির দ্বারা উহাদের আভ্যন্তরিক গঠনাদি নিরীক্ষণ করিলে এক পদার্থ ভিন্ন ভিন্ন অবস্থায় ভিন্ন ভিন্ন পদার্থরূপে প্রকাশিত হয়। হীরক, গ্র্যাফাইট, কয়লা, কাষ্ঠ, জীব, জন্তু, বৃক্ষ, লতা, ফল, মূল প্রভৃতি অসংখ্য প্রকার স্বতন্ত্র পদার্থ হইতে অন্তর্দৃষ্টিযোগে অতি সুন্দর অদ্বৈতজ্ঞান লাভ করা যায়। অর্থাৎ এই বহু বিচিত্র আকৃতি, প্রকৃতি ও ব্যবহারের পদার্থনিচয়ে এক অদ্বিতীয় অঙ্গার বিরাজ করে! হীরকে অঙ্গার, একথা প্রক্রিয়াশীল বৈজ্ঞানিক ব্যতীত কাহাকেও কি বুঝান যায়? পার্থিব পদার্থের মধ্যে হীরক অপেক্ষা মহামূল্যের বস্তু আর দ্বিতীয় নাই, ইহা রাজরাজেশ্বরের শিরোদেশে স্থান পায়। ইহা অঙ্গার! কয়লা!! যে হীরকের মূল্যের কথা শ্রবণ করিলে অমূল্য বলিয়া যাহাকে স্বীকার করা হয়, তাহাকে কয়লা বলা হয় কেন? একদা

জনৈক ফরাসীদেশের সৈনিক পুরুষ আমাদের কোন ঠাকুরের একটী হীরকের চক্ষু অপহরণ করিয়া পলায়ন করে। এই হীরকখানি ক্ষুদ্রাকৃতি কপোতের ডিম্বের ন্যায়। ইহা মহারাজ্ঞী ক্যাথারাইন বিক্রেতাকে ৯০,০০ হাজার পাউণ্ড নগদমূল্য, এতদ্ব্যতীত ৪০০০ পাউণ্ড বার্ষিক দিয়াছিলেন। এই হীরকখানির ওজনের এক খানির কয়লার মূল্য কত? কিন্তু স্থূলে উভয়ের পার্থক্যের ইয়ত্তা নাই। চিনি উপাদেয় সামগ্রী, তাহাকে কয়লা বলিলে স্থূলদ্রষ্টা কি উপহাস করিবে না? এইরূপে উদ্ভিজ্জ, জান্তব এবং খনিজ বহুবিধ পদার্থে কয়লা অদ্বিতীয় ভাবে বিরাজ করিতেছে।

কয়লা সম্বন্ধে যাহার এই প্রকার অদ্বিতীয় জ্ঞান সঞ্চারিত হয়, তাহার চক্ষে হীরকও যে বস্তু, কয়লাও সেই বস্তু বলিয়া প্রতীতি না হইবে কেন? যদিও হীরক এবং কয়লা জ্ঞানদৃষ্টিতে এক বলিয়া ধারণা হইল বটে, কিন্তু বৈজ্ঞানিক হীরক এবং কয়লাকে স্থূলে এক পদার্থ বলিবেন না। হীরককে হীরক এবং কয়লাকে কয়লা বলিতে বাধ্য। হীরক এবং কয়লা অবস্থাবিশেষে একাকার হয় এবং অবস্থাবিশেষে পৃথক হইয়া থাকে। যতক্ষণ হীরক ততক্ষণ উহা হীরক, উহা অমূল্য পদার্থ। হীরকের অবস্থান্তর হইলে তখন সে কয়লা, আর তাহাকে হীরক বলা যাইবে না। অতএব এক পদার্থের অবস্থান্তরই বিবিধ পৃথকধর্ম্মযুক্ত পদার্থের সৃষ্টির কারণস্বরূপ বলিয়া জ্ঞান লাভ করা রামকৃষ্ণদেবের অদ্বৈত জ্ঞান আঁচলে বাঁধিবার উদ্দেশ্য বুঝিতে হইবে।

এক পদার্থের অবস্থাগত প্রভেদ প্রদর্শন করাইবার নিমিত্ত রামকৃষ্ণদেব বলিতেন, জল এক বস্তু। গঙ্গার জলও জল, সাগরের জলও জল, পুষ্করিণীর জলও জল, কূপের জলও জল, নর্দ্দামার জলও জল,

প্রস্রাবও জল, মুখের লালও জল, জল সর্ব্বত্রে এক, কিন্তু স্থানবিশেষে তাহার অবস্থান্তর বিধায় নানাপ্রকার নামে কথিত হয়। সর্ব্বত্রে এক প্রকার জল বলিয়া গঙ্গাজলের সহিত অন্য জলের তুলনা হয় না। গঙ্গাজলের পরিবর্ত্তে অন্য জল ব্যবহার করা যায় না। জল হিসাবে সকলকে জল বলা যাইবে, কিন্তু স্থলে তাহাদের ধর্ম্মহিসাবে পৃথক পৃথক ভাবে দৃষ্টি করিতে হইবে।

জড় পদার্থ কিম্বা জড়-চেতন পদার্থ লইয়া বিচার করিলে কয়লা এবং জলের দৃষ্টান্তের ন্যায় এক পদার্থে উপনীত হওয়া যায় এবং তাহা হইতে দৃষ্টিপাত করিলে সেই এক পদার্থের বহুল স্বাতন্ত্র্য বিকাশ দেখিয়া অদ্বৈতজ্ঞানী আনন্দে মাতিয়া উঠেন। এই বৈজ্ঞানিক মীমাংসাবিষয়টী আমি ইতিপূর্ব্বের বক্তৃতাদিতে উপর্যুপরি নানাভাবে উল্লেখ করিয়াছি, তন্নিমিত্ত এ স্থলে সংক্ষেপে উহার উপসংহার করিতে বাধ্য হইতেছি। স্থূলে যে সকল পদার্থ দেখা যায়, তাহারা কতিপয় অদ্বিতীয় পদার্থের সংযোগসম্ভূত। ঐ অদ্বিতীয় পদার্থদিগের মধ্যে অঙ্গারও উল্লিখিত হয় হয়। অঙ্গার যে কোন যৌগিকে হউক, যে কোনরূপে হউক, উহা অঙ্গার। বিশুদ্ধ অঙ্গারের ধর্ম্ম যাহা, রূপান্তর কিম্বা সংযোগে তাহা থাকে না; অর্থাৎ অদ্বিতীয় অঙ্গার এবং রূপান্তরিত অঙ্গারের ধর্ম্ম ও কার্য্য এক প্রকার নহে। যদিও অদ্বিতীয় অঙ্গারের ধর্ম্ম স্বতন্ত্র ও রূপান্তরিত অঙ্গারের ধর্ম্ম স্বতন্ত্র বলা হইল বটে, কিন্তু অদ্বিতীয় অবস্থায় অঙ্গারের যে ধর্ম্ম এবং যৌগিকাবস্থায় যে ধর্ম্ম, তাহাও অঙ্গারের ধর্ম্মই বলিতে হইবে। উভয়ক্ষেত্রে এক পদার্থও কহিতে হইবে, কিন্তু এক ধর্ম্ম বলা যাইতে পারে না।

এক্ষণে মনুষ্য লইয়া বিচার করিয়া দেখা হউক। মনুষ্য উল্লিখিত কতিপয় অদ্বিতীয় পদার্থের যোগে সৃষ্ট হইয়া থাকে। যথা, অক্সিজেন,

হাইড্রোজেন, নাইট্রোজেন, ক্লোরিণ, গন্ধক, ফস্ফরাস্, পোটাসিয়ম্, সোডিয়ম্, ক্যাল্সিয়ম্, লৌহ ইত্যাদি। এই অদ্বিতীয় পদার্থসকলের মধ্যে লৌহ এবং গন্ধক আবালবৃদ্ধবণিতার পরিচিত বস্তু। মনুষ্য শরীরে গন্ধক আছে, লৌহ আছে, একথা কি সাধারণ মনুষ্য ধারণা করিতে পারিবে? লৌহ বলিলে তাহাদের সংস্কার আসিয়া ছুরি, কাঁচি, পেরেক, বঁটি, রাস্তার রেল, গঙ্গার সাঁকো দেখাইয়া দিবে। গঙ্গার সাঁকোতে লৌহ আছে, তাহা মনুষ্য শরীরে কেমন করিয়া প্রবেশ করিল, এই ভাবিয়া সে কূলকিনারা দেখিতে পাইবে না। গন্ধকের ব্যবহার সকলেই জানে, ইহা অগ্নিসংযুক্ত হইলে অমনি জ্বলিয়া উঠে এবং শ্বাসক্লেশোৎপাদক কটু ধূমপুঞ্জ বাহির হয়। মনুষ্যদেহে এমন কোন লক্ষণ দেখা যায় না। গন্ধকে বারুদ হয়, মনুষ্য দেহ দ্বারা বারুদ প্রস্তুত করা যায় না। অদ্বিতীয় লৌহ এবং গন্ধকের ধর্ম্মের সহিত যৌগিকলৌহ এবং গন্ধকের ধর্ম্মের সাদৃশ্য থাকে না, পার্থিব স্থূল পদার্থের রীতি এই, কিন্তু তাহা বলিয়া যে গন্ধক নাই বা লৌহ নাই, তাহা বলা যাইতে পারে না। একটী মনুষ্যশরীর যে সকল পদার্থে গঠিত হয়, ভূমণ্ডলস্থিত সমুদয় মনুষ্য সেই সেই পদার্থের সেই সেই পরিমাণে সৃষ্টি হইয়া থাকে। যখন মনুষ্যশরীর সম্বন্ধে এই জ্ঞান সঞ্চারিত হয়, তখন তাহা একপ্রকার অদ্বৈতজ্ঞান কহা যায়। এই জ্ঞান অবশ্য মনুষ্যশরীর সম্বন্ধে বলিতে হইবে। এই জ্ঞান লাভপূর্ব্বক প্রত্যেক মনুষ্যের কার্য্য মিলাইলে সর্ব্বত্রে একপ্রকারই প্রতীয়মান হয়। শোণিতের কার্য্য সর্ব্বত্রে সমান, অস্থির কার্য্য সর্ব্বত্রে সমান, ইন্দ্রিয়াদির কার্য্য সর্ব্বত্রে সমান, মস্তিষ্কের কার্য্য সর্ব্বত্রে সমান, দুটো হাত, দুটো পা, দুটো চক্ষু সকলেরই হয়। পরে শরীরের ভিন্ন ভিন্ন ভাবের যে প্রকার কার্য্য, তাহাও সর্ব্বত্রে এক প্রকার। ক্ষুধায় আহার, পিপাসায় জলপান,

কাম ক্রোধ লোভ মোহাদি বৃত্তিদিগের উদয়, ক্রমে স্বীয় স্বীয় কার্য্য সম্পাদন হওয়াও সর্ব্বত্রে সমান। দয়াদাক্ষিণ্যাদির কার্য্য কোন ব্যক্তির ইতরবিশেষ হয় না, কিন্তু উল্লিখিত কার্য্যপদ্ধতির স্থিরতা নাই। এক ভাব সর্ব্বত্রে দেখা যায় না।

আহার করা মানুষের সাধারণ ধর্ম্ম। যে জাতি হউক, যে বর্ণ হউক, যেরূপ অবস্থাপন্ন ব্যক্তি হউক, সকলেই আহার করিয়া থাকেন। কিন্তু যাহা তাঁহারা আহার করেন, তাহা কোনমতে সর্ব্বত্রে সমান হইতে পারে না। কেহ হবিষ্যান্ন আহারে তুষ্টি লাভ করেন, কেহ মৎস্যাদির সম্বন্ধ ব্যতীত এক গ্রাস অন্ন গলধঃস্থ করিতে অসমর্থ হন, কেহ মৎস্যাদির আড়ম্বর ভিন্ন পশুর আহার মনে করেন। হিন্দুর সাত্বিকাহারে মাছ মাংসের সম্বন্ধ নিষেধ, রাজসিক ও তামসিক আহারে মৎস্যমাংসের শ্রাদ্ধ হইয়া থাকে। কিন্তু হিন্দুর আহারের সহিত যবন এবং ম্লেচ্ছের আহারের তুলনা হয় না। আহারের স্থূল ভাব দেখিলে কাহারও সহিত কাহারও সামঞ্জস্য রক্ষা করিবার সম্ভাবনা নাই, কিন্তু উদ্দেশ্যে সকলেই এক ভাবের পরিচয় দেয়। মানব প্রকৃতির আর একটী দৃষ্টান্ত গৃহীত হউক। দয়া, এই বৃত্তিটীর দ্বারা পরদুঃখনিবারণ ও পরোপকার কার্য্যে মনুষ্যদিগকে নিয়োজিত করিয়া থাকে। দুঃখ এক জাতীয় নহে। আমাদের জীবনটাই দুঃখময়, যে স্থানে বসতি, তাহাও দুঃখে পরিপূর্ণ, যাহাদের সহিত বাস করা যায়, তাহারাও দুঃখাধারবিশেষ। মনুষ্যদিগের দুঃখ অপার, অনন্ত এবং বচনাতীত বিষয়। মানসিক, শারীরিক, আধ্যাত্মিক, এই ত্রিবিধ সাম্রাজ্যের দুঃখকাহিনী বলিতে গেলে বেদব্যাসের অবতরণ হওয়া আবশ্যক। সে যাহা হউক, মনুষ্যেরা দয়াপরবশে রুচি এবং শক্ত্যনুসারে সর্ব্বদা কার্য্যক্ষেত্রে পরিভ্রমণ করিতেছেন। কেহ মানসিক উন্নতির জন্য

বিজ্ঞান ও দর্শন বিষয় লইয়া জীবনাতিবাহিত করিয়া যাইতেছেন, কেহ শারীরিক স্বচ্ছন্দতা সংরক্ষণ এবং সম্বর্দ্ধনের জন্য প্রাণপণে তাহারই চেষ্টা করিতেছেন, কেহ অন্ন বস্ত্রের ক্লেশ নিবারণের উপায়-স্বরূপ জীবিকানির্ব্বাহের নব নব পন্থা উদ্ভাবন করিবার জন্য জীবনোৎসর্গ করিতেছেন। কেহ মুষ্টিভিক্ষা দিয়া, কাহাকে অন্ন বস্ত্র দিয়া, রোগীর রোগযন্ত্রণা বিমুক্ত করিয়া, কন্যাভারের অংশ লইয়া, ঋণীর ঋণ শোধ করিয়া, মুটের মোট তুলিয়া দিয়া, দয়ার কার্য্য করেন। কার্য্য-বিশেষ লইয়া যদ্যপি আমরা তুলনা করিতে যাই, তাহা হইলে বিষম অসামঞ্জস্য ভাব উপস্থিত হইবে। কিন্তু স্থূল কার্য্যের উদ্দেশ্য নিরূপণ করিয়া দেখিলে সর্ব্বস্থলে এক দয়া—এক অদ্বিতীয় দয়াকে—বিরাজ করিতে দেখা যায়।

মনুষ্যদিগকে লইয়া এইরূপে বৈশ্লেষিক প্রক্রিয়ার দ্বারা আলোচনা করিলে প্রত্যেক ভাব সম্বন্ধে এক অদ্বিতীয় জ্ঞানলাভ করা যায় এবং সেই ভাবের কার্য্য ব্যক্তিবিশেষে স্বতন্ত্র হইয়া থাকে।

মানসিক সাধারণবৃত্তিপরম্পরা বিচারপূর্ব্বক ধর্ম্মবৃত্তির দিকে অগ্রসর হইয়া দেখিলে অতি অদ্ভুত কপাট উদ্ঘাটন হইয়া যায়। ধর্ম্মের সহিত ভগবানের সম্বন্ধ, ইহা কেহ অস্বীকার করেন না। ভগবান্‌কে অনন্ত ব্যক্তি অনন্ত ভাবে উপলব্ধি করেন। যাঁহার যে প্রকার ধারণা, যাঁহার যে প্রকার দর্শন, যাঁহার যে প্রকার শিক্ষা, ভগবান্ সম্বন্ধে তাঁহার সেই প্রকার জ্ঞান সঞ্চারিত হয়। অবস্থাবিশেষে, সামর্থ্যবিশেষে এবং সময়বিশেষে লোকে আহার করিতে বাধ্য হয়। যাহার দুই পয়সা ব্যয় করা সাধ্যাতীত, সে কেমন করিয়া চর্ব্যচুষ্য-লেহ্যপেয় সংগ্রহপূর্ব্বক রসনার পরিতৃপ্তি করিতে পারিবে? ধর্ম্মবিশ্বাস, ধর্ম্মানুষ্ঠান এবং ধর্ম্ম-জ্ঞানও সেইরূপ বুঝিতে হইবে।

মনুষ্যদিগের ধারণা অদ্ভুত ব্যাপার, একটী প্রসঙ্গ লইয়া বিচার করিতে হইলে প্রত্যেক ব্যক্তি সে সম্বন্ধে স্বতন্ত্র অভিপ্রায় প্রকাশ করেন। কেহ লুচি, কেহ রুটী, কেহ পরটা খাইতে ভালবাসেন, কিন্তু ময়দা ও ঘৃত এক পদার্থ। ঠাকুর বলিতেন, কেহ মাছ ভাজা, মাছের ঝোল, মাছের চচ্চড়ী, মাছ ভাতে, মাছের কাবাব, মাছের কালিয়া বা পোলাও অথবা মাছ পোড়া খাইতে ভালবাসে। সর্ব্বত্রে মাছ এক পদার্থ। ধর্ম্মবিষয়টীও ব্যক্তিবিশেষে বিশেষ প্রকার দেখা যায়।

একজন নিরক্ষর ব্যক্তি পিপাসান্বিত হইয়া ঊর্দ্ধশ্বাসে যাইয়া জলাশয় হইতে অঞ্জলি পূরিয়া জলপান করিতে কখনই ইতস্ততঃ করিবে না, একজন নিরক্ষর ব্যক্তি পথশ্রান্ত হইয়া বৃক্ষমূলে কীটকণ্টকাদিসঙ্কুল স্থানে সুখে নিদ্রা যাইতে ভীত হইবে না, একজন নিরক্ষর ব্যক্তি বিকৃত মৎস্য ভোজন করিতে সন্দিহান হইবে না, কিন্তু যিনি পণ্ডিত, যিনি শরীর পালন ও সংরক্ষণ-শাস্ত্রাদি অধ্যয়ন করিয়াছেন, যিনি জলের উত্তমাধমতা বিষয়ে জ্ঞান লাভ করিয়াছেন, যিনি স্থানিক কারণবিশেষে ব্যাধির উৎপত্তিবিষয়ক বিদ্যা লাভ করিয়াছেন, যিনি মৎস্যমাংসবিকৃতি-জনিত বিশেষ প্রকার বিষের (Ptomane), উদ্ভাবন জ্ঞান প্রাপ্ত হইয়াছেন, তিনি কখন নিরক্ষর ব্যক্তির ন্যায় অবাধে যে কোন জলাশয়ের জল পান, যথা ইচ্ছায় শয়ন এবং যে কোন মৎস্য মাংস ভক্ষণ করিতে পারিবেন না। ফলে, যে ব্যক্তি যে প্রকার সংস্কারগ্রস্ত হইয়াছেন, যিনি যেরূপ শিক্ষা পাইয়াছেন, যিনি যেরূপ ভাবে মন সংগঠিত করিয়াছেন, তিনি সেই সংস্কার, সেই ভাব, সেই শিক্ষা অতিক্রম করিয়া কিরূপে কার্য্য করিবেন? এই নিমিত্ত ধর্ম্ম বা ঈশ্বর বিষয়ে প্রত্যেক ব্যক্তির স্বতন্ত্র প্রকার ধারণা হইয়া থাকে। ব্যক্তি-বিশেষে স্বতন্ত্র ধারণা হইলে তাহার ইতরবিশেষ করিবার কাহার শক্তি

নাই। কারণ, যে বস্তু লইয়া ধারণা, তাহা সর্ব্বত্রে এক অদ্বিতীয় এবং পাত্রবিশেষে তাহার কার্য্য স্বতন্ত্র প্রকার হওয়া বিশ্বমণ্ডলের সাধারণ লক্ষণ, তাহা আমরা বিশেষরূপে দেখিয়াছি।

এক্ষণে একটী প্রশ্ন উঠিতেছে যে, যাহার যে বিষয়ে যেরূপ ধারণা, তাহা সর্ব্বত্রে অভ্রান্ত বলিবার হেতু কি? নিরক্ষর ব্যক্তি জলের উত্তমাধমতা বিষয়ে অজ্ঞান বলিয়া যাহা ইচ্ছা পান করে, কিন্তু তাহা বলিয়া সেই অজ্ঞানকে কি অভ্রান্ত বলা যাইবে? বৈজ্ঞানিকেরা সে কথা কখন বলিতে দিবেন না। ধর্ম্ম জ্ঞান সম্বন্ধেও সেই প্রকার। অজ্ঞানতাবশতঃ মনুষ্যেরা অধর্ম্মকেও ধর্ম্ম বলিয়া বিশ্বাস করেন, মনুষ্যকে ভগবান্ বলিয়া কৃতার্থ হইতে চাহেন, এ প্রকার অজ্ঞানপ্রসূত কার্য্যকে বিশুদ্ধ ধর্ম্ম বলিয়া স্বীকার করা যাইতে পারে না।

বিশুদ্ধ বিচার এবং কার্য্যক্ষেত্রপ্রসূত জ্ঞান সম্পূর্ণ বিশুদ্ধভাবসম্পন্ন বলিয়া প্রভু অদ্বৈতজ্ঞান লাভপূর্ব্বক কার্য্যক্ষেত্র দেখিতে উপদেশ দিয়াছেন। মানসিক কল্পনায় যাহা স্থির করা যায়, কার্য্যক্ষেত্রে তাহা দেখিতে পাওয়া যায় না। মানসে আকাশ কুসুম ফুটাইয়া তাহার মালা গাঁথিয়া পুষ্পশয্যা রচনা করিতে পারি, কিন্তু কার্য্যে তাহা সমাধা করা যায় না।

বৈজ্ঞানিকেরা যে সকল কারণ নিরূপণপূর্ব্বক পানীয় জলের যোগ্যাযোগ্যতা বিষয় সিদ্ধান্ত করেন, সেই সকল কারণ সত্ত্বেও কোন স্থলে কোন প্রকার ব্যাধির উত্তেজনা হয় এবং কোথাও হয় না। বিসূচিকার বিষ অতি প্রবল, তাহা আমরা দেখিতে পাই। বৈজ্ঞানিকেরা বলেন যে, জলের দ্বারা ঐ বিষ শরীরে প্রবেশ করে। এই নিমিত্ত বিসূচিকাগ্রস্ত রোগীর মলমূত্র জলে নিক্ষেপ করিলে রাজদণ্ডার্হ হইতে হয়। কিন্তু কার্য্যক্ষেত্রে এই আনুমানিক মীমাংসায় বিপরীত

ফল প্রাপ্ত হওয়া যায়। যখন পরিবার মধ্যে কাহারও বিসূচিকা হয়, তাহাকে পরিত্যাগ করিয়া সকলে পলায়ন করে না। সন্তানের রোগ হইলে মাতা দক্ষিণ হস্তে মলাদি পরিষ্কার করেন, স্বামীর পীড়া হইলে স্ত্রী স্বহস্তে সে কার্য্য সম্পন্ন করেন। যদ্যপি মরিতে হয়, তাহা হইলে ইহাদেরই অগ্রে মরা উচিত, কিন্তু কোথায় সে ঘটনা? যাহারা মরিবার, তাহারাই মরে। বিশেষ সুপণ্ডিত যাঁহারা, স্বাস্থ্যরক্ষায় বিধাতাপুরুষ যাঁহারা, তাঁহারাই যখন বিসূচিকাদি রোগে পরাজয় স্বীকার করিতে বাধ্য হইতেছেন, তখন বিজ্ঞানশিক্ষা করা এবং না করায় কি সমানফল নহে। নিরক্ষর ব্যক্তি না জানিয়া জলের সহিত বিসূচিকাবিষ পান করিল, সুপণ্ডিত সর্ব্বদা সতর্ক থাকিয়াও সতর্কতা-পূর্ণ হৃদয়ে আহারাদি করিয়া বিসূচিকার হস্ত হইতে পরিত্রাণ পাইলেন না, এই কার্য্যক্ষেত্র দেখিলে কি মীমাংসা করা যাইবে? কার্য্যক্ষেত্রে সকলেরই এক দশা, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। রামকৃষ্ণদেবের উপদেশ মতে বিচার করিয়া দেখিলে এই বুঝা যায় যে, ধর্ম্মের নিগূঢ় বিজ্ঞান জ্ঞাত হইয়াই হউক অথবা তাহা না জানিয়া হউক, কার্য্যক্ষেত্রে উভয়ে ফললাভ করিয়া থাকেন।

ধর্ম্মভাব যে স্থানে যে ভাবে প্রস্ফুটিত হউক, তাহার কার্য্য একই প্রকার। যেমন, পিতা মাতাকে শ্রদ্ধা ভক্তি করা সর্ব্বব্যক্তির একই ভাব একই কার্য্য। ভগবান্ সম্বন্ধে যদ্যপি বাস্তবিক ভগবানের সম্বন্ধ থাকে, তাহা হইলে সকলেরই একপ্রকার ভাব এবং এক প্রকার কার্য্য হইবেই হইবে, তদ্বিষয়ে তিলার্দ্ধ সন্দেহ নাই।

এই প্রশ্নটী মীমাংসা করিতে হইলে ধর্ম্ম সম্বন্ধে সাধারণের বিশ্বাস কি, তাহা একবার দেখা কর্ত্তব্য। ভগবানের দুইটি ভাব সকলেই বিশ্বাস করেন। যথা নিত্য এবং লীলা, অথবা অপ্রকাশ এবং প্রকাশ

ভাব। নিত্য বা অপ্রকাশ ভাব সমর্থনকারীরা আমাদের বৈদান্তিক সম্প্রদায় বলিয়া উল্লিখিত। বৈদান্তিকমতে প্রকাশ বা লীলাভাব অলীক এবং মিথ্যা, সুতরাং তাহা গ্রাহ্যনীয় নহে। এই ভাবের ভাবুকেরা আপনাকে ভগবান্ মনে করেন এবং তাহাই সকলে মনে করিতে বলেন। ভগবানের পাপ পুণ্য নাই, ধর্ম্মাধর্ম্ম নাই, কর্ম্মাকর্ম্ম নাই। দ্বিতীয়মতে ভগবান্ এবং ভক্তজ্ঞান থাকে। পাপপুণ্য, ধর্ম্মাধর্ম্ম এবং কর্ম্মাকর্ম্ম বোধ বিলক্ষণ থাকে। এই ক্ষেত্রে ভগবান্ লীলারূপধারী বলিয়া ভক্তেরা প্রত্যক্ষ করেন। অর্থাৎ ভগবান্ হওয়া এবং ভগবান্‌কে পাওয়া দুইটী মতের সংক্ষিপ্ত ভাব। এই উভয় ভাবের তাৎপর্য্য বুঝিয়া দেখিলে বিশেষ তারতম্য আছে বলিয়া বোধ হইবে না। ভগবান্ হইয়া যাওয়া, তথায় ভগবান্ ও ভক্তের স্বাতন্ত্র্য থাকে না। এবং ভগবান্ প্রাপ্ত হওয়া পক্ষেও ভগবান্ এবং ভক্তে স্বাতন্ত্র্য থাকে না। যেব্যক্তি ভগবানে বিলীন হন, তাঁহার স্থানে ভগবান্ কর্ত্তা, এই নিমিত্ত তিনিই ভগবান্ বলিয়া পরিকীর্ত্তিত হইয়া থাকেন এবং যে স্থানে ভগবান্ লাভ করা যায়, সে স্থানেও ভগবান্ কর্ত্তারূপে বিরাজ করেন। তাঁহার নিজের কোনও বলবুদ্ধি থাকে না। ভক্তের নিজের কর্তৃত্ব বোধ থাকে না। এই মতে প্রভু বলিতেন যে, একদা কৃষ্ণপ্রিয়া গোপাঙ্গনারা শ্রীকৃষ্ণকে পরিবেষ্টন পূর্ব্বক প্রেম বিহার করিতেছিলেন। ক্রমে ক্রমে গোপাঙ্গনারা শ্রীকৃষ্ণের শ্রীঅঙ্গ দর্শন করিয়া পুলকার্ণবে নিমগ্ন হইয়া যাইলেন। এতক্ষণ যে মন নয়ন-পথদ্বারা দর্শনসুখানুভব করিতেছিলেন, তাহা প্রেম সাগরে নিমজ্জিত হইয়া যাওয়ায় আপন হৃদয়ের অভ্যন্তরে প্রাণবল্লভকে লইয়াই ডুবিলেন। তখন তাঁহারা আর আপনার ভাব সংরক্ষা করিতে অসমর্থ হইয়া পড়িলেন। আপনাকে আপনি বিস্মৃত হইলেন বটে, কিন্তু শ্রীকৃষ্ণকে ভুলিতে পারি-

লেন না। শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র ক্রমে প্রাণ অধিকার করিয়া ফেলিলেন, তখন প্রাণে প্রাণে কৃষ্ণ কৃষ্ণ করিতে করিতে কৃষ্ণ ভাবই স্ফূর্ত্তি পাইতে লাগিল। তাহারা অন্তরে শ্রীকৃষ্ণের ছবি দেখিতে লাগিলেন। দেখেন আপনিই কৃষ্ণ। তখন কোন সখী আপনার বক্ষাচ্ছাদিত উত্তরীয় বস্ত্রাগ্রভাব বাম হস্তের কনিষ্ঠাঙ্গুলির দ্বারা উত্তোলনপূর্ব্বক চিৎকার করিয়া বলিতে লাগিলেন, "দেখ! দেখ! তোমরা সকলে চাহিয়া দেখ! আমি গোবর্দ্ধন ধারণ করিয়া ইন্দ্রের প্রকোপ হইতে তোমাদের গোকুলে রক্ষা করিলাম। কোন সখী অপর সখীর বেণীর অগ্রভাগ বাম হস্তে ধারণ পূর্ব্বক সদর্পে হুঙ্কার দিয়া বলিয়া উঠিলেন, "হাঁরে পামর! তোর এতদূর স্পর্দ্ধা! তুই আমার সর্ব্বস্বধন নিরীহ রাখাল বালকগণের জীবন নাশ করিয়াছিলি? এখন তোকে কে রক্ষা করিবে?" এইরূপে প্রত্যেক সখী প্রেমোন্মাদিনী হইয়া কৃষ্ণচন্দ্রের লীলাভিনয় করিয়াছিলেন। অতিরিক্ত চিন্তার ফলে উন্মত্ততা আইসে, তাহা আমরা জানি এবং এই অবস্থায় সত্য সম্বন্ধ থাকিলে তাহার সত্য ফলই লাভ হয়। আর্কিমিডিজের বৃত্তান্ত স্মরণ করিলে অতি চিন্তায় সাধারণ বাতুলতা আসিতে পারে না বলিয়া জ্ঞাত হওয়া যায়। সে যাহা হউক, লীলাভাবেও তন্ময়ত্ত হওয়া যায়। অতএব দ্বৈত এবং অদ্বৈত ভাবের পরিণাম একই প্রকার কিন্তু কার্য্যপ্রণালী সম্পূর্ণ বিপরীত। আমরা স্থূলে এই কার্য্যপ্রণালীর সহিত উদ্দেশ্য মিলাইতে যাইয়া বিভ্রাটে নিপতিত হইয়া থাকি। উদ্দেশ্য বা ভাব এবং কার্য্যপ্রণালী বা স্থূল আচরণাদির তাৎপর্য্য জ্ঞান লাভ করিবার নিমিত্ত রামকৃষ্ণদেব অগ্রে অদ্বৈত জ্ঞান আঁচলে বাঁধিতে বলিয়াছেন।

রামকৃষ্ণদেবের আজ্ঞানুসারে মনুষ্যজীবন বিশ্লিষ্ট করিয়া আমরা কি

বুঝিলাম? পুনরায় তাহা সংক্ষেপে দেখা হউক। আমরা বুঝিয়াছি যে, মনুষ্যজাতি বলিলে এক প্রকার পদার্থ ও ভাবাদি সম্মিলনসম্ভূত পদার্থ বুঝায়। হিন্দু, যবন, ম্লেচ্ছ, চীন, রুষ, তাতার, কাফ্রি প্রভৃতি সভ্য অসভ্য, নরনারী, ধনী, নির্ধনী, জ্ঞানী, মূর্খ, সকলেই এক প্রকার। এক্ষণে ধর্ম্ম বৃত্তিটী লইয়া আলোচনা করিয়া দেখা কর্ত্তব্য। যদ্যপি অন্যান্য বৃত্তিগুলির এক অদ্বিতীয় ভাবে থাকিয়া কার্য্যের অসমতা প্রকাশ করা ধর্ম্ম হয়, তাহা হইলে ধর্ম্মবৃত্তিটীও সেইরূপ সর্ব্বত্রে এক বলিয়া স্বীকার না করিবার কোন হেতু নাই। এক জন ক্ষুধায় সন্দেশ খাইতেছে, আর একজন কলা খাইয়া জঠরানল নিবারণ করিতেছে। যে ব্যক্তি কলা ভক্ষণ করিতেছে, সে সন্দেশ না খাইলে কি তাহার ক্ষুধা স্বীকার করিব না? আহার করা ক্ষুধার পরিচায়ক, সেইরূপ ধর্ম্মানুষ্ঠান ধর্ম্মভাবের নির্দ্দেশকস্বরূপ। এস্থানে অদ্বৈত জ্ঞান ধর্ম্ম এবং তাই আঁচলে বাঁধিয়া যাহা ইচ্ছা অর্থাৎ যে কোন প্রক্রিয়া, সাধন বা ভজন দ্বারা স্বধর্ম্ম প্রতিপালন কর, ইহাই প্রভু রামকৃষ্ণের অভিপ্রায়। এইরূপে সকল নরনারীর ধর্ম্মবৃত্তি এক অদ্বিতীয় এবং তাহার কার্য্য বহুভাবব্যঞ্জক বলিয়া চূড়ান্ত জ্ঞান জন্মিলে পরস্পর সমতা সংস্থাপনের কি আর বিলম্ব হইতে পারে? সর্ব্বত্রে ধর্ম্ম এক, কিন্তু তাহার কার্য্য বহু; ইহাকেই প্রকৃতপক্ষে বিশ্বজনীন ধর্ম্ম কহা যায়।

রামকৃষ্ণদেব যে কেবল এইরূপ আনুমানিক সিদ্ধান্ত করিয়া বসিয়াছিলেন, তাহা নহে। আপনি নিজে কার্য্য করিয়া যাহা দর্শন করিতেন, তাহাই সাধারণকে উপদেশ দিতেন। "অদ্বৈত জ্ঞান আঁচলে বেঁধে যাহা ইচ্ছা তাহা কর," এই উপদেশটীও তাঁহার নিজের প্রত্যক্ষ সাধনের ফল বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া গিয়াছেন। বিশ্বজনীন ধর্ম্মভাব শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রের শ্রীমুখ হইতে সর্ব্বপ্রথমে প্রকাশিত হইয়াছে। তিনি

অর্জ্জুনকে বলিয়াছিলেন, পুষ্পমাল্যে নানাবিধ ফুল সংস্থাপিত হয় বটে, কিন্তু অন্তরে অদ্বিতীয় আমি সূত্রবৎ অবস্থিতি করিয়া থাকি। এই কথার তাৎপর্য্য যাহা, রামকৃষ্ণদেব তাহাই অভিনয় করিয়াছেন। কেবল কথায় কার্য্য হয় না, তাহা হইলে শ্রীকৃষ্ণের কথায়ই সর্ব্বত্রে সমতা হইয়া যাইত। পরিতাপ সাধারণ নহে যে, হিন্দুর পূর্ণাবতার শ্রীকৃষ্ণের উপদেশ হিন্দুশাস্ত্রগীতা, হিন্দু হইয়া প্রতিপালন করিতে চাহেন না। বৈদান্তিক একেশ্বরবাদীরা অবতার অস্বীকারই করেন, সুতরাং শ্রীকৃষ্ণের কথায় ফল হইবে কিরূপে? এই নিমিত্ত রামকৃষ্ণ কার্য্যের প্রতি বিশেষ লক্ষ্য রাখিতেন, কার্য্যে কোন বিষয় না দেখাইলে লোকের মনে কখন ধারণা হইতে পারে না। এই কারণে তিনি বৈদান্তিক একদেশীমত অবলম্বনপূর্ব্বক সাধন করিয়াছিলেন। সাধন দ্বারা অখণ্ড সচ্চিদানন্দ সিদ্ধান্তপূর্ব্বক সে অবস্থাটী এইরূপে প্রকাশ করিলেন। যেমন, পারার হ্রদে সীসার চাপ ফেলিয়া দিলে সীসা পারা এক হইয়া যায়, সীসা স্বতন্ত্র থাকে না, অখণ্ড সচ্চিদানন্দে জীবের তদ্রূপাবস্থা হয়। অথবা, নুনের ছবি সমুদ্রের জল নিরূপণ করিতে জলমগ্ন হইলে কিয়ৎকালমধ্যে গলিয়া যায়। এই দুইটী দৃষ্টান্ত দ্বারা অদ্বৈতবিজ্ঞানের প্রকৃতাবস্থা প্রকাশিত হইয়াছে। অদ্বৈতবিজ্ঞানের সাধকের স্বাতন্ত্র্য থাকে না। সাধক এবং সচ্চিদানন্দ একাকার হইয়া যান। সচ্চিদানন্দ পারা বা সমুদ্রবৎ, সাধক সীসা বা লবণের পুত্তলিকাবিশেষ। যাঁহারা বৈদান্তিক মতকে বিশ্বজনীন ধর্ম্ম বলেন এবং প্রত্যেক নরনারীর এই অবস্থা আকাঙ্ক্ষা করেন, তাহা তাঁহাদের মুখে শোভা পায় না। কারণ, বিশ্ববিধাতার অখণ্ড ব্রহ্মাণ্ডের কাণ্ডকারখানা জীবের জৈব ভাব ধারণ করিতে কখন সমর্থ হইতে পারে না। বিশেষতঃ জীবের পক্ষে অদ্বৈতজ্ঞান সম্ভবে, কিন্তু অদ্বৈত বিজ্ঞানী

হওয়া যারপরনাই অসম্ভব কথা। সশরীরে সচ্চিদানন্দে বিলীন হওয়া মুখের কথা নহে। সত্যযুগে এই সাধনের ফল প্রত্যাশায় আর্য্যেরা সহস্র সহস্র বৎসর সন্ন্যাসাশ্রমের আশ্রয় লইয়া ধ্যানাবলম্বনপূর্ব্বক বিশ্বরচনার নিগূঢ় রহস্যভেদ করিবার চেষ্টা করিতেন। যখন ধ্যানে সিদ্ধ হইতেন, অর্থাৎ যখন ব্রহ্মাণ্ডের স্থূল, সূক্ষ্ম, কারণাদি উপলব্ধির শক্তি সঞ্চারিত হইত, তখন তাহাকে ধারণা করা যাইত। মনের ধারণাশক্তি হইলে সে বিষয় আর বিস্মৃত হওয়া যায় না, সুতরাং তাহা সর্ব্বদা মনের অধিকারভুক্ত থাকে। এই ধ্যেয় বস্তু লইয়া মন যখন বিভোর হইয়া পড়ে, তখন অন্যত্রে মনের সম্বন্ধ থাকিতে পারে না, ইহাকে সমাধি কহে। সমাধি যোগীর অবস্থাবিশেষ। সমাধি না হইলে সচ্চিদানন্দের আভাস প্রাপ্তির দ্বিতীয় উপায় নাই। রামকৃষ্ণদেব তোতাপুরীর নিকট অদ্বৈতমতের দীক্ষা গ্রহণপূর্ব্বক সাধন কার্য্যে নিমগ্ন হন এবং তাঁহার সৃষ্টিছাড়া শক্তিবলে তিন দিনে সমাধি লাভ করেন। তাঁহার বাস্তবিক যে সমাধি হইয়াছিল, তাহা ন্যাংটা তোতাপুরী নিজে স্বীকার করিয়াছিলেন এবং তিনি আশ্চর্য্য হইয়া বলিয়াছিলেন যে, সমাধি লাভ করিতে আমার ৪০ বৎসর অতিবাহিত হইয়া গিয়াছে, উনি তিন দিনে কিরূপে সেই অবস্থা লাভ করিলেন? তিনি এইরূপ ভাবিয়া চিন্তিয়া রামকৃষ্ণদেবের নিকট এগার মাস অবস্থিতি করিয়াছিলেন। এই নিমিত্ত অদ্বৈতবাদ সম্বন্ধে রামকৃষ্ণদেবের উপদেশ গ্রাহ্য। যেহেতু, তিনি সাধক হইয়া যাহা প্রত্যক্ষ করিয়াছেন, তাহা বিশ্বাস না করিয়া আনুমানিক সিদ্ধ ব্যক্তির কথা কখন গ্রাহ্য হইতে পারে না।

রামকৃষ্ণদেব অদ্বৈত বিজ্ঞানী হইয়া অর্থাৎ অদ্বৈত জ্ঞান আঁচলে বন্ধনপূর্ব্বক দ্বৈত বা লীলার বৃত্তান্ত অবগত হইবার আয়োজন করেন।

স্থূল জগতে প্রত্যেক বস্তু স্বতন্ত্র এবং প্রত্যেক বস্তুর কার্য্য স্বতন্ত্র বিধায়, স্বভাবতঃ সকলের মনে পার্থক্য বোধ হয়। আমি অমুক, তুমি অমুক, সে অমুক, ইত্যাকার ভাবের কার্য্য হওয়া অনিবার্য্য। এইরূপ কার্য্যে আত্মাভিমান আইসে। রামকৃষ্ণদেব তজ্জন্য অভিমান চূর্ণ করিবার নিমিত্ত যৎপরোনাস্তি সাধন করিয়াছিলেন। তিনি সর্ব্বদা বিশ্বজননী মহাকালীর নিকট কৃতাঞ্জলিপুটে সরোদনে বলিতেন, "মাগো! আমার অভিমান চূর্ণ করিয়া দে মা! আমি দীনের দীন, হীনের হীন, কীটানুকীটাপেক্ষা ক্ষুদ্রতম, এইজ্ঞান জন্মাইয়া দে মা! আমি ব্রাহ্মণতনয়, আমি ব্রাহ্মণ, আমি ঈশ্বরানুরাগী, এই অভিমান আসিয়া যেন আমার হৃদয়ভূমি অধিকার করিতে না পারে।" অদ্বৈত জ্ঞান তাঁহার অঞ্চলে বাঁধা ছিল, অদ্বৈত জ্ঞানে কোথায় কিরূপে কার্য্য করিতে হয়, তাহার অভিনয় আরম্ভ হইল। তিনি সর্ব্বজীবকে জীব হিসাবে এক বলিয়া বোধ করিলেন।

একদিন মেতরকে দেখিয়া পূর্ব্বসংস্কার হেতু তাহাকে নীচ জাতি বলিয়া তাঁহার জ্ঞান হয়। তিনি তৎক্ষণাৎ মা! মা! বলিয়া ক্রন্দন করিতে লাগিলেন এবং আপনাকে শতধিক্কার দিয়া বলিতে লাগিলেন যে, "মা! অদ্যাপি আমার অভিমান যায় নাই, অদ্যাপি আমার ভাল মন্দ জ্ঞান যায় নাই। সর্ব্বজীবে আমার সমজ্ঞান হওয়া দূরে থাক, এক মনুষ্যজাতির মধ্যে ব্রাহ্মণ মেতরের পার্থক্য ভাব অদ্যাপি রহিয়াছে। তবে আমার উপায় হইবে কি?" তিনি বুঝিলেন যে, কার্য্য ব্যতীত ফল ফলে না। কেবল আনুমানিক বিচারের দ্বারা কোন বিষয়ের প্রত্যক্ষ জ্ঞান প্রাপ্ত হইবার সম্ভাবনা নাই। তিনি বুঝিলেন যে, বেল কাঁটাকে না ভস্মীভূত করিলে তাহার বিদ্ধকরণ ধর্ম্ম বিলুপ্ত হয় না। নিকটে বেলকাঁটা রাখিয়া নয়ন মুদিয়া মনে মনে দগ্ধ করিলে

উহা কখন বিনষ্ট হয় না। বাস্তবিক কার্য্য চাই, বাস্তবিক অগ্নির দ্বারা বেল কাঁটাকে দগ্ধ করিতে হইবে, তাহা হইলে উহার দ্বারা আর শরীর বিদ্ধ হওনজনিত ক্লেশানুভব করিতে হইবে না। তিনি এইরূপ চিন্তা করিয়া পরদিবস অতি প্রত্যুষে পাইখানায় যাইয়া, হস্তে নহে, মুখে সম্মার্জ্জনী লইয়া উহা পরিষ্কার করিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন। এইরূপ নানাবিধ সাধন দ্বারা, মানবজাতি কেবল কার্য্যের দ্বারা পরস্পর পৃথক জ্ঞান করিতে শিক্ষা করে বলিয়া বুঝিলেন। যিনি ঈশ্বর চিন্তা করেন, যিনি সাধন ভজন করেন, যিনি শাস্ত্রাদি পাঠ করেন, তিনি তদ্বিপরীত ভাবাপন্ন ব্যক্তিকে ঘৃণা করেন। যিনি ধনী, তিনি দুঃখীকে অবজ্ঞা করেন, যিনি বলিষ্ঠ, তিনি দুর্ব্বলের শাসন করেন। ফলে, কার্য্যই সর্ব্বাপেক্ষা প্রবল এবং কার্য্যই সকলের সর্ব্বনাশের মূলীভূত কারণ। কার্য্যেই বর্ণশ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণ, কার্য্যেই মূর্খ অক্ষম কৃষক, কার্য্যেই একব্যক্তি মেথর, কার্য্যেই মেথর সর্ব্বজনসম্মানিত অতি উচ্চ পদ অধিকার করেন। অতএব কার্য্য ছাড়িয়া দিলে সকলেই এক মনুষ্যজাতি। আজ কার্য্যসূত্রে এক ব্যক্তি রাজরাজেশ্বর, কাল কার্য্যসূত্রে তিনি পথের কাঙ্গাল। স্থূলে কার্য্যই অতি প্রবল। অতঃপর রামকৃষ্ণদেব স্ত্রীজাতি লইয়া বিচার করেন। স্ত্রীজাতি এক অদ্বিতীয়, কেবল কার্য্য-ভেদে পার্থক্য জ্ঞান জন্মায়। কার্য্যেই স্ত্রীলোক মহারাণী, কার্য্যেই স্ত্রীলোক পথের কাঙ্গালিনী, কার্য্যেই স্ত্রীলোক গৃহস্থের বধূ সতী সাবিত্রী, কার্য্যেই স্ত্রীলোক বারাঙ্গনা বলিয়া উল্লিখিত হইয়া থাকেন। অঞ্চলস্থিত অদ্বৈত জ্ঞানের ফলে তাঁহার সর্ব্বত্রে মাতৃভাব জন্মিয়া যায়। তাই তিনি বলিতেন যে, "স্ত্রীজাতিমাত্রেই আমার মা। আমার মা আনন্দময়ী কখন ঘোমটা দিয়া গৃহস্থের বধূ হইয়া থাকেন, আবার কখন দেখি মেছুয়াবাজারের বারাণ্ডায় হুঁকো হাতে করিয়া খান্‌কি

সাজিয়া দাঁড়াইয়া আছেন। নরনারীসম্বন্ধে এবম্বিধ অদ্বৈত এবং দ্বৈত-জ্ঞান সিদ্ধান্ত করিয়াও তিনি নিরস্ত হন নাই। কেবল বস্তুবিশেষে অদ্বৈতজ্ঞান কখন আবদ্ধ থাকে না; ইহা বিশ্বব্রহ্মাণ্ডব্যাপিত জ্ঞান। সুতরাং, জীব, জন্তু, কীট, পতঙ্গ, উদ্ভিদ, স্থাবর, জঙ্গম, সমুদয় একাকার করিয়াছিলেন। তিনি সর্ব্বত্রে অদ্বিতীয় চৈতন্যশক্তি বিরাজিত দেখিয়া সকলের নিকটে মস্তাকবনত করিতেন। প্রত্যহ পিপীলিকা কীট পতঙ্গাদিদিগকে চিনি প্রদান করিয়া বেড়াইতেন। এই কার্য্যে কখন কখন তাঁহার দুইটা তিনটা বাজিয়া যাইত। ভোজন করিতে করিতে নিকটে কুক্কুরাদি কোন জন্তু দেখিলে অমনি ছুটিয়া যাইয়া তাহাকে ভোজন করাইতেন। রাত্রিকালে শৃগাল সকল আসিয়া আহার করিয়া যাইত। উদ্ভিদাদিতে চৈতন্যস্ফূর্ত্তি হওয়ায় আর তিনি পুষ্পচয়ন করিতে পারিতেন না। তৃণাদি পদদলিত হইবার আশঙ্কায় অতি সাবধানে পদবিক্ষেপ করিতেন। অসাবধান প্রযুক্ত যদ্যপি কখন তৃণ মাড়াইতেন, তাহা হইলে তিনি কাঁদিয়া অস্থির হইতেন। তৃণের গাত্রে হাত বুলা-ইয়া দিতেন, তাহাতে জল ঢালিয়া তাহার বেদনা দূর করিবার চেষ্টা করিতেন। জড়পদার্থ বিচারকালে তিনি টাকা এবং মাটির সামঞ্জস্য করিয়াছিলেন। কার্য্যক্ষেত্রে টাকা মাটিতে প্রভেদ অসীম। একটী টাকা এবং উহার ওজনের মাটির মূল্য এক নহে। তিনি অদ্বৈতজ্ঞানের বিক্রমে তাহা একশক্তিপ্রসূত বলিয়া বুঝিয়া লইলেন। টাকা মাটি স্থূলে এক নহে কিন্তু উহাদের ঔৎপত্তিক কারণ বিচার করিলে উহা-দের এক বলিতে বাধা হইতে হয়। পদার্থবিজ্ঞান মতে স্থূলে পদার্থ-দিগের নানাবিধ ভাব, নানাবিধ ধর্ম্ম এবং নানাবিধ কার্য্য দেখা যায়, তাহাদের কারণাদি বিচার করিলে শক্তি ব্যতীত আর কিছুই প্রাপ্ত হওয়া যায় না। কারণ, পদার্থদিগের অবস্থান্তরাদি শক্তির অধিকার

সম্ভূত। শক্তি এবং পদার্থ বিভাগ করিতে যাইলে পদার্থ হারাইয়া যায়। যেমন, জল ও বাষ্প এক পদার্থ, উত্তাপশক্তির দ্বারা অবস্থান্তর হয় বলিয়া উল্লিখিত, কিন্তু পদার্থ এবং শক্তি উভয়ে এত জড়িত যে, উহাদের কাহাকেই স্বতন্ত্র করা যায় না। এই নিমিত্ত কেহ পদার্থ এবং শক্তি স্বীকার করেন। কেহ কেবল শক্তি স্বীকার করেন। রামকৃষ্ণদেব সর্ব্বত্রে শক্তিকেই সকলের নিদান বুঝিয়া টাকা এবং মাটি এক শক্তির বিকাশ জ্ঞান করিয়াছিলেন। তিনি কেবল টাকা মাটির অদ্বৈতভাব নিরূপণ করিয়া ক্ষান্ত হন নাই। অদ্বৈত বিজ্ঞানীর চক্ষে বিষ্ঠাচন্দনও এক। প্রভু আমার তাহাও পরিত্যাগ করেন নাই। তিনি আপনার বিষ্ঠা লইয়া সাধন করেন। এই কার্য্য দেখিয়া জনৈক ব্রাহ্মণ উপহাস করিয়াছিলেন যে, "আপনার বিষ্ঠা স্পর্শ করিলে যদ্যপি অদ্বৈতজ্ঞানী হয়, তাহা হইলে আবালবৃদ্ধবনিতা সকলকেই তাহা বলা যাইবে না কেন?" ব্রাহ্মণের এই উপহাস রামকৃষ্ণদেব দৈববাণীবিশেষ বলিয়া গ্রহণ করিলেন। তিনি সাধারণ ব্যক্তিদিগের ন্যায় ক্রোধান্ধ হইয়া তাহাকে সাধ্যমত তিরস্কার করিতে যাইলেন না। তিনি আপনাপনি বুঝিলেন যে, ব্রাহ্মণ বাস্তবিক কথা বলিয়াছেন। তিনি পরদিবস অদ্বৈতজ্ঞানের সহায়তায় গঙ্গাতীরে গমনপূর্ব্বক সদ্যতক্ত মল জিহ্বার দ্বারা বার বার স্পর্শ করিয়া হৃষ্টমনে প্রত্যাগমন করিলেন।

তদনন্তর রামকৃষ্ণদেব ভাবের খেলা আরম্ভ করেন। তিনি ধর্ম্মের বিবিধ ভাবের তাৎপর্য্য বাহির করিবার নিমিত্ত অতি সামান্য ব্রত, যথা গোকল হইতে প্রায় সকল প্রকার ভাব লইয়া সাধন করিয়াছিলেন। অদ্বৈতবিজ্ঞান লাভ করিবার ন্যায় এই সকল সাধনের সময়ও তেমনি তিন দিনের অধিক সময়ের প্রয়োজন হয় নাই! আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, প্রত্যেক ভাব সাধনের সময় সেই ভাবের একজন সিদ্ধ পুরুষ

আসিতেন। এই রূপে তিনি পঞ্চবটী সংগঠিত করিয়া তথায় বেদ-বিহিত সাধন সমাপন করেন। বেলতলায় পঞ্চমুণ্ডীর আসন স্থাপন-পূর্ব্বক তান্ত্রিক যাবতীয় সাধনা ব্রাহ্মণীর তত্ত্বাবধারণে পরিসমাপ্ত করেন। প্রভু বলিতেন যে, ব্রাহ্মণীর দ্বারা কর্ত্তাভজা, নররসিক, পঞ্চ নামী প্রভৃতি ধর্ম্ম সাধনার সহায়তা হইয়াছিল। শিখ, রামাৎ, নিমাৎ আদি বিবিধ মত সাধনান্তে গোবিন্দ দাস নামক ব্যক্তির নিকটে মহম্মদীয় ধর্ম্মে দীক্ষিত হন এবং তিন দিবস সাধনান্তে তদ্ধর্ম্মে সিদ্ধিলাভ করেন। সর্ব্বশেষে তিনি খ্রীষ্টভাবে অবস্থিতি করিয়া আধুনিক ব্রাহ্ম ধর্ম্মটীও দেখিতে বাকী রাখেন নাই। তিনি সর্ব্বদা বলিতেন যে, "সখি! যাবৎ বাঁচি তাবৎ শিখি।" অর্থাৎ, শিক্ষা না করিলে শিক্ষিত হওয়া যায় না এবং শিক্ষার পরিসমাপ্তি হয় না। মানুষ যতদিন জীবিত থাকে, ততদিন তাহার শিক্ষার সময়। কিঞ্চিৎ শিক্ষার বিশেষ দোষ। তাহাতে মনুষ্যকে প্রবীণ করিয়া তুলে। প্রবীণ হইলেই সর্ব্বনাশ, তখন তাহাতে গুরুগিরি আইসে, তখন তিনি সকলকে শিক্ষা দিতে চাহেন, শিক্ষা করিতে তাঁহার আর স্পৃহা থাকে না। শিক্ষা করিতে থাকিলে আপনাকে বিস্মৃত হওয়া যায় না; পদে পদে আপনার অজ্ঞতার ভাব উদ্দীপন থাকে বলিয়া অভিমান আসিতে পারে না।

রামকৃষ্ণদেব অদ্বৈত জ্ঞান আঁচলে বাঁধিয়া সর্ব্বত্রে সমতা প্রদর্শন-পূর্ব্বক বলিয়াছিলেন যে, এক ঈশ্বরের অনন্ত ভাব; অনন্ত ভাবের পরিচয় স্থূল জগতের অনন্তপ্রকার বস্তু, অনন্তবস্তুর সমষ্টিই ঈশ্বর। তিনি এই ভাবটীর তাৎপর্য্যবোধ জন্মাইবার নিমিত্ত বলিতেন যে, চন্দ্র সূর্য্য এক অদ্বিতীয়। মনুষ্য, জীব, জন্তু, জল, বায়ু, মৃত্তিকা, পাহাড়, পর্ব্বত, সকলেই এক সূর্য্য চন্দ্রের দ্বারা আপনাপন ভাবের কার্য্য করিয়া লই-তেছে। উদ্ভিদেরা উদ্ভিদ্‌দিগের প্রয়োজনমত জীবগণ তাহাদের প্রয়োজন

মত কার্য্য করিতেছে। ইহারা পরস্পরকলহ করে না, ইহারা আপন ভাবে সকলকে আকর্ষণ করিতে যায় না। যদ্যপি সেরূপ ঘটনা ঘটিত, তাহা হইলে উদ্ভিদ্ এবং জীবমণ্ডল এক মুহূর্ত্তকাল বাঁচিতে পারিত না। জীব এবং উদ্ভিদ্‌মণ্ডলের সমতারক্ষার কারণ নিরূপণ করিলে দেখা যায় যে, উহারা আপনাপন কার্য্যের দ্বারা পরস্পরের সহায়তা করিয়া থাকে। যতক্ষণ উহারা আপন কার্য্য আপনি করে, ততক্ষণই সমতা রক্ষা হয়। এই নিমিত্ত রামকৃষ্ণদেবের অভিপ্রায়ে ধর্ম্মের সমতা স্থাপন করিলে আপনাপন ভাব রক্ষা ও প্রতিপালন করা বুঝায়। হিন্দুতে হিন্দুভাব, মুসলমানে মহম্মদীয় ভাব, খৃষ্টানে খ্রীষ্ট ভাব, এবং বৌদ্ধে বুদ্ধ ভাব অর্থাৎ যাহার হৃদয়ে যে প্রকার ভাব উত্থিত হইবে, সেই ভাব তাহার নিজের বলিয়া বুঝিতে হইবে। সে ভাব অন্যের নহে। সে ভাবে অন্যকে আকর্ষণ করা সমতাস্থাপনের তাৎপর্য্য নহে। এই নিমিত্ত প্রভু আমার বলিতেন, যেমন বাটীর কর্ত্তা এক অদ্বিতীয়, নানাবিধ ভাব তাঁহাতে আছে। তিনি পিতা, তিনিই পিতামহ, তিনিই মাতামহ, তিনিই সময়ে বৃদ্ধপিতামহ এবং মাতামহ, তিনিই স্বামী, তিনিই পুত্র, তিনিই দৌহিত্র, তিনিই শ্বশুর, তিনিই জামাতা, তিনিই সাধু, তিনিই অসাধু, তিনিই চোর, লম্পট, অর্থাৎ যত প্রকার ভাব সম্ভবে, সমুদয় এক ব্যক্তিতে সম্ভবে। কিন্তু এই বিবিধ ভাবের কার্য্য এক স্থানে হয় না। বিবিধ ভাব বলিলে কার্য্যের পার্থক্য আসিতেছে। স্ত্রীর ভাব কন্যায় কিম্বা পুত্রবধুতে কার্য্য করে না। স্ত্রীর ভাব স্বতন্ত্র, কন্যার ভাব স্বতন্ত্র এবং পুত্রবধুর ভাব স্বতন্ত্র অর্থাৎ বাটীর কর্ত্তা মধ্যবিন্দু বা কেন্দ্রবৎ এবং পরীধির বিন্দুবৎ ভিন্ন ভিন্ন ভাব। মধ্যে কর্ত্তা বসিয়া আছেন, চারিদিকে পারিবারিক সম্বন্ধ বা ভাব দেদীপ্যমান রহিয়াছে। প্রত্যেক ভাব এক মধ্যস্থানেই পর্য্যবসিত হইয়া থাকে। এই অবস্থায়

পারিবারিক সমতা হয়। অর্থাৎ পরিবারের প্রত্যেক নরনারী নিজ নিজ ভাব প্রতিপালন করিলে সমতা থাকিতে পারে। কিন্তু, যদ্যপি তাহার ভাববিপর্য্যয় হয়, যদ্যপি স্ত্রী যাইয়া কন্যার স্থল বা ভাব অধিকার করে, তাহা হইলে কর্ত্তার সহিত ভাবান্তর উপস্থিত হইবে, তাহার সন্দেহ নাই। কারণ, কর্ত্তার সহিত কন্যার বাৎসল্যভাবের সম্বন্ধ এবং স্ত্রীর সহিত মধুর ভাবের সম্বন্ধ। বাৎসল্যে মধুর যাইলে, সুতরাং ভাবের অসমতা উপস্থিত হয়। এইরূপে একজনের ধর্ম্মভাব অপরে অবলম্বন করিতে যাইলে ধর্ম্মের সমতা স্থাপন না হইয়া অসমতাই সংঘটন হইয়া যায়।

রামকৃষ্ণদেব সর্ব্বজন প্রত্যক্ষীভূত পারিবারিক ছবির দ্বারা ধর্ম্ম-জগতের অবিকল সেইরূপ ছবি আপনি দেখাইয়া ভাবজগতের বিবাদ-ভঞ্জন পূর্ব্বক সর্ব্বত্রে সমতাস্থাপনের ভিত্তিভূমি নির্ম্মাণ করিয়া গিয়াছেন। তিনি বাটীর কর্ত্তা অর্থাৎ কেন্দ্রবিশেষরূপে অবস্থিতি করিয়া ধর্ম্মজগতের যাবতীয় ভাবকে পরিধির বিন্দুবিশেষ অথবা পারিবারিক ভাববিশেষরূপে পরিণত করিয়াছিলেন। আমরা দেখিয়াছি যে, বৈদান্তিক পরমহংসেরা তাঁহার মুখারবিন্দবিনিঃসৃত উপদেশ-সুধাপান করিবার নিমিত্ত সতৃষ্ণচিত্তে চরণপ্রান্তে উপবেশন করিয়া থাকিতেন। পরমহংসেরাই তাঁহার পরমহংস উপাধি প্রদান করিয়াছিলেন। ভারতবর্ষে যে স্থানে যত পরমহংস ছিলেন, রামকৃষ্ণদেবকে সকলেই দর্শন করিয়া গিয়াছেন, তাহা আমরাও দেখিয়াছি। পরমহংসেরা রামকৃষ্ণদেবকে তাঁহাদের শ্রেণীর সিদ্ধপুরুষ বলিয়া পরিকীর্ত্তন করিতেন। অন্যান্য সাম্প্রদায়িক উদাসীন, যথা, নানক, রামাৎ, গরীবদাসী, শঙ্কর প্রভৃতি সম্প্রদায়ভুক্তসাধুগণ এপ্রদেশে আসিলে রামকৃষ্ণদেবকে দর্শন না করিয়া যাইতেন না। তাঁহারা প্রত্যেকেই আপনাপন সম্প্রদায়ের

ভাবুক বলিয়া আনন্দ লাভ করিতেন এবং যাঁহার যাহা প্রয়োজন হইত, রামকৃষ্ণদেবের নিকট তাঁহার তাহা পূর্ণ হইয়া যাইত। একদা তিন জন উদাসীন সাধু আসিয়াছিলেন। এই সাধুত্রয়ের মধ্যে এক জন প্রবীণ এবং বিশেষ সুপণ্ডিত ছিলেন। তাঁহারা তীর্থ পর্য্যটন করিয়া বেড়াইতেছিলেন। জলপাইগুড়িতে রামকৃষ্ণদেবের নাম শ্রবণ করিয়া তাঁহারা এ প্রদেশে আগমন করেন। যে দিন তাঁহারা প্রভুর সন্নিহিত হন, এ দাস তথায় উপস্থিত ছিল। রামকৃষ্ণদেবের কোন ধর্ম্মের ভেক ছিল না; তিনি সাধারণ লোকের ন্যায় লালপেড়ে কাপড় পরিধান করিতেন। সাধুরা উপস্থিত হইয়াই প্রভুকে চিনিতে পারিলেন এবং নারায়ণ বলিয়া মস্তকাবনতপূর্ব্বক উপবেশন করিলেন। কিঞ্চিৎ ভাবের আলাপন হইবার পর পণ্ডিত সাধুটী নানাপ্রকার প্রমাণ প্রয়োগ করিয়া সত্ত্ব গুণের শ্রেষ্ঠতা নিরূপণ করিলেন। প্রভু ঈষৎ হাসিয়া কহিলেন, "দেখ কোন সময়ে এক গৃহস্থের বাড়ীতে তিন জন চোর প্রবেশ করিয়াছিল। চোরেরা সর্ব্বস্ব অপহরণ করিয়া বাটীর কর্ত্তার হস্তপদাদি এবং চক্ষু পর্য্যন্ত উত্তমরূপে বন্ধন পূর্ব্বক নিবিড় বনে তাহাকে লইয়া গেল। তদনন্তর এক জন চোর কহিল যে, আর বিলম্ব কেন, উহার গলদেশ সঞ্চাপিত করিয়া প্রাণসংহার করিলেই আমাদের কার্য্যের পরিসমাপ্তি হয়।" দ্বিতীয় চোর কহিল, "উহাকে সর্ব্বস্বান্ত করিয়াছি ও হস্তপদাদি বন্ধন করিয়া বনে আনিয়াছি, শাস্তির আর অবশিষ্ট কি আছে? উহার প্রাণসংহার না করিয়া বন্ধনাবস্থায় পরিত্যাগ করা যাক, বন্যজন্তুগণ আসিয়া ভক্ষণ করিয়া ফেলিবে।" তৃতীয় চোর কহিল যে, "আমার বিবেচনায় উহার বন্ধন মুক্ত করিয়া দেওয়া উচিত।" নিরাশ্রয় ব্যক্তি তৃতীয় চোরের শরণাপন্ন হইয়া সকাতরে কহিল, "মহাশয়! দয়া প্রকাশ করিয়া বন্ধনমুক্ত করিলেন, কিন্তু আমাকে পথ দেখাইয়া না দিলে

কিরূপে বাটীতে ফিরিয়া যাইব? কোন্ পথ দিয়া আনিয়াছেন, তাহা আমি জানি না।" তৃতীয় চোর উহাকে সমভিব্যাহারে লইয়া কিয়দ্দূর আসিয়া কহিল, "ঐ তোমার বাটী, স্বচ্ছন্দে চলিয়া যাও। আমি তোমার বাটী পর্য্যন্ত গমন করিতে পারিব না।" এই তিন চোর তিনটী গুণস্বরূপ। তমঃ প্রাণে মারিতে চাহে, রজঃ বন্ধনাবস্থায় রাখিতে চাহে, এবং সত্ত্ব বন্ধন খুলিয়া বাটী দেখাইয়া দেয়। সেও চোর, সুতরাং বাটী পর্য্যন্ত গমন করিবার তাহার অধিকার নাই। যে স্থানে সত্ত্বের গতি রোধ হয়, সেই স্থান হইতে বাটী পর্য্যন্তকে শুদ্ধসত্ত্ব কহে। ত্রিগুণ স্বপ্নে কাহারও ব্রহ্মলাভ হয় না; গুণাতীত বা শুদ্ধ সত্ত্বাবস্থায় উপনীত হইতে না পারিলে কেবল পথের ইতরবিশেষ ব্যতীত বাড়ী যাওয়া হয় না। সাধুরা এই কথা শ্রবণ করিয়া আনন্দে মাতিয়া উঠিলেন। তাঁহারা প্রায় বৃদ্ধকালে পতিত হইয়াছেন, সমগ্র ভারতবর্ষ ভ্রমণ করিয়াছেন, কিন্তু একথা কোথাও শ্রবণ করেন নাই। তাঁহাদের বিশ্বাস ছিল যে, সত্ত্বগুণী হইলেই কার্য্য মিটিয়া যায়। তাহার পর যে কার্য্য থাকে, তাহা তাঁহারা নূতন শুনিলেন এবং তদ্দ্বারা তাঁহারা নবজীবন লাভ করিলেন বলিয়া কৃতার্থ হইলেন।

তন্ত্রের সাধকেরা রামকৃষ্ণদেবকে কৌল বলিয়া জানিতেন এবং কিছুদিন প্রত্যেক শনিবারে চক্র হইত। এ প্রদেশের অচলানন্দ প্রভৃতি প্রসিদ্ধ তান্ত্রিক সাধক মহাশয়েরা প্রায় সকলেই উপস্থিত থাকিতেন।

শৈবমতের উপাসকেরা সময়ে সময়ে আসিতেন, তন্মধ্যে ইঁদেশের গৌরির নাম আমরা শুনিয়াছি। ইনি দীর্ঘকাল ঠাকুরের নিকট অবস্থিতি কারয়াছিলেন। নবরসিক সম্প্রদায়ের বৈষ্ণবচরণ তাঁহার বিশেষ অনুগত ছিলেন। বৈষ্ণবচরণ প্রভুকে বিষ্ণুর অবতার বলিয়া প্রত্যক্ষ করেন এবং এই সম্বন্ধে তিনি এক খানি সংস্কৃত গ্রন্থও প্রণয়ন করিয়া-

ছিলেন। দুর্ভাগ্যবশতঃ সে গ্রন্থ খানির অদ্যাপিও কোন সন্ধান করিতে পারি নাই।

রামকৃষ্ণদেব একবার ব্যারাকপুর ক্যাণ্টনমেণ্টে যাইয়া উপস্থিত হইয়াছিলেন; তথায় শিখ রেজিমেণ্টে কতিপয় শিখ ভক্ত ছিল। তাঁহারা প্রভুকে নানক সাহেব বলিয়া জানিতেন। শিখেরা তিন দিন প্রভুর সেবা করিবে বলিয়া অধ্যক্ষ সাহেবের অনুমতি লইয়াছিল। রামকৃষ্ণদেব ক্যাণ্টনমেণ্টে তিন দিন শিখদিগের সহিত আনন্দ করিয়াছিলেন। নেপালের প্রতিনিধি মেজর বিশ্বনাথ উপাধ্যায় একজন নেপালী ব্রাহ্মণ। তিনি সপরিবারে প্রভুর কৃতদাসের ন্যায় পরিবর্ত্তিত হইয়াছিলেন। বিশ্বনাথ প্রভুকে যেরূপ শ্রদ্ধা ভক্তি করিতেন, তাহার একপরমাণু শ্রদ্ধা ভক্তি আমরা পাইলে কৃতার্থ হইয়া যাই। বিশ্বনাথের স্ত্রী আপনি শুদ্ধাচারের সহিত প্রভুর জন্য পাক করিতেন এবং তিনি আপনিই ভোজন করাইয়া দিতেন। ভোজনান্তে প্রেমিক দম্পতি প্রভুর পদসেবা করিয়া মানবজীবন চরিতার্থ করিতেন। ঠাকুরের শৌচ প্রস্রাব ত্যাগের জন্য দ্বিতল গৃহের ছাদের উপরে তাঁবু খাটাইয়া রাখিতেন। এপ্রকার ভক্তির কার্য্য আমাদের দেশের লোকেরা আপনার ইষ্টদেবের প্রতিও কখন কেহ দেখাইতে জানে না।

বৈষ্ণবচূড়ামণি বঙ্গের গৌরব কালনার ভগবান্‌দাস বাবাজীর সহিত একবার প্রভুর সাক্ষাৎ হয়। ভগবান্‌দাস বাবাজীর বয়স স্থির করিয়া কেহ বলিতে পারিতেন না। শতবর্ষের অধিক বলিয়া অনেকের ধারণা আছে। রামকৃষ্ণদেব বাবাজীর আশ্রমে উপস্থিত হইবামাত্র তিনি চমকিয়া উঠিয়া বলিলেন, "আজ কোন্ মহাপুরুষ অধীনকে কৃতার্থ করিতে আসিয়াছেন, আমার শরীর কেমন করিতেছে।" বলিতে বলিতে প্রভু তাঁহার সমক্ষে আসিয়া সমাধিস্থ হইয়া পড়িলেন। ভগবান্-

দাস অষ্ট সাত্ত্বিকভাবের বিকাশ দেখিয়া প্রভু! প্রভু! বলিয়া চরণপ্রান্তে নিপতিত হইলেন এবং রামকৃষ্ণদেবকে জানিতে পারিয়া তাঁহার পূর্ব্ব-বিরুদ্ধভাবজনিত অপরাধের নিমিত্ত বার বার ক্ষমা প্রার্থনা করিয়া লই-লেন। ইতিপূর্ব্বে কলুটোলার চৈতন্যসভায় রামকৃষ্ণদেব গমনপূর্ব্বক সভার চৈতন্যাসনে উপবেশন করিয়াছিলেন। ভগবান্‌দাস বাবাজী এই ঘটনা শ্রবণ করিয়া রামকৃষ্ণের প্রতি যারপরনাই বিরক্ত হইয়াছিলেন। সে দিবস গৌরাঙ্গসুন্দরের মহাভাব দর্শন করিয়া তাঁহাকে গৌরাঙ্গদেব জ্ঞানপূর্ব্বক ক্ষমা প্রার্থনা করিয়াছিলেন।

মুসলমানেরা ঠাকুরকে আপনাদের দেবতা বলিয়া বিশ্বাস করিতেন। আমি এমন অনেককে জানি। আমাদের প্রসিদ্ধ ডাং সরকারের পুত্র অমৃতলাল একদিন এ দাসের বাটীতে প্রভুর পদধূলি পতিত হইবে শুনিয়া জনৈক মুসলমান ডাক্তারকে সমভিব্যাহারে লইয়া আইসেন। প্রভুকে দেখিয়া ডাক্তারের প্রাণ কাঁদিয়া উঠে। প্রভুর চরণস্পর্শ করি-বার জন্য তাঁহার প্রাণ ব্যাকুলিত হইলেও লোকলজ্জা আসিয়া প্রতিবন্ধক জন্মায়। পরে প্রাঙ্গনে সঙ্কীর্ত্তনের সময় প্রভুর প্রসাদ পাইয়া দুই হস্ত উত্তোলনপূর্ব্বক আপনভাবে উন্মত্তপ্রায় হইয়া নৃত্য করেন এবং মহা প্রসাদ ভক্ষণ করিয়া তাঁহার জীবন সার্থক হইল বলিয়া পরমানন্দে অমৃতকে প্রাণ ভরিয়া ধন্যবাদ দিয়া গৃহে প্রত্যাগমন করেন।

উইলেম, পি. ডি. মিশির খ্রীষ্টান সম্প্রদায়ের দৃষ্টান্তবিশেষ। উইলেম প্রোটেষ্টাণ্ট চার্চ্চসম্ভূত খ্রীষ্টান। তিনি উত্তর পশ্চিমাঞ্চলের দুই পুরুষে খ্রীষ্টান। প্রকৃত সাহেব বলিলে অতিরঞ্জিত হয় না। তাঁহার প্রাণটা খ্রীষ্ট দর্শনের জন্য অতিশয় ব্যাকুলিত হয়। কিন্তু দেখায় কে? উইলেম প্রভুর নাম শুনিয়া কলিকাতায় আসেন। ভাল দিন দেখিয়া প্রভুকে দর্শন করিবেন এবং গুডফ্রাইডে নিকটবর্ত্তী ভাবিয়া কয়েকদিন অপেক্ষা

করেন। গুডফ্রাইডের দিনে বেলা দুইপ্রহরের সময় একজন স্থূলকায় সুদীর্ঘবিশালচক্ষুবিশিষ্ট কৃষ্ণবর্ণ সাহেবী পরিচ্ছদে বিভূষিত একজন ব্যক্তিকে কেদার বাবুর সহিত আসিতে দেখিয়া আমরা উইলেম বলিয়া বুঝিলাম এবং অতি দ্রুতপদে প্রভুকে যাইয়া জ্ঞাপন করিলাম। প্রভু উইলেমের নাম শ্রবণমাত্রে বৎসহারা গাভীর ন্যায় উইলেমের নিকটে ছুটিয়া আসিলেন। উইলেম নগ্নপদে মস্তকাবনত করিয়া বহির্দ্দেশে অপেক্ষা করিতেছিলেন। প্রভু নিকটে আসিবামাত্র অমনি চরণচুম্বন-পূর্ব্বক নয়নবারিরদ্বারা তাহা ধৌত করিয়া দিলেন। সে দিনের কাহিনী কি বলিব। যাহা কখন শুনি নাই, যাহা কখন দেখি নাই, যাহা কেহ শুনেনাই,দেখেনাই, ভাবরাজ্যের অমিয় প্রেমের খেলার কি অদ্ভুত রহস্য, তাহাও দর্শন করিলাম। প্রভু আমার উইলেমকে লইয়া ভাবে বিভোর এবং তাঁহার হস্ত ধারণপূর্ব্বক আপন গৃহে লইয়া যাইয়া সম্মুখে উপবেশন করাইলেন। উইলেম কোন কথা কহিলেন না। কেবল কৃতাঞ্জলিপুটে প্রভুর মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন। প্রভু তাঁহাকে দুইদিন আসিবার আজ্ঞা করিলেন। তদন্তর উইলেম প্রভুকেই খ্রীষ্টরূপে দর্শন করিয়া পশ্চিমাঞ্চলের পার্ব্বত্য প্রদেশের নিভৃত গিরিগুহাবাসী হইয়া যাইলেন।

হিন্দুধর্ম্মের অন্যান্য সকল প্রকার ধর্ম্মসম্প্রদায়ের সমুদয় নরনারী রামকৃষ্ণদেবকে আপনাপন ধর্ম্মের দেবতা বা ভগবান্ বলিয়া বুঝিতেন।

হিন্দুধর্ম্মত্যাগী ব্রাহ্মেরাও রামকৃষ্ণদেবকে তাঁহাদের অভিলষিত, তাঁহাদের ধারণাসঙ্গত, খ্রীষ্ট, মহম্মদ, চৈতন্য প্রভৃতি মহাপুরুষদিগের ন্যায় মহাপুরুষ বলিয়া আশ্রয় লইয়াছিলেন। ব্রাহ্মদিগের মধ্যে আমাদের পরম শ্রদ্ধেয় কেশব বাবুর প্রতি তাঁহার সমধিক কৃপা ছিল। কেশব বাবু যখন আদিব্রাহ্মসমাজে ছিলেন, তখন একদিন রামকৃষ্ণদেব তথায় গমন করিয়াছিলেন। উপাসনান্তে মহর্ষি সমাজের কার্য্যাদি

সম্বন্ধে অভিপ্রায় প্রকাশ করিতে অনুরোধ করায়, প্রভু যাহা বলিয়াছিলেন, আমি তাহাই বলিতেছি। কথাগুলি নিতান্ত কটু এবং তিনি কাহার মুখাপেক্ষা করিয়া কোন কথা বলিতেন না, তাহা বোধ হয় অনেকেই জানেন। অতএব তাঁহার কথা উল্লেখ করায় যেন কেহ আমায় অপরাধী না করেন। আমি সত্য কথা বলিতে আসিয়াছি। সত্য কথা গোপন অথবা সাধারণের রুচিবিরুদ্ধ বলিয়া তাহা বিকৃত করিয়া বলা আমার উচিত নহে। রামকৃষ্ণদেব কেশব বাবুকে লক্ষ্য করিয়া বলেন, "ঐ পাতলা সুন্দর যুবকটীর ফাত্না নড়িতেছে। অবশিষ্ট সকলে কেবল চক্ষু বুজাইয়া রহিয়াছে মাত্র। উহাদের দেখিয়া আমার একটী রহস্য মনে উদয় হইল। আমি দেখিয়াছি যে, দুপুর বেলা রৌদ্রের সময় বাঁদরগুলো ঝাউতলায় চক্ষু মুদিয়া যেন কত ভদ্রলোকের মত বসিয়া থাকে। কিন্তু তাহারা বাস্তবিক চক্ষু বুজাইয়া বিশ্রাম করে না। তাহারা সেই সময় কাহার মাচায় শশা, কাহার গাছে পেয়ারা, অথবা কাহার চালে কুমড়া আছে, তাহাই চিন্তা করিয়া রাখে। একটু রৌদ্র কমিয়া যাইলে অমনি হুপ্ হাপ্ করিয়া গৃহস্থের বাটীতে উপদ্রব করিতে যায়। এই সকল উপাসকদিগের কপট ধ্যান ব্যতীত ঈশ্বরে মনের সংযোগ হয় নাই, কেবল বিষয় চিন্তা করিতেছে। সুতরাং লোকের কাছে যে ভাবে পরিচিত হইতেছে, সে ভাব অন্তরের নহে। কেশব বাবুর ফাত্না নড়িতেছে, অর্থাৎ উহার প্রাণ কাঁটায় ভাবরূপ টোপ ঈশ্বর মীন স্পর্শ করিতেছেন, তাহার মনরূপ ফাত্নার দ্বারা তাহা প্রকাশ পাইতেছে।"

কেশব বাবু আদি ব্রাহ্মসমাজ হইতে বাহির হইয়া ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মমন্দির স্থাপন করিলেন। রামকৃষ্ণদেব ১৮৭২ সালের ফাল্গুন কি চৈত্র মাসের বেলা ৯টার সময় বেলঘরিয়ার বাগানে কেশব বাবুর সহিত

সাক্ষাৎ করিতে গমন করিয়াছিলেন। কেশব বাবুকে দেখিয়া প্রভু বলিয়াছিলেন যে, "তোমার লেজ খসিয়াছে।" এই কথা শুনিয়া উপস্থিত ব্যক্তিগণ হাঁসিয়া উঠেন। কেশব বাবু সকলকে নিরস্ত করিলেন। অতঃপর প্রভু কহিতে লাগিলেন যে, "ব্যঙ্গাচি যখন জলে থাকে, তখন তাহাদের লেজ থাকে। কিন্তু লেজ খসিয়া যাইলে, অমনি লাফাইয়া ড্যাঙ্গায় উঠে।" সেই দিনে রামকৃষ্ণদেবের সহিত কথোপকথনে কেশব বাবুর যে প্রকার অবস্থান্তর হয়, তাহা ১৮৮৬ সালের সপ্টেম্বর এবং অক্টোবর তারিখের ইণ্টারপিটার নামক পত্রিকায় উল্লিখিত আছে। যথা, "অনুমান একাদশ বৎসর অতীত হইল, একদিন প্রাতঃকালে বেলঘরিয়ার তপোবনে কেশব বাবু এবং তাহার শিষ্যেরা স্নানাদি করিতেছিলেন, এমন সময় পরমহংসদেব তথায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তিনি কিয়দ্দণ্ডের মধ্যে তাঁহাদের অন্তরে প্রেমের আলোক প্রজ্বলিত করিয়াছিলেন, তাহা এতাবৎকাল সমভাবে সংরক্ষিত হইয়াছিল এবং জ্ঞান হয়, তাহা কেহ কালকবলিত হইলেও নির্ব্বাপিত হইবে না।"

কেশব বাবুর ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসম্প্রদায় দ্বিখণ্ড হইয়া সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ স্থাপিত হইলে রামকৃষ্ণদেব তথায় যাইতে ছাড়েন নাই এবং ব্রাহ্মসমাজনেতা শিবনাথ বাবু এবং বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী মহাশয় তাঁহার নিকট গমন করিতেন। বলিতে কি, শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয় আমাদিগকে রামকৃষ্ণদেবের ভাবসম্বন্ধে প্রথমে চক্ষু ফুটাইয়া দেন। শিবনাথ বাবু বলিয়াছিলেন যে, "পরমহংস মহাশয় যাহা বলেন, তাহাতে বিশেষ নূতনত্ব থাকুক, বা না থাকুক, কেন না, কোন না কোন ধর্ম্মগ্রন্থে তাহার আভাস পাওয়া যায়। ওঁর মহত্ব কোথায়? মা বলিয়া মাতৃহারা বালকের ন্যায় কাঁদিয়া বেড়ানই মহত্ব। ধর্ম্মের জন্য উনি যেরূপ কাতর

হইয়াছিলেন, এমন দৃষ্টান্ত দুই তিনটী স্থানে পাওয়া যায়। চৈতন্য-দেব যেমন অনুরাগে কেশোৎপাটন ও মুখঘর্ষন করিতেন, মহম্মদ গিরিকন্দরে বসিয়া থাকিতেন, কেহ নিকটে যাইলে তাহাকে ছেদন করিতে আসিতেন। ঈশা চল্লিশ দিবারাত্র অনাহারে ছিলেন, এঁর অবিকল সেইরূপ লক্ষণ দেখা গিয়াছে।" এক্ষণে আমরা বুঝিতে চাই যে, রামকৃষ্ণদেবকে ভিন্ন সম্প্রদায়ের সাধকেরা কি ভাবে দেখিতেন? তাঁহারা সকলে কি আপনাপন পন্থা পরিত্যাগ পূর্ব্বক রামকৃষ্ণদেবের কল্পিত কোন নূতন ধর্ম্মের অনুগামী হইয়াছিলেন?

প্রথম প্রশ্নের উত্তরে বলিতেছি যে, যে ধর্ম্ম সম্প্রদায়ের যে ভাব, সেই সম্প্রদায়ের ব্যক্তিরা রামকৃষ্ণকে সেই ভাবে দেখিয়াছেন। পরম-হংসেরা পরমহংস বলিতেন, কেন না, পরমহংস বলিলে ভগবান্‌কেই বুঝায়। তান্ত্রিকেরা কৌল বলিতেন, কৌল বলিলে শিবত্ব প্রাপ্ত হওয়া বুঝায়। তন্ত্রমতে শিবই অদ্বিতীয় ঈশ্বর। কালী উপাসকেরা রাম-কৃষ্ণকে কালী বলিয়া জানিতেন। রাণী রাসমণির জামাতা মথুর বাবুও রামকৃষ্ণদেবকে তাঁহাদের প্রতিষ্ঠিতা কালীর মানবলীলারূপ বলিয়া সচক্ষে দর্শন করিয়াছিলেন। এই নিমিত্ত যেদিন কালীর অন্ন-ব্যঞ্জন নিবেদিত হইবার পূর্ব্বে রামকৃষ্ণদেব ভক্ষণ করিয়া ফেলিতেন, সেইদিন মথুর বাবুর আনন্দের সীমা থাকিত না। কেহ কেহ তাঁহাকে শ্রীমতি জ্ঞান করিতেন। সাধনকালে তিনি প্রথমে রাধার ভাবে পরিচ্ছদাদি পরিধানপূর্ব্বক কৃষ্ণ কৃষ্ণ করিয়া সমাধিস্থ হইতেন। মথুর বাবু এই সময়ে তাঁহার পেশোয়াজ কাঁচুলি ও নানাবিধ অলঙ্কার প্রস্তুত করিয়া দিয়াছিলেন।

রামকৃষ্ণদেব যে সময়ে বৃন্দাবনেগমন করিয়াছিলেন, গঙ্গামাতা নাম্নী জনৈক পশ্চিমাঞ্চলের বৃদ্ধা সাধ্বী তাঁহাকে দর্শন করিবামাত্র দুলালী

দুলালী (দুলালী শ্রীমতি রাধিকার নাম) বলিয়া আলিঙ্গন করিয়াছিলেন। তিনি রামকৃষ্ণকে লইয়া সর্ব্বদা বৃন্দাবনের ব্রজ লীলা বিষয়ে আলাপ করিতেন এবং মধ্যে মধ্যে রহস্য করিয়া বলিতেন, "তোমার কি এখন সে সকল কথা মনে হয়?" তিনি সর্ব্বদা সখী সম্বোধন করিয়া কথা কহিতেন।

যে মুসলমান ডাক্তারের কথা উল্লিখিত হইয়াছে, তিনি যদিও সঙ্কীর্ত্তনে নৃত্য করিয়াছিলেন, যদিও মহাপ্রসাদ ধারণ করিয়াছিলেন, কিন্তু রামকৃষ্ণদেব তাঁহাকে হিন্দু হইতে, অথবা হরিনাম, কিম্বা কালীনাম উচ্চারণ করিতে বলেন নাই। তিনি আপনভাবে অবস্থিতি করিয়াছেন। উইলিয়েম, পি, ডি, মিশির প্রভৃতি খৃষ্টানদিগের খৃষ্টানধর্ম্ম পরিত্যাগ করিতে একদিনও আজ্ঞা করেন নাই। তাঁহারা অদ্যাপি খৃষ্টানই আছেন। রামকৃষ্ণদেবের কৃপায় তাঁহারা যে কি জ্ঞান লাভ করিয়াছিলেন, তাহার একটী ঘটনা উল্লেখ করিতেছি। একদা উইলিয়মের সহিত কথোপকথন করিতে করিতে আমি ঠন্ঠনের সিদ্ধেশ্বরীর নিকটে উপস্থিত হই। উইলিয়েম বাস্তবিক রামকৃষ্ণদেবের কৃপা পাইয়াছেন কিনা, জানিবার জন্য অতিশয় কুতূহল জন্মিল। আমি তাঁহাকে কোন কথা জিজ্ঞাসা না করিয়া দেবীর সম্মুখীন হইয়া প্রণাম করিলাম। উইলিয়ম একজন খৃষ্টান, খৃষ্টানেরা সাকার উপাসনাকে পৌত্তলিকতা বলিয়া অবজ্ঞাসূচক ভাব ঘোষণা করেন। যে খৃষ্টানেরা হিন্দুর দেবদেবীকে যথা ইচ্ছা অবজ্ঞা করেন, হিন্দু জাতির ধর্ম্মকর্ম্ম সমুদয় দোষসঙ্কুল জ্ঞানে হিন্দু নরনারীর জাতিকুল পরিত্যাগপূর্ব্বক খৃষ্ট ধর্ম্মের আশ্রয় গ্রহণ করেন এবং যে ব্যক্তির পিতা এক সময়ে স্বইচ্ছায় খৃষ্টান হইয়াছিলেন, সেই খৃষ্টান উইলিয়েম আনন্দময়ীর সমক্ষে আসিয়া মস্তকাবনত পূর্ব্বক সেলাম করিলেন। আমি আনন্দে জিজ্ঞাসা করি-

লাম, "আমাদের মৃণ্ময়ী দেবীকে সেলাম করিলেন কেন?" তিনি পরমপুলকে কহিলেন, "আমার খৃষ্টকে দর্শন করিলাম।" অতঃপর তিনি কহিতে লাগিলেন যে, "ভাই! আর কি আমার পূর্ব্বভাব আছে! প্রভু রামকৃষ্ণ তৎসমুদয় চূর্ণ করিয়া নবচক্ষু দিয়াছেন। পূর্ব্বে যাহা বুঝিতে পারিতাম না, পূর্ব্বে যাহা দেখিতে পাইতাম না, এক্ষণে তাঁহার প্রসাদে দেখিতে পাই এবং বুঝিতে পারি। এখন সময়ে সময়ে মনে হয় যে, কত কুকর্ম্মই করিয়াছি। কি করিব, আমাদের শিক্ষাই ছিল দেবদেবী ঘৃণা করা। কিন্তু কি সৌভাগ্যে আমরা প্রভুর কৃপাকণা লাভ করিয়া নবজীবন পাইয়াছি!"

কেশব বাবু ব্রাহ্ম ছিলেন। তিনি সতত নীরস ধর্ম্ম উপাসনা করিতেন, একথা এক সময়ে তাঁহার সম্প্রদায় হইতে প্রতিধ্বনিত হইয়াছে। রামকৃষ্ণদেব কেশব বাবুকে শক্তি মানাইয়া, মা বলিয়া উপাসনা করিতে শিক্ষা দেন। তদবধি ব্রাহ্মসমাজে মাতৃভাবের উপাসনা সন্নিবিষ্ট হইয়াছে।

১৮০৮ শকের ১লা আশ্বিনের ধর্ম্মতত্ত্ব পত্রিকায় লিখিত আছে যে, "পরমহংসের জীবন হইতেই ঈশ্বরের মাতৃভাব ব্রাহ্মসমাজে সঞ্চারিত হয়। সরল শিশুর ন্যায় ঈশ্বরকে সুমধুর মা নামে সম্বোধন এবং তাঁহার নিকট শিশুর মত আব্দার করা, এই অবস্থাটী পরমহংস হইতেই আচার্য্যদেব বিশেষরূপে প্রাপ্ত হন। পূর্ব্বে ব্রাহ্মধর্ম্ম শুষ্ক তর্ক ও জ্ঞানের ধর্ম্ম ছিল। পরমহংসের জীবনের ছায়া পড়িয়া ব্রাহ্মধর্ম্মকে সরস করিয়া ফেলে।" রামকৃষ্ণদেবের কৃপায় ব্রাহ্মসমাজের যে কি পর্য্যন্ত কল্যাণ সাধিত হইয়াছিল, তাহা শ্রদ্ধাস্পদ প্রতাপচন্দ্র মজুমদার মহাশয়ই ইং ১৮৭৯ সালের থিষ্টিক কোয়াটার্লী রিভিউতে রামকৃষ্ণদেব বিষয়ে প্রবন্ধ লিখিবার সময় পাঠকের বিশ্বাস বৃদ্ধি করিবার মানসে

সর্ব্বাগ্রে, তিনি যাহা লিখিতেছেন, তাহা চঞ্চল চিত্তে অথবা প্রবীণ ধীসম্পন্ন মূর্খের [clever intellectual fool] ন্যায় কোন কথা বলিবেন না, যাহা বলিবেন, তাহা সজ্ঞানেই [deliberately] বলা হইবে, এইরূপ প্রতিজ্ঞাপূর্ব্বক যাহা বলিয়াছেন, তাহার ভাবান্তর এই, "তাঁহার ধর্ম্ম কি? হিন্দুধর্ম্ম, কিন্তু ইহা এক আশ্চর্য্য প্রকার হিন্দুধর্ম্ম। সাধু রামকৃষ্ণ পরমহংস কোন বিশেষ হিন্দু দেবতার উপাসক নহেন। তিনি শৈবও নহেন, শাক্তও নহেন, বৈষ্ণবও নহেন এবং বৈদান্তিকও নহেন। কিন্তু এ সকলই তিনি। তিনি শিবের উপাসনা করেন, কালীর উপাসনা করেন, রামের উপাসনা করেন, কৃষ্ণের উপাসনা করেন এবং বেদান্তমতের দৃঢ় সমর্থনকারী। তিনি এক জন পৌত্তলিকও বটেন এবং অদ্বিতীয় নিরাকার এবং অনন্ত ঈশ্বরের পূর্ণত্বের একান্ত উৎসর্গীকৃত এবং অনুরক্ত ধ্যাতা, যাঁহাকে তিনি অখণ্ড সচ্চিদানন্দ বলিয়া অভিহিত করেন। তাঁহার নিকট এই প্রত্যেক দেবতাই সেই সনাতন চিদানন্দ এবং নিরাকার সত্তার সহিত মানবাত্মার মহোচ্চ সম্বন্ধ আবিষ্কারক একটী শক্তি এবং আকারে পরিণত তত্ত্ব। তিনি বলেন যে, এই সকল অবতার, সেই অনন্ত জ্ঞানময় এবং করুণাবিধান অখণ্ড সচ্চিদানন্দের লীলা এবং শক্তি, যিনি পরিবর্ত্তন এবং নিরাকরণহীন, যিনি অদ্বিতীয়, অসীম এবং অনন্ত, সৎ চিৎ এবং আনন্দের সমুদ্র। তিনি কখন কখন বলেন যে, রূপাদি তাঁহাকে পরিত্যাগ করিতেছে। তাঁহার মাতা বিদ্যাশক্তি কালী দূরে আছেন, কৃষ্ণকে বাৎসল্য ভাবে গোপালরূপে, অথবা মধুর ভাবে স্বামীরূপে অনুভব করিতে পারিতেছেন না। নিরাকার ব্রহ্ম সমুদয় গ্রাস করিয়া ফেলে এবং তিনি নির্ব্বাক আনন্দ এবং ভক্তিরসে নিমগ্ন হইয়া যান।

কিন্তু যতদিন তিনি আমাদের নিকট জীবিত আছেন, আমরা

আনন্দের সহিত তাঁহার চরণে উপবেশন করিয়া তাঁহার নিকট হইতে পবিত্রতা, বৈরাগ্য, চিরবাসনাশূন্য আধ্যাত্মিকতা এবং ভগবৎ-প্রেমোন্মত্ততা সম্বন্ধীয় অত্যুচ্চ উপদেশ শিক্ষা করিব।"

রামকৃষ্ণদেবের উপদেশ এবং কথা বাস্তবিক সম্পূর্ণ নূতন। তিনি ব্যক্তিবিশেষের ধারণানুযায়ী অদ্বিতীয় ঈশ্বরের সম্বন্ধ স্থাপন করিয়া দিতেন। তিনি কাহাকে জাতিত্যাগ অথবা ধর্ম্মত্যাগ করিতে বলেন নাই। যাঁহার যে ভাব, সেই ভাবের পুষ্টি সাধন করিয়া দিতেন। ভাবের কোন দোষ থাকিলে তাহা সংশোধন করিয়া দিতেন। তিনি কখন কোন ধর্ম্মপন্থাকে কাল্পনিক কিম্বা ভ্রমাত্মক বলেন নাই, সুতরাং, সর্ব্বত্রে তাঁহার সমান ভাব ছিল। সেই জন্য সকলেই তাঁহাকে লইয়া জীবন সার্থক করিতেন, সকল ধর্ম্মের একতা, সকল ধর্ম্মের সমতা তাঁহার নিকটে সম্পন্ন হইয়াছিল। হিন্দু, মুসলমান, খৃষ্টান, ব্রাহ্ম প্রভৃতি সকল ভাবের উপাসকেরা সেই এক অদ্বিতীয় রামকৃষ্ণের নিকটে শান্তি লাভ করিতেন। এ পর্য্যন্ত এমন ঘটনা কেহ দেখেন নাই, কেহ শুনেন নাই, কাহারও অদৃষ্টে সংঘটনা হয় নাই। এক ব্যক্তির নিকটে সকলে নতশির। মুসলমানধর্ম্মে যাহাদিগকে কাফের বলেন, সেই কাফেরের সহিত একস্থানে উপবেশন, খ্রীষ্টানেরা যাহা-দিগকে হিদেন বলেন, সেই হিদেনের সহিত এক স্থানে উপবেশন, যে বৈষ্ণব শক্তি-উপাসক দেখিলে আন্তরিক দ্বেষভাবে জ্বলিয়া উঠেন, সেই বৈষ্ণব এবং শাক্তের এক স্থানে উপবেশন, সন্ন্যাসী গৃহস্থের এক স্থানে উপবেশন, সাধু অসাধুর একস্থানে উপবেশন, জ্ঞানী অজ্ঞানীর এক স্থানে উপবেশন, সতী অসতীর একস্থানে উপবেশন, বালকবৃদ্ধের একস্থানে উপবেশন, মাতাল লম্পট নাস্তিক আস্তিক সকলের একস্থানে উপবেশন, ইহা নিতান্ত অভিনব ঘটনা। এই স্থানেই সকল ধর্ম্মের

সমতা দৃষ্ট হয়, এই স্থানেই সকল ধর্ম্ম নিজ নিজ ধর্ম্মের তান উত্থিত করিয়া সমস্বরে বাদিত হইতেছে। যেমন, ঐক্যতান বাদনে বিবিধ প্রকার যন্ত্রের সমস্বর শ্রবণপথে ধ্বনিত হইলে শ্রুতিমধুর হয়, ধর্ম্মজগতে রামকৃষ্ণদেব অদ্বিতীয় ব্যাণ্ড মাষ্টার এবং তাঁহার নিকটে সকল ধর্ম্ম-যন্ত্র সমস্বরে বাদিত হইয়াছে। এই নিমিত্ত বলিতেছি যে, বিশ্বজনীন ধর্ম্ম বলিলে শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবকেই বুঝায়। তিনি ব্যতীত আর দ্বিতীয় ব্যক্তি বিশ্বজনীন ধর্ম্মের প্রত্যক্ষ অভিনয় অদ্যাপি কোন দেশে কোন কালে করেন নাই। যদ্যপি বিশ্বজনীন ধর্ম্মানুষ্ঠান করিতে হয়, যদ্যপি বিশ্বজনীন ধর্ম্মের প্রত্যক্ষ অভিনয় দেখিতে হয়, তাহা হইলে রামকৃষ্ণদেব ব্যতীত দ্বিতীয় স্থান নাই।

একথা কেহ মনে না করেন যে, বিশ্বজনীন ধর্ম্ম বলিলে সমুদয় ধর্ম্মের ভাব একজনকে আয়ত্ত করিতে হইবে, সকল ধর্ম্মের লেজামুড়া বাদ দিয়া তাহার সারাংশ গ্রহণ করিতে হইবে। যেমন, পাঁচ ফুলের তোড়া হয়, ধর্ম্মজগতে তাহা হয় না। ঈশা, মুষা, নানক, বুদ্ধ, চৈতন্য, নিরাকার সাকার একজাই করাকে বিশ্বজনীন ধর্ম্ম বলে না। ভিন্ন ভিন্ন ধর্ম্মভাব বিনিময় করা ধর্ম্মজগতে সম্ভবে না। আমার ধর্ম্ম তুমি লও, তোমার আমি নেই, এরূপ হইতে পারে না। গোলাপফুলের গাছে গোলাপই হয়, তাহাতে জুঁই বেল ফুটে না। জুঁই বেলগাছে গোলাপ জন্মায় না, আঁব গাছে কাঁটাল, কাঁটাল গাছে আঁব ফলে না, যে ফল ফুল যে গাছে ফলে বা ফুটে, সেই গাছ প্রয়োজন। যে যে ধর্ম্মসাধন করিলে যে যে ভাব প্রস্ফুটিত হয়, তাহা সেই সেই ধর্ম্ম ব্যতীত কখন ফুটিতে পারে না। গৌরাঙ্গের প্রেম ভক্তি অতি সুধাময় বটে, কিন্তু তাহা গৌরাঙ্গ-উপাসনা ব্যতীত কখনই লাভ করা যায় না। বৃন্দাবনের প্রেমলীলা রাধাকৃষ্ণের উপাসনা ব্যতীত অন্যত্র লাভ করা

যায় না। মাতৃভাবের কার্য্য আদ্যাশক্তি ভগবতী ভিন্ন নিরাকার ব্রহ্মে কখনও প্রাপ্ত হওয়া যায় না। পিতার ভাব পুত্রে, মাতার ভাব স্ত্রীতে যেমন অসম্ভব, ধর্ম্ম রাজ্যের ভাবও তদ্রূপ জানিতে হইবে।

রামকৃষ্ণ-প্রদর্শিত বিশ্বজনীন ধর্ম্ম অতিশয় প্রশান্ত,এবং সর্ব্বজন-কল্যাণকর ধর্ম্ম। ইহার তাৎপর্য্য জ্ঞাত হইতে যে আর কত দিন কাটিয়া যাইবে, তাহা কে বলিতে পারেন? আমরা স্বীয় পূর্ব্ব কুসংস্কারের বশবর্ত্তী হইয়া আপন বুদ্ধি-পরামর্শে আপন ভাবেই আপনাকে পরিচালিত করিতে ভালবাসি, সুতরাং, সর্ব্বদা বিবাদ বিসম্বাদের হস্ত হইতে পরিত্রাণ পাওয়া যায় না।

আমি পুনরায় বলিতেছি, বিশ্বজনীন ধর্ম্ম বলিলে একটী বিশেষ প্রকার সম্প্রদায় বুঝাইবে না। তাহার দৃষ্টান্ত আমরা। আমরা নিজ নিজ ভাব চূর্ণ করিয়া একভাবে পরিবর্ত্তিত হইয়া যাইতেছিলাম, যাহাতে সকল শ্রেণীর ব্যক্তিরা একস্থানে দ ণ্ডায়মান হইতে পারেন, এরূপ ব্যবস্থার ভিত্তিভূমি করিবার জন্য আমরা ব্যস্ত ছিলাম, কিন্তু সেই সময় প্রভু আমাদের মধ্যে এক একটী পরস্পর অসদ্ভাব জন্মাইয়া দিলেন যে, কেহ কাহাকে দেখিতে পারে না। কাহার ভাব কাহার পক্ষে ভাল লাগে না। পরস্পর স্বাতন্ত্র্য জন্মিল বটে, তাহা ক্রমে বর্দ্ধিত হইতে লাগিল বটে, কিন্তু রামকৃষ্ণকে কেহ ছাড়িতে পারিল না। ক্রমে সময় আসিতেছে। এক্ষণে আমরা বুঝিতেছি যে, আমরা সকলে একভাবে গ্রথিত হইলে রামকৃষ্ণের সম্প্রদায়বিশেষে পরিণত হইবে।

আপনাপন ভাব বজায় রাখিয়া কার্য্য করিতে পারিলে তবে রামকৃষ্ণের ভাব প্রকাশ পাইবে। রামকৃষ্ণ-প্রদর্শিত ধর্ম্ম সেইজন্য কেবল আমার তোমার নহে। ইহা আমারও বটে, তোমারও বটে, এবং পৃথিবীর সকলেরই বটে। যিনি যাহা বলিয়া ঈশ্বরের উপাসনা

করিতেছেন, যিনি যাহা ভাবিয়া ঈশ্বরোপাসনা করিতে চাহেন, তাহাতেই ঈশ্বর লাভ হয়, তাহাই প্রকৃত ধর্ম্ম বলিয়া বিশ্বাস করিতে হইবে। কারণ, রামকৃষ্ণদেবের অভিপ্রায়ে ধর্ম্ম বলিয়া, অর্থাৎ ঈশ্বর ভাব সম্বন্ধীয় যে কোন ভাব হউক, তাহার নিন্দা করিবার কাহারও অধিকার নাই।

রামকৃষ্ণদেবের এই অনুপম ধর্ম্মভাব বাস্তবিক প্রত্যেক ধর্ম্মসম্প্রদায়ের হৃদয়ের সামগ্রী। এই ভাবে দ্বেষাদ্বেষী নাই, ধর্ম্মের ভাল মন্দ বিচার করিবার অধিকার নাই। প্রভু বলিতেন, যেমন, চাঁদামামা সকলেরই, ভগবানও তেমনি সকলের। ভগবান্‌কে সাধুভাষায় উপাসনা করিলে তিনি শ্রবণ করেন, এমন কোন কথাই নাই। তাঁহার কোন বিশেষ নাম ধরিয়া না ডাকিলে তিনি শুনিতে পান না, এমন কোন কথাই নাই। তাঁহাকে শাস্ত্রবিশেষের মতে উপাসনা না করিলে তাঁহাকে লাভ করা যায় না, এমন কোন কথাই নাই, যিনি বিধিমতে এবং শাস্ত্রমতে ভগবান্‌কে চাহেন, তিনি সেই রূপেই তাঁহার অভীষ্টসিদ্ধির সুপন্থা প্রাপ্ত হন। বিধি ব্যবস্থায় যাঁহার অধিকার নাই, শাস্ত্রাদিতে যাঁহার অধিকার নাই, তাঁহার কি উপায় হয় না? সেই নিরুপায় দিক্‌বিদিক্‌দৃষ্টিশূন্য অনাথের কি অনাথনাথের রাজ্যে সুবিধা হয় না? তাহা হইতে পারে না। প্রভু বলিতেন যে, আমার একজন সৃষ্টিকর্ত্তা, তোমার আর একজন সৃষ্টিকর্ত্তা নহেন। এক ঈশ্বর সকলের কর্ত্তা, সকলের ভর্ত্তা এবং সকলের পরিত্রাতা। তাঁহাকে ডাক না ডাক, সাধন কর না কর, শাস্ত্র পড় না পড়, সময় হইলে, যেমন তিনি সকলের আহারের উপায় করেন, তিনি যেমন রোগের ঔষধি দেন, তেমনি তিনি সকলের পরিত্রাণের উপায় করিয়া থাকেন।

আমরা দেখিতে পাই যে, জলে ডুব দিয়া একমুহূর্ত্তকাল অবস্থিতি

করিলে শ্বাসক্লেশ উপস্থিত হইয়া মৃত্যুর গ্রাসে পতিত হয়। কিন্তু ভাবিয়া দেখুন দেখি যে, মাতৃগর্ভে জলের ভিতর কিরূপে জীবিত থাকা যায়? আহার না করিলে প্রাণ ওষ্ঠাগত হইয়া পড়ে, কিন্তু মাতৃগর্ভে বিনা ভোজনে কেমন করিয়া একদিন নহে, দুইদিন নহে, সুদীর্ঘকাল অবস্থিতি করা যায়? বৈজ্ঞানিকেরা নানাপ্রকার কারণ দর্শাইবেন। তাঁহারা বলিবেন যে, তখনও ফুসফুসের কার্য্য আরম্ভ হয় নাই, সেই জন্য বায়ুর অপ্রয়োজন, সুতরাং বায়ুবিহীন স্থানে তাহার থাকিবার অসুবিধা হয় না। আহারের কার্য্য মাতৃশোণিত দ্বারা সম্পন্ন হয়, সুতরাং, স্থূল ভোজ্য পদার্থের প্রয়োজন হয় না, কিন্তু এ সুন্দর নিয়ম কাহার? এ সুন্দর ব্যবস্থা কাহার? সেই বিশ্ববিধাতার কি এ সকল কার্য্য নহে? যুগে যুগে কত জগাই মাধাই তরিয়া গিয়াছে, তাহা আমরা শুনিতে পাই। কে তাঁহাদের পরিত্রাণ করেন? সাধুরা? কখন না। পণ্ডিতেরা? কখন না। কোন বিশেষ দেব-দেবী? কখন না। তবে কে পথভ্রান্ত আত্মভ্রান্ত নরনারীর কল্যাণ সাধন করেন? তাঁহাদের কল্যান সাধন হয়, ইহা সত্য ঘটনা। যেমন, যোগীর পরিত্রাণ হয়, যেমন জ্ঞানীর পরিত্রাণ হয়, যেমন সাধকের পরিত্রাণ হয়, যেমন ভক্তের পরিত্রাণ হয়, তেমনি পাষণ্ড, বর্ব্বর, মূর্খ, অজ্ঞানী, অভক্ত, মাতাল, লম্পট, বারাঙ্গনারও কিনারা হয়। তাহারা কূল পায়, সশরীরে দেবতা বাঞ্ছিত পরম পদার্থ লাভ করিয়া থাকে। আমরা একথা শুনিয়াছি এবং প্রত্যক্ষ দেখিয়াছি। সশরীরে আমরা সম্ভোগ করিয়াছি, গঙ্গাজল, তামাতুলসি স্পর্শ করিয়া একথার সাক্ষ্য দিতে পারি। মহাশয়! ভগবান্ যদ্যপি জ্ঞানীর একচেটে হইতেন, ভগবান্ যদ্যপি পরিমার্জ্জিত ধীশক্তিসম্পন্ন সুপণ্ডিতের একচেটে হইতেন, যদ্যপি নীতিজ্ঞ ভদ্রলোকের হইতেন, তাহা হইলে আমাদের

কস্মিনকালে উপায় হইত না। আমরা যে পাষণ্ড নরাধম ছিলাম, তাহাই থাকিতাম। আমরা ভগবান্ দেখিয়াছি, আমরা তাঁহার প্রসাদ খাইয়াছি, আমরা তাঁহার ক্রীতদাস বলিয়া পরিণত হইয়াছি। এ সৌভাগ্য পণ্ডিতের হয় মা, এ সৌভাগ্য জ্ঞানীর হয় না, এ সৌভাগ্য কর্ম্মীর হয় না, এ সৌভাগ্য ধনীর হয় না, এ সৌভাগ্য মানীর হয় না, যাহাদের কেহ নাই, অনাথনাথ তাহাদের। পতিত বলিয়া সমাজ যাহাদের অবজ্ঞা করে, সেই পতিতদিগের জন্য পতিতপাবন। যাহারা নির্ধনী, পথের কাঙ্গাল কাঙ্গালিনী, তাহাদের জন্য কাঙ্গালের ঠাকুর। একথা কাঙ্গাল কাঙ্গালিনী ব্যতীত অন্যের বুঝিবার অধিকার নাই। ধনের গর্ব্বে ধনী গর্ব্বিত, পাণ্ডিত্যের গর্ব্বে পণ্ডিত গর্ব্বিত, সাধনা-গর্ব্বে সাধক গর্ব্বিত, ভগবানের সম্বন্ধ সেথায় স্থাপিত হইবে কিরূপে? এই নিমিত্ত কাঙ্গাল কাঙ্গালিনীরাই যুগে যুগে অগ্রে পরিত্রাণ পাইয়া থাকে।

সমাজবিতাড়িত সাধারণের ঘৃণিত পাষণ্ডপুঞ্জের পরিত্রাণের জন্য ভগবানের এত মাথা ব্যথা কেন? সামঞ্জস্য স্থাপন করা তাঁহার কার্য্য। যখন পাষণ্ডেরা বলবান হয়, তখনই তাহাদের দলন না করিলে সাধারণ সমতা রক্ষা হয় না। অত্যাচারী রাবণের দ্বারা স্বর্গ, মর্ত্ত, পাতালের সমতা ভঙ্গ হইয়াছিল, তাই ধনুর্ধারী রামের অবতরণ। কংশের অত্যাচারে যখন সকলের শান্তি ভঙ্গ জনিত মনের সমতা বিচ্ছিন্ন হইয়াছিল, শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র তখন অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। হিংসাবৃত্তির উত্তেজনায় যখন সর্ব্বসাধারণের মানসিক অসমতা উপস্থিত হইয়াছিল, তখন বুদ্ধদেব আবির্ভূত হইয়াছিলেন। দুর্ব্বল কলির জীবের সাংসারিক আসক্তির প্রাবল্য জনিত স্বার্থপরতার বৃদ্ধি, জ্ঞান-বিলুপ্তি এবং পশুবৎ আকারে পরিণত হওয়ায় প্রেমাবতার শ্রীগৌরাঙ্গ-

দেব অবনী মাঝারে প্রেমের প্রস্রবণ খুলিয়া আপামরকে প্রেমিক করিয়া সমতা স্থাপন করিয়াছিলেন। সে সময়ে জগাই মাধাইকে শ্রীগৌরাঙ্গদেব কৃপা না করিলে তাহাদের কি কখন অন্য উপায় হইত? বর্ত্তমান কালে সর্ব্বত্রে,সকলের মনে সমতা ভঙ্গের বিলক্ষণ লক্ষণ পরিদৃশ্যমান হইতেছে। চারিদিকে বিশ্বজনীন ধর্ম্মের জন্য হাহাকার উঠিয়াছে। যাহাতে একভাবে এক স্থানে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের প্রত্যেক নরনারী উপবেশন করিতে পারেন, যাহাতে সকল ধর্ম্মের সারভাগ মন্থন পূর্ব্বক একস্থানে সংস্থাপিত করিতে পারেন, পরস্পর সৌভ্রাত্র-সূত্রে গ্রথিত হইয়া হিন্দু, মুসলমান, ম্লেচ্ছাদি সমুদয় মনুষ্য পরস্পরকে আলিঙ্গন করিতে পারেন, এমন ধর্ম্ম সংস্থাপিত হওয়া উচিত। কেশব বাবু এইরূপ ধর্ম্মের প্রবর্ত্তনা করেন, চিকাগোর বিরাট ধর্ম্মমণ্ডলীতেও বিশ্বজনীন ধর্ম্মের অভিনয় করিবার চেষ্টা করিয়াছিল, এ প্রদেশেও স্থানে স্থানে ঐরূপ ভাবের আভাস পাওয়া যাইতেছে। লোকের এই রূপ অবস্থা হইবে জানিয়া ভগবান্ তাহার ব্যবস্থা করিয়াছেন। এক্ষণে রামকৃষ্ণদেব ধর্ম্মজগতের আভ্যন্তরিক কার্য্য যাহা প্রদর্শন করিয়া গিয়াছেন, যদ্যপি বিশ্বজনীন ধর্ম্মাকাঙ্ক্ষিত ব্যক্তিরা একবার মনোনিবেশ পূর্ব্বক তাহা শিক্ষা করেন—শিক্ষা নহে, কার্য্যে করিয়া দেখেন—তাহা হইলে বুঝিতে পারিবেন যে, সকল ধর্ম্মের সারাংশ গ্রহণ করিয়া তাহাকে সর্ব্বসাধারণ বা বিশ্বজনীনরূপে পরিণত করা যায় না। সাধনা অদ্ভুত সামগ্রী। আমরা সামান্য অর্থকরী বিদ্যার সাধনায় যেরূপ ফল ফলিতে দেখিতে পাই, তাহা বিচার করিয়া বুঝিলে বলিতে হয় যে, শিক্ষা না করিলেও হয় না এবং শিক্ষা করিলেও হয় না। সাধনা পথে বিঘ্ন অসীম। গন্তব্য স্থানে উপনীত হওয়া কাহারও ভাগ্যে ঘটে এবং কাহারও ভাগ্যে ঘটে না। সকল

ধর্ম্মের সারাংশ গ্রহণ করা যায় না, তাহার হেতু এই যে, ধর্ম্ম সাধন লব্ধ বস্তু। সাধনার অধিকার কাহার আছে? যদিও থাকে, তাহা কয় জনের সম্ভবে? যদ্যপি তাহার সম্ভাবনা হয়, তাহা হইলে স্থূল-জগতের ক্ষুদ্রতম মনুষ্যের কি কখনও সমুদয় ধর্ম্মের সারাংশ গ্রহণ করিবার সাধ্য হইতে পারে? সারাংশ লইতে হইলে তাহার সাধনা চাই। সাধনা করিলে সময়ে তাহার সারাংশ লাভ হইবার সম্ভাবনা। যদ্যপি কাহাকে সমুদয় ধর্ম্মের সারাংশ বাহির করিয়া বুঝিতে হয়, তাহা হইলে শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের ন্যায় সাধক হইতে হইবে। সাধক হইলে সাধনা করায় কে? রামকৃষ্ণদেবের নিকট সিদ্ধপুরুষদিগের যে প্রকার সমাবেশ হইয়াছিল, এ প্রকার ঘটনা কি অদ্যাবধি আর কোন স্থানে হইয়াছে? সেই অদ্ভুত ব্রাহ্মণীর ন্যায় দ্বিতীয় স্ত্রীলোকের ইতিবৃত্ত কি কেহ কখন পাঠ করিয়াছেন? ব্রাহ্মণী হিন্দু কুলোদ্ভবা বলিয়া পরিচিত, বয়সে নবীনা, হিন্দুর সমুদয় শাস্ত্রে অধিকার ছিল। বেদ জানিতেন, পুরাণ জানিতেন, তন্ত্র, একখানা নহে, পঞ্চতন্ত্রের সমুদয় জ্ঞান ছিল, কেবল তাঁহা নহে, এই সকল শাস্ত্রের সাধনা প্রণালী তাঁহার আয়ত্ত ছিল। ঊর্দ্ধমুখ তন্ত্রের অতি ভীষণ সাধনাদিতে সেই ব্রাহ্মণী রামকৃষ্ণদেবকে আপনি সমুদয় সহায়তা করিয়াছিলেন। এ রূপ ঘটনা উপন্যাসের চরিত্র রচনা নহে; কখন কি জীবের ভাগ্যে সংঘটিত হয়? তাই বলিতেছি যে, ইহা ভগবানের লীলা ব্যতীত কিছুই নহে। বর্ত্তমান কালের যেমন প্রয়োজন হইবে, তাহা জানিয়া রামকৃষ্ণরূপে তাহার ব্যবস্থা হইয়াছে। এই বিশ্বজনীন ধর্ম্মভাব শ্রীশ্রীকৃষ্ণাবতারে উদ্ভাসিত হইয়া পরম পবিত্র গীতায় লিপিবদ্ধ ছিল। বর্ত্তমান কালে শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেব কার্য্যের দ্বারা সেই ভাবের অভিপ্রায় সম্যক্‌রূপে প্রকটিত করিয়াগিয়াছেন। আমি পুনরায় বলি

যে, ভাব লইয়া সকলেই স্বতন্ত্র। ভাবের মিশামিশি হইতে পারে না, ভাব বিনিময় হইতে পারে না। এক ব্যক্তি যেমন, আর এক ব্যক্তি তেমন হইতে পারে না, তেমনি যাহার যে ভাব, তাহা পরিবর্দ্ধিত হইতে পারে এবং সময়ে এক অদ্বিতীয় ঈশ্বরেই তাহা পর্য্যবসিত হইয়া থাকে। যেমন, শরীর বিকৃত হইলে জল জলে যায়, মাটি মাটিতে যায়, জল মাটি কাহারও স্বতন্ত্র নহে, সেইরূপ ধর্ম্মভাব পরিশেষে এক অদ্বিতীয় ভগবানেই বিলয় প্রাপ্ত হইয়া থাকে। এই কথাটী বুঝিবামাত্র অমনি আপনার ভিতর সমতা স্থাপন হইবে। আপনি স্নিগ্ধ হইলে জগৎও স্নিগ্ধ হইয়া যাইবে।

শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র বিশ্বজনীন ধর্ম্ম যে প্রকারে উল্লেখ করিয়াছিলেন এবং রামকৃষ্ণদেব যে প্রকার কার্য্যে প্রদর্শন করিয়াছেন, সে প্রকার ধর্ম্ম কখন কোন ব্যক্তির সাধনের ধর্ম্ম হইতে পারে না। রামকৃষ্ণদেব বলিয়াছেন যে, কিছু শিক্ষা করিতে হয় এবং কিছু সাধন করিতে হয়। বিশ্বজনীন ধর্ম্ম সম্বন্ধে অদ্বৈতজ্ঞান শিক্ষা করিয়া যাহা ইচ্ছা অর্থাৎ যাহার যাহা ধারণা, যাহা যাহার আনন্দকর, যাহা যাহার রুচিজনক, তাহাই তাহার করিবার বিষয়।

এক্ষণে আমরা বুঝিতে পারিতেছি যে, বিশ্বজনীন ধর্ম্মের যে সাইক্লোন উঠিবার বিভীষিকা আশঙ্কা হইতেছিল, তাহা নিবারণের সুন্দর উপায় প্রাপ্ত হওয়া গেল। রামকৃষ্ণের উপদেশরূপ কীলক ধারণ করিয়া থাকিলে কখন কোন বিপদ সংঘটনা হইবে না।

এইজন্য বলি যে, রামকৃষ্ণদেব সকলের এবং সকলেই রামকৃষ্ণদেবের। রামকৃষ্ণদেব যেমন হিন্দুর, রামকৃষ্ণদেব যেমন মুসলমানের, রামকৃষ্ণদেব যেমন বৌদ্ধের, রামকৃষ্ণদেব তেমনি সকলের। রামকৃষ্ণদেব সর্ব্বত্রে এক অদ্বিতীয়, কিন্তু সকলে অর্থাৎ হিন্দু মুসলমান ম্লেচ্ছাদি

স্বতন্ত্র। স্বতন্ত্র থাকাই রামকৃষ্ণপ্রদর্শিত বিশ্বজনীন ধর্ম্মের অভি-প্রায়।

এতক্ষণে, বোধ হয়, বুঝিলেন যে, রামকৃষ্ণদেব চিরপ্রচলিত ধর্ম্ম-লোপ করিবার জন্য অবতীর্ণ হন নাই, তিনি ধর্ম্মভাবের বিপর্য্যয় করি-বার জন্য অবতীর্ণ হন নাই, তিনি জাতিকুল বিনষ্ট করিবার জন্য অবতীর্ণ হন নাই, যথেচ্ছাচারিতার প্রশ্রয় দিবার জন্য অবতীর্ণ হন নাই, জাতি, কুল, ধর্ম্ম রক্ষার নিমিত্ত কলেবর ধারণ করিয়া দেশ, কাল এবং পাত্র বিচারপূর্ব্বক তৎসমুদয় অভিনয় করিতেছিলেন। সেই অভি-নয়—সেই অপূর্ব্ব অভিনয়—কেহ দেখিয়াছিলেন, কেহ দেখেন নাই, কেহ শুনিয়াছিলেন এবং কেহ শুনেনও নাই, সহসা স্থগিত হইয়া গেল। আজ নবম বৎসর পূর্ণ হইয়া দশম বৎসর হইল, সেই রঙ্গমঞ্চের যবনিকা নিপতিত হইয়া গিয়াছে। একবার মনে হয় যে, কলির জীবের সৌভাগ্য অসীম, যেহেতু, লীলাময়ের লীলা স্বচক্ষে দেখিয়া জীবন সার্থক করিয়াছে। আবার মনে হয় যে, কলির জীবের ন্যায় এমন হতভাগ্য আর কোনকালে জন্মায় নাই। হতভাগ্য বলিবার হেতু এই যে, এমন অমূল্য নিধি প্রাপ্ত হইয়া প্রাণ ভরিয়া সম্ভোগ করিতে পারিল না। সংসারক্ষেত্রে সুখ দুঃখ পর্য্যায়ক্রমে আসে যায়। দুঃখ আসিলে সুখের প্রত্যাগমন আশা করা যাইতে পারে, কিন্তু প্রভু সম্বন্ধে সে আশা আর নাই। তিনি দ্বারে দ্বারে গৃহে গৃহে আপনি স্বইচ্ছায় গৃহস্থের অনভিপ্রায়ে, মনতুষ্টি করিবার নিমিত্ত নানাপ্রকার সামগ্রী দিয়া কেঁদে কেঁদে প্রেম বিতরণ করিয়াছেন। ধনীরা ধনের গর্ব্বে অন্ধ। তাহা চূর্ণ করিবার অভিপ্রায়ে কাঙ্গাল ঠাকুর প্রেমিক কাঙ্গালের বেশে তাঁহাদের বাটীতে প্রবেশ করিয়াছেন। একদা কোন ক্রোরপতির বাটীতে যাইয়া উপস্থিত হন। সেই বাটীর কর্ত্তৃঠাকুরাণী প্রভুকে পূর্ব্বে

চিনিতেন। ঠাকুরকে দেখিয়া কর্ত্তৃঠাকুরাণী বিশেষ আনন্দ প্রকাশ-পূর্ব্বক নানাবিধ উপদেশ শ্রবণ করিলেন। সায়ংকাল সমাগত দেখিয়া প্রভু বিদায় চাহিলেন। কর্ত্তৃঠাকুরাণী পরমানন্দে কহিলেন, "বাবা! আহা! তোমার কি মিষ্ট কথা? কথা শুনিতে শুনিতে সব ভুলিয়া যাই। মাঝে মাঝে এস।" ঠাকুর বাহিরে আসিয়া পুনরায় অতিব্যস্তে অন্তঃপুরে প্রবেশ পূর্ব্বক কহিলেন, "ওগো! তোমরা আমায় কিছু খেতে দিলে না।" গিন্নি অপ্রতিভ হইয়া একটী সন্দেশ আনিয়া দিলেন। ঠাকুর তাহার কণিকা মাত্র স্পর্শ করিয়া প্রস্থান করিলেন। ঠাকুরের এই কার্য্যের দ্বারা তাঁহাকে লোভী বলিতে পারেন, কিন্তু ভাবিয়া দেখিলে তাহা বলা যায় না। লোভী একটী সন্দেশ পাইয়া তাহার কণিকা গ্রহণ করিলেন কেন? একদিন একথা তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করায় বলিয়াছিলেন যে, আমি কি বিপদেই পড়িয়াছি, তাহা আমিই জানি। আমার বিপদ অপরে কিরূপে বুঝিবে? যাহার যন্ত্রণা হয় সে আপনিই বুঝিতে পারে, অপরকে বুঝান যায় না। আমায় কেহ ডাকিতে চাহে না, বাটীতে লইয়া যাইতে চাহে না, কি করি আমার নিজের প্রয়োজন, সুতরাং, আপনিই একটা হেতু করিয়া যাই, পরিচয়ও দিই, বুঝিয়াও বুঝে না, দেখিয়াও দেখে না, অমনি বিদায় করিয়া দেয়। যদ্যপি কিছু চাহিয়া না ভক্ষণ করি, তাহা হইলে গৃহস্থের অকল্যাণের আর সীমা থাকিবে না। শাস্ত্রের বিধি আমি কিরূপে অমান্য করিব। তাই কিছু চাহিয়া মুখে দিয়া আসি। তাঁহার কাঙ্গালবেশ, কাঙ্গালভাব দেখিয়া কেহ প্রহার করিতে আসিত, কেহ গালাগালি দিত, কেহ বিদ্রূপ করিত, তিনি অঞ্জলি পাতিয়া সমুদয় গ্রহণপূর্ব্বক তাহাদের পূর্ণ মর্য্যাদা প্রদান করিতেন। প্রেমের পাগল, প্রেমচূড়ামণি, প্রেম দিতে হয়, তাহাই সাধ্যমত ঢালিয়া দিয়াছেন। আমরা কলির জীব অপ্রে-

মিক, আমাদের সছিদ্র হৃদয়-কুম্ভ, কাম ক্রোধাদি নানাবিধ ছিদ্র দিয়া প্রেমবারি বাহির হইয়া গেল! প্রেমের ব্যাপার বুঝিতে পারিলাম না! ঠাকুর কেঁদে কেঁদে গিয়াছেন, এখন আমাদের কাঁদিবার দিন পড়িয়াছে, এখন আমরা কাঁদি। কাঁদিতে পারি কৈ? এখন মনে হয় যে, প্রভুর চরণপ্রান্তে পতিত হইয়া প্রাণ ভরিয়া কাঁদিয়া লই, কিন্তু কাঁদিতে পারি না। নয়নের জল নয়নেই শুষ্ক হইয়া যায়। বিরহাদির উত্তাপে বাষ্প হইয়া যায়, কাঁদিব কিরূপে? প্রভু! কৃপা করুন, যেন নয়ননীরে আমাদের হৃদয়ের অপ্রেমিকতাবৃত্তিগুলি বিধৌত করিয়া, রামকৃষ্ণ বলিয়া কাঁদিয়া জীবনের অবশিষ্ট কয়েকদিন কাটাইয়া যাইতে পারি।

গীত।

ফুল্ল প্রাণে, মধুর তানে, গায় বিহগ গহনে।
গায় যশরাশি, রবি তারা শশী, গ্রহগণে গগণে॥
অনিল ধায় ফুল দোলায়, কহে ধীরে তায় সৃজন যার,
অলি গুণগুণে, উষা সমীরণে, মহিমা তাঁর বাখানে॥
অধীরা ধরণি নিয়ত ধায়, সে জানে সে চলে কা'র কথায়,
নগ নতশিরে, দামিনী শিহরে ব্যাকুল জলধি চুমিতে চরণে॥
দীন হীন জনে, আকুলিত প্রাণে, নিরুপায় যবে চায় মুখপানে,
কৃপাময় কৃপাবারি বরিষণে জুড়াও তাপিত জীবনে॥

রসনায় নাম পরসে তরে যায়।
মনে বা শ্রবণে, শয়নে স্বপনে, ধ্যানে কিবা ধারণায় ॥
সেই গুণধাম, সম সব নাম, যে ভাবে যে চায়, সে ভাবে সে পায়,
নাম তায় নিমিত্ত উপায় ॥
সাধন ভজন, চাহে কোন জন, করে কেহ সাধে নাম আলাপন,
কি নাম না জানে, দৈবে উচারণে, লভে চির করুণায় ;—
সরল প্রাণে আপনি সে বলায় ॥
জ্ঞানে বা অজ্ঞানে, কিবা কায়মনে ভ্রমবশে রসনায়,
পরিহাস ছলে, নাম তার নিলে, অবহেলে পায় চরণকৃপায় ;—
যদি রয়না চুরি ভাবের ঘরে তায় ॥

যা বল সে একই সকল।
যদি ভাবের ঘরে না রয় গোল ॥
গুরুদত্ত আপন জনে, ডাক্‌লে পরে শোনেই শোনে,
সরল প্রাণে হয় না বিফল ;—
প্রাণ যদি ধায় ক্ষণের তরে, দয়াল ঠাকুর রইতে নারে,
আদর করে কাতরে দেয় কোল ;—
শরণ নিয়ে চরণতলে কররে জনম সফল ॥

ডাকরে ডাকরে মন দিন যে ফুরায়ে যায়।
যে নামে যে ভাবে ডাক, সেত তাতেই শুনতে পায় ॥
না বাধে তার নামভেদে, ঈশা মুষা মহম্মদে,
কালী তারা হরিপদে, সম সে উপায় ॥

যতই ধরম ভবে, নহে কেহ একভাবে,
মতভেদে একেরই পূজায় ;—
নানা ফুলে গাঁথা মালা একটী সূত’র বাঁধন তায় ॥

এ ধরা তোমার, এস বার বার,
দেহ ধরি হরি হরিতে ভার।
বেদের উদ্ধার, অবণি আধার, দানব দুর্ব্বার করিতে সংহার,
বলি ছলি কর পাতালে বিহার, দয়াময় তব মায়া বুঝা ভার ॥
তুমি ভৃগুপতি ক্ষত্রিয় নিধনে, তুমি রঘুপতি সত্যের পালনে,
তুমি যদুপতি হেরি বৃন্দাবনে, প্রাণ হরি গোপিকার ॥
বুদ্ধরূপে জীবে অপার করুণা, অহিংসা ধরম পরম ঘোষণা,
নদীয়ায় গোরা প্রেমে মাতুয়ারা, বিলাইলে প্রেম ফিরি দ্বারে দ্বার ॥
আগমন ভবে যবে প্রয়োজন, দুষ্কৃতি দমন, ধর্ম্মের স্থাপন,
সাধন ভজন বঞ্চিত যে জন, রামকৃষ্ণপদ সার ॥

একি স্বপন, কোথায় রতন, হৃদয়-আসন শূন্য ক’রে।
যে ফুলহারে, সাজায়ে তোমারে, হেরিতাম মনোসাধে নয়ন ভরে ;-
আজি সে কুসুমহার পরাণ বিদরে ॥
আর কে আমার আমার ব’লে, আদর ক’রে কোলে তুলে,
মুছায়ে সকল মলা জুড়াবে জীবনে ;—
ছিলেনা ত নিদয় এত, কোথায় লুকালে নাথ,
এস নাথ এস ফিরে ক্ষণেক তরে ;—
ধোয়াব চরণদুটী আজি আঁখিনীরে ॥

আপনি পাগল পাগল করে সবারে।
এমন প্রেমের পাগল হয়নি রে আর, প্রেম বিলায় যারে তারে
কি ভাবে সে বিভোর কে জানে, ধারা বহে নয়নে,
দীনের ব্যাথা সয় প্রাণে প্রাণে ;—
বলে না হয় যদি সাধন ভজন, ভার দিবি আয় আমারে ॥
দীনের দুঃখ আর ত রবে না, অভয় চরণ কারো নয় মানা,
কাতর প্রাণে ডাক্‌রে রসনা ;—
সুধামাখা মধুর নাম বলরে বদন ভরে ॥
বল রামকৃষ্ণ রামকৃষ্ণ বলরে বদন ভরে ॥

রামচন্দ্রের বক্তৃতাবলী।

সপ্তদশ বক্তৃতা।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবকথিত

জমা খরচ

১৩০৩—১৫ই ভাদ্র রবিবার, ষ্টার থিয়েটারে প্রদত্ত।

---

৬২ রামকৃষ্ণাব্দ।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ

শ্রীচরণ ভরসা।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেব কথিত জমা খরচ

ব্রাহ্মণাদি সকলের চরণে প্রণাম।

একদা চারিজন ব্যক্তি অমরত্ব-লাভ করিবার উদ্দেশ্যে নিবিড় বন, গিরি কন্দর প্রভৃতি জনশূন্য স্থলসমূহ দীর্ঘকাল ব্যাপিয়া অনুসন্ধান করিতে করিতে কোন অত্যুচ্চ পর্ব্বতশৃঙ্গে জনৈক মহাত্মার সাক্ষাৎ পান। মহাত্মাকে দর্শন করিবামাত্র, তাঁহাদের মন প্রাণ বিমোহিত হইয়া গেল এবং পুনঃ পুনঃ সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত ও পদধূলি গ্রহণান্তর কৃতাঞ্জলিপুটে তাঁহারা স্থিরভাবে দাঁড়াইয়া রহিলেন। মহাত্মা ঈষৎ হাসিয়া কহিলেন, "তোমরা অমরত্ব-লাভ করিবার অভিপ্রায়ে এত কষ্ট-স্বীকার করিয়াছ, ইহাতে আমি অতিশয় দুঃখিত হইলাম। যাহা হউক, তোমাদিগকে এই ফল চারিটী প্রদান করিতেছি, ভক্ষণ কর। তোমরা নিশ্চয় অমর হইবে। কিন্তু সাবধান! এ সম্বন্ধে আর কাহাকেও বলিও না।" এই বলিয়া মহাত্মা একটী বৃক্ষমূল হইতে চারিটী ফল আনিয়া উহাদিগকে দিলেন। চারিজন ব্যক্তির মধ্যে তিন জনে ফল তিনটী অবিলম্বে উদরসাৎ করিয়া মুখ পুঁছিয়া ফেলিল এবং উপর্য্যুপরি শপথ করিতে লাগিল যে, "প্রভুর নিষেধবাক্য আমাদের শিরোধার্য্য। আমাদিগকে দ্বিখণ্ড করিয়া ফেলিলেও এ সন্ধান কাহাকেও বলিয়া দিব না। যদ্যপি কেহ কোন সূত্রে এ সম্বন্ধে আভাস পাইয়া আমাদিগকে জিজ্ঞাসা করে, আমরা বলিব

যে, ফল খাইয়া অমরত্ব-লাভ করা যায়, একথা সাধারণ বুদ্ধির গোচর নহে। এপর্য্যন্ত কি কেহ একথা শুনিয়াছেন? এইরূপ নানাবিধ কথা বলিব।” চতুর্থ ব্যক্তি আপন অংশের ফল হইতে কিঞ্চিৎ ভক্ষণ করিয়া মহাত্মাকে প্রণতি পূর্ব্বক চতুর্দ্দিকে চাহিয়া দেখিল যে, গিরির সন্নিধানে লোকালয় আছে। সে অতি সত্বর মহাব্যস্ত হইয়া একটী অত্যুচ্চ শৃঙ্গোপরি আরোহন করিয়া প্রাণপণে চীৎকার পূর্ব্বক কহিতে লাগিল, “ওহে গ্রামবাসিগণ! তোমরা সপরিবারে আইস, আমি অমরত্ব-লাভের ফল পাইয়াছি। তোমরা তাহার অংশাস্বাদন পূর্ব্বক কালের হস্ত হইতে পরিমুক্তি লাভ করিয়া যাও।” মহাত্মা আশ্চর্য্য হইয়া বলিলেন, “আরে মূর্খ! তোকে আমি যাহা নিষেধ করিলাম, তুই তাহাই আমারই সমক্ষে কাল বিলম্ব না করিয়া উল্লঙ্ঘন করিলি? তোকে আমি অভিশাপ দিব।” সে কহিল “প্রভু! অভিশাপ দেন, বক্ষ পাতিয়া গ্রহণ করিতে প্রস্তুত আছি। কিন্তু প্রভু বলুন দেখি, সহজে কি অমরত্ব লাভ করিতে কেহ কখন কৃতকার্য্য হইয়াছে? সৌভাগ্যক্রমে আপনার কৃপায় আমি সেই অমরত্বলাভ করিবার উপায় পাইয়াছি, তাহা সাধ্যমত অন্যকে না দিয়া কেমন করিয়া নিশ্চিন্ত থাকিব? কিন্তু আমার পরিতাপ এই যে, আমরা চারিজন চারিটী ফল পাইয়াছিলাম। যদ্যপি সকলে কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ ভক্ষণ করিয়া অবশিষ্ট ফল রাখিতেন, তাহা হইলে হাজার হাজার নর-নারীর কল্যাণ সাধিত হইত।” বলিতে বলিতে সাধু অদৃশ্য হইলেন। আমাদের অবিকল সেইরূপ ঘটিয়াছে। অনেকেই রামকৃষ্ণদেবের চরণপ্রসাদে কৃতার্থ হইয়াছেন, অনেকেই তাঁহার অমৃত-ভাণ্ডের রস পান করিয়াছেন, অনেকেই তাঁহর অক্ষয়ভাণ্ডারস্থিত রত্ন সমূহ সংগ্রহ করিয়া রাখিয়াছেন। কিন্তু তাঁহারা উক্ত তিনজন ব্যক্তির

ন্যায় স্বার্থপর, আপনাপন মুখ পুঁছিয়া বসিয়া আছেন। যেমন চতুর্থ ব্যক্তি আক্ষেপ করিয়া বলিয়াছিলেন যে, সকলের অংশ দিলে অন্তের প্রচুর হইত, আমিও আক্ষেপ করিয়া বলিতেছি যে, যদ্যপি সকলে আপনাপন সংগৃহিত অংশ হইতে সাধারণকে কিছু কিছু প্রদান করিতে চেষ্টা করিতেন, তাহা হইলে এত দিনে বাঙ্গালা দেশ কেন, সমুদয় ভারতবর্ষ রামকৃষ্ণ নামামৃতরস পান করিয়া অমরত্ব লাভ করিত।

আমার এ প্রকার আক্ষেপ করিবার বিশেষ কারণ আছে। অনেকের স্মরণ আছে যে, ইতিপূর্ব্বে প্রত্যেক মাসে প্রভুর নামামৃত পান করিয়া আমরা কৃতার্থ হইতাম। কিন্তু গৃহী আমরা, কামিনী-কাঞ্চনের ক্রীতদাস হইয়া রহিয়াছি, তাহারা তাহাতেও প্রতি-বন্ধক জন্মাইল, সুতরাং, আর আমরা এমন কি ছয় মাসেও একত্রিত হইতে পারিতাম না। পরে বৎসরান্তে আসিয়া দাঁড়াইল। কিন্তু এ বৎসরে যেরূপ বিভীষিকা উঠিয়াছিল, তাহাতে এ দাসের পুনরায় আপনাদের সমক্ষে উপস্থিত হইবার কোন আশা ছিল না। সে যাহা হউক, প্রভুর লীলাসম্বরণের পর এই সুদীর্ঘ কালের মধ্যে আর দ্বিতীয় ব্যক্তি কার্য্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইলেন না, দেখিয়া বাস্তবিক মর্ম্মাহত হইয়াছি। আমি এই কথা বিশ্বাস করি যে, যদ্যপি কেহ দুই পয়সা উপার্জ্জন করিতে পারে, সে ব্যক্তি সর্ব্বাগ্রে আপন পরিবার-বর্গের সহায়তা করিতে চেষ্টা করিবে, পরে তাহা হইতে উদ্বর্ত্ত হইলে বাটীর বহির্দ্দেশে বাহুপ্রসারণ করিলে একদিন শোভা পায়। বিশেষতঃ যখন যে দেশে ধর্ম্ম-সংস্থাপনের প্রয়োজন হয়, তখন সেই দেশে ভগবান্ অবতীর্ণ হন, এবং তথায় কার্য্য সম্পন্নকালে সেই ঢেউ অন্যত্রে যাইয়া উপস্থিত হয়।

রামকৃষ্ণদেবের বিষয় এখন বোধ হয় আমাদের দেশের পোনের আনা রকম লোকের বিশেষ কোন প্রকার স্থির ধারণা হয় নাই। কেহ পরমহংস বা সাধু বলেন, কেহ কর্ত্তাভজা সম্প্রদায়ের লোক বলেন, কেহ কালীভক্ত বলেন এবং কেহ বা তাঁহাকে পাগলও বলেন। তাঁহার উপদেশগুলি অতি সরল কথায় প্রচলিত। অনেকে তাহা সময়ে সময়ে উল্লেখ করেন, কিন্তু তাহার অভ্যন্তরে প্রবেশ করিবার রুচি জন্মে নাই। হুজুকে সহর, হুজুকপ্রিয় লোককে কালেভদ্রে একত্রিত করা কঠিন নহে, তাহাতে প্রকৃতপক্ষে তাঁহাকে বিশেষরূপে জানিবার, বুঝিবার এবং ধারণা করিবার কখন সুবিধা হয় না। তাই প্রভুর ঐশ্বর্য্যপ্রাপ্ত ব্যক্তিদিগের নিকট আমার সানুনয় নিবেদন এই যে, তাঁহারা গুপ্তভাবে অবস্থিতি না করিয়া রামকৃষ্ণের উপদেশাদি প্রকাশ করিয়া সর্ব্বসাধারণের কল্যান বিধান করুন। দেশের সম্পত্তি দেশে থাকিলে দেশেরই শ্রীবৃদ্ধি হয়। বর্ত্তমান সভ্যতার প্রণালীমতে বিনিময় সূত্র ধর্ম্মভাবে প্রয়োগ করিতে আমরা যারপরনাই কুণ্ঠিত হইয়া থাকি; আমি আশা করি, এ দাসের এই মিনতি প্রভুর কৃপায় প্রত্যেক সেবক ও ভক্তের চরণে উপনীত হইবে।

"জমা খরচ" কথাটী অতি সাধারণ কথা, আমরা প্রায় ইহার অর্থ সকলেই জানি। কিন্তু রামকৃষ্ণদেব এই জমা খরচের যেরূপ ভাব প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন, অদ্য তাহাই সর্ব্বসমক্ষে প্রকটিত করা আমার অভিপ্রায়। জমা খরচ বিষয়টী যদিও আমরা বুঝি বটে, কিন্তু কিঞ্চিৎ চিন্তা করিয়া দেখিলে কলিকাতা এবং ইহার সন্নিহিত দেশনিবাসী লোকেরা তদ্বিষয়ে বিশেষ অজ্ঞ বলিয়া জ্ঞাত হওয়া যায়। ব্যবসায়ী না হইলে জমা খরচ বোধ হয় না এবং জমা খরচের অধিকারী না হইলে ব্যবসায়ীও হওয়া যায় না। যে হেতু ব্যবসার উৎকর্ষতা এবং

অপকর্ষতা জমাখরচের উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করিয়া থাকে। এদেশের লোকেরা কয় জন ব্যবসা বাণিজ্য দ্বারা উন্নতি লাভ করিয়াছে? কেবল গোলামী, গোলামী, গোলামী ব্যতীত আর কথা নাই। বঙ্গদেশীয় লোকেরা কিঞ্চিৎ অর্থ সংগ্রহপূর্ব্বক আজ মাথায় করিয়া আঁব বেচিয়া বেড়ায়, দুইদিন পরে সে দোকানদার হইয়া ক্রমে মহাজন গদীয়ান হইয়া বসে। আজ একজন শিশি বোতল বিক্রী বলিয়া পাড়ায় পাড়ায় রৌদ্রবৃষ্টিতে অভিষিক্ত হইয়া পরিভ্রমণ করিতেছে, কল্য সে বহুবাজারে দোকানদার হইয়া দাঁড়াইল। উত্তর পশ্চিম দেশীয় ব্যক্তিরাও আজ মাথায় বস্ত্র বন্ধন করিয়া দ্বারে দ্বারে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে, কল্য সে সে ভার মুটের মাথায় দিয়া আপনি "রূপেয়া মে চারিঠো কাপড়া" বলিয়া প্রতিধ্বনিত করিতেছে, পরশ্ব দিবসে পগেয়াপটিতে সে একজন ক্ষুদ্র দোকানদার, তৎপরদিন সেই অদ্বিতীয় ব্যক্তি গদীয়ান হইয়া বসিয়া থাকে। আমাদের দেশের লোকেরা ব্যবসার মধ্যে শিখিয়াছে পুস্তকের দোকান করিতে, ছাপাখানা করিতে এবং ঔষধের ও কাটা কাপড়ের দোকান করিতে, আর মণি-হারির দোকানদার হইতে শিখিয়াছে। স্ত্রীর অলঙ্কার বাঁধা দিয়া, বাটীর পাটা বন্ধক দিয়া, আত্মীয়ের নিকট অর্থ কর্জ্জ লইয়া ব্যবসা খোলা হয়, পরে ক্রমে ক্রমে সেই অর্থ উদরসাৎ করিয়া হাত পা গুড়া-ইয়া বসিয়া পড়েন। এই নিমিত্ত জমা খরচ বিষয়টীর দ্বারা রামকৃষ্ণদেব আমাদের জীবনের উৎকর্ষ সাধন সম্বন্ধে যে অপূর্ব্ব উপদেশ দিতেন, তাহা ক্রমে বলিতেছি।

তিনি একটী রহস্যপূর্ণ গল্প বলিয়া জমা খরচের পরিণাম ফল বুঝাইয়া দিতেন। তিনি বলিতেন যে, কোন দেশে একজন অতিশয় ধর্ম্মপরায়ণ নরপতি ছিলেন। এই রাজ্যে প্রজাদের বিশেষ কোন

ক্লেশ ছিল না। রাজা সকলের সহিত পুত্রবৎ ব্যবহার করিতেন, সুতরাং কেহ কখন রাজসন্নিধানে গমনাগমন করিতে ভীত হইত না। রাজধানীর প্রান্তভাগে একটী বিস্তীর্ণ বাঁশবন ছিল। উপদেবতার ভয়ে কেহ কখন সেই স্থানের সন্নিহিত হইত না। প্রজাদের আভ্যন্তরিক ব্যবস্থা এবং রাজশাসনের প্রতি তাহাদের অন্তরের ভাব অবগত হইবার জন্য রাজা একাকী রাত্রকালে ছদ্মবেশে পথে পথে ভ্রমণ করিয়া বেড়াইতেন। একদা এইরূপ পরিভ্রমণ কালে তিনি সহসা ঐ বাঁশবনের নিকটে উপস্থিত হইলেন। তিনি পূর্ব্বেই শুনিয়াছিলেন যে, কেহ ভয়ে বাঁশবনের নিকটে যাইতে চাহে না। কিন্তু সে কথায় নির্ভীক রাজার হৃদয়ে ভয়ের উদ্রেক না হইয়া, বরং তাঁহার মনে হইল যে, হয়ত এই নিভৃত স্থানে চোর দস্যু প্রভৃতি ব্যক্তিরা আশ্রয় লইয়া তাহাদের আপন আপন কু-অভিপ্রায় চরিতার্থ করণার্থ অবস্থিতি করে। এই ভাবিয়া তিনি সাহসে ভর করিয়া বাঁশবনের ভিতরে প্রবেশ করিলেন। তথায় যাইবামাত্র কে বলিয়া উঠিল, "মহারাজ সাত ঘড়া টাকা লইবেন?" রাজা আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া চারিদিক সাধ্যমত নিরীক্ষণ করিয়া কাহাকেও দেখিতে না পাইয়া, কহিলেন, "কে তুমি নিকটে আইস, তাহার পর আমি তোমার কথার উত্তর দিব।" পুনরায় পূর্ব্ববৎ কথা শুনিলেন। রাজা তখন মনে মনে চিন্তা করিলেন যে, লোকে উপদেবতার কথা কহিয়া থাকে, বোধ হয় তাহার কারণ এই। পুনরায় তিনি শুনিলেন, কে বলিতেছে—"মহারাজ শীঘ্র করিয়া বলুন, সাত ঘড়া টাকা লইবেন কি না?" রাজা ভাবিতে লাগিলেন যে, আমায় টাকা দিতে চাহে কেন? এবং কে বা টাকা দিতে চাহিতেছে? জিজ্ঞাসা করিয়াও উত্তর পাইলাম না। তিনি অতঃপর কহিলেন, "যে সাত ঘড়া টাকা দিতে চাহিতেছ, তাহা জমা না খরচের?"

তৎক্ষণাৎ উত্তর আসিল, "মহারাজ! আপনি ভারি চতুর। চতুর না হইলে বা রাজা হইবেন কেন? বুঝিয়াছি আপনি এ টাকা লইবেন না।" রাজা জিজ্ঞাসা করিলেন, "আমি টাকা লইব কি না তুমি কিরূপে বুঝিলে? আমি এখনও আমার অভিপ্রায় কিছু প্রকাশ করি নাই। তুমি আমায় বল যে এই টাকা জমা না খরচের?" রাজার এই কথা সমাপ্ত না হইতেই অমনি উত্তর আসিল যে, "মহারাজ! উহা জমার, খরচের নহে।" রাজা ঈষৎ হাসিয়া প্রস্থান করিলেন।

পরদিবস প্রাতঃকালে রাজার ক্ষৌর কার্য্য সম্পাদনার্থ পরামাণিক আসিয়া উপস্থিত হইল। নাপিত মহাশয় রাজার পুরাতন ভৃত্য, বিশেষ অনুগৃহীত এবং অতিশয় বিশ্বাসী। রাজা নাপিতের সহিত অনেক রহস্য করিতেন। কথায় কথায় বাঁশবনের টাকার কথাটী বলিয়া ফেলিলেন, কিন্তু জমা কি খরচের টাকা তাহা বলিলেন না। সাত ঘড়া টাকার কথা শুনিয়া নাপিতের মস্তিষ্ক বিঘূর্ণিত হইয়া গেল, কিন্তু রাজার নিকট কিছুই বলিল না। কার্য্যগতিকেই হউক, কিম্বা অন্য কোন কারণেই হউক, সে সম্প্রতি টাকার চেষ্টা করিতে পারিল না। সময়ে সময়ে ঐ কথা তাহার মনে উদয় হইত, কিন্তু কিছুতেই বাঁশবনে যাইবার সুবিধা হয় নাই। ক্রমে মনে করিল যে, হয়ত এত দিনে কে লইয়া গিয়াছে। কথাটা সুতরাং একরকম ভুলিয়া গেল। একদা একটা বনলতার অন্বেষণ করিতে করিতে নাপিত ঐ বাঁশবনের নিকটে সমাগত হইবামাত্র সে শুনিল, কে বলিতেছে, 'ওরে পরামাণিক! সাত ঘড়া টাকা লইবি?" পরামাণিক একবার এদিক, একবার ওদিক, একবার অগ্রে, একবার পশ্চাতে, পুনঃপুনঃ দৃষ্টিপাত করিয়া কাহাকেও দেখিতে পাইল না। পুনরায় শুনিল, "ওরে নাপিত! বল্ না, টাকা লইবি কি না?" নাপিত ভয়ে আনন্দে পরিপূর্ণ

হইয়া বলিল, "মহাশয়! আমি বড় দরিদ্র। রাজ সরকারে চাকুরি করিয়া জীবন নিঃশেষিত করিলাম, কিন্তু জীর্ণ বস্ত্র পরিধান করার অদৃষ্ট পরিবর্ত্তন হইল না। আমি অতিশয় দীনহীন। অতি নীচ বৃত্তি অবলম্বনপূর্ব্বক উদরান্নের সংস্থান করিতে হয়। তাহাও সম্পূর্ণরূপে নহে। কে আপনি দয়াময়! দরিদ্রের মা বাপ! এই দরিদ্রের প্রতি দয়া হইয়াছে, ইহা অপেক্ষা দয়ার কার্য্য কি হইতে পারে? টাকা লইব কিনা জিজ্ঞাসা করিতেছেন? টাকার জন্যে নাপিতগিরি কার্য্য করিতেছি। যদ্যপি লেখা পড়া শিখিতাম, তাহা হইলে রাজসরকারে একটা উচ্চ পদান্বিত হইয়া গাড়ি ঘোড়া চড়িতাম।" নাপিত নিস্তব্ধ হইলে উত্তর পাইল যে, "নাপিত! গৃহে ফিরিয়া যাও, আমি সাত ঘড়া টাকা রাখিয়া আসিয়াছি।" নাপিত এই কথা শুনিয়া একবার মনে করিল, হয় ত কে আমায় বিদ্রূপ করিল। এই কথা কহিতে কহিতে অমনি আমার ঘরে টাকা পৌঁছাইয়া আসিল, আমি কিছুই জানিতে পারিলাম না। আবার ভাবিল, ছি! ছি! আমার দুর্ব্বল মন সহসা বিশ্বাস করিতে চাহি না। আমি এ ব্যক্তির নিকট টাকা ভিক্ষা করিতে আসি নাই। উনি আপনি টাকা দিতে চাহিলেন, তখন টাকা না দিবেন কেন? পরে আবার অন্তর ভেদ করিয়া দীর্ঘ নিশ্বাস উত্থিত হইয়া বলিতে লাগিল, ওরে অদৃষ্ট সঙ্গে সঙ্গে যায়। আমার যদ্যপি এমন অদৃষ্ট হইবে, তাহা হইলে নাপিতকুলে জন্মিলাম কেন? সাত ঘড়া টাকা ভাবিলে বক্ষঃস্থল শুষ্ক হইয়া আইসে। আমি কখন এক ঘটি টাকা দেখি নাই, সাত ঘড়া টাকা আমার দগ্ধ কপালে কি কখন সম্ভবে? এইরূপ মনে মনে নানা প্রকার তর্ক বিতর্ক করিতে করিতে নিজ কুটিরে উপস্থিত হইল। সে দিন গৃহে তাহার গৃহিণী ও সন্তানাদি কেহ ছিল না। গৃহের দ্বার পূর্ব্ববৎ রুদ্ধ দেখিয়া নাপিত মস্তকে হাত

দিয়া বসিয়া পড়িল এবং তৎদৃষ্টে স্থির নিশ্চয় করিল যে, টাকা কড়ি সমুদায় মিথ্যা কথা। কোন দুষ্টলোক বাঁশবনের ভিতরে বসিয়া আমার সহিত রহস্য করিয়াছে। এ স্থানে টাকা আনিতে কাহাকে দেখিলাম না, এখানেও গৃহে প্রবেশ করিবার কোন লক্ষণ নাই। তবে কেমন করিয়া টাকার কথা বিশ্বাস করিব? নাপিত এই-রূপ চিন্তা করিয়া অতিশয় বিষাদিত হইয়া দ্বারোদ্ঘাটন করিল। গৃহমধ্যে প্রবেশ করিয়া দেখে যে, একটী দুইটী নহে, সারি সারি সাতটী ঘড়া বসান রহিয়াছে। আনন্দে নাপিতের বক্ষঃস্থল যেন ফাটিয়া যাইবার মতন হইল। গৃহিণী নাই বলিয়া শত সহস্র বার হায় হায় করিতে লাগিল। ঘড়ার আবরণ খুলিয়া দেখিল যে, একটী ব্যতীত সকলগুলি পরিপূর্ণ আছে। নাপিত ঘড়াগুলি স্পর্শ করিয়া কত কি ভাবিতে লাগিল, তাহা বর্ণনা করে কে? কখন তাহার মনে হইতে লাগিল যে, হয়ত ইহা টাকা নহে। আমি অনেকক্ষণ টাকা টাকা ভাবিতেছিলাম, তজ্জন্য হয়ত এই ভ্রম দেখিতেছি। শুনিয়াছি, ভ্রমে মিথ্যাকেও সত্য বলিয়া বোধ হয়। আমার তাহাই হইয়াছে। ইত্যাকার চিন্তাকালে গৃহিণীঠাকুরাণী উপস্থিত হইলেন। গৃহিণীকে দেখিয়া নাপিত পুলকে লম্ফ দিয়া উঠিয়া কহিল, "আরে ভাগ্যধরী! সতী সাবিত্রী! আজ তোমার অদৃষ্টে আমি রাজা হইয়াছি। আর তুমি নাপ্তিনী নও, আর পাড়ায় মেয়েদের আলতা পরাইতে যাইতে হইবে না। দেখ দেখ সাত ঘড়া টাকা পাইয়াছি।" নাপ্তিনী টাকা দেখিয়া নাপিতকে শত ধন্যবাদ দিয়া বলিল, "আমার মা বাপ যখন তোমার সঙ্গে বিবাহ দেন, তখন কুটুম্বেরা নিন্দা করিয়াছিল। কিন্তু তোমাতে অনেক সুলক্ষণ ছিল, আমার বাপ সেই লক্ষণ দেখিয়া বলিয়াছিলেন যে,

এই পাত্র যদ্যপি বাঁচিয়া থাকে, তাহা হইলে রাজা হইবে। যখন তুমি রাজার নাপিত হইলে, তখনই মা বলিয়াছিলেন যে, কর্ত্তা যা বলেছিলেন, তাহা এখন হইল। তিনি বাঁচিয়া থাকিলে আজ রাজার শ্বশুর হইতেন, আমি তাঁহাকে কত দিতাম, মনের সাধে কত খাওয়াইতাম। যাহা হউক, আমি এখনি বলিয়া পাঠাই।” নাপিত নিষেধ করিয়া কহিল, “দেখ, আপাততঃ একথা কাহাকেও বলিও না। যদ্যপি রাজা জানিতে পারেন, তিনি এখনি জোর করিয়া সব কাড়িয়া লইয়া যাইবেন। আইস, মাটি খুঁড়িয়া ঘড়া গুলি পুঁতিয়া রাখি। এই বলিয়া তাহারা গৃহের দ্বার রুদ্ধ করিয়া ঘড়া গুলি মাটির ভিতর পুঁতিয়া রাখিল। একটী ঘড়া অসম্পূর্ণ দেখিয়া নাপিত কহিল যে, “এই ঘড়াটী পূর্ণ করিতেই হইবে।” নাপ্তিনী কহিল, “সে বিষয়ে সন্দেহ কি আছে।” এই বলিয়া তাহাদের যাহা কিছু দ্রব্য ছিল, সমুদয় সেই ঘড়ায় রাখিয়া দিল, কিন্তু পূর্ণ হইতে অনেক বাকি রহিল। নাপ্তিনীর সোনা রূপার যে অলঙ্কার ছিল, তাহা বিক্রয় করিয়া টাকাগুলি ঘড়ায় ফেলিয়াও কোন মতে পূর্ণ করিতে পারিল না। এই রূপে নাপিত যেস্থলে যাহা পায়, রাজবাটীর মাহিনাদি সমুদয় টাকা সেই ঘড়ায় রাখিতে লাগিল। ক্রমে সংসার যাত্রা নির্ব্বাহ হওয়া অতি কষ্টকর হইয়া উঠিল। কখন এক সন্ধ্যা হয়, কখন জীর্ণ সহস্রগ্রন্থী মলিন বস্ত্র ব্যতীত আর একখানি ভাল বস্ত্র অঙ্গে উঠে না এবং রাজ সরকারে সর্ব্বদাই অভাব অভাব শব্দ করিয়া থাকে। রাজা নাপিতের মলিন দশা দেখিয়া কারণ জিজ্ঞাসা করায় নাপিত সংসারের অতি ব্যয়ের প্রচুর তালিকা দিল। রাজা তৎক্ষণাৎ তাহার বেতনের দ্বিগুণ বৃদ্ধি করিয়া দিলেন। নাপিত বেতন পাইবামাত্র উহা পূর্ব্বের ন্যায়

ঘড়ার ভিতর নিক্ষেপ করিল এবং অতি ক্লেশে দিন যাপন করিতে লাগিল।• নাপিতের পূর্ব্ববৎ মলিন অবস্থা দেখিয়া একদিন রাজা তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "পরামানিক! সত্য করিয়া বল্, তোর এরূপ দুর্দ্দশা হইবার কারণ কি? পূর্ব্বে যে অর্থে স্বচ্ছন্দে দিন যাপন হইত, এখন তাহার দ্বিগুণেও হয় না; কথাটা উপেক্ষার নহে। আমি অনুসন্ধান করিয়া জানিয়াছি যে, পূর্ব্বাপেক্ষা সংসার খরচ বৃদ্ধির অন্য কোন কারণ হয় নাই। ভিতরে ভিতরে নিশ্চয় কোন ভ্রমে পড়িয়াছিস্। বলিতে পারিস্, তুই কি বাঁশবন হইতে সাত ঘড়া টাকা আনিয়াছিস?" নাপিত কৃতাঞ্জলিপুটে অতি বিষাদিত হইয়া কহিল, "মহারাজ! আমি অতি বিপদগ্রস্ত হইয়াছি, তাহাতে এমন কে পাষণ্ড আপনাকে একটা মিথ্যা কথা বলিয়া গিয়াছে। মহারাজ বাঁশবনের টাকা আমায় দিবে কেন? আপনি ওকথা বিস্মৃত হইয়া যান।" রাজা কহিতে লাগিলেন, "আরে বাতুল! আমায় বলিবে কে? আমি তোর লক্ষণ দেখিয়া বুঝিয়াছি। দেখ! সেই টাকা এখনি ফিরাইয়া দে। তাহা না করিলে তোর দুর্দ্দশার অবধি থাকিবে না। তোর স্মরণ নাই যে আমি উহা লই নাই? তুই একথা জানিয়া কেন লইয়াছিস্? তোর ভয় নাই, আমি সে টাকা লইব না। সে জমার টাকা, খরচের নহে। আমি বুঝিয়াছি, ঐ সাত ঘড়া টাকা যক্ষের দ্বারা সংরক্ষিত হইতেছে। যাহার জন্য টাকাগুলি রক্ষা করিতেছে, তাহার এখনও সাক্ষাৎ পায় নাই। সেই জন্য উহা বাড়াইয়া রাখিবার জন্য চেষ্টা করিতেছে। আমার পরামর্শ শোন, যে টাকাগুলি তুই ঘড়ায় রাখিয়াছিস, সে টাকাগুলি পারিস ত বাহির করিয়া লইতে চেষ্টা কর, কিন্তু তুই তাহা পাইবি কি না বলিতে পারি না।"

রাজাজ্ঞা শিরোধার্য্য করিয়া নাপিত, বাঁশবনের নিকটে যাইয়া উচ্চৈঃস্বরে বলিল "ওগো মহাশয়! যে টাকাগুলি আমায় দিয়াছিলে, সেই টাকাগুলি আমার কি অন্যের?" কোন উত্তর আসিল না। নাপিত তখন মনে করিল, রাজা আমায় অন্যায় কথা বলিয়াছেন। কৈ কেহ কোন কথা বলিল না। পুনরায় জিজ্ঞাসা করিল, "ওগো যক্ষ মহাশয়! আমায় যে সাত ঘড়া টাকা দিয়াছিলে, তাহা জমা না খরচের?" তথাপি কোন প্রত্যুত্তর আসিল না। নাপিত কি করিবে ভাবিতে লাগিল। রাজার আদেশ টাকা অবশ্যই প্রত্যর্পণ করিতে হইবে, এই চিন্তা করিয়া পুনরায় বলিল, "যাহা হউক, তুমি সেই টাকাগুলি ফিরাইয়া লও, আমি তাহা লইব না।" এই বলিয়া নাপিত অতিশয় ব্যস্ত হইয়া গৃহে প্রত্যাগমন করিতে লাগিল, ঘড়া হইতে কিছু টাকা বাহির করিয়া লইবে স্থির করিল, কিন্তু হায় গৃহে আসিবামাত্র গৃহিণী কাঁদিতে কাঁদিতে সংবাদ দিল যে, "তুমি রাজবাড়ী যাইবার পরক্ষণেই ঘড়া সাতটী কে চুরি করিয়া লইয়া গিয়াছে।" নাপিত একেবারে অধৈর্য্য হইয়া উন্মাদের ন্যায় রাজসন্নিধানে সমাগত হইয়া তাঁহার চরণযুগল ধারণ পূর্ব্বক ক্রন্দন করিতে করিতে বলিতে লাগিল, "মহারাজ! রক্ষা করুণ, আমার যথাসর্ব্বস্ব গিয়াছে, একটা ঘটি বাটিও রাখি নাই, এক খানা নূতন বস্ত্রও রাখি নাই, একটী পয়সাও রাখি নাই, সমস্ত টাকা কড়ি ঘড়ায় রাখিয়াছিলাম। আমার কি হইবে? মূর্খ আমি, জাতিতে নাপিত, লেখা পড়া জানি না। মহারাজের কৃপায় জীবন যাত্রা নির্ব্বাহ করিয়াই সুখে ছিলাম, কি অশুভক্ষণে যে টাকার লোভে পড়িয়াছিলাম যে, আমার দুর্গতির একশেষ হইয়া গেল। মহারাজ রক্ষা করুণ, আপনি না রক্ষা করিলে আমি সপরিবারে অন্ন

বিনা মারা যাইব। আপনি মাতা, আপনি পিতা, আপনার নিকটে আর লুকাইব না। মহারাজ! আজ ছয়মাস কখন আমরা প্রত্যহ এক সন্ধ্যা আহার করিতে পাই নাই। কোন দিন কেবল শাক সিদ্ধ করিয়া প্রাণ ধারণ করিয়াছি, কোন দিন গাছের পিয়ারা দ্বারা জীবন রক্ষা করিয়াছি, কোন দিন কেবল অঞ্জলি পূরিয়া জলপান দ্বারা দিন কাটাইয়াছি। আর বাঁচিনা, মহারাজ আমাদের সপরিবারকে রক্ষা করুণ।" রাজা নাপিতের দুঃখের কাহিনী শ্রবণ করিয়া যারপরনাই বিষাদিত হইলেন এবং তৎক্ষণাৎ কোষাধ্যক্ষকে প্রচুর অর্থদান করিবার নিমিত্ত আজ্ঞা দিলেন।

রামকৃষ্ণদেব নাপিতের এই গল্পটীর দ্বারা সাধারণকে সতর্ক করিয়া বলিতেন যে, জমা খরচ বোধ না থাকিলে, সকলেরই নাপিতের ন্যায় দুর্দ্দশা ঘটিয়া থাকে। প্রভু বলিতেন যে, এই সংসারে সকলেই ব্যবসা করিতে আসিয়াছে; যাহার যত দূর জমা খরচ বোধ থাকিবে, তাহার ব্যবসায় ততদূর উন্নতি হইবে। তিনি তদনন্তর বলিতেন যে, ব্যবসা বলিলে কেবল অর্থোপার্জ্জন করিবার সুপ্রণালীকে বুঝায় না। ইহা ব্যতীত অন্য অর্থও আছে। কিরূপে মনুষ্য জীবনের ব্যবসা সুচারুরূপে সম্পাদিত হইতে পারে, তাহা উপদেশ দিবার নিমিত্ত একটী সুন্দর গল্প বলিতেন।

কোন পল্লিতে জনৈক কাঠুরিয়া বাস করিত। সে সন্নিহিত বনে কাষ্ঠাদি সংগ্রহ পূর্ব্বক হাটে বিক্রয় করিয়া যৎকিঞ্চিৎ অর্থোপার্জ্জন দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করিত। এই কাঠুরিয়াকে দুইবেলা দুই মুঠা অন্ন ভক্ষণ করিতে দেখিয়া, পল্লির অন্যান্য লোকেরাও ঐ কাঠুরিয়ার পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করিয়া কাঠ কাটিয়া হাটে বিক্রয় করিতে লাগিল। কাঠুরিয়া কাহাকেও কিছু বলিতে পারিত না। কিন্তু মনে মনে

অতিশয় বিরক্ত হইয়া উঠিল। কিয়দ্দিবসের মধ্যে বনগুলি কাষ্ঠবিহীন হইয়া আসিল। কাঠুরিয়া অতঃপর কোথায় আর কাষ্ঠ পাইবে, এই চিন্তায় বিষাদিত হইয়া এক নিভৃত স্থানে চুপ করিয়া বসিয়া রহিল। এমন সময়ে একজন ব্রাহ্মণ আসিয়া কাঠুরিয়াকে অতি মধুর-বচনে বলিলেন, "কাঠুরিয়া! অত চিন্তিত কেন? আমি তোমাকে অতিশয় ভালবাসি, তন্নিমিত্ত তোমাকে একটী পরামর্শ দিতে আসিয়াছি।" কাঠুরিয়া ব্রাহ্মণকে প্রণাম করিয়া চরণধূলি লইয়া কৃতাঞ্জলিপুটে কহিল, "এ দাসের প্রতি আপনার যখন কৃপা-দৃষ্টি আছে, তখন আর আমার চিন্তার বিষয় কি? আজ্ঞা করুন, আমায় কি করিতে হইবে।" ব্রাহ্মণ বলিলেন, "দেখ, তুমি সঙ্কীর্ণ বনে আবদ্ধ না থাকিয়া ক্রমে এগিয়ে যাও।" কাঠুরিয়া কহিল, "প্রভু! এগিয়ে যাইব কোথায়? তাহার অর্থ বুঝিলাম না।" ব্রাহ্মণ বলিলেন, "একটী বনে সীমাবদ্ধ না থাকিয়া বনান্তরে গমন করিতে চেষ্টা কর।" কাঠুরিয়া বলিল, "তাহা বুঝিলাম, কিন্তু পাড়ার লোকের জ্বালায় আমি দীর্ঘকাল তাহাতে কাষ্ঠ কাটিতে পারিব না। আমাকে বনান্তরে কাঠ কাটিতে দেখিলেই অমনি তাহারা আমার পশ্চাদ্ধাবিত হইবে, তাহার উপায় কি কিছু আছে?" ব্রাহ্মণ হাসিয়া বলিলেন, "বাপু! আমি তাহা জানি। আপনাপনি অগ্রসর হইতে কেহ চাহে না। অন্যের অনুকরণ করিবার জন্য সকলেই লালায়িত। যাহাকে কোন ব্যবসায় কিছু উন্নতি করিতে দেখে, সকলেই তাহাকে অনুকরণ করে। সেই ব্যবসা করিতে সকলেই যত্নবান হয়। ফলে সকলেরই ব্যবসার কল্যাণ হওয়া দূরে থাকুক, দিন দিন সকলেরই মূলধন বিনাশ প্রাপ্ত হইতে থাকে। যাহাতে তোমার উন্নতিপথে কেহ কণ্টক নিক্ষেপ করিতে না পারে, তাহার ব্যবস্থা করিয়া দিতেছি। তুমি অগ্রসর

হইলে বিস্তীর্ণ শালবৃক্ষের বন দেখিতে পাইবে। তুমি আপনি চুপি চুপি তাহা হইতে কাষ্ঠ আহরণ করিতে না যাইয়া তোমার পল্লির লোকদিগকে আহ্বানপূর্ব্বক বলিবে যে, "রাজার নিকট হইতে ঐ বনটী জমা করিয়া লইয়াছি। সুতরাং, উহাতে আমারই স্বত্ব আছে তাহাদের দৈনিক মজুরি দিয়া কাঠ কাটাইয়া লও, তোমারও সুবিধা হইবে এবং তাহাদেরও সুবিধা হইবে।" কাঠুরিয়া কহিল, "মহাশয়! তাহাদের মজুরি দিয়া আমার কি লভ্য থাকিবে।" ব্রাহ্মণ হাসিয়া কহিলেন, নির্ব্বোধ তুমি, তোমার জমা খরচ বোধ নাই। দেখ, মনে কর, যদ্যপি লোকগুলিকে মজুরি হিসাবে চারি আনা দিতে হয়, তুমি তাহাদের দ্বারা ছয় আনা বা আট আনার কার্য্য করাইয়া লইবে। এইরূপে তোমার লভ্য হইবে।" এই বলিয়া ব্রাহ্মণ অদৃশ্য হইলেন। কাঠুরিয়া পুলকিতান্তরে অনতিবিলম্বে কিঞ্চিৎ অগ্রসর হইতে আরম্ভ করিয়া কিয়ৎকাল মধ্যে এক বিস্তীর্ণ শালবৃক্ষের উদ্যানে প্রবেশ করিল। কাঠুরিয়ার আনন্দের আর অবধি রহিল না। সে গৃহে প্রত্যাগমন পূর্ব্বক ব্রাহ্মণের উপদেশমতে প্রতিবাসিদিগকে তাহার কাছে কার্য্য করিতে অনুরোধ করিল। তাহারাও তাহাতে বিশেষ সন্তুষ্ট হইল। পরদিবস হইতে কাঠুরিয়া লোকজন দ্বারা কাষ্ঠ কাটাইয়া বিক্রয় করাইতে লাগিল এবং দিন দিন তাহার আর্থিক উন্নতিপক্ষে বিশেষ সুবিধা হইতে লাগিল। কিয়দ্দিবসের মধ্যে এই বনটী নিঃশেষিত হইয়া আসিল। কাঠুরিয়া তখন কি করিবে চিন্তা করিতে লাগিল। পরে তাহার মনে হইল যে, ব্রাহ্মণ ঠাকুর এমন কিছু বলেন নাই যে, এই পর্য্যন্ত যাইও, তিনি এগিয়ে যাইতেই বলিয়াছেন, অতএব আরও অগ্রসর হইয়া দেখি। কাঠুরিয়া তৎপর-দিন এক সেগুন বৃক্ষের বনে উপস্থিত হইল। ক্রমে সেই কাষ্ঠ

বিক্রয় করিয়া তাহার অবস্থান্তর সংঘটিত হইয়া গেল। যখন সেগুন কাষ্ঠের বন নিঃশেষিত হইবার উপক্রম হইল, সে পুনরায় মনে করিল যে, ব্রাহ্মণ ঠাকুর এগিয়ে যাইতে বলিয়াছেন। কাঠুরিয়া তদনন্তর চন্দন বৃক্ষের বন বাহির করিল এবং তথায় কার্য্য করিয়া সে একজন ধনী ব্যক্তির ন্যায় মর্য্যাদাপন্ন হইল। কাঠুরিয়া তাহাতে সন্তুষ্ট না হইয়া মনে ভাবিল যে, এগিয়ে যাইবার কথা আছে। চন্দন বৃক্ষের বন অবধি সীমা করিয়া দেন নাই। সে ক্রমে আরও অগ্রসর হইয়া লৌহ তাম্র দস্তা রৌপ্য স্বর্ণ প্রভৃতি বিবিধ খনি প্রাপ্ত হইয়া বিদেশ-স্থিত লোকজন আনাইয়া কার্য্য করাইতে লাগিল। সে আপনি ঐশ্বর্য্যান্বিত হইল, তাহার পল্লিস্থ লোকেরাও অবস্থাপন্ন হইল এবং বিদেশস্থিত লোকেরাও প্রতিপালিত হইতে লাগিল। কাঠুরিয়া তথাপি চুপ করিয়া রহিল না। তাহার মনে হইতে লাগিল যে ব্রাহ্মণ ঠাকুর এগিয়ে যাইতে বলিয়াছেন, আমি কি জন্য তাঁহার কথা অবহেলা করিব, আরও এগিয়ে দেখি, যদ্যপি কিছু প্রাপ্ত হওয়া যায়। সে তদনন্তর চূণী, পান্না, হীরক এবং মুক্তাদির আকর-স্থানের অধীশ্বর হইয়া পড়িল। কাঠুরিয়ার সুখের আরও ইয়ত্তা রহিল না। রাজ-প্রাসাদবিনিন্দিত অট্টালিকায় বাস করিতে লাগিল, হয়, হস্তী, শকট প্রভৃতির আতিশয্য হইয়া পড়িল। দিন দিন নূতন তালুক মুলুক সম্পত্তির অন্তর্গত হইতে লাগিল। স্বর্ণের পর্য্যঙ্কোপরি শয়ন, স্বর্ণের তৈজসাদিতে ভক্ষণ, হীরকাদি খচিত পরিচ্ছদ পরিধান, কাঠুরিয়া যেন মহারাজা বাহাদুরের অবস্থায় নিপতিত হইল। কাঠুরিয়া সুখের পারাবারে ভাসিতে লাগিল। ঐশ্বর্য্যের অধীশ্বর হইয়া কাঠুরিয়ার আর্থিক দুঃখ তিরোহিত হইল বটে, কিন্তু তাহার নিত্য নব নব ক্লেশের কারণ জন্মিতে লাগিল। বিষয়ীর সুখ নাই, আজ

মোকদ্দমা, কাল দাঙ্গা, পরশু বিষয়চ্যুত হওয়া। অশান্তির হিল্লোলে কাঠুরিয়া ব্যতিব্যস্ত হইয়া উঠিল। সে মনে করিল যে, যখন সে কাষ্ঠ কাটিয়া কিঞ্চিৎ অর্থ আনিয়া শাকান্ন ভোজন করিত, তখন তাহার যে প্রকার নিরুপদ্রবে নিশ্চিন্ত চিত্তে দিন যাপন হইত, বহুল ঐশ্বর্য্যের ঈশ্বর হইয়া তাহার একদিনও সেরূপ আনন্দে অতিবাহিত হইল না। কিরূপে কিঞ্চিৎ শান্তি পাইবে, তাহার সাধ্যমত চেষ্টা করিল ; কিন্তু কিছুতেই পূর্ব্বের ন্যায় অবস্থা আর আসিল না। একদিন সে নির্জ্জন স্থানে বসিয়া পূর্ব্ব ঘটনাবলী চিত্তপটে দর্শন করিতেছে, এমন সময়ে ব্রাহ্মণ ঠাকুরের সেই দৈববাণীতুল্য "এগিয়ে যাও" কথাটী স্মরণ হইয়া গেল। কাঠুরিয়া মনে মনে বিচার করিল যে, আমাকে তিনি এগিয়ে যাইতে বলিয়াছেন, তাহা না করিয়া একস্থানে স্থির হইয়া আছি কেন ? যাহা হউক, পুনরায় অগ্রসর হইতে হইবে। এই বলিয়া পরদিন প্রত্যুষে সে একাকী ভ্রমণ করিতে করিতে এক নিবিড় বনে প্রবেশ করিল। সেই বন অতিক্রম করিয়া এক গিরিমূলে উপস্থিত হইয়া, সম্মুখে পর্ব্বতে উঠিবার পথ দেখিয়া সে তদুপরি আরোহণ করিতে লাগিল। কাঠুরিয়া আর পূর্ব্বের ন্যায় কষ্ট সহ্য করিতে পারিত না। ঐশ্বর্য্যে তাহাকে হীনবল করিয়া ফেলিয়াছিল। পর্ব্বতোপরি উঠিবামাত্র সে সেই পূর্ব্বপরিচিত ব্রাহ্মণের সাক্ষাৎ পাইল। ব্রাহ্মণকে দেখিয়া কাঠুরিয়া প্রণিপাত করিয়া পদধূলি লইল। ব্রাহ্মণ কাঠুরিয়াকে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন,—"তুমি এখানে আসিলে কেন ? এপরামর্শ তোমায় কে দিল ?" কাঠুরিয়া, ব্রাহ্মণের উপদেশমতে যেরূপে অবস্থার পরিবর্ত্তন হইয়াছে, যেরূপে তাহার আর্থিক উন্নতি হইয়াছে, সমুদায়ব্যক্ত করিল। সে আরও বলিল, "প্রভু! আপনার কৃপায় আমার ঐশ্বর্য্যের অবধি নাই, কিন্তু যতই সমৃদ্ধিশালী হইয়াছি, আমার ততই অশান্তি উপস্থিত হইয়াছে। এই অশান্তির

অধিকার হইতে অব্যাহতি পাইবার মানসে কতই অনুষ্ঠান করিয়াছি, কিন্তু কিছুতেই কৃতকার্য্য হইতে পারি নাই। পরে একদিন আপনার উপদেশবাক্য "এগিয়ে যাও" কথাটা স্মরণ হয়। সেই বাক্যের পরামর্শে আমি অদ্য মহাশয়ের শ্রীচরণদর্শন পাইলাম। এক্ষণে প্রভু! দীনের প্রতি করুণা বিস্তার করিয়া বলিয়া দি'ন, আরও কি এগিয়ে যাইতে হইবে?" ব্রাহ্মণ কহিলেন, "তোমার অদৃষ্ট প্রসন্ন হইয়াছে, তজ্জন্য ঐশ্বর্য্যের মধ্যে নিপতিত হইয়াও আমায় বিস্মৃত হও নাই। সাধারণ লোকে কিঞ্চিৎ ঐশ্বর্য্য লাভ করাকেই জীবনের চরম সীমা মনে করে। ব্যবসাবিশেষে কৃতকার্য্য হইলেই তাহাকে ব্যবসার চরম জ্ঞান করে। তুমি তাহা কর নাই, এই নিমিত্ত তুমি আমার নিকটে পুনরায় আসিতে সমর্থ হইয়াছ। তুমি এখন এগিয়ে যাইবার অর্থ বুঝিতে পারিবে। ইহার চরম স্থান কোথায় তাহা সর্ব্বপ্রথমে বলিলে, এত দূর অগ্রসর হইতে পারিতে না। সে কথা তখন ধারণা হইত না। প্রত্যেক মনুষ্য-জীবন এক একটী ব্যবসার স্থান। যে এগিয়ে যাইবার সূত্র অবলম্বন করে, সেই তোমার মত জীবন-ব্যবসায় উন্নতি সাধন করিতে পারে। স্বাধীন বৃত্তি অবলম্বন না করিলে স্বাধীনতার ভাব সঞ্চারিত হয় না, এবং স্বাধীনতা ব্যতীত কেহ কখন জীবনের উৎকর্ষতা লাভ করিতে সক্ষম হয় না। স্বাধীন ব্যক্তিরাই যাহা ইচ্ছা তাহা সম্পন্ন করিয়া আপনার কল্যাণ বৃদ্ধি করিতে পারে। স্বাধীন ব্যক্তি যথা ইচ্ছা গমন করিতে পারে, স্বাধীন ব্যক্তির মানসক্ষেত্রে যাহা উদয় হয়, তাহা কার্য্যে পরিণত করিতে পারে, স্বাধীন ব্যক্তির মস্তিষ্কের অসীম শক্তি এবং সেই অসীম শক্তির অনন্ত প্রকার কার্য্য হইতে পারে। তুমি স্বাধীন বৃত্তি অবলম্বন করিয়াছিলে, সেই ফলে অদ্য তুমি অসীম অর্থের স্বামী হইয়াছ। কিন্তু যাহারা তোমার অধীনতা স্বীকার করিয়াছে, তাহাদের অবস্থার সহিত তোমার অবস্থার

কি কখন তুলনা হয় ? সংক্ষেপে পরস্পর কতদূর প্রভেদ দেখিয়া লও। তুমি,এখনও অগ্রসর হইতে চাও, তাহারা সেরূপ চাহে না। স্বাধীন বৃত্তির ফল এই। দেখ কাঠুরিয়া! জীবন-ব্যবসার প্রথমে অর্থের দ্বারা উৎকর্ষ সাধন করিতে হয় বটে, কিন্তু তাহাই চরম নহে। বাপু! অর্থের পর পরমার্থ লাভ করিতে পারিলে ব্যবসার রঙ্গমঞ্চে যবনিকা নিপতিত হইয়া যায়। জীবনের তাহাই শেষ সীমা জানিবে। তুমি অর্থের ব্যবহার জানিয়াছ, অর্থের শক্তি কতদূর বুঝিয়াছ, অর্থের দ্বারা জীবনের কি হয় না হয়, তাহা বিলক্ষণরূপে হৃদয়ঙ্গম করিয়াছ, এখন আইস, তোমায় পরমার্থ লাভের উপায় বলিয়া দি। দেখ কাঠুরিয়া! শাস্ত্রে বলে যে, বিবেক বৈরাগ্য ব্যতীত পরমার্থ লাভ হয় না। একথা সত্য বটে, কিন্তু তুমি আপনি বুঝিয়া দেখ যে, তোমার সে কার্য্য হইয়া গিয়াছে। লোকে সামান্য অর্থের মায়ার উচ্ছেদ করিতে অশক্ত হয়। তুমি এই ঐশ্বর্য্য ত্যাগ করিয়া আসিয়াছ, ইহাতে প্রকৃত বৈরাগ্যের কার্য্য হইয়াছে। আর এগিয়ে যাইতে হইবে, ইহা তোমার বিবেকের কথা। অতএব তুমি বিবেকী এবং বৈরাগী। হে বিবেকী! হে বৈরাগী! তোমাকে দেখিয়া আমি আনন্দে বিহ্বল হইয়া যাইতেছি। তুমি আর কি সাধন করিবে? আর কি কঠোর ব্রত অবলম্বন করিবে? ঐ দেখ! ভগবান্ করুণানিধান তোমার জন্য আপনি লীলারূপধারণপূর্ব্বক অবস্থিতি করিতেছেন। অপার সৌভাগ্যবলে কাঠুরিয়া তুমি আজ নরলোকের দৃষ্টান্ত স্বরূপ।" এই বলিয়া সেই ছদ্মবেশী ব্রাহ্মণ অদৃশ্য হইয়া শঙ্খচক্রগদাপদ্মধারী বিষ্ণুরূপে কাঠুরিয়ার সম্মুখে দণ্ডায়মান হইলেন। কাঠুরিয়া প্রাণ ভরিয়া জগদানন্দের আনন্দ-ঘন-মূর্ত্তি দর্শন, স্পর্শনাদি করিয়া যে কিরূপ আনন্দিত হইল, তাহা বর্ণনাতীত, বাক্যাতীত, এবং মানব প্রবৃত্তির দুর্জ্ঞেয় বস্তু।

রামকৃষ্ণদেব গল্পচ্ছলে যে উপদেশ দিয়া গিয়াছেন, তাহার তাৎপর্য্য বাহির করিয়া জীবনে প্রতিফলিত করিতে পারিলে বাস্তবিক প্রত্যে-কের কল্যাণ হয়, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। তিনি কাঠুরিয়াকে এগিয়ে লইয়া গিয়া যেরূপ পরিবর্ত্তন দেখাইয়াছেন, তাহা প্রকৃত পক্ষে উপন্যাস নহে। কার্য্যক্ষেত্রের দিকে দৃষ্টিপাত করিলে তাহার যথার্থ প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া যাইবে। রামকৃষ্ণদেব দেখাইয়াছেন যে "এগিয়ে" যাওয়াই উন্নতির একমাত্র সোপান। একথা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। যে যতদূর অগ্রসর হইতে পারে, সে ততদূর উন্নতি লাভ করে। বর্ণপরিচয় পাঠ করিলে যে উন্নতি হয়, রায়চাঁদ, প্রেম-চাঁদ পাস করিলে কি সেইরূপ উন্নতি হয়, না তাহা অপেক্ষা কোটি কোটি গুণ অধিক উন্নতি জ্ঞান করিতে হইবে?

সভ্যতার প্রারম্ভে ক্ষিত্যপতেজমরুৎব্যোম এই পঞ্চ ভূতকে বিশ্বসংসারের আদি কারণ বলিয়া জ্ঞান করা হইত। পূর্ব্ব পুরুষ-গণ যত অগ্রসর হইতে লাগিলেন, ততই উহাদের অভ্যন্তর হইতে অপূর্ব্ব সামগ্রী বাহির হইয়া মানসিক এবং সামাজিক উন্নতির দ্বারোদ্ঘাটন হইয়া গেল। এই অগ্রসর হওয়া সূত্রক্রমে আজ আমরা রূঢ়পদার্থ জানিয়াছি, আজ তাহাদের ধর্ম্মাদি অবগত হইয়া জীবনের সুখ স্বচ্ছন্দতার সহায়তা সম্পাদন করিতেছি। রূঢ়পদার্থাদির পরস্পর সংযোগসম্ভূত অভিনব পদার্থ সৃষ্ট করিয়া জনসমাজের অভ্যুদয়ের সীমা পরিসীমা নাই। তেজ হইতে অগ্রসর হইয়া বিদ্যুৎ, চুম্বক, উত্তাপ আলোক প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন পূর্ব্বোক্ত বনাদির ন্যায় নব নব পন্থা পাইয়া, তাহা হইতে কোটি কোটি প্রাণী কোটি কোটি মুদ্রালাভ করিতেছে। কিন্তু যাহারা এগিয়ে যাওয়ার সূত্র অবলম্বন করে নাই, তাহাদের পরপাদুকা বহন করা

ব্যতীত আর গত্যন্তর নাই, সুতরাং তাহাদের ক্লেশেরও অবধি নাই। এগিয়ে যাওয়া সূত্রটী আমাদের দেশের লোকেরা অদ্যাপি হৃদয়ঙ্গম করিতে পারে নাই। এই নিমিত্ত, আমাদেরই শিক্ষার নিমিত্ত, প্রভু আমার "এগিয়ে যাও" উপদেশটী অতি যত্নপূর্ব্বক প্রদান করিলেন। এগিয়ে যাইতে শিখিলে কি হয়, তাহার আভাস দিয়াছি। ইয়োরোপাদি দেশে এগিয়ে যাওয়া সূত্রানুসারে কাঠুরিয়ার ন্যায় সামাজিক উন্নতির চরমাবস্থা উপনীত হইয়াছে। এগিয়ে যাওয়া কাহাকে বলে, তথাকার কার্য্যকলাপ দৃষ্টি করিলে বুঝা যায়। পাথুরিয়া কয়লা একটী পদার্থ। আমরা এগিয়ে যাওয়া কাহাকে বলে জানি না, সুতরাং পাথুরিয়া কয়লার স্থূল ব্যবহার ব্যতীত অন্য কিছুই বুঝি নাই। ইয়োরোপে এগিয়ে যাওয়ার সূত্র চলিতেছে, তথায় কয়লা অতিক্রম পূর্ব্বক কিঞ্চিৎ অগ্রসর হইয়া তাহা হইতে গ্যাস বাহির করিয়া সর্ব্বসাধারণের তিমিররাশি নিবন্ধন নানাবিধ অসুবিধা বিদূরিত করিয়া আর্থিক উন্নতির কত দূর সুবিধা হইয়াছে, তাহা আমাদের অবিদিত নাই। কয়লা দগ্ধকালে কেবল যে বাষ্প বহির্গত হয়, তাহা নহে। নানাপ্রকার নব নব পদার্থ সৃষ্টি হইয়া থাকে। কয়লা হইতে বাষ্প বহির্গত হইলে, কিয়দংশ অত্যুত্তাপে বিকৃত হইয়া অঙ্গার পৃথক হয়, তাহাকে গ্যাস কার্ব্বন কহে। ইহার নানাপ্রকার ব্যবহার বাহির হইয়া বাণিজ্যে নব পন্থা খুলিয়া গিয়াছে। কিন্তু এই খানে চরমসীমা জ্ঞান করা হয় নাই। আরও অগ্রসর হওয়ায় কয়লার দগ্ধোৎপাদিত তরল পদার্থ হইতে অতি প্রয়োজনীয় অ্যামোনিয়া সৃষ্টি হয় এবং তাহার ভিন্ন ভিন্ন যৌগিক ভিন্ন ভিন্ন ভাবে ব্যবহৃত হইয়া ব্যবসার শ্রীবৃদ্ধি সাধন করিতেছে। তদনন্তর অগ্রসর হওয়ায় আলকাতরা প্রাপ্ত হওয়া যাইল। আল্-

কাতরা হইতে অগ্রসর হইয়া কার্ব্বলিক অ্যাসিড, অ্যানিলিন প্রভৃতি বিবিধ পদার্থ বাহির হইল এবং এই সকল পদার্থ হইতে পুনরায় নানাবিধ অভিনব পদার্থ সৃষ্টি হইয়া ব্যবসার পুষ্টিসাধন পক্ষে বিশেষ সুবিধা হইল। গোলাপ ফুলের রং, চাপা ফুলের রং প্রভৃতি অসীম প্রকার রং প্রস্তুত হইয়া উপার্জ্জনের কি সুন্দর পন্থাই বাহির হইয়াছে। কাঠুরিয়ার ন্যায় ইংরাজেরা উদ্যানের পর উদ্যান বাহির করিতেছে এবং তাহার সামগ্রী আমরা লইয়া তাহা হইতে অর্থোপার্জ্জন করিয়া উদরান্নের সংস্থান করিতেছি। অতএব এই একটী দৃষ্টান্তের দ্বারা রামকৃষ্ণদেবের এগিয়ে যাওয়ার উপদেশ আমরা বিশেষরূপে অনুধাবন করিতে পারিব। অন্য দৃষ্টান্ত বৃদ্ধি করিবার প্রয়োজন নাই।

বর্ত্তমানকাল যে সকল দেশে এই "এগিয়ে যাওয়া" সূত্রানুসারে কার্য্য চলিতেছে, তথায় কেবল আর্থিক উন্নতিতে তাহারা আর নিশ্চিন্ত থাকিতেছে না। তথায় পারমার্থিক পথে অগ্রসর হইতেও ধাবিত হইতে দেখা যাইতেছে। কাঠুরিয়া যেমন অতুল ঐশ্বর্য্যের অধিপতি হইয়া অশান্তির করগ্রস্ত হইয়াছিল, সেই অবস্থা যে কাঠুরিয়ার পক্ষে বিশেষ প্রকার বা এক জাতীয় ছিল, তাহা নহে, এই ভাব সর্ব্বত্রেই হইয়া থাকে। বাস্তবিক, এই পরমার্থের অভাব হইয়াছিল বলিয়া, প্রভুর কৃপাপ্রাপ্ত বিবেকানন্দ, প্রভুকথিত পারমার্থিকতত্ত্ব লাভের উপদেশ-গুলি প্রকাশ করিবামাত্র আমেরিকাবাসী নরনারীগণ বিমোহিত হইয়া গিয়াছে। তাহারা প্রভুর উপদেশগুলিতে অভূতপূর্ব্ব শান্তি লাভ করিয়াছে, তাহাদের অর্থামোদী প্রাণ নূতন আনন্দ পাইয়াছে। তাহাদের অন্তরে পরমার্থসঞ্চিত হইয়া তাহারা আনন্দসাগরে ভাসিতেছে। তাহারা ধন্য! তাহাদের সহস্রবার ধন্যবাদ দিয়াও হৃদয়ের আক্ষেপ মিটিতে

চাহে না। এগিয়ে যাওয়ার কি ফল, তাহার তাহারাই দৃষ্টান্তস্বরূপ। যেমন ব্যবসার উন্নতি, তেমনি পরমার্থের উন্নতি হইতে দেখা যাইতেছে। তাহারা পণ্ডিত জ্ঞানী ধীশক্তিসম্পন্ন সভ্যজাতি হইয়া এক কথায় যে রামকৃষ্ণের উপদেশে আত্মবিসর্জ্জন করিল, তাহা সামান্য আশ্চর্য্যের বিষয় নহে! কিন্তু আশ্চর্য্য হইবার কারণ নাই। কাঠুরিয়ার অবস্থার ন্যায় তাহাদের অবস্থা হইয়াছিল, তাহাদের হৃদয়ে পূর্ব্বসঞ্চিত কারণ উপস্থিত ছিল, প্রভুর উপদেশ উত্তেজক কারণস্বরূপ হইয়া কার্য্য করিয়াছে। ভূমি প্রস্তুত হইয়া থাকিলে বীজ পতিত হইলেই বৃক্ষ জন্মে। সে যাহা হউক, আপাততঃ আমেরিকাবাসীরাই ধন্য! তাহারা অন্য অপেক্ষা অগ্রে অগ্রসর হইয়া কার্য্যক্ষেত্রে জিতিয়া গেল।

কিন্তু হায়! আমাদের দুর্দ্দশার আর অবধি নাই। আমরা এগিয়ে যাওয়া কাহাকে বলে তাহা জানি না; জানিতাম, কিন্তু এক্ষণে তাহার সম্যক্ ভুল জন্মিয়াছে। আর্য্যেরা এগিয়ে যাইতে না জানিলে, তাঁহারা কখন রাজ্য-স্থাপন করিতে পারিতেন না। সুতরাং, সামাজিক উন্নতির পন্থা বিশেষরূপে অবগত ছিলেন। স্থূল জাগতিক পদার্থেই তাঁহারা সীমাবদ্ধ ছিলেন না। তাঁহারা "এগিয়ে যাওয়া" সূত্রানুসারে অগ্রসর হইয়া পরমাণু পর্য্যন্ত গমন করিয়াছিলেন। এগিয়ে না যাইলে সৌর জগতের আভ্যন্তরিক রহস্য কিরূপে তাঁহারা ভেদ করিলেন? তাঁহাদের শিল্পাদির উন্নতির পরাকাষ্ঠা দেখিয়া শিল্পপ্রিয় জাতিরা অদ্যাপি আশ্চর্য্যান্বিত হইতেছে। পারমার্থিক তত্ত্বের চরম সীমার কাণ্ডকারখানা দেখিতে এখনও পৃথিবীর কোন দেশ সক্ষম হয় নাই। যেমন পদার্থবিশেষ হইতে অগ্রসর হইলে ভিন্ন ভিন্ন নূতন পদার্থ লাভ করা যায়, পরমার্থ

পদার্থ হইতে অগ্রসর হইলেও ভিন্ন ভিন্ন নব নব ভাব প্রস্ফুটিত হয়, তাহা আর্য্যেরা উপভোগ করিয়া গিয়াছেন। অদ্য সভ্যতম দেশে পার্থিব উন্নতি সাধন করিয়া তৃপ্তি লাভের জন্য আমাদের আর্য্যদিগের পরমার্থ বিষয়ে অগ্রসর হওয়ার ফলগুলি সংগ্রহ করিতেছেন। তাই মোক্ষমূলার বেদান্ত শাস্ত্র এত যত্নপূর্ব্বক অধ্যয়ন করিয়া তাহার সার বাহির করিতে পারিয়াছেন। তাই তিনি বিবেকানন্দকে দেখিয়া প্রভুর নামোচ্চারণ পূর্ব্বক অশ্রু নিপতিত করিয়াছিলেন। তাই বলি, ধন্য শ্বেত-পুরুষেরা! তাই আমি আপনার শিরে করাঘাত করিয়া বলিতেছি যে, আমাদের উপায় কি হইবে? আমরা আর্য্যসন্তান বলিয়া অভিমান করি, আর্য্য-শোণিত আমাদের ধমনিতে প্রবাহিত হইতেছে বলিয়া গর্ব্ব করিয়া বেড়াই, কিন্তু আর্য্যের কোন লক্ষণের কোন সংস্রব রাখি নাই। আমরা সীমাবিশিষ্ট ভাবেই দিন যাপন করিতে বিশেষ পটু। বলিয়াছি যে, আমরা গোলামী পাইলে কখন স্বাধীন-বৃত্তি অবলম্বন করিব না। এগিয়ে যাইতে হইলে চিন্তা চাই, মস্তিষ্কের চালনা চাই। চিন্তা করিব কিরূপে? মস্তিষ্ক চালনা করিব কিরূপে? মস্তিষ্ক কি আমাদের আছে, যে চিন্তা করিব? মস্তিষ্ক বৃদ্ধি এবং সু-আয়তন সম্পন্ন না হইতেই তাহার অযথা অপব্যয় করিয়া অকালে বিলয় প্রাপ্ত হইবার সুরাহা করাইয়া দিই। আর্য্যদিগের দৈনিক জীবনযাত্রার প্রণালী অদ্যাপি শাস্ত্রাকারে ঘরে ঘরে শোভা পাই-তেছে, তথাপি আমরা তদনুসারে পরিচালিত হইতে চেষ্টা করি না। সভ্যতম জাতিরা অর্থাৎ যাহারা এগিয়ে যাইতে শিখিয়াছে, তাঁহারা যেরূপ শরীর গঠন ও মস্তিষ্ক সংরক্ষণ করিবার ব্যবস্থা করিয়াছেন, তাহা আমরা প্রত্যক্ষ করিতেছি, তথাপি আমরা সেদিকে দৃষ্টিপাত

করিতে চাহি না। দেশের আশা ভরসা-রূপ বালকের, বাল্যাবস্থায়, যখন বিদ্যালয়ের দ্বারে দণ্ডায়মান রহিয়াছে, সেই সময়ে, পরিণয় কার্য্য সম্পন্ন করাইয়া সন্তানের ভবিষ্যৎ উন্নতির পথে একেবারে অশনি নিপাত করিয়া দিই। তাহার অগ্রসর হওয়া দূরে থাকুক, যে অবস্থায় উপনীত হইয়াছিল, তাহা হইতে ক্রমে নিম্নগামী হইতে আরম্ভ করে। বাল্যবিবাহজনিত মস্তিষ্ক ব্যয় হেতু অকালে জরাজীর্ণ বার্দ্ধক্য আসিয়া অধিকার করে। বঙ্গের অক্ষয় কবি খ্যাতনামা মাইকেল মধুসূদন দত্ত মহাশয় যথার্থ কথাই বলিয়া গিয়াছেন, "যৌবনে অন্যায় ব্যয়ে বয়সে কাঙ্গালী।" আমরা বালকবালিকাদিগকে কাঙ্গাল কাঙ্গালিনী করিবার নিমিত্ত যত্ন সহকারে তাহার সহায়তা করিতেছি।

আমাদের এইরূপ শোচনীয় অবস্থা দেখিয়া রামকৃষ্ণদেব এই প্রদেশে জন্ম গ্রহণ পূর্ব্বক কিরূপে জীবন ব্যবসায়ে ব্যবসায়ী হইতে হয় অর্থাৎ আত্মোৎকর্ষতা লাভ করিতে হয়, তাহার ব্যবস্থা করিয়া গিয়াছেন। এক্ষণে আমাদের জীবন-ব্যবসার খাতা খুলিয়া কৈফিয়ৎ কাটিয়া দেখা হউক।

কাঠুরিয়ার গল্পে কথিত হইয়াছে যে, ব্যবসার দুইটি অবস্থা—অর্থ এবং পরমার্থ। স্বাধীন-বৃত্তি অবলম্বন পূর্ব্বক অর্থোপার্জ্জন করিতে পারিলে পরমার্থ লাভ পক্ষে সহায়তা হয়। ইহার কারণ একবার বলা হইয়াছে, কিন্তু এইটীই বুঝা কঠিন বিধায়, আমি পুনরায় বর্ণনা করিব।

আমরা স্বাধীন-বৃত্তি অবলম্বন করিতে জানি না। সুতরাং অর্থের নিমিত্ত সাময়িক শরীর মন প্রাণ সমুদয় বিক্রীত করিয়া রাখিতে হয়। পরাধীন ব্যক্তি নিজ ইচ্ছানুসারে, নিজের জ্ঞানের

ইঙ্গিতে, নিজ বুদ্ধির পরামর্শে কখন কার্য্য করিতে পারে না। বেতনদাতার যেরূপ অভিপ্রায় সেইরূপ কার্য্য করা চাই। এইরূপে অল্পদিনের মধ্যে আপনার পূর্ব্ব জ্ঞানাদি বিলুপ্ত হইয়া যাইবে। যেমন দুর্ব্বল ব্যক্তির শরীর রোগের আশ্রয়স্থান, তেমনি পরাধীন ব্যক্তির মন দুর্নীতির আশ্রয়স্থল। যেমন দুর্ব্বল ব্যক্তির শরীরে কোন রোগের বিষ প্রবেশ করিলে, উহার প্রতিবন্ধক জন্মাইবার কারণাভাবে শীঘ্র কার্য্যক্ষম হইয়া থাকে, বলীয়ানের দেহে সেরূপ পারে না। পরাধীন ব্যক্তির মনের বল নাই, দুর্নীতির প্রলোভন দেখিবামাত্র অমনি তাহাতে পরাজয় লাভ করে। কিন্তু স্বাধীন মনের নিকটে সেরূপ কার্য্য হইতে পারে না। স্বাধীন মন কখন দুর্নীতির করকবলিত হয় না। যেহেতু, তাহারা এগিয়ে যাইতে জানে অর্থাৎ সেই ঘটনার ভাবী ফল বিচার দ্বারা স্থির করিতে পারে। পরাধীন ব্যক্তিকে দুর্নীতি ইঙ্গিত করিল যে, বেতনদাতার অর্থ অপহরণ কর, সে তৎক্ষণাৎ তাহাই করিল। কিন্তু একবার ভাবী ফল বিচার করিয়া দেখিল না যে, তাহাকে শ্রীঘরে পচিয়া মরিতে হইবে। একজন বারাঙ্গনা পরাধীন ব্যক্তির নয়নগোচর হইবামাত্র তাহার ধৈর্য্যচ্যুত হইয়া গেল। সে আপনার কল্যাণ বিস্মৃত হইয়া সেই কালভুজঙ্গিণীর অধীনতা স্বীকার করিল। তাহার কপট প্রণয়ে অভিভূত হইয়া নিজ আবাসবাটীতে আনিয়া কামের অভিনয় আরম্ভ করিল। অগ্রপশ্চাৎ দৃষ্টি নাই, সে বুঝিল না যে, তাহার এই কার্য্যে দুর্নীতির চরমফল ফলিবে। তাহার নিজের অকল্যাণ, তাহার পরিজনের অকল্যাণ, একথা সে একবারও বুঝিতে পারিল না। আমাদের কোন প্রকার নীতিশিক্ষা নাই, তাহার উপর এইরূপ দুর্নীতির অভিনয় দেখিলে সন্তানবর্গেরা কি শিক্ষা

করিবে? তাহাদের নবকর্ষিত মস্তিষ্ক-ভূমিতে এইরূপ দুর্নীতি-বীজ ছড়াইয়া দিলে তথায় কুবৃক্ষ জন্মিতে আর কত বিলম্ব হইবে? এইরূপ নানাপ্রকার দুর্নীতির কার্য্যকলাপ আমরা বাটীতে বসিয়া সম্পন্ন করিতেছি। লজ্জার লেশমাত্র নাই। পিতা মাতাকে লজ্জা নাই, পাড়া-প্রতিবাসীকে লজ্জা নাই, বয়োজ্যেষ্ঠকে লজ্জা নাই, একেবারে উচ্ছন্নে গিয়াছি। এইরূপ পরাধীন ব্যক্তিরা দুর্নীতির করকবলিত হয় বলিয়া পরমার্থ-তত্ত্বের অধিকারী হইতে পারে না। আমাদের দেশে এই নিমিত্তই ধর্ম্মের দুর্দ্দশা ঘটিয়াছে, ধর্ম্মের আভ্যন্তরিক মর্ম্ম বাহির করিবার মস্তিষ্ক নাই। যাহার মনে যাহা আইসে, তাহার মুখে তাহাই বাহির হইয়া থাকে। আমাদের অবস্থা আর ভাবিয়া উঠা যায় না। কি আর্থিক, কি পারমার্থিক, সকল বিষয়েই শূন্যময় হইয়া গিয়াছে, এ কথার আর বিশেষ বিবরণ দেওয়া বোধ হয় নিষ্প্রয়োজন। কিন্তু অনেকে উপরোক্ত ভাব অস্বীকারও করিতে পারেন, এই জন্য, আমি কয়েকটীর দৃষ্টান্ত দেখাইতেছি। অর্থোপার্জ্জনের দুর্গতি দেখিতে হইলে আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ের বালকদিগকে দেখিলেই চূড়ান্ত মীমাংসা হইয়া যাইবে। দেখুন আইন। শত শত যুবা, বৎসর বৎসর পরীক্ষোত্তীর্ণ হইতেছে, কিন্তু তাহারা করে কি? অতি কষ্টে কাহারও দিনযাপন হয় এবং কাহারও হয় না। ট্রামগাড়ীতে উকিলভায়াদের গমনাগমন কি কেহ দেখেন নাই? কেন তাঁহাদের গাড়ি ঘোড়া নাই? এত বিদ্যা শিখিয়া এমন ক্লেশ কেন? অর্থোপার্জ্জন হয় না। দুঃখের কথা বলিব কি, বিদ্যার দুরাবস্থার কথা বলিব কি, দুই বৎসর হইল ভারতবর্ষীয় বিজ্ঞান মন্দিরে একজন সহকারীর প্রয়োজন হয়। এই পদের মাসিক বেতন ২৫ টাকা মাত্র। এক-

জন বি, এল, পাশকরা যুবক সেই কর্ম্মের জন্য ব্যবসা ছাড়িয়া আসিল, উকিলি ছাড়িয়া ২৫৲ টাকার বেতনে নিযুক্ত হইবার কারণ তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করায়, তিনি কাঁদিতে কাঁদিতে বলিলেন, "মহাশয়! আর কি বলিব! এলে পাশ করিবামাত্র পিতা মাতা জনৈক মুন্সেফের কন্যার সহিত বিবাহ দেন। কালসহকারে পিতা এবং শ্বশুর গতাসু হইলেন। আমারও একটী কন্যা সন্তান হইল। কোন গতিকে বি, এল, পাশ করিয়া নিম্ন আদালতে ব্যবসা আরম্ভ করিলাম, কিন্তু কিছুই উপার্জ্জন করিতে পারি না। সংসার অচল হইয়া পড়িল। সাহায্য পাইবার আর উপায় রহিল না। স্ত্রীর অলঙ্কারগুলি ক্রমে উদরসাৎ করিলাম। অবশেষে অনন্যোপায় দেখিয়া কেরাণীগিরির চেষ্টা করিলাম, তাহারও সুবিধা হইল না। পরিশেষে এই চাকুরীর কথা শুনিয়া সুপারিসাদি দ্বারা প্রাপ্ত হইয়াছি। পরিবারকে কোথায় রাখিয়া আসিব, সঙ্গে আনিয়াছি! কিন্তু একটী বাটীভাড়া করিবার শক্তি কোথায়? মুসলমান পাড়ায় একটী কুঠারি ভাড়া লইয়া তথায় বাস করিতেছি।" ভদ্রলোকের পক্ষে ইহা অপেক্ষা দুর্দ্দশা আর কি হইবে? চিকিৎসা। ইহাও যারপরনাই অনিশ্চিত ব্যবসা হইয়া দাঁড়াইয়াছে। নিখরচায় ডাক্তারের অভাব নাই। দ্বারে দ্বারে দাতব্য চিকিৎসা বলিয়া বিজ্ঞাপন দেওয়া আছে। কে কত চিকিৎসিত হইবে! কিন্তু দাতব্য চিকিৎসা করা চিকিৎসা ব্যবসায়ের অভিপ্রায় নহে। চিকিৎসকের বাড়ীতে যাইলেও কোথাও অর্দ্ধেক এবং কোথাও পূর্ণ দর্শনী দিতে হয়। দাতব্য চিকিৎসা. করিবার উদ্দেশ্য অন্য প্রকার বলিয়া বুঝা যায়। ব্যবসা। আমি পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, আমরা যারপরনাই অব্যবসায়ী। জমা খরচ বোধ না থাকাতে অচিরাৎ মূলধন নিঃশেষিত করিয়া নিশ্চিন্ত হইয়া

বসি। আমাদের জনৈক বন্ধু কর্ম্ম কার্য্যের কোন সুবিধা করিতে না পারিয়া• ব্যবসা করিতে কৃতসঙ্কল্প হইল। টাকা কোথায় পাইবে! বাটীর পাট্টা বন্ধক দিয়া পটলডাঙ্গায় একখানি মনিহারির দোকান খুলিল। তাহার একজন শূন্যবকৃরাদারও জুটিল। দুইজনে পরামর্শ করিয়া জুতার কারবার আরম্ভ করিল। আপনারা কিছুই বুঝে না, সুতরাং, একজন সর্দ্দার মুচি রাখিতে বাধ্য হইল। তাহাদের যাহার যাহা প্রয়োজন হয়, তহবিল হইতে খরচ করিতে লাগিল, ক্রমে মূলধন ফুরাইল। এক পয়সা দেনা পরিশোধ করিতে পারিল না। পরিশেষে দোকান উঠিয়া গেল এবং বাটীখানি বিক্রয় হইল। এইরূপ ব্যবসাদারই অধিক।

এক্ষণে আমরা কি করিব? যে অবস্থায় বর্ত্তমান সমাজ চলিতেছে, সেই অবস্থাই চলিবে,কিম্বা আত্মোন্নতি করিবার জন্য চেষ্টা করা হইবে? আমরা জমা খরচ বুঝিতে চেষ্টা করিব কি না? আমরা এগিয়ে যাইতে প্রয়াস পাইব কি না? গোলামী শৃঙ্খলে হস্ত পদ বাঁধিয়া সংসারকূপে নিপতিত হইয়া পচিয়া মরিব, তথাপি স্বাধীন হইয়া সুবিমল মুক্ত বায়ুর সংস্পর্শে শরীর স্নিগ্ধ করিব না। আর্য্যবাক্য শুনিব না, চক্ষের উপরে দৃষ্টান্ত হৃদয়ঙ্গম করিব না, তবে আমাদের গতি কি হইবে? দেখিতেছ না, অগতির গতি রামকৃষ্ণ আপনি শিক্ষা দিতে আসিলেন, তাঁহার বাক্যও অদ্যাপি কাহারও বুদ্ধিগোচর হইল না? হায় হায় আমরা যাইব কোথায়? একবার নিজ নিজ অবস্থা ভাবিবারও কি শক্তি নাই? যদ্যপি না থাকে, ভগবানের কাছে প্রার্থনা করুন, যেন তিনি শক্তি প্রদান করেন। আপনার অবস্থা ভাবিলে, আপনার জীবন খাতাখানা খুলিয়া কৈফিয়ৎ কাটিতে যাইলে, এক অপূর্ব্ব প্রকার জমা খরচ দেখিতে পাই। অর্থসম্বন্ধে জমাস্থলে শূন্য, খরচের স্থানে অতি খরচ বিধায় দেনা,

পরমার্থ সম্বন্ধে জমা স্থানেও শূন্য, খরচের স্থানেও শূন্য। সুতরাং শরীর এবং মনের নিগ্রহ বিধিমতে ঘটিবে, তাহা নিবারণ করিবার উপায় নাই। পাওনাদারেরা প্রাতঃকালে যখন খাতা বগলে করিয়া দ্বারে উপস্থিত হইয়া আরক্তিম নয়নের ভঙ্গি দেখায়, যখন নূতন নূতন ঢংএর নূতন নূতন বোলচাল দিতে আরম্ভ করে, তখন প্রাণের অবস্থা কি হয়, সে বিষয়ে আমরা বিলক্ষণ ভুক্তভোগী আছি। শমনের উপর শমন যখন আসিল, তখন দশদিক শূন্যময় দেখিতে হইল। ক্রমে দেনার জ্বালায় যথাসর্ব্বস্ব বিক্রয় করিয়া দিয়াও গত্যন্তর থাকে না।

পরমার্থ জমা নাই, সেই ভীষণ দিনাগত হইবে, যদ্যপি মনে কখন উদয় হয়, তখন কি কাহারও কূল কিনারা পাইবার প্রত্যাশা থাকে? আত্মার সদ্‌গতি হইবার কোন কার্য্য করা হয় নাই, জীবনান্তে উন্নতি লাভ করিব কিরূপে? প্রভু বলিতেন, "যাহার এখানে আছে, তাহার সেখানেও আছে, যাহার এখানে নাই তাহার সেখানেও নাই।" এখানে যাহাকে ঋণগ্রস্ত হইতে হইল, পরমার্থ উপার্জ্জন করিতে যে পারিল না, পরকালে তাহার উপায় কি? যে অর্থের সংস্থান করিতে পারে, সেই দেশ বিদেশে বিনা ক্লেশে বিনা চিন্তায় দিন যাপন করিতে পারে। অর্থবিহীন লোকের স্বদেশ যেমন কষ্টকর, বিদেশে তাহার বৃদ্ধি ব্যতীত হ্রাস হইবার সম্ভাবনা নাই। অর্থ ইহকালেই বিশেষ সহায়তা করে, কিন্তু পরমার্থ ইহ এবং পরকালের সম্বল। পরমার্থতত্ত্ব হৃদয়ে সমুপস্থিত থাকিলে অর্থকেও পরমার্থ পক্ষে ব্যবহার করা যায়। নতুবা উহা অনর্থের মূলস্বরূপ হইয়া অনেক সময়ে সর্ব্বনাশ করিয়া থাকে।

পৃথিবী কর্ম্মস্থল। যে যেরূপ কার্য্য করিবে, সে সেইরূপ ফল লাভ করিবে। যে মাতাল হয়, সে রাজদ্বারে দণ্ড পায়, পাহারাওলার ঝোলায় গমনাগমন করে, অথবা অপমানিত হয়, গৃহপরিজন প্রতিবাসী সকলে

উৎপীড়িত হয়, আপন দেহ ক্ষয় পাইতে আরম্ভ হয়, ক্রমে উৎকট পীড়াক্রান্ত হইয়া যাবজ্জীবন ক্লেশ পাইয়া থাকে। যে চোর ডাকাত হয়, সে বেত খায়, জেল খাটে, দ্বীপান্তরে বাস করে এবং সাধারণের ঘৃণার্হ হইয়া থাকে। যে কামুক লম্পট হয়, সে অপ্রেমিক, নরাকারে পশুবৎ কার্য্য করে। সে খুনী হয়, সংসারক্ষেত্রে তাহার ন্যায় ভীষণ শত্রু আর দ্বিতীয় ব্যক্তি দেখা যায় না। মানবসমাজে ইহাদের এই অবস্থা, পরকালে তাহাদের নিমিত্ত শমনরাজকে নূতন নরকের সৃষ্টি করিতে হয়। আত্মার অধোগতি হওয়া যতদূর সম্ভব, তাহা হইয়া থাকে। সাধু যাঁহারা, তাহাদের হৃদয়ে সযত্নে পরমার্থতত্ত্ব সংগৃহীত হইয়াছে, তাঁহারা মাতাল নহেন, চোর ডাকাইত নহেন, কামুক লম্পট নহেন, সুতরাং, সমাজে কুলনারী পর্য্যন্ত কেহ তাঁহাদের সমক্ষে দণ্ডায়মান বা উপবেশন করিতে আশঙ্কিত হন না। কপট সাধুদিগের কথা স্বতন্ত্র। সাধুদিগের (এ স্থানে সাধু শব্দের দ্বারা আমি কেবল সন্ন্যাসী কিম্বা পরমহংস বুঝাইতেছি না। গৃহীদিগকেও লক্ষ করিতেছি) অর্থে পরমার্থের সহায়তা হয়। তাঁহারা কাহার ভদ্রাসন বাটী জোর পূর্ব্বক কাড়িয়া লন না, দুর্ব্বলকে পথের ভিখারী করেন না। তাঁহারা অনাথ অনাথিনীর মাতা পিতা, প্রতিবাসীর আশ্রয়দাতা ও বিপদে বন্ধুস্বরূপ। তাঁহারা আত্মার উৎকর্ষ সাধনের নিমিত্ত পূজা, যাগ, যজ্ঞ, দান, অতিথিসৎকার প্রভৃতি কল্যাণকর কার্য্যে নিয়ত ব্যাপৃত থাকেন। এরূপ ব্যক্তির শান্তির বিচ্ছেদ কোথায়? তিনি এখানেও যেমন সুখে থাকেন, পরকালেও তেমনি স্বচ্ছন্দতা লাভ করেন। তাঁহাকে নরকে যাইতে হয় না। তাঁহার স্বর্গাদি উচ্চ লোকেই বাসস্থান হয়। অথবা কখন শিবলোক এবং বিষ্ণুলোকাদিতে প্রবেশাধিকারও হইয়া থাকে। সুতরাং যাহাদের এখানে আছে, তাহাদের সেখানেও আছে।

আমাদের এখানে কিছুই নাই, যাহা আছে তাহার ফল অতি ভয়াবহ। সুতরাং, পরকালের অবস্থা অতীব শোচনীয়। অর্থ নাই, পরমার্থ কাহাকে বলে জানি না,আমাদের তবে কি হইবে? আমরা বেশ বেশ্যাদের মত সাজিয়া গুজিয়া দেঁতোর হাসি হাসিয়া দিন কাটাইয়া যাইতেছি। আমাদের জীবন খাতাখানা একবার খুলিয়া দেখিতেছি না যে, ব্যবসার অবস্থা কি দাঁড়াইয়াছে। কত দিন আর ব্যবসা চলিবে। তাই সবিনয়ে প্রভুর আদেশে বলিতেছি, একবার আপনাপন জীবন-খাতাখানা খুলিয়া দেখুন। জমার স্থানে নাপিতের জমার টাকা জমার ন্যায় পাপরাশি জমা হইয়া গিয়াছে। যাহা কিছু করিতেছি, সমুদয় জমায় যাইতেছে। খরচ করিবার কিছুই নাই। থাকিবে কি? ধর্ম্মোপার্জ্জন করি নাই। যদ্যপি ধর্ম্মোপার্জ্জন করিতাম, তাহা হইলে তাহাই জমা হইত এবং তাহা হইতে খরচ করিবার শক্তি লাভ হইত। পাপ জমায় কল্যাণ হইবে কিরূপে? আমাদের যে অবস্থা ঘটিয়াছে, তাহাতে শমনরাজও চিন্তিত হইয়াছেন। তাঁহার আর স্থান নাই, আর তাঁহার বুদ্ধিতে কি নরক আমাদের জন্য ব্যবস্থা করিবেন, তাহা ভাবিয়া স্থির করিতে পারিতেছেন না। এই অবস্থা দেখিয়া বিশ্বপালক আর নিরস্ত থাকিতে পারিলেন না। তিনি আমাদের দেশে অবতীর্ণ হইয়া যেরূপে কল্যাণ হইবে, তাহার ব্যবস্থা করিয়া যাইলেন। আমাদের মত যাহারা এ যাত্রায় একেবারে পূর্ণমাত্রায় দেনদার হইয়াছে, অর্থাৎ যাহাদের পুণ্য কর্ম্ম কিছু নাই, ধর্ম্মোপার্জ্জন হয় নাই, নাপিতের মত কেবল পাপ জমা করা হইয়াছে, তাহাদের নিমিত্ত তিনি আপনি বাহু প্রসারণ করিয়া বলিয়া গিয়াছেন, "আয় আয় যাহারা কূল কিনারা দেখিতে পাইতেছিস্ না, যাহাদের ধর্ম্মকর্ম্ম বোধ নাই, যাহাদের এমন কি হরি, কালী, দুর্গা বলিবার স্পৃহা

নাই, যাহারা সমাজতাড়িত, লোকঘৃণিত, মাতাল, বারাঙ্গনাসক্ত, চোর ডাকাইত, নাস্তিক, ভ্রষ্টাচারী আয় আয় আমায় বকলমা দিয়া যা। আমি সাধন করিয়া ধর্ম্মজমা করিয়া রাখিয়াছি, তোদের পাপ-জমা আমায় দিয়ে তাহার বিনিময়ে পরমার্থ লইয়া যা।" অনাথনাথ পতিতপাবনের এই কথা, এই অমৃতবাণী শ্রবণ করিয়া যাহারা নাপিতের রাজার চরণে পতিত হওয়ার ন্যায় রামকৃষ্ণের চরণে আত্ম-সমর্পণ করিয়াছেন, তাঁহারই আজ ধন্য হইয়াছেন। তাঁহাদের হৃদয়ের অ:স্থা যদ্যপি খুলিয়া দেখাইবার হইত, তাহা হইলে সর্ব্বসাধারণে দেখিতে পাইতেন। এই বকলমা অর্থে ধর্ম্মজগতে ইন্সলভেণ্ট বিশেষ। যেমন ব্যবসায় দেনদার হইলে, রাজা কর্ত্তৃক সংরক্ষিত হওয়াকে ইন্সলভেণ্ট বলে। ইন্সল্‌ভেণ্ট লইতে হইলে, তাহার যথাসর্ব্বস্ব দিতে হয়। তেমনি বকলমায় আপনার সর্ব্বস্ব প্রদান করিতে হয়। ইন্সল্‌ভেণ্ট লইলে বিষয় লুকাইয়া রাখিলে চলে না, তেমনি ভাবের ঘরে চুরি রাখিয়া বকলমা হয় না। যেমন, ইন্সল্‌ভেণ্ট লইয়া পরিশেষে ব্যবসার জমা খরচের দিকে দৃষ্টি না রাখিয়া যদ্যপি কেহ ব্যবসা করে, তাহা হইলে পুনরায় ঋণগ্রস্ত হইতে হয়, তেমনি বকলমা দিয়া নিশ্চিন্ত হইয়া জমা খরচ ভুলিয়া যথেচ্ছাচারী হইলে পরিতাপ পাইতে হয়। অতএব, জমা খরচ শিক্ষা করা আমাদের সকল অবস্থায় বিশেষ প্রয়োজন। প্রভু বলিয়া গিয়াছেন, যেমন ব্যবসায়ীরা প্রত্যহ রজনীকালে জমা খরচ মিলাইয়া কৈফিয়ৎ কাটিয়া ব্যবসার উন্নতি অবনতি অবগত হয়, তেমনি সকলে শয়নকালে দিবসের কার্য্যকলাপগুলি স্মরণ করিয়া বুঝিয়া দেখিবে যে, কতগুলি মিথ্যা কথা কহিয়াছে, কতগুলি প্রতারণা বাক্য বলিয়াছে, কত ব্যক্তিকে ঠকাইয়াছে, পরদ্রব্যে পরস্ত্রীতে দৃষ্টিপাত করিয়াছে কি না, অথবা কি পরোপকার করিয়াছে, ভগবানের দিকে কতবার মন

ধাবিত হইয়াছিল। এইরূপ জমা খরচ কাটিতে আরম্ভ করিলে, অতি-সত্বর তাহারা সাধুতা লাভ করিবে।

তাই পুনরায় বলিতেছি যে, আমাদের মত ঋণগ্রস্ত যাঁহারা আছেন, যাঁহারা পাওনাদারের উৎপীড়নে উত্যক্ত হইয়াছেন, যাঁহাদের ব্যবস্থা স্থগিত হইয়াছে, তাঁহারা রামকৃষ্ণের পাদপদ্মে আত্ম-সমর্পণ করুন। তাঁহারা কি একথা বুঝিবেন না যে, দিন অতিবাহিত হইয়া গেল, আয়ুসূর্য্য অস্তমিত হইবার উপক্রম করিতেছে, তাঁহাদের কি দশা হইবে? আর ভাবিবার সময় নাই। রামকৃষ্ণের করুণা, তাঁহার স্নেহের প্রচুর দৃষ্টান্ত দর্শন করিয়া তথাপি আমরা তাঁহাকে বিশ্বাস করিতে পারিতেছি না! তথাপি অদ্যাপি তাঁহাকে চিনিতে পারিলাম না! ইহা অপেক্ষা বিড়ম্বনা আর কি আছে! আমরা কি শুনিতেছি না যে, যখন বিবেকানন্দ মহাত্মা মোক্ষমূলারকে রাম-কৃষ্ণের কথা বলে, মোক্ষমূলার তখনি সপ্রেমে বলিয়াছিলেন যে, "আমি তাঁহাকে বহুদিন পূর্ব্বে চিনিয়াছি। যখন কেশবচন্দ্র সেনের সহসা পরিবর্ত্তনের কথা আমার কর্ণগোচর হয়, আমি তখনি আশ্চর্য্য হইয়া উহার কারণ অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হই। স্বর্গীয় বল পশ্চাতে না থাকিলে ধর্ম্মের এরূপ পরিবর্ত্তন হয় না, ইহা জানিতাম। অনুসন্ধান করিয়া রামকৃষ্ণ পরমহংসদেবকে সেই বলের আকর জানিলাম। তদবধি তাঁহার বৃত্তান্ত শুনিতে বড়ই আনন্দিত হই।" বিবেকানন্দ তদনন্তর বলিয়াছিল যে, "অদ্য হাজার হাজার লোকে তাঁহাকে পূজা করিতেছে।" বৃদ্ধ প্রেমিক অমনি উৎসাহিত হইয়া বলিয়া উঠিলেন, "তাঁহাকে পূজা করিবে না ত আর কাহাকে পূজা করিবে?" মোক্ষমূলার! স্বার্থক জীবন তোমার! তোমার চরণে আমার কোটি কোটি প্রণাম। আমরা তাঁহার সহবাস করিয়া

অদ্যাপি তাঁহাকে চিনিতে পারিলাম না, কিন্তু তুমি সহস্র সহস্র ক্রোশ দূরে বাস করিয়া তাঁহাকে অনেক দিন পূর্ব্বে চিনিয়া বসিয়া আছ। বুঝিয়াছি, সেই জন্য তুমি বেদান্তের মর্ম্ম চূড়ান্ত করিয়া ফেলিয়াছ। হায়! তুমি কি ম্লেচ্ছ? না আর্য্যসন্তান বিশেষ! যখন বিবেকানন্দকে রেলওয়ে ষ্টেসনে পৌঁছিয়া দিবার জন্য অধ্যাপকচূড়ামণি আগমন করেন, বিবেকানন্দ তাহাতে কিঞ্চিৎ সঙ্কুচিত হওয়ায় তিনি বলিয়াছিলেন যে, "রামকৃষ্ণদেবের ভক্তের সহিত দেখা হওয়া প্রতিদিনের ঘটনা নহে।" অ্যামেরিকায়ও শুনা যাইতেছে যে, তথাকার সহস্র সহস্র নরনারী রামকৃষ্ণে মনার্পণ করিয়াছেন। কিন্তু আমাদের দুরদৃষ্ট যে কবে খণ্ডন হইবে, তাহা জানি না। অভিমানেই আমাদের সর্ব্বস্ব গেল, আত্মগরিমায় ইহপরকাল গেল, ধর্ম্মের ধ্বজী হইয়া ধর্ম্ম সমালোক হইয়া আপন পায়ে কুঠারাঘাত করিলাম। সম্মুখের রহস্য বুঝিতে দিল না। ম্লেচ্ছ বলিয়া যাহাদের আমাদের ধর্ম্মধ্বজীরা ধর্ম্মরাজ্যের অনধিকারী বলিয়া ব্যবস্থা করেন, তাহারা যাহা বুঝিয়া লইল, আমরা তাহাতে বঞ্চিত রহিলাম। পরমধনে বঞ্চিত হইয়া ধূর্ত্ততায় আস্ফালন পূর্ব্বক অন্যের কর্ণে সেই মন্ত্র সঞ্চারিত করিতেছি। আমিও মলাম, অন্যকেও মারিলাম। শ্বেত পুরুষ অপেক্ষা ধূর্ত্তজাতি অতি বিরল। আমাদের অপেক্ষা ধূর্ত্ত, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই; যেহেতু আমরা প্রজা, তাঁহারা রাজা। তাঁহারা আমাদের দেশীয় ভাবে বিমোহিত হইলেন এবং আমরা তাহা অনুধাবন করিতে পারিলাম না। আমাদেরই দুর্ভাগ্য বলিতে হইবে। কিন্তু আমি এখনও হতাশ হই নাই। প্রভু এই প্রদেশে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন. এই প্রদেশবাসীদিগের অবশ্যই কল্যাণ করিবেন। আমার একটী

ঘটনা স্মরণ হইতেছে। যখন আমরা দক্ষিণেশ্বরে গমনাগমন করিতাম, তথাকার বিজ্ঞপ্রবরেরা আমাদিগকে সহানুভূতি করিয়া বলিতেন, "তোমরা কলিকাতার যুবক, বিশেষ কিছু বুঝিতে পার নাই, আমরা ইহাকে (ঠাকুরকে) বালককাল হইতে দেখিতেছি। তোমরা যাহা মনে কর, তাহা একেবারেই নহে।" তাঁহারা আমাদিগকে কতই উপদেশ দিতে উদ্যোগী হইতেন। এক্ষণে তাঁহারা শিরে করাঘাত করিয়া বলেন যে, কি কুকর্ম্ম করিয়াছি। মনে করিলে কৃতার্থ হইতে পারিতাম, কিন্তু আত্মাভিমান এমন নয়নাবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছিল যে, কিছুতেই তাঁহার স্বরূপতত্ত্বের দিকে দৃষ্টিপাত করিতে পারি নাই। আমার নৈরাশ না হইবার আর একটী কারণ আছে, আমরা অনুকরণ করিবার জাতি। সাহেবদের দেখিয়া আমাদের জ্ঞান হইতে পারে। যদিও এরূপে জ্ঞান সঞ্চার হওয়া আর্য্যসন্তানের পক্ষে গৌরবের কথা নহে, কিন্তু কি করিব অবস্থায় সকলই সম্ভবে। ইংরাজিতে ধর্ম্মোপদেশ ইংরাজের মুখে শুনিতে আমরা বড় ভালবাসি, বড় মিষ্টি লাগে, সেই জন্য অলকট, বুথ এবং এনি বেসাণ্ট প্রভৃতি সাহেব বিবি এ প্রদেশে এত প্রতিষ্ঠা লাভ করিলেন। সহস্র সহস্র লোক তাঁহাদের মুখবিনিঃসৃত আর্য্যকথা আর্য্যধর্ম্মবৃত্তান্ত শুনিবার জন্য অর্থ ব্যয় করিয়া লালায়িত। সে যাহা হউক, মনের আক্ষেপে অনেক কথাই বলিয়া ফেলিলাম। বাস্তবিক রামকৃষ্ণদেব ঠক্ কিম্বা প্রতারক ছিলেন না, একথা কি কেহ জানেন না? তিনি যে সকল পাষণ্ড দলন করিয়া গিয়াছেন, তাহাদের কার্য্যকলাপ দেখিয়া কি কেহ বিমোহিত হইতেছেন না? বিবেকানন্দ সিদ্ধকুলে জন্মগ্রহণ করে নাই, সাধন ভজন দ্বারা আত্মোন্নতি করে নাই, সে এক জন সাধারণ ব্যক্তির অপেক্ষা কোন

অংশে শ্রেষ্ঠ ছিল না। প্রভুর কৃপায়, কেবল তাঁহারই চরণপ্রসাদে অদ্য, পরমার্থতত্বের উপদেষ্টার আসন প্রাপ্ত হইয়াছে। আমাদের গিরিশবাবু যদিও প্রকাশ্য আচার্য্যের কোন কার্য্য করেন নাই, কিন্তু তিনি প্রভুর কৃপায় নাটকাকারে যে সকল পরমার্থতত্ব প্রকাশ করিতেছেন, তাহার মূল্য কত দূর, যিনি সম্ভোগ করিয়াছেন, তিনিই প্রাণে প্রাণে বুঝিয়াছেন। বুদ্ধদেব চরিত, বিল্বমঙ্গল, রূপ-সনাতন প্রভৃতি অন্যান্য অভিনব গ্রন্থাদি তাহার পরিচয়স্থল। প্রভুর কৃপা ব্যতীত তিনি পরমার্থতত্বের নিগূঢ় বৃত্তান্ত কোথায় পাইতেন? এ সকল কি প্রভুর কার্য্য নহে! আর কত বলিব।

তাই সবিনয়ে করজোড়ে বলিতেছি যে, রামকৃষ্ণের উপদেশ গুলি যাহাতে আমরা জীবনে প্রতিফলিত করিতে পারি, তাহার চেষ্টা পাওয়া উচিত। তিনি যে জমাখরচের গল্পচ্ছলে আমাদের আত্মোন্নতি সম্বন্ধে উপদেশ দিয়া গিয়াছেন, তাহা অবলম্বন করিলে অবশ্যই আমাদের কল্যাণ হইবে। আমরা বাস্তবিক, কি সামাজিক কি নৈতিক কি আধ্যাত্মিক, সকল বিষয়ে অজ্ঞ হইয়া রহিয়াছি। আমাদের এ অবস্থার পরিবর্ত্তন হওয়া অতীব আবশ্যক। আর কতদিন এ অবস্থায় চলিবে? আমরা সকলই হারাইয়াছি। মানসিক বল গিয়াছে, শারীরিক বল গিয়াছে, ধর্ম্মের বল গিয়াছে। এই জন্যই যেদিকে যেরূপ বায়ু বহন করে, আমরা সেই দিকে উড়িয়া যাই।

আমরা যদি এগিয়ে যাইতে চেষ্টা করি, তাহা হইলে অগ্রসর হইতে কতদিন লাগিবে? আমরাইত একদিন এই হিন্দুস্থানে এক-ছত্রী ছিলাম, আমরাইত একদিন পরমার্থতত্বের চরমসীমায় উপনীত হইয়াছিলাম, আমরা এক্ষণে চেষ্টা করিলে না পারিব কেন? প্রভুর

চরণে প্রার্থনা করি, যেন তাঁহার এই উপদেশটী আমাদের প্রত্যেকের হৃদয়ে মূলমন্ত্র রূপে অঙ্কিত হইয়া যায়।

অদ্য প্রভুর নিকটে উদ্দেশে প্রার্থনা করিতে হইল, অদ্য তাঁহার প্রতিমূর্ত্তির সম্বন্ধে মনের আকাঙ্ক্ষা ব্যক্ত করিতে হইল। যাঁহার চরণযুগল ধারণ করিয়া কত আব্দার করিয়াছি, যাঁহার সমক্ষে কৃতাঞ্জলি হইয়া কত অনাথ অনাথিনীর কল্যানের নিমিত্ত প্রার্থনা করিয়াছি, অদ্য তাঁহার ছায়া লইয়া কার্য্য করিতে হইল। আমরা হতভাগা, আজ একাদশ বৎসর হইল ছায়া লইয়া দিনযাপন করিতেছি। প্রভু বলিতেন যে, "শোলার আতা দেখিলে সত্যের আতা স্মরণ হয়।" তাঁহার ছায়া দেখিলে এখনও সেই পাতকী-তরাণ চরণযুগল মনে হয়, এখনও তাঁহার সেই প্রসারিত অভয় বাহুযুগল মনে হয়, এখনও তাঁহার প্রেমপূর্ণ হাসিমুখ মনে হয়, তাই প্রাণটা সুশীতল হয়। কিন্তু যখনই মনে হয় যে, ছায়া অবলম্বন পূর্ব্বক স্বপ্ন দেখিতেছি, তখনই বিষাদ-সাগরে নিমগ্ন হইয়া যাই। আবার পরক্ষণেই, প্রভুর শ্রীমুখের আজ্ঞা—"যে কেহ ঈশ্বর লাভের নিমিত্ত, জ্ঞান লাভের নিমিত্ত আমার নিকট আসিবে, তাহারই মনোবাসনা পূর্ণ হইবে"—মনে হইবামাত্র ভগ্নহৃদয় উৎসাহিত হইয়া উঠে। প্রভু! আপনার এই আজ্ঞানুসারে আমি আপনার শ্রীচরণে এই ভিক্ষা যাচ্ঞা করিতেছি, কেহ যেন আপনার করুণাকণা লাভ করিতে বঞ্চিত না হয়। প্রভু অনাথ অনাথিনীর জন্য আসিয়াছিলেন, যদ্যপি তাহারা কৃপা না পায়, আপনার অনাথনাথ নামে কলঙ্ক হইবে। আপনার দোহাই, আপনার সেবকদিগের দোহাই, রামকৃষ্ণ নামের মধুরতা, রামকৃষ্ণ নামের শান্তিপ্রদ শক্তি, রামকৃষ্ণ নামের মহিমা সকলে প্রাণে প্রাণে উপলব্ধি করিতে সক্ষম হউক। রামকৃষ্ণ নামের

তুলনা নাই। রামকৃষ্ণ নামে রামকৃষ্ণ লাভ হয়, রামকৃষ্ণ নামে আপনাপন ইষ্ট লাভ করা যায়, রামকৃষ্ণ নামে নিজ নিজ ভাব প্রস্ফুটিত হয়, রামকৃষ্ণ নামে জ্ঞান লাভ হয়, রামকৃষ্ণ নামে বিজ্ঞান লাভ হয়, রামকৃষ্ণ নামে ভক্তি লাভ হয়, রামকৃষ্ণ নামে প্রেম লাভ হয়। রামকৃষ্ণ নামে সকলের অধিকার। গৃহীর যেমন অধিকার, সন্ন্যাসীর তেমনি অধিকার। হিন্দুর যেমন অধিকার, মুসলমান, খৃষ্টান, শিক, পার্শি ম্লেচ্ছের তেমনি অধিকার। রামকৃষ্ণ নাম লইলে জাত্যন্তর হইতে হয় না, ধর্ম্মান্তর হইতে হয় না। তিনি সকলকে নিজ নিজ গন্তব্য স্থানে যাইবার সহায়তা করিয়া থাকেন। কিন্তু পুনরায় বলিতেছি, যাহার কোন উপায় নাই, যাহার জীবন-ব্যবসায় সম্পূর্ণ ক্ষতি হইয়াছে, তাহার আর রাজরাজেশ্বর রামকৃষ্ণের চরণে ইন্সলভেণ্ট লওয়া ব্যতীত দ্বিতীয় পন্থা নাই। সে যেই হউক, হিন্দু মুসলমান ম্লেচ্ছ বলিয়া ইতর বিশেষ হইবে না, সকলকেই সমান ভাবে ক্রোড়ে লইয়া থাকেন। তাই বলিতেছি, আর আমরা কত দিন দুঃখানলে পুড়িয়া মরিব, আর কত দিন স্বার্থপরতার পরামর্শে বিঘূর্ণিত হইব, আর কত দিন গোলামী শৃঙ্খলে আবদ্ধ থাকিয়া বৃশ্চিকাদি দংশনে দগ্ধীভূত হইব? আইস, সকলে রামকৃষ্ণের এগিয়ে যাওয়া মূলমন্ত্রটী ঘরে ঘরে সাধনা করিতে যত্নবান হই, আইস সকলে জমা খরচ বুঝিয়া জীবন খাতার দৈনিক কৈফিয়ৎ কাটিতে শিক্ষা করি। আলস্যে, অজ্ঞানতা প্রযুক্ত অনেক সময় বৃথা ক্ষেপন করিয়াছি। আপনাপন বুদ্ধিতে জীবন গঠন করিতে যাইয়া যে ফল পাইয়াছি,তাহা আমরা জানি। রামকৃষ্ণের উপদেশ মতে দিনকতক চলিয়া দেখা হউক, কি ফল প্রাপ্ত হওয়া যায়। এখনও সতর্ক করিয়া দিতেছি, এমন সুবিধা ছাড়িয়া দিলে ভবিষ্যতে নিশ্চয় অনুশোচনার অবধি থাকিবে না।

গীত।

ভব পারাবারে।
এক কাণ্ডারী হরি অকূল পাথারে॥
দীন জন চরণ চাহে মুখ চাহি সকাতরে,
বিতর করুণা অনাথনাথ দীন পরে।
মোহিত চিত অবিরত মগন আঁধারে,
মোহনমূরতি বিমল ভাতি বিকাশ অন্তরে।
গোকুলবিহারী নররূপধারী তাপিত তারিবারে।

(২)

দিন সমাগম ধীরে।
গাবে নাম সবে ঘরে ঘরে॥
মোহ তিমির বিনাশি, কৃপা অরুণ বিকাশি,
অভেদ জ্ঞান সঞ্চারে;—
মোহিত ভকত নেহারে॥
দীন ভারত দুখবারী, রামকৃষ্ণ নাম দুখহারী,
গাও সাধে বিলাও সবারে;—
দূর পারাবার পারে॥

বক্তা শ্রীযুক্ত রামচন্দ্র দত্ত মহাশয় বক্তৃতার পূর্ব্ব দিন পর্য্যন্ত বক্তৃতা দিবার জন্য প্রয়াস পাইয়াছিলেন, কিন্তু নিতান্ত অসুস্থতা নিবন্ধন কৃতকার্য্য হন নাই। সেই জন্য তাঁহার আজ্ঞানুসারে রামকৃষ্ণের চরণাশ্রিত অনৈক সেবক দ্বারা এই বক্তৃতাটী প্রদত্ত হয়।

(৩)

কে বলে পায় না চরণ চায়না বলে।
রাখ পায়, চায় বা না চায়, আপন কৃপায় অবহেলে ॥
রাখতে রাঙা পায়, তোমারিত দায়,
জীব তরাতে আপনি ধরায়,—
বোঝ প্রাণের জ্বালা প্রাণে প্রাণে
দীনের দুখে প্রাণ গলে ॥

(৪)

সাদায় কালি সাধ ক'রে।
ভবের·বাজার বিষম ব্যাপার নাই কিছু জমার ঘরে ॥
খসড়া খতেনে, গোঁজা মিলনে, লাভ ছিল মনে—
(শেষে) বাকী টেনে, রুজু ধরে নিকেষ দিতে প্রাণ ডরে
ঋণ দায় প্রাণ যায়, রাখ রাঙা পায়,
দিতে অব্যাহতি জগপতি তোমারিত দায়,
(দেখ) পাওনাদারে, ঐক্য করে এল শমন শিয়রে ॥
বিপদ ভঞ্জন. এসময় চাহি দরশন,
সহায় সম্বল হীনে দেহ শ্রীচরণ,
(পেয়ে) জীবতরাণ মধুর নাম নামের গুণে যাই তরে ॥

(৫)

নিবারি নয়নবারি দিয়ে দরশন।
বল নাথ কেন হলে নিঠুর এমন ॥
যবে কেঁদে অভয় পদে লয়েছি শরণ,
মুছায়ে নয়ন বারি করিসে আপন।
কেন ফিরে দুখনীরে আজি নিমগন ॥

না পেয়ে কেঁদেছি কত, পেয়ে তোমায় কাঁদি কেন,
কাঁদান তোমারি সাজে দুখে সুখে চিরদিন ॥

(৬)

(সারা হয়ে) সার করেছি ও চরণ।
আপন হতে তুমি হে আপন ॥
নাহি কোন ঠাঁই, কোথা বা জুড়াই,
কোথা যাই কারে বা সুধাই,—
কাঙ্গাল বলে, কোলে তুলে, জুড়ালে তাপিত জীবন ॥
দীনের দায় এসেছ ধরায়,
রাখ পায় আপন কৃপায়,
সঁপেছি প্রাণ রাঙ্গাপদে না জানি সাধন ভজন।
বলি রামকৃষ্ণ রামকৃষ্ণ রামকৃষ্ণ প্রাণ ধন ॥

অষ্টাদশ বক্তৃতা।

শাস্ত্রাদি সম্বন্ধে

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের উপদেশ।

১৩০৩—১৬ই চৈত্র রবিবার, ষ্টার থিয়েটারে প্রদত্ত।

---

৬৩ রামকৃষ্ণাব্দ

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ

শ্রীচরণভরসা।

শাস্ত্রাদি সম্বন্ধে

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের উপদেশ।

ব্রাহ্মণাদির চরণে প্রণাম।

আমাদের সামাজিক এবং আধ্যাত্মিক ভাব যে অতিশোচনীয়াবস্থায় পতিত হইয়াছে, তাহা প্রত্যেক চিন্তাশীল ধর্ম্মানুরাগী ব্যক্তিই প্রাণে প্রাণে বুঝিতে পারিতেছেন। পূর্ব্বে সকল বিষয়েই নিয়ম ছিল, তাহা এখন একেবারে শিথিল হইয়া আসিয়াছে বলিলে অত্যুক্তি হয় না। আমাদের এই অবস্থাপরিবর্ত্তন যেরূপ তীব্র ভাবে সংঘটিত হইতে আরম্ভ হইয়াছে, তাহাতে বোধ হয়, অতি সত্বরেই আমাদের হিন্দু নাম পর্য্যন্ত বিলুপ্ত হইয়া যাইবে। প্রভু রামকৃষ্ণদেব আমাদের এই চরম অবনতির সময়ে অবতীর্ণ হইয়া অবস্থানুযায়ী উপদেশ প্রদান করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার উপদেশানুযায়ী কার্য্য করিতে পারিলে, বাস্তবিক যে আমাদের সমূহ কল্যাণ সাধিত হইবে, সে বিষয়ে অনুমাত্র সন্দেহ নাই। অদ্য আমি তাঁহার সেই উপদেশ আলোচনা করিতেই আপনাদের নিকট আসিয়াছি। যদিও আমি বিশেষরূপে জানি যে, আমার ন্যায় দুর্ব্বল ব্যক্তির এরূপ কার্য্যে প্রয়াস পাওয়া অতীব রহস্যের কথা, কিন্তু শুনিয়াছি যে, রামচন্দ্র যখন সীতা উদ্ধারের জন্য সেতু বন্ধন করেন, তখন হনুমান্ জাম্বুবান্ প্রভৃতি শ্রেষ্ঠ বীরেরাই তাঁহার কার্য্যের বিশেষ সহায়তা করিয়াছিল। তৎকালে একটী ক্ষুদ্র কাষ্ঠবিড়ালী সেতুর বালুকা লইয়া ক্রীড়া করিতেছিল। হনুমান্ তদ্দর্শনে ক্রুদ্ধ

হওয়ায় রামচন্দ্র বলিয়াছিলেন যে, উহার শক্ত্যনুসারে আমারই কার্য্যের সহায়তা করিতেছে। রামকৃষ্ণদেবের উপদেপ বিস্তার করা সম্বন্ধে আমার কাষ্ঠবিড়ালীর অবস্থার অধিক নহে।

রামকৃষ্ণদেব বলিতেন যে, কার্য্য থাকিলেই কারণ থাকিবে। সুতরাং, আমাদের যে অবস্থাপরিবর্ত্তন সংঘটিত হইয়াছে, তাহারও কারণ আছে; তাহা নির্ণয় করা কর্ত্তব্য। আমি সেইজন্যই, প্রথমে ধর্ম্মশাস্ত্রাদি, পরে জাতি ও তৎপরে সমাজসংস্কার বিষয়ে রামকৃষ্ণ-দেবের উপদেশ লইয়া আলোচনা করিব বলিয়া মনে করিয়াছি।

শাস্ত্র, এই কথাটী লইয়া কিঞ্চিৎ বিচার করিলে, শাস্ত্র অর্থে শাসন বলিয়াই বুঝা যায়। পূর্ব্বে যখন হিন্দুরাজগণের রাজত্ব ছিল, যখন তাঁহাদের স্বাধীনতা-সূর্য্য অস্তমিত হয় নাই, তখন কি বহিঃ-রাজ্য কি মনোরাজ্য, সকল বিষয়েই, আমাদের শাসন ছিল। আমরা সকলে সেই শাসনানুযায়ীই পরিচালিত হইতাম। কিন্তু যবন ও ম্লেচ্ছের আধিপত্যবিস্তারের সহিতই সে শাসন লুপ্তপ্রায় হইয়া আসিয়াছে। পূর্ব্বে ব্রাহ্মণের হস্তে শাস্ত্র নিহিত ছিল, তাঁহারা যেরূপ উপদেশাদি প্রদান করিতেন, সকলেই তাহা অনুসরণ করিয়া কার্য্য করিত, কিন্তু আজকাল সেই ব্রাহ্মণদিগেরই অধঃপতন হই-য়াছে। সুতরাং উপদেষ্টাদিগের অধঃপতনের সহিত আমাদেরও চরম অবনতি হইয়াছে। শাস্ত্র শিক্ষা করিতে হইলে পাত্রের বা অধিকারীর প্রয়োজন। আমাদের সেই পাত্রের অভাব হইয়াছে। আমাদের মানসিক পাত্রের অভাব, সেই জন্য আমরা কোন বিষয় অধ্যয়ন করিতে যাইলেও তাহা পাত্রের অভাবে স্থান পায় না।

হিন্দু শাস্ত্র একখানি বা দুইখানি নহে, নানাবিধ লোকের জন্য নানা শাস্ত্রের ব্যবস্থা হইয়াছে। কিন্তু আধুনিক শাস্ত্রজ্ঞ যাঁহারা, তাঁহারাই এক

শাস্ত্রের শ্লোকাদি উদ্ধৃত করিয়া অপর শাস্ত্রকে খণ্ডন করেন এবং শাস্ত্রের নামে, অশাস্ত্রেরও প্রচলন করিতে কুণ্ঠিত হন না। এই জন্য, সকলেই দেখিতে পান যে, অধিকাংশস্থলেই শাস্ত্রের বিরুদ্ধে কার্য্য চলিতেছে।

এই কলিকাতা সহরের বিলাত হইতে প্রত্যাগত কোন এক জন সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি, যে কোন কারণেই হউক, সমাজভুক্ত হইতে চান। ইনি ম্লেচ্ছানীর পানিগ্রহণ করিয়াছিলেন, সুতরাং শাস্ত্রমতে সমাজে উঠিতে পারেন না বলিয়াই অনেকে আপত্তি করেন। এখনকার যাঁহারা বিশিষ্টরূপে শাস্ত্রজ্ঞ ও পণ্ডিতগণের শ্রেষ্ঠ বলিয়া পরিচিত, তাঁহাদের মধ্যেই একজন পণ্ডিতবর এই ব্যক্তিকে সমাজে তুলিয়া লইবার ব্যবস্থা প্রদান করেন। এই সংবাদ চতুর্দ্দিকে প্রচারিত হইলে পর, তিনি কোন্ শাস্ত্রমতে ব্যবস্থা দিয়াছেন, তাহা জিজ্ঞাসা করিবার জন্য পণ্ডিত-মণ্ডলী এক মহাসভা আহূত করেন। তিনি এই সভায় উপস্থিত হইয়াই বলেন যে, "এমন কে শাস্ত্রজ্ঞ আছে যে, আমায় এ বিষয়ে প্রশ্ন করিতে পারে?" তাঁহার এই দাম্ভিক প্রশ্নেই সকলে নিস্তব্ধ হইয়া যান। তৎপরে একদিন উত্তরপাড়ার পূজনীয় শ্রীযুক্ত রাসবিহারী মুখোপাধ্যায়ের বাটীতে তাঁহার সহিত আমার সাক্ষাৎ হয়। আমি তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম, "মহাশয় আপনি কিরূপে এরূপ ব্যবস্থা দিলেন? ইহা কি শাস্ত্রসঙ্গত?" তিনি বলিলেন, "শাস্ত্রসঙ্গত না হইলে কি প্রায়শ্চিত্ত হয়?" রাসবিহারী বাবু এই কথা শুনিয়া কহিলেন, "ভাল মহাশয়! এই প্রায়শ্চিত্ত দ্বারা তাহার কি দেহ শুদ্ধ হইয়াছে?" পণ্ডিত মহাশয় অম্লান বদনে কহিলেন, 'না'। এই কথা শুনিয়া আমি পণ্ডিত মহাশয়কে পুনরায় বলিলাম যে, "মহাশয়! বলিলেন কি? তাহার শরীর শুদ্ধ হইল না, তথাপি লোকে জানিল যে, আপনি শাস্ত্রানুসারে তাহার

প্রায়শ্চিত্ত বিধান করিয়াছেন। এরূপ কার্য্য করিবার আপনার অভিপ্রায় কি?" তিনি অপ্রতিভ হইয়া বলিলেন যে, "বাপু! তোমরা আবদার করিলে, আর কি করিব?"

শাস্ত্রের এইরূপ অবস্থাই ঘটিয়াছে। শাস্ত্র এক্ষণে শাস্ত্রজ্ঞদিগের উপজীবিকার হেতুস্বরূপ হওয়ায় অর্থের বিনিময়ে যথেচ্ছাচারের করগ্রস্ত হইয়া পড়িয়াছে। শাস্ত্রের অভিমতে, শাস্ত্রের আজ্ঞানুসারে আমরা চলিতে চাহি না। আমাদের ইচ্ছানুক্রমে শাস্ত্রকে পরিবর্ত্তিত করিয়া লইতেছি, সুতরাং শাস্ত্রের কার্য্যানুরূপ ফল ফলিতে পারিতেছে না। সে যাহা হউক, আমাদের এই ভীষণাবস্থায় কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য স্থির করিতে হইলে, প্রভু রামকৃষ্ণের উপদেশই একমাত্র উপায়। আমি তজ্জন্য তাঁহার কৃপা প্রার্থনা পূর্ব্বক তাঁহারই আদিষ্ট উপদেশক্রমে অদ্য কার্য্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়াছি।

রামকৃষ্ণদেবের মতে আমাদের শাস্ত্র সকল তিন ভাগে বিভক্ত। বেদ, পুরাণ এবং তন্ত্র। রামকৃষ্ণদেব বলিয়াছেন যে, অদ্বৈত জ্ঞান লাভ করা বৈদিক শাস্ত্রের অভিপ্রায়। অদ্বৈত অর্থে এক ব্যতীত দুই বুঝায় না। স্থূল পৃথিবীতে আমরা প্রকৃত অদ্বৈত বস্তু দেখিতে পাই না। যে দিকে দৃষ্টিপাত করি, আমরা সেইদিকেই বিবিধ পদার্থের বিন্যাস দেখিতে পাই। দেখি নানাপ্রকার মনুষ্য, দেখি নানা প্রকার গাভী, দেখি নানাপ্রকার বৃক্ষ, লতা, গুল্ম, পশু, পক্ষী, পতঙ্গ, দেখি জল, বায়ু, বহ্নি, সর্ব্বত্রে বহুবিধ পদার্থনিচয়ের সমাবেশ দেখিতে পাই, এই পদার্থ সকল কখন আমাদের প্রীতিজনক এবং কখন যারপরনাই অপ্রীতিকর বলিয়া বোধ হয়। কখন আমরা ইহাদের দ্বারা সুখশান্তি লাভ করি এবং কখন অশান্তির করকবলিত হইয়া থাকি।

পদার্থ সকল সর্ব্বদা পরিবর্ত্তনশীল। এই একটী বিচি দেখিতেছি, পরে অঙ্কুরিত হইল, পত্র বাহির হইল, কাণ্ড প্রকাণ্ড শাখা প্রশাখা ফুল ফলে পরিশোভিত হইল। ফল পাকিয়া গেল, পত্র শুকাইল, বৃক্ষ শুষ্ক কাষ্ঠে পরিণত হইয়া গেল। তথায় তাহার পরিবর্ত্তনের পরিসমাপ্তি হইল না। উহাকে খণ্ড খণ্ড করিয়া অগ্নির সহযোগে ভস্মীভূত করা হইল।

মনুষ্যগণ এক সময়ে আণুবীক্ষণিকাবস্থায় অবস্থিতি করিতেছে, ক্রমে বর্দ্ধিত হইয়া শিশু, বালক, পৌগণ্ড, যুবা, বৃদ্ধাদি বিবিধ শব্দের দ্বারা তাহাদের অবস্থান্তরের কথা উল্লিখিত হইতেছে। মনুষ্য মরিল, তাহার দেহ একেবারে বিকৃত হইয়া গেল। আর পূর্ব্বের অবয়ব কিছুই রহিল না।

এইরূপ পদার্থ সকল প্রতিমুহূর্ত্তে পরিবর্ত্তিত হইয়া স্থূল জগতের বাহুল্যবিধান করিতেছে। আমরা এই স্থূল বস্তু সকলের সহিত নানাভাবে সম্বন্ধগ্রস্ত হইয়া তাহাদের ধর্ম্মকর্ম্মানুসারে পরিচালিত হইতেছি। যখন যে বস্তু প্রচুর পরিমাণে পাইতেছি, তখন আনন্দে মাতিয়া উঠিতেছি এবং যখন তাহাতে বঞ্চিত হইতেছি, তখনি বিষাদ-সাগরে নিমগ্ন হইয়া যাইতেছি। প্রাণপণে চেষ্টা করিয়া ধনোপার্জ্জন করিলাম, আনন্দের সীমা নাই, সুখের অবধি নাই, পরক্ষণে ধননাশ হইয়া গেল, নিরানন্দের চরমসীমায় উপনীত হইলাম। আনন্দরূপিণী কামিনীর করাশ্রয় পূর্ব্বক সংসার বিস্তার করিলাম, দিনযামিনী সুখে অতিবাহিত করিলাম, কতই আনন্দোর্ম্মী উথলিয়া উঠিল, কিন্তু কালে তাহা একে একে অগাধ সংসার-জলধিতে বিলীন হইয়া গেল। নিরানন্দের আর পরিসীমা রহিল না।

মনুষ্যেরা পদার্থদিগের পরিবর্ত্তনজনিত বিরহ-বিষাদ অনুক্ষণ

সম্ভোগ করিয়াও কেহ তাহা প্রাপ্তির উপর্য্যুপরি অনুষ্ঠান করে এবং কাহারও বা এই পরিবর্ত্তনের নিদান অনুসন্ধান করিবার জন্য চিত্তচাঞ্চল্য হইয়া থাকে। কেন ধনোপার্জ্জন করিতে পারিতেছি না? কেন পুত্রাদি মরিয়া যায়? কেন সর্ব্বদা পীড়ার অত্যাচার সহ্য করিতে হয়? অমনি চিন্তা আসিল, অমনি স্থূল পরিবর্ত্তনকার্য্যের কারণ বাহির হইয়া আসিল। বুঝা গেল যে, গ্রহবৈগুণ্যে ধন-নাশ হইতেছে, গ্রহবৈগুণ্যে সন্তানগুলি মরিয়া যাইতেছে। অমনি গ্রহ-শান্তি করিতে প্রবৃত্ত হইলাম। জলবায়ুর দোষই পীড়ার কারণ বুঝিবামাত্র স্থান পরিবর্ত্তন করিলাম, কিন্তু হায়! তাহাতে সিদ্ধ মনোরথ হইতে পারিলাম না। এই অবস্থায় কেহ জীবনান্ত করিয়া যায় এবং কেহবা ইহার অন্য প্রকার কারণ বাহির করিবার জন্য চেষ্টা করিয়া থাকে। যাহার এই প্রকার অবস্থা হয়, যখন কেহ চিন্তাগ্রস্ত হয়, তখন তাহার মানসাকাশে স্থূল জগতের পরিবর্ত্তন-শীলতার কারণ আপনি উদয় হইতে আরম্ভ হইয়া থাকে। তাহার মনে হয় যে, কঠিন বরফখণ্ড খাইতেছি, ইহার শীতলতায় শরীর স্নিগ্ধ হইতেছে, কিন্তু নিমেষমধ্যে গলিয়া গেল কেন? বরফ গলিয়া জল হইল এবং ঐ জল কিয়ৎকাল মধ্যে দৃষ্টির অন্তরালে চলিয়া গেল। বরফ, জল এবং বাষ্পের কিছুমাত্র সাদৃশ্য নাই। না আকারে, না ধর্ম্মে, না ব্যবহারে ইহাদের সামঞ্জস্য দেখা যায়। স্থূলে এই প্রকার পার্থক্য দৃষ্টি হয় বটে, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে উহা একটা পদার্থের অবস্থান্তরের কথা মাত্র। বরফ, জল এবং বাষ্পের বৃত্তান্ত বুঝিয়া, মন নিরস্ত না হইয়া, বরং আরও অগ্রসর হইবার জন্য ব্যাকুলিত হইল, যে পদার্থটী পরিবর্ত্তিত হইয়া বরফ, জল এবং বাষ্প হয়, সে পদার্থটী কি? বিচার করিতে যাইয়া এক

অভিনব জ্ঞানের সঞ্চার হইল। দুইটী বাষ্পীয় পদার্থের সংযোগে তাপের সহায়তায় উহার সৃষ্টি হয়। যে পর্য্যন্ত তাপের প্রকোপ না কমে, সে পর্য্যন্ত উহা জল, কিম্বা বরফাকারে পরিণত হয় না। ভাবুক এতক্ষণে বুঝিতে পারিল, দুইটী বাষ্প এবং তাপ ও ইহার হ্রাসবৃদ্ধিই বরফ, জল এবং বাষ্পের কারণ। অথবা, দুইটী বাষ্প তাপের সহায়তায় ত্রিবিধ ভাবে পরিবর্ত্তিত হয়, তাহাকেই বরফ জল ও বাষ্প কহে।

ভাবুকের চিন্তাস্রোত এই অবস্থায় উঠিয়াও নিরস্ত হয় না। তখন মনে হয় যে, এই বাষ্প দুইটী কি পদার্থ এবং তাপের সহিত ইহাদের সম্বন্ধ কি প্রকার? জল বিসমাসিত করিয়া দুইটী বাষ্প পৃথক করা হইল, এবং পুনরায় তাহাদের বিসমাসিত করিতে চেষ্টা পাইয়া কৃতকার্য্য হওয়া গেল না। এই বাষ্প দুইটী মৌলিক পদার্থ বলিয়া সাব্যস্ত হইল।

তাপের সম্বন্ধ স্থির করিতে যাইয়া পদার্থ হইতে তাপকে পৃথক করিতে পারা গেল না। উহারা উভয়ে এরূপভাবে জড়িত যে, পদার্থ ছাড়া তাপ এবং তাপ ছাড়া পদার্থ থাকিতে পারে না। চিন্তার স্রোত ক্রমে ঊর্দ্ধগামী হইতে লাগিল। জলের উপাদানকারণ পদার্থ দুইটীকে বাষ্পাবস্থায় রাখিয়া, তাপ লইয়া বিচার কার্য্য চলিতে লাগিল। তাপ বলবিশেষের বিকাশমাত্র বলিয়া উপলব্ধি হইল। এই বলের উৎপত্তির কারণ আকাশ। আকাশে উপস্থিত হইয়া চিন্তা স্থির হইয়া গেল। আকাশের জ্ঞান ব্যতীত আর কিছু রহিল না। ভাবুক এই অবস্থায় দীর্ঘকাল অবস্থিতি করিতে পারিল না। মন অবলম্বনবিহীন হইলে সে অবস্থায় কতক্ষণ থাকিতে পারে? সুতরাং উহা ক্রমে নিম্নগামী হইতে লাগিল। আকাশের পরে বল, বলের পরেই বিবিধ শক্তির বিকাশ এবং পদার্থের বাষ্পীয় ভাব, তৎপরে তরল এবং সর্ব্বশেষে কঠিন

বরফে আসিয়া উপনীত হইল। এতক্ষণে ভাবুক বুঝিল যে, কঠিন বরফে এবং আকাশের প্রভেদ কতদূর। স্থূলভাবে উহাদের পার্থক্যের অবধি নাই, কিন্তু কারণচক্ষে আকাশেরই রূপান্তর না বলিয়া আর কিছুই বলা যায় না। তথায় সে আরও বুঝিতে পারিল যে, বরফ, জল এবং বাষ্প, তিনটীই এক অদ্বিতীয় আকাশের বিকাশবিশেষ।

অতঃপর ভাবুকের চক্ষে মনুষ্যের ছবি প্রতিফলিত হইল। মনুষ্য অশেষ প্রকার। দুইটী এক রকম মনুষ্য দেখিতে পাওয়া যায় না, দুই জনের ঠিক এক রকম বর্ণ দেখা যায় না। কিন্তু মনুষ্যদেহ সকলেরই এক প্রকার। হিন্দু মুসলমান ম্লেচ্ছ প্রভৃতি কাহারও দৈহিক বন্দোবস্তের তারতম্য হয় না। একখানি দেহ-তত্ত্ব (Anatomy.) পাঠ করিলে সমগ্র পৃথিবীস্থিত মনুষ্যের বৃত্তান্ত অবগত হওয়া যায়। এইরূপে একে একে স্থূল পদার্থ লইয়া বিচার করিলে প্রত্যেক পদার্থের আদি কারণ আকাশে যাইয়া পর্য্যবসিত হইয়া থাকে। পূর্ব্বে বলিয়াছি যে, আকাশের অস্তিত্ববোধ কেবল বোধে বা জ্ঞানে অবস্থিতি করে। এই নিমিত্ত জ্ঞানই সকল পদার্থের কারণবিশেষ। স্থূল জগতের এই জ্ঞানকে অদ্বৈত জ্ঞান কহে। বৈদিক শাস্ত্র এই জ্ঞান অতিক্রম করিয়া যাইতে বলেন। এই জ্ঞানেরই যখন কোন নির্দ্দিষ্ট আকার প্রকার নাই, উপলব্ধি বা ভাবনার কিছুই নাই, তখন তাঁহার অতীত বস্তু ধারণা করা মনুষ্যবুদ্ধি এবং মনেরও সাধ্যাতীত কথা। এই নিমিত্ত, সেই অনাদি বস্তুকে বাক্যমনের অতীত বিষয় বলিয়া শাস্ত্রে উল্লিখিত হইয়াছে। মনুষ্যমন যদিও সেই পরমপদার্থকে সাধারণ চিন্তার প্রণালীমতে ধারণা করিতে অসমর্থ হয় বটে, কিন্তু কার্য্যকারণবিচারমতে তাঁহার অস্তিত্ব স্বীকার করিতে হয়। যেহেতু, জ্ঞান বলিয়া যখন একটী বিষয় রহিয়াছে, তাহা বিনা আশ্রয়ে কখনই থাকিতে পারে না। আমি আছি,

আমার জ্ঞানও আছে। আমি নাই, আমার জ্ঞানও নাই। এই জন্ত জ্ঞানের আশ্রয়বিশেষ বস্তুকে ব্রহ্ম কহা যায়। এই ব্রহ্মের স্বরূপকে সৎ কহে। সৎএ চিৎ অবস্থিতি করে বলিয়া তিনি সচ্চিৎ শব্দে অভিহিত হইয়া থাকেন। এই সৎ পদার্থই সমুদয় ব্রহ্মাণ্ডের আদি কারণ স্বরূপ এবং বৈদিক শাস্ত্র তাঁহারই গুণগান করিয়া থাকে।

রামকৃষ্ণদেব এই বিষয়টী একটী উপমার দ্বারা বুঝাইতেন। একটী অন্ধকারগৃহে বাটীর কর্ত্তা শয়ন করিয়া আছেন। গৃহের ভিতরে প্রবেশ করিয়া কর্ত্তাকে অনুসন্ধান করিতে যাইয়া সর্ব্বপ্রথমে হয়ত কৌচের উপরে হস্ত পতিত হইল। অনুসন্ধানকারী অমনি বুঝিল, "ন ইতি"—ইনি তিনি নহেন। এইরূপে গৃহস্থিত অন্যান্য সামগ্রীবিশেষে হস্তার্পণ করিয়া "ন ইতি ন ইতি" করিয়া পরিশেষে কর্ত্তার গাত্রে হস্ত স্পর্শ হইবামাত্র অমনি "ইতি"—ইনি সেই কর্ত্তা বলিয়া উপলব্ধি হইল। এই কর্ত্তাই বেদপ্রতিপাদ্য সৎবস্তু।

বৈদিক শাস্ত্র, এই সৎ পদার্থ অনুসন্ধান করিতে আদেশ করিয়াছেন। স্থূল জগতে, আমরা স্থূল সম্বন্ধে আবদ্ধ থাকি বলিয়া, তথায় সৎ বস্তু দেখিতে পাই না। ফলে, স্থূলে সৎ বস্তুর স্বরূপলক্ষণ কখনই লক্ষিত হইবার নহে। বরফ ও জলে তাহাদের আদি কারণ সৎস্বরূপ আকাশ কোথায়? তথায় আকাশের অবস্থান্তরিত রূপই প্রতীয়মান হইয়া থাকে। এই নিমিত্ত নেতি নেতি অর্থাৎ এ তিনি নহেন, এ তিনি নহেন, এইরূপ বিচার দ্বারা স্থূল জগৎ বিশ্লিষ্ট করিয়া যাইলে, যে স্থানে এই ব্রহ্মাণ্ডের স্থূল সূক্ষ্ম কারণ ভাবাদি অদৃশ্য হইয়া যায়, তাহাকেই হিসাবমতে সৎ জ্ঞান কহিতে সকলেই বাধ্য হইয়া থাকেন। তথায় চন্দ্র সূর্য্য নাই, তথায় তাপ শৈত্য নাই, ভাল মন্দ নাই, পাপ পুণ্য নাই, গুরু শিষ্য নাই, সাধু অসাধু নাই, আমি তুমিও নাই। তথায় জ্ঞান

জ্ঞেয় জ্ঞাতা, ধ্যান ধ্যেয় ধ্যাতা নাই। কিছুই নাই। সে অবস্থার কথা কথায় প্রকাশ করা যায় না, ভাবরাজ্যের সম্পূর্ণ অতীত কথা. সুতরাং ভাবেও আভাস দিবার উপায় নেই। দ্বিতীয় দৃষ্টান্ত নাই যে, তাহার উপমা দ্বারা বুঝা যাইবে। প্রভু বলিতেন যে, সেই জ্ঞান হাবার স্বপ্নবৎ ব্যাপার। কেহ রসগোল্লা ভক্ষণ করিলে যেমন চলিত কথা মিষ্ট বিশেষণ ব্যতীত প্রকৃত আস্বাদনের স্বরূপ বিবরণ কোনমতে বিবৃত করা যায় না, যেমন শৃঙ্গার-রসানুভবকাহিনী বাক্যে স্ফূর্ত্তি পাইতে পারে না, তেমনি এই সৎ-জ্ঞান লাভ করিলেই যে সমুদয় কার্য্য শেষ হইয়া যায়, তাহা নহে। জ্ঞানের পর বিজ্ঞান। যে পর্য্যন্ত জ্ঞানের রাজ্যে অবস্থিতি করা যায়, সে পর্য্যন্ত আমি এবং আমার জ্ঞান যায় না। আমি ভাবিতেছি, আমার এ প্রকার উপলব্ধি হইতেছে, তাহা বিলক্ষণ হৃদয়ঙ্গম থাকে। কিন্তু সৎবিজ্ঞান হইলে আর নিজের স্বাতন্ত্র্য থাকিতে পারে না। প্রভু বলিতেন, যেমন পারার হ্রদে সীসার চাপ ফেলিয়া দিলে সীসার স্বাতন্ত্র্য থাকে না। উহা পারায় দ্রবীভূত হইয়া যায়। নুনের ছবি সমুদ্রে ফেলিয়া দিলে গলিয়া যায়, তাহার আর স্বাতন্ত্র্য থাকে না। তেমনি মনুষ্যেরা সদ্‌বিজ্ঞানের অবস্থায় আত্ম হারাইয়া ফেলে। যেমন, মনুষ্যদেহ বিশ্লিষ্ট কিম্বা বিকৃত করিলে দৈহিক উপাদানকারণবিশেষ পদার্থনিচয় স্থূল জগতেই থাকিয়া যায়, আত্মা সেই পরমাত্মা বা সৎ-স্বরূপে মিলিত হইয়া যায়। ইহাকে সমাধি কহে। বেদাদি শাস্ত্রের ইহাই চরম অভিপ্রায়। রামকৃষ্ণদেব কহিয়াছেন যে, বিচার দ্বারা স্থূল, সূক্ষ্ম কারণ অতিক্রম করিয়া মহাকারণে গমন করাই বেদাদি শাস্ত্রের সাধনা। স্থূলে সৎবস্তুর স্বস্বরূপ দেখা যায় না বলিয়া এবং তাহারা সতত পরিবর্ত্তনশীল বিধায় উহাদিগকে পদার্থের প্রকৃত অবস্থা বলা যায় না। বরফ, জল এবং বাষ্পের কোন অবস্থাটী সত্য বলা যাইবে?

ইহাদের অবস্থা সম্বন্ধে সুতরাং স্থির নিশ্চয়তা নাই, এই জন্য মায়া বা মিথ্যাশব্দ প্রয়োগকরা হয়। মিথ্যা বস্তু সত্য বলিয়া প্রতীতিজন্মিলে মায়া কহা যায়। বেদাদি শাস্ত্রে স্থূল জগৎকে সেইজন্য মায়া বলিয়া পরিত্যক্ত হইয়াছে। বৈদান্তিকেরা তন্নিমিত্ত জগতের পদার্থকে অপদার্থ; ভাব, প্রেম হাসি কান্না প্রভৃতি যাবতীয় দৈহিক এবং মানসিক ক্রিয়াকে মায়ার অন্তর্গত বলিয়া ব্যক্ত করেন। সংক্ষেপে বেদাদি শাস্ত্রে এক অদ্বিতীয় বস্তুর অস্তিত্ব স্বীকার করা হয় এবং তদ্ব্যতীত সমুদয় ভ্রম পরিপূর্ণ। ইহাকেই অদ্বৈতবাদ কহে।

রামকৃষ্ণদেব বেদাদিশাস্ত্রের এইরূপ বৈশ্লেষিক (Analytical) ভাব দেখাইয়া অদ্বিতীয় সৎবস্তুর শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপাদন পূর্ব্বক পুনরায় সাংশ্লেষিক (Synthetical) প্রথানুসারে স্থূল জগতে বিচার ভাবে অবতরণ করিতে উপদেশ দিয়াছেন। যেমন জল কিংবা বরফ অথবা বাষ্প বিশ্লিষ্ট করিলে দুইটী বাষ্প প্রাপ্ত হওয়া যায়। পরে ঐ দুইটী বাষ্পের পুনর্ম্মিলন করিলে পুনরায় জল সৃষ্টি হয়। ইহাকে সংশ্লেষণ কহা যায়। সৎবস্তু বা মহাকারণ হইতে কারণ, সূক্ষ্ম এবং স্থূল পর্য্যন্ত আসিলে, অর্থাৎ সমুদয় ব্রহ্মাণ্ডস্থিত পদার্থ নিচয় একত্রে সংযোগ করিলে সেই সৎ বস্তুরই বিকাশ দেখা যায়। কারণ প্রত্যেক বস্তুর এমন কি অতি সূক্ষ্ম তৃণের উৎপত্তির ক্রম নির্ণয় করিতে যাইলে অদ্বিতীয় সৎ পদার্থেই উপনীত হইতে হয়। এই নিমিত্ত সাংশ্লেষিক বিচারের দ্বারাও সর্ব্বত্রে অদ্বৈত জ্ঞান স্ফূর্ত্তি পাইয়া থাকে। রামকৃষ্ণদেব সর্ব্বজন বোধগম্যার্থ অতি সামান্য দৃষ্টান্তদ্বারা এই গভীর ব্রহ্মতত্ত্বের মর্ম্ম প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন। তিনি বলিতেন, যেমন পাকা বেল। বেল একটী পদার্থবিশেষ। বেল লইয়া বিচার করিলে প্রথমে ইহার বাহিরের

আবরণ খোসা, ইহা কঠিন। বেল ভাঙ্গিলে শাঁস পাওয়া যায়। ইহার সহিত আঠা, বিচি এবং সূত্রবৎ পদার্থগুলি জড়িত থাকে। বেলটাকে স্থূলে এইরূপ বিচার দ্বারা বিশ্লিষ্ট করিলে, নানা প্রকার পদার্থে পর্য্যবসিত করা যায়। এই পদার্থগুলির মধ্যে বেলের শাঁসই আমাদের ব্যবহারোপযোগী। এই স্থানে বিচার বন্ধ না করিয়া আরও কিঞ্চিৎ অগ্রসর হইলে বুঝা যায় যে, বেল একেবারে পরিপক্ক হয় না। পাকিবার পূর্ব্বে উহা কাঁচা থাকে। তাহার পূর্ব্বে অপক্কাবস্থায় নানাবিধ ক্রমিক পরিবর্ত্তন দেখা যায়। কাঁচা-বেলের পূর্ব্বে উহা পুষ্পাকারে অবস্থিতি করে। স্থূলে বেলফুলের সহিত পাকা বেলের কোন সাদৃশ্য থাকে না। ফুল ফুটিবার পূর্ব্বে উহা বৃক্ষেই অদৃশ্য ভাবে অবস্থিতি করে। উহার তাৎকালিক অবস্থা আমাদের চিন্তার অতীত কথা হইলেও মনে মনে একপ্রকার আভাস জ্ঞান থাকে। এই জ্ঞানকে প্রভু আমার সত্ত্বা শব্দে অভিহিত করিতেন। তিনি বলিতেন যে, বেল গাছের সত্ত্ব হইতেই বেল জন্মায়। এই সত্ত্বই বেলের গাছে, বেলের কাণ্ডে, প্রকাণ্ডে, শাখা, পাতায়, ফুলে, বেলে এক ভাবে পরিব্যাপ্ত হইয়া থাকে। সত্ত্বা হিসাবে এক অদ্বিতীয়, কিন্তু সেই অদ্বিতীয় বেলের সত্ত্বাই আবার ভিন্ন ভিন্ন আকারের, অবস্থার এবং ধর্ম্মের পরিচয় দিতেছে। বৈশ্লেষিক বিচার দ্বারা বেলকে ভিন্ন ভিন্ন ভাবে পর্য্যবসিত করিয়া সত্ত্বায় উপনীত হওয়া যায় এবং সত্ত্বা হইতে বেলের খোসা পর্য্যন্ত পুনরায় সাংশ্লেষিক প্রথানুসারে পুনরায় নামিয়া আসিলে সর্ব্বাবস্থায় সেই এক সত্ত্বারই বিকাশ দেখা যায়। তখন মনে হয় যে, বেলের কোন্ অংশ সেই সত্ত্ব—সেই অদ্বিতীয় সত্ত্ব বিবর্জ্জিত? ব্যবহারবিশেষে যদিও শাঁসেরই প্রয়োজন হয় বটে, কিন্তু তাহা

বলিয়া বিচার জ্ঞানে অন্য অংশকে বেলের সত্ত্ববিহীন বলিয়া উল্লেখ করা যায় না। ব্রহ্মাণ্ড সম্বন্ধেও তদ্রূপ বুঝিয়া লওয়া কর্ত্তব্য। সেই এক অদ্বিতীয় সৎপদার্থ হইতে ব্রহ্মাণ্ডের যাবতীয় বস্তু সৃজিত হইয়াছে। তাঁহার সত্ত্বায়ই অতি সূক্ষ্মানুসূক্ষ্ম আনুবীক্ষণিক দৃষ্টির অতীত পদার্থবৃন্দ হইতে মহান্ মহান্ পদার্থ প্রভৃতিতে সমভাবে বিরাজ করিতেছে। যেমন বেল গাছের সত্ত্বা গাছে থাকে বলিয়া অতি দূরস্থিত ফল পরিবর্দ্ধিত হয়, কিন্তু বেলগাছ ছেদন করিয়া দিলে অথবা ফলকে বৃক্ষ হইতে ছিন্ন করিয়া লইলে তাহার পরিবর্দ্ধন সেই স্থানেই পরিসমাপ্তি প্রাপ্ত হয়, তেমনি ব্রহ্মাণ্ডস্থিত পদার্থনিচয় সেই এক অদ্বিতীয় সৎসত্ত্বায় সমুদয় পদার্থ নিজ নিজ ভাবে অবস্থিতি করিতেছে। তিনিই বিশ্বাত্মন্ আত্মারূপে অদ্বিতীয়। আত্মা বলিলে সাধারণ ভাবে জীবের চৈতন্যশক্তিকে বুঝায়। এই নিমিত্ত উহা জীবাত্মা নামে অভিহিত। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তাহা নহে। বিশ্বসংসারস্থিত সমুদয় বস্তুই আত্মার জাজ্জ্বল্য প্রতিভা সাধারণ ভাবে জড় পদার্থ বলিয়া যাহারা উল্লিখিত হয়, তাহারা বাস্তবিক জড় নহে, তাহারা আত্মার রূপান্তরবিশেষ। জীবগণ যেমন আত্মার আশ্রয়ে বর্দ্ধিত হয়, সংরক্ষিত হয়, তেমনি জড়পদার্থের আকৃতি, প্রকৃতি এবং পরিবর্দ্ধনাদি আত্মার দ্বারা সাধিত হইয়া থাকে। জড়পদার্থ বলিয়া কোন বস্তু একেবারেই নাই। আমরা যাহাকে জড় বলি, তাহা কেবল স্থূলের বস্তুনির্দ্দেশক শব্দবিশেষ। মাতৃগর্ভে যখন আমাদের সঞ্চার হয়, তখন আমরা আনুবীক্ষণিক অবস্থায় অবস্থিতি করি। মাতৃশোনিত দ্বারা ক্রমে ক্রমে অবস্থান্তর সংঘটিত হইয়া থাকে। ভূমিষ্ঠ হইলে দুগ্ধপান এবং বয়োবৃদ্ধির ক্রমানুসারে অন্যান্য ভোজ্য সামগ্রীর দ্বারা আমরা পুষ্টিলাভ করিয়া থাকি।

যে যে পদার্থ দ্বারা আমরা বর্দ্ধিত হই, তাহারা জড় বলিয়া কথিত হয়। দুগ্ধকে চৈতন্য পদার্থ বলিতে কাহার শক্তি আছে? অন্ন-ব্যঞ্জনই বা চৈতন্য পদার্থ বলিয়া উল্লিখিত হইবে কিঁরূপে? কিন্তু এই পদার্থগুলিই আমাদের শরীর ধারণের একমাত্র উপায়। আহার কমিয়া যাইলে আমরা দুর্ব্বল হই। আহার বাড়িলে বলিষ্ঠ হইয়া থাকি। চৈতন্য বস্তু সকল সময়েই আছেন, তবে এরূপ পরিবর্ত্তনের হেতু কি? এক পদার্থ পদার্থবিশেষের প্রয়োজনানুসারে রূপান্তরবিশেষে পরিণত হইয়া জগতের কার্য্যাদি সমাধা করিয়া থাকে। ইহাই প্রকৃতির নিয়ম। জলপান করিলে পিপাসার শান্তি হয়। কিন্তু জলের উপাদানকারণ হাইড্রোজেন এবং অক্‌সিজেন বাষ্প-গুলি সেবন করিলে পিপাসা নিবারণ হয় না কেন? প্রকৃতপক্ষে উভয়স্থলে একই পদার্থ ব্যবহার করা যাইতেছে, কিন্তু অবস্থা-বিশেষে একেরই অবস্থান্তর না করিলে কার্য্য সম্পন্ন হওয়া সম্বন্ধে প্রত্যবায় ঘটিয়া থাকে। যেমন জলের পরিবর্ত্তে হাইড্রোজেন এবং অক্‌সিজেন ব্যবহার করা যায় না, তেমনি অন্যান্য পদার্থ সম্বন্ধেও ঐরূপ নিয়ম দেখিতে পাওয়া যায়। অঙ্গার, নাইট্রোজেণ হাইড্রোজেন প্রভৃতি পদার্থ সকল দ্বারা আমাদের জীবন ধারণোপ-যোগী বলকারক ভোজ্যসামগ্রী সকল সৃষ্টি হইয়া থাকে। ঘৃত, দুগ্ধ, আটা, ডাল, মৎস্য, মাংস প্রভৃতি পদার্থ সকল তাহার দৃষ্টান্তস্থল। এই সকল পদার্থের পরিবর্ত্তে ইহাদের উপাদানগুলি ভক্ষণ করিলে সেরূপ ফললাভ করা যায় না, ইহা স্বাভাবিক ঘটনা। উদ্ভিদগণের পুষ্টির জন্য অঙ্গারের প্রয়োজন, কিন্তু বৃক্ষমূলে অঙ্গাররাশি অনন্তকাল ঢালিয়া রাখিলে কোন ফল দর্শিবে না। অঙ্গারকে রূপান্তর করিয়া দিলে তবে উদ্ভিদগণের আহারোপযোগী হইতে পারে।

পৃথিবীর যে দিকে দৃষ্টিপাত করা যায়, সেইদিকেই পদার্থদিগের এইরূপ রূপান্তর এবং কার্য্যান্তর দেখিতে পাওয়া যায়। পদার্থের মৌলিকভাবের কার্য্য একপ্রকার এবং তাহাদের অবস্থান্তর এবং যোগভাবের কার্য্য অন্যপ্রকার। হীরক, কয়লা এবং গ্রাফাইট, তিনই এক জাতীয় মৌলিক পদার্থ, কিন্তু রূপান্তরভেদে বর্ণের এবং কার্য্যের প্রচুর প্রার্থক্য দৃষ্ট হয়। হীরকখণ্ড রাজমুকুটে শোভা পায়, অঙ্গার জুতার কালীতে ব্যবহার হইয়া থাকে। নাইট্রোজেন, অঙ্গার এবং হাইড্রোজনের যোগে বলকারক ভোজ্য সামগ্রী উৎপাদন করে এবং উহারাই অবস্থান্তরে প্রাণান্তকারী অতি ভীষণ কালকূটসদৃশ হাইড্রো-সিয়ানিক এসিডে পরিণত হয়। স্থূলে পদার্থগত ঈদৃশ প্রভেদ হইলেও মূলে এক অদ্বিতীয় বস্তু। আত্মা বিষয়ে তদ্রূপ বুঝিতে হইবে। আত্মা এক অদ্বিতীয়। বিশ্বমণ্ডলে তিনিই অনন্ত প্রকারে প্রকটিত এবং অপ্রকটিত হইয়া রহিয়াছেন। অনন্ত আকার, অনন্ত প্রকার, অনন্ত ভাববিশিষ্ট এই লীলা-রঙ্গমঞ্চের রঙ্গতরঙ্গের গতি নিবারণ করিতে সাধ্য কাহার? অপার লীলা-জলধির কণিকা সমগ্র জলরাশির তত্ত্ব প্রদান করিতে কি কখন সমর্থ হইতে পারে? আমরা সেই অনন্ত-লীলাময়ের প্রকট লীলার পরমাণুবিশেষের সমষ্টিমাত্র। প্রকট লীলার বৃত্তান্তেই আমাদের অধিকার নাই, প্রকট লীলার তাৎপর্য্য বোধ করিতেই দেখিতে দেখিতে যুগের পর যুগ চলিয়া গেল, অতি ধীশক্তি সম্পন্ন সংখ্যাতীত বিজ্ঞানবিৎ মহাত্মারা একে একে চলিয়া গেলেন। বেদ, পুরাণ, তন্ত্র, বাইবেল, কোরাণ প্রভৃতি শাস্ত্রাদি কত কথাই বলিতে প্রয়াস পাইল, কিন্তু কোথায়, কোথায় সেই লীলারসময়ের স্বরূপকাহিনী ব্যক্ত করিতে পারিয়াছে? আভাস—আভাস আভাস ব্যতীত আর কোন কথাই নাই।

সাংশ্লেষিক বিচার দ্বারা এইরূপে সর্ব্বত্রেই সৎসত্ত্বার বিকাশ উপলব্ধি করাই বিশিষ্টাদ্বৈতবাদের অভিপ্রায়। এই নিমিত্ত বিশ্বস্থিত এবং বিশ্বের অতীত যাহা কিছু আছে, ছিল ও হইবে, সমুদয় সেই পরমাত্মার বিরাট ভাব। তিনি এক অদ্বিতীয় এবং কারণ, সূক্ষ্ম ও স্থূলে তিনিই বহু। পদার্থবিজ্ঞান তাহার পোষকতা করিয়া দিতেছে। তিনিই এক অদ্বিতীয় সৎ, সকল পদার্থের উৎপত্তির কারণ; তিনিই এক অদ্বিতীয় সৎ, সকল পদার্থের স্থিতির কারণ এবং তিনিই এক অদ্বিতীয় সৎ, সকল পদার্থের স্থূল গঠনেরও পরিবর্ত্তনের কারণ। তিনিই জগৎ, তিনিই জগদীশ্বর এবং তিনিই জগতাতীত ব্রহ্ম। তিনিই স্থূল জগতের অতি স্থূল পদার্থ, তিনিই মহাকারণের মহাকারণস্বরূপ বাক্যমনের অতীত বস্তু। তিনিই এক অদ্বিতীয় নিত্য পদার্থ এবং তিনিই লীলার বহুভাবব্যঞ্জক বিচিত্র পদার্থবিশেষ এবং তিনিই নিত্যলীলার অতীত বিষয়। ঈদৃশ তত্ত্বজ্ঞানকে প্রকৃত ব্রহ্মজ্ঞান কহে। ইহাই বেদাদি মতের চরমাবস্থা।

রামকৃষ্ণদেব বলিতেন যে, চিকিৎসকেরা রোগোপসমের নিমিত্ত কতক ঔষধ সেবন করান এবং কতক ঔষধ গাত্রে মর্দ্দন করিতে দেন। বর্ত্তমান কলিযুগে বৈদিক শাস্ত্রাদি শ্রবণ করিয়া জ্ঞানলাভ করিতে হয় এবং তন্ত্রোক্ত সাধনাই প্রকৃত কর্ম্ম করিবার বিষয়। তিনি বলিতেন যে, দেশকালপাত্র বিচার দ্বারা যুগে যুগে যুগধর্ম্মের ব্যবস্থা হইয়াছে। সত্যযুগে বৈদিক সাধনার বিধি প্রচলিত ছিল। তাৎকালিক ব্যক্তিগণ অতিশয় বলিষ্ঠ এবং দীর্ঘকাল জীবিত থাকিতেন। তাঁহারা স্বভাবতঃ সত্ত্বগুণবিশিষ্ট ছিলেন। তাঁহারা চিরসন্ন্যাস ব্রতে ব্রতী হইয়া রিপু সংযম করিতে পারিতেন। তাঁহারা ভোগ বিলাসের লেশমাত্র সংশ্রব রাখিতেন না। তাঁহারা নিভৃত গিরিগুহায় অথবা কাননের বৃক্ষচ্ছায়ায়

বসিয়া অনন্ত সৎ চিন্তায় অঙ্গ ঢালিয়া দিয়া সমাধিমন্দিরে চলিয়া যাইতেন। তাঁহাদের এই অবস্থা লাভ করিতে দীর্ঘকাল কাটিয়া যাইত। তাঁহারা সর্ব্বপ্রথমে বর্ণাশ্রমধর্ম্মানুসারে ব্রহ্মচর্য্যাদির ভাবে গুরুর আশ্রমে শিক্ষা করিতেন। এই শিক্ষা সমাপ্ত করিতে ন্যূনকল্পে ত্রিশ বৎসর লাগিত। বেদাধ্যয়ন করাই তাঁহাদের জীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল। সর্ব্বপ্রথমে সংস্কৃত ভাষাজ্ঞান লাভপূর্ব্বক বেদমর্ম্মে প্রবেশাধিকার জন্মিবার নিমিত্ত তাঁহাদিগকে বেদাঙ্গ এবং দর্শন শাস্ত্রাদি অধ্যয়ন করিতে হইত।

বেদাঙ্গ ছয়ভাগে বিভক্ত। যথা শিক্ষা, ছন্দ, ব্যাকরণ, নিরুক্ত, জ্যোতিষ এবং কল্প। কিরূপে লঘু গুরু করিয়া বৈদিক শ্লোক উচ্চারণ করিলে সুশ্রাব্য হয়, তাহা অভ্যাস করাই শিক্ষার অভিপ্রায়। পদ্যের ভেদবোধক সংজ্ঞাকে ছন্দ কহে। বৈদিক ভাষার তাৎপর্য্য বোধগম্যের নিমিত্ত বৈদিক ব্যাকরণ অধ্যয়ন করা কর্ত্তব্য। বেদের ব্যাখ্যান অর্থাৎ দুরূহ শব্দের ভাবার্থ নির্ণয়ক্ গ্রন্থকে নিরুক্ত বুঝায়। বেদবিহিত কার্য্যাদি সাধনার নিমিত্ত দিন নক্ষত্র সময় নিরূপণ করিবার যোগ্যতা লাভের উদ্দেশ্যে জ্যোতিষ শিক্ষার আবশ্যকতা হইত। বেদবিহিত কার্য্যাদি সম্পন্নের নিয়মমালাকে কল্প কহা যায়। এই বেদাঙ্গ বা ষড়ঙ্গে অধিকারী না হইলে বৈদিককার্য্যে পারদর্শিতা জন্মিতে পারে না। কেবল বেদান্ত শাস্ত্রে ব্যুৎপত্তি জন্মিলেই যে বেদের মর্ম্মোদ্ধার হইয়া যায়, তাহা নহে। দর্শনাদি শাস্ত্র সকল বেদশিক্ষার অদ্বিতীয় পথস্বরূপ। দর্শনশাস্ত্রও ছয় খানি। যথা, ন্যায়, বৈশেষিক, সাংখ্য, পাতঞ্জল বা যোগ, মীমাংসা এবং উত্তরমীমাংসা। শেষোক্ত দর্শনদ্বয় বেদান্ত বলিয়া উল্লিখিত হইলেও, পূর্ব্বমীমাংসা, এবং উত্তরমীমাংসা বেদান্ত শব্দে অভিহিত।

গৌতম কৃত ন্যায় শাস্ত্রমতে স্থূল জগৎ যুক্তিবিচার দ্বারা বিশ্লেষণ পূর্ব্বক নিত্য পরাৎপর পরমাত্মা ঈশ্বরের সত্বা নিরূপণ ও সংশয়াদি ছেদন করিয়া বেদার্থ নির্ণয় হইয়াছে। বৈশেষিক দর্শন প্রণেতা কনদ। এই শাস্ত্রখানি ন্যায়শাস্ত্রের পরিশিষ্ট বলিলেও বলা যাইতে পারে। পরমাণুতত্ব নিরূপণ করাই ইহার মুখ্য উদ্দেশ্য। পাতঞ্জল দর্শনকে যোগশাস্ত্র কহে। এই শাস্ত্রের বিচারাদি ন্যায়শাস্ত্রের অনুগামী। আত্মা এবং পরমাত্মা বিশ্বাস করা এবং উহাদের সংযোগসাধন করা, এই শাস্ত্রের উদ্দেশ্য। ইহা চারিপাদে বিভক্ত। যোগের লক্ষণাদি, ক্রিয়া-যোগাদি, সাধনপ্রকরণ, ধ্যান ধারণাদি বিভূতিবিবরণ এবং কৈবল্য-প্রাপ্তি অর্থাৎ জীবের নিখিল ব্রহ্মাণ্ডে ব্রহ্মাভাস হইয়া পরমানন্দস্বরূপ পরাৎপর পরমাত্মাতে লীন হইয়া যাওয়া। বিচার দ্বারা বৈদিক মর্ম্ম নিষ্পাদন করা মীমাংসাশাস্ত্রের উদ্দেশ্য এবং বেদান্তে ব্রহ্মের স্বরূপাদি নিরূপিত হইয়াছে। তিনিই বিশ্ব সংসারের সৃষ্টি, স্থিতি এবং লয়ের একমাত্র কারণ স্বরূপ। তিনি সর্ব্বশক্তিমান, সর্ব্বব্যাপ এবং সর্ব্বজ্ঞ। তাঁহার ইচ্ছায় সৃষ্টি হয়, থাকে এবং বিলয় প্রাপ্ত হইয়া থাকে। সুতরাং তিনিই এই পৃথিবীর একমাত্র কারণস্বরূপ। তিনিই জন্মমরণ-আদি-অন্ত-শূন্য, অনাদি, অক্ষয়, অজর, অদ্বিতীয় বিশ্বাত্মাস্বরূপ। বেদের শিরোভাগকে উপনিষৎ কহে। ইহার সংখ্যা শতাধিক। বিশ্বসংসারের উৎপত্তির কারণ, ব্রহ্মের স্বরূপলক্ষণাদি আত্মার বিচার এবং মন ও জড় পদার্থের সম্বন্ধ নির্ণয় করা উপনিষদের অভিপ্রায়। বেদের জ্ঞান-কাণ্ডাংশকে উপনিষদ্ কহা যায়।

ষড় দর্শন এবং ষড়বেদাঙ্গ শাস্ত্রাদিতে ব্যুৎপত্তি জন্মিলে বেদপাঠের অধিকার লাভ করা যায়। বেদ চারিখানি, ঋক্, সাম, যজুঃ এবং অথর্ব্ব। এই বেদ চতুষ্টয় ও শতাধিক উপনিষদ অধ্যয়ন করিলে বেদ

বিদ্যালাভ করা যায়। বেদ বিদ্যোপার্জ্জন করিবার পর সাধন পথাবলম্বন,পূর্ব্বক সমাধিস্থ হইবার কথা। সংক্ষেপে জ্ঞান বা বৈদিক মতের উদ্দেশ্য প্রভু আমার এইরূপে উল্লেখ করিয়াছেন।

বর্ত্তমান কালে বৈদিক শাস্ত্রাদি রীতি পূর্ব্বক অধ্যয়ন করিতে যদ্যপি কেহ প্রয়াস পান, কিন্তু তাহার সাধন করিবে কে? যোগের প্রক্রিয়া কণ্ঠস্থ করা সহজ হইলেও তাহা আয়ত্ত করা যারপরনাই কঠিন। যোগের একটী একটী প্রক্রিয়ানুষ্ঠান এবং তাহা সমাধান করিতে এক জন্মে সংকুলান হয় না। হটযোগের আসন, নেতি, ধৌতি প্রভৃতি অন্ত্র শুদ্ধি, ইন্দ্রিয়াদি সংযমন, ধ্যান, ধারণা, সমাধি কার্য্যে যে কি সাধনার প্রয়োজন, তাহা আমাদের বিদ্যাবুদ্ধির অতীত বিষয়। কেবল পাঁচটী আসনায়ত্ত করিতে পারিলেই সে সর্ব্বকার্য্য সিদ্ধি হইয়া যায়, তাহা নহে। কেবল দর্শনবিশেষের তাৎপর্য্য বোধ করিতে পারিলেই যে বেদমতে সিদ্ধ হইয়া যাইলাম, তাহা নহে। কার্য্য চাই, শাস্ত্র মর্ম্মজীবনে প্রতিফলিত করা চাই, তাহা হইলেই শাস্ত্রের উদ্দেশ্য সাধন হইতে পারে। কিন্তু এরূপ সাধক কোথায়? কেহ থাকিতে পারেন গিরিগুহায়, কেহ থাকিতে পারেন নিবিড় অরণ্যে, কিন্তু সর্ব্বসাধারণের উপায় কি? সর্ব্বসাধারণে বৈদিক কার্য্যে অশক্ত। অশক্ত অদ্য বা কল্য হন নাই। তাহা যুগ যুগান্তরের কথা। এই নিমিত্ত যুগধর্ম্মের ব্যবস্থা হইয়া আসিতেছে।

ভক্তি পথে পুরান এবং তন্ত্রাদি শাস্ত্র কথিত হয়। সাধারণ সংস্কার এই যে, বৈদিক ধর্ম্ম তেজোহীন হইলে পুরাণ এবং তন্ত্রাদি সৃষ্ট হয়। একথা সম্পূর্ণ কাল্পনিক বলিয়া বোধ হয়। কারণ, বেদাদিশাস্ত্রও যেমন ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টির পর সৃষ্টি দেখিয়া সৃষ্টি এবং সৃষ্টিকর্ত্তার বৃত্তান্ত তদন্ত হইয়াছে, তেমনি লীলারসময়ের লীলাবলম্বন পূর্ব্বক পুরাণের

সৃষ্টি হইয়াছে। এই নিমিত্ত পুরাণকে ইতিহাসও কহা যায়। পুরাণের পাঁচটী লক্ষণ নির্দ্দিষ্ট আছে। সৃষ্টিপ্রকরণ, সৃষ্টিনাশ এবং পুনর্সৃষ্টির বিবরণ, দেবতাতত্ব, মন্বন্তর বর্ণনা এবং চন্দ্র ও সূর্য্যবংশীয় রাজাদিগের ইতিহাস। পুরাণ অষ্টাদশভাগে বিভক্ত। সত্ব, রজঃ এবং তমোগুণ বা এই ত্রিগুণের স্বরূপ ব্রহ্মা বিষ্ণু এবং মহেশ্বরপ্রধান ভাববিশেষে তিন শ্রেণীতে বিভক্ত। যথা, সত্ব গুণপ্রধান পুরাণে বিষ্ণু, নারদীয়, ভাগবত, গড়ুর, পদ্ম, এবং বরাহ প্রভৃতি ছয়খানি পুরাণ উল্লিখিত। ইহারা বৈষ্ণব পুরাণ অর্থাৎ বিষ্ণুর প্রাধান্য দেখা যায়। দ্বিতীয় শ্রেণীর পুরাণসমূহকে তমোপ্রধান পুরাণ কহা যায়। ইহাতে মৎস্য, কূর্ম্ম, লিঙ্গ, শিব, স্কন্দ, এবং অগ্নি পুরাণাদি নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। ইহাকে শৈবভাবসম্পন্ন পুরাণ কহে। রজোভাবপূর্ণ পুরাণে ব্রহ্মার প্রাধান্য স্বীকার করা হয়। ব্রহ্মা, ব্রহ্মাণ্ড, ব্রহ্মবৈবর্ত্ত, মার্কণ্ডেয়, ভবিষ্য এবং বামন পুরাণ ইহার অন্তর্গত। বায়ুপুরাণের উল্লেখ আছে, উহা কখন কখন অগ্নির পরিবর্ত্তে ব্যবহার হয়। এতদ্ব্যতীত অষ্টাদশ উপপুরাণ আছে।

পুরাণশাস্ত্রমতে অদ্বৈত ব্রহ্মের লীলারূপের উপাসনার পদ্ধতি লিপিবদ্ধ হইয়াছে। অনন্তশক্তিসম্পন্ন ব্রহ্ম বা সৎ চিৎশক্তির বিকাশ-দ্বারা যেমন ব্রহ্মাণ্ড বিস্তারিত করিয়াছেন, তেমনি চিৎশক্তির দ্বারা অনন্ত অবতারের অভ্যুদয় করিয়া থাকেন। এই অবতার বা দেবদেবী কার্য্যবিশেষে প্রকটিত হইয়া সাধারণ জীবের কল্যাণ সাধন করিয়া থাকেন। জীবগণ এই বিশেষ বিশেষ অবতারদিগের অর্চ্চনা করিয়া দিব্যগতি লাভ করিয়া থাকে।

পুরাণে যদিও নানাবিধ দেবদেবীর উপাসনা বৃত্তান্ত দেখিতে পাওয়া যায়, কিন্তু প্রত্যেক দেবদেবীই সেই এক অদ্বিতীয় চিৎশক্তি

হইতে উদ্ভূত হইয়াছেন বলিয়া অদ্বৈতভাবে বৈষম্য দোষ ঘটিতে পারে না। যদ্যপি স্থিরভাবে কিয়ৎকাল বিচার করিয়া দেখা যায়, তাহা হইলে বুঝা যাইবে যে, পুরাণ শাস্ত্রাদি প্রকৃতপক্ষে ব্রহ্মের সাকার রূপের শাস্ত্র বলিয়া প্রতীতি জন্মিবে। বেদাদিশাস্ত্রে তিনি আকার-বিবর্জ্জিত ব্রহ্ম, পুরাণে আকারবিশিষ্ট দেবতা। যেমন জলীয় বাষ্প এবং বরফ প্রকৃতপক্ষে একই পদার্থ, কিন্তু অবস্থান্তরে আকৃতি প্রকৃতির তারতম্য হয়, সেইরূপ ব্রহ্ম এবং ব্রহ্মের লীলারূপ। বেদে অদ্বিতীয় সৎবস্তুর গুণগান করেন, পুরাণে সেই অদ্বিতীয় সৎবস্তুর লীলারূপের গুণগান করিয়া থাকেন। উভয় শাস্ত্রের উদ্দেশ্য এক অদ্বিতীয়, সৎবস্তু, কিন্তু কার্য্যপদ্ধতি স্বতন্ত্র প্রকার। হিসাবমতে বৈদিকশাস্ত্রকে সত্বগুণ এবং পুরাণকে রজোগুণবিশিষ্ট শাস্ত্র বলা যাইতে পারে। বেদের কঠোরসাধন, পুরাণসাধনের কঠোরতা সেরূপ নহে। পুরাণের ভক্তি বা সাধারণ কার্য্য, যথা, সেবার্চ্চনাদির ভাব থাকায় সাধারণ জীব বিনা সাধনে সে ভাবের কার্য্য সম্পন্ন করিতে কৃতকার্য্য হইয়া থাকে। এইজন্য বৈদিক ভাবের পরিবর্ত্তে পুরাণভাব প্রকাশ করা পরাৎপর পূর্ণব্রহ্মের দ্বিতীয় প্রয়াস হইয়াছে। জীবের কল্যাণ সাধনার্থ যেমন শ্রুতির উৎপত্তি হইয়াছে। জীবের কল্যাণ সাধনের নিমিত্ত তেমনি রূপের উৎপত্তি হইয়াছে, উভয় স্থলের উৎপাদক এক অদ্বিতীয় সৎবস্তু, এই নিমিত্ত পুরাণ এবং বেদ উভয়েই এক। বেদপ্রতিপাদ্য সৎবস্তু। যেমন সৃষ্টি অবলম্বনপূর্ব্বক স্থিরীকৃত হইয়াছে। সৃষ্টি চিৎশক্তিপ্রসূত ; ফলে চিৎশক্তির বিকাশ বলা যায়। পুরাণেও সেই চিৎশক্তিই অবলম্বন করিবার ব্যবস্থা আছে। উভয় স্থলে উদ্দেশ্য একই প্রকার, এই জন্য বেদ এবং পুরাণের পার্থক্য নাই।

বেদ অপেক্ষা পুরাণের সাধনপ্রণালী সুলভ হইলেও গুণ প্রভাবে

তাহা সাধারণের পক্ষে সর্ব্বদা সহজ বলিয়া বোধ হয় না। সাংসারিক ভাবে মন রঞ্জিত হইয়া যাইলে সে মনে ইষ্ট মূর্ত্তি ধ্যান ও ধারণা অতীব কষ্টসাধ্য, এমন কি দুঃসাধ্য বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। বৈদিক মতে চিত্ত নিরোধ করিয়া পরব্রহ্মে ধ্যান করা যেমন কঠিন, পুরাণমতে বিষয়াসক্ত মন বিষয়বিরহিত হইয়া বিশ্ববিধাতার লীলারূপে অর্পণ করা তাহা অপেক্ষা কোনমতে স্বল্প কঠিন নহে। তমোগুণ প্রধান ব্যক্তিদিগের মানসিক শক্তি ক্রমে সাংসারিক ভাবে এমন হীনবল হইয়া পড়ে যে, তাহারা এমন কি লীলারূপেও মনার্পন করিয়া শুদ্ধ ভাবে সেবা করিতে অশক্ত হইয়া থাকে। স্থূলজগতের অতি স্থূলভাবেই মন প্রাণ পরিপূর্ণ হইয়া যায়। মনোরাজ্যে ইন্দ্রিয় সমূহ একাধিপত্য স্থাপন করিয়া ফেলে। এরূপাবস্থায় বেদ পুরাণ আর স্থান পাইতে পারে না। মন নাই, অনন্ত চিন্তা করিবে কে? বুদ্ধি নাই, ন্যায়ের বিচার করিবে কে? বৈজ্ঞানিক চক্ষু নাই, বৈশেষিক দর্শন শাস্ত্রের পারমাণবিক অভিনয় দর্শন করিবে কে? ভক্তি নাই, রূপের সেবা করিবে কে? এইরূপাবস্থায় তন্ত্রের সাধন কখন কখন ফলদায়ক হইয়া থাকে। তন্ত্রশাস্ত্রের কার্য্যকলাপ তমোগুণে পরিপূর্ণ। সাধারণ জীব যে ভাবে দিন যাপন করিয়া থাকে, তন্ত্রে তাহাই প্রচুর পরিমাণে ব্যবহার করিতে দিয়াছেন। একটী দুইটী মকারে জীব পরিতৃপ্তি লাভ করে, ইহাতে পঞ্চ মকারের অবতরণ হইয়াছে। পঞ্চমকারের জীব হাবুডুবু খাইতে থাকে। তন্ত্রের বামাচারমতে পঞ্চমকারের ব্যবহারের আদেশ দিয়া মহেশ্বর দক্ষিণাচারের সাত্ত্বিকভাবের ব্যবস্থা করিয়া রাখিলেন। দক্ষিণাচারে পঞ্চমকার নাই। তথায় শিব শক্তির স্থূল সম্মিলন নাই। আধার চক্রস্থিত কুণ্ডলিনী বা জীবাত্মা শিরস্থিত সহস্রদল কমলশায়ী-পরমশিব বা পরমাত্মার সহিত সম্মিলন হওয়া দক্ষিণাচারের

উদ্দেশ্য। এই অবস্থা বৈদিক সমাধির ন্যায় অবস্থাবিশেষ। বামাচারের পরিণামও এই প্রকার। বামাচার এবং দক্ষিণাচারের পরিণাম এক বলিয়া কথিত হইলেও, বামাচারী সাধকদিগের সাধন পথে অতি সাবধানে বিচরণ করিতে হয়। প্রভু বলিতেন, বামাচার "পিছল ঘাট", অর্থাৎ সাবধান না হইলে এই পথে প্রতি পদে পদে পদস্খলিত হইবার সম্ভাবনা। অনেকেই এই ভাবে বিচরণ করিতে করিতে প্রকৃত উদ্দেশ্য ভুলিয়া যান এবং কেবল স্থূল ভাবে আকৃষ্ট হইয়া সমূহ বিপদপাৎ করিয়া থাকেন।

তন্ত্রে মাতৃভাবের উপাসনার প্রাধান্য দেখিতে পাওয়া যায়। আজকাল আমাদের মধুরাদি অন্যান্য ভাব বিকৃত হইয়াছে বলিলে অত্যুক্তি হয় না। আমরা তমোপ্রধান প্রকৃতিবিশিষ্ট হইয়াছি, সুতরাং আমাদের পক্ষে মাতৃভাবই অবলম্বন করা শ্রেয়। সুমধুর মাতৃভাবে উপাসনা করিলে আমাদের হৃদয় দ্রবীভূত হইয়া যায়, প্রাণে বিমল আনন্দের অভ্যুদয় হইয়া থাকে। কিন্তু আমরা যদ্যপি মধুরাদি ভাব অবলম্বন করিতে যাই, তাহা হইলে দেখিতে পাওয়া যায় যে, অধিকাংশ স্থলেই কাঁচারসের আস্বাদন করিয়া ফেলি। এই জন্যই, কর্ত্তাভজা নবরসিক প্রভৃতি সম্প্রদায়দিগের মধ্যে নানাবিধ কুৎসিৎ ভাবের প্রচলন দেখিতে পাওয়া যায়।

এই মাতৃভাব সাধারণের অবলম্বনীয় বলিয়াই প্রভু আমার সদা সর্ব্বদা "মা কালীর ইচ্ছা" বলিতেন। কিরূপে মাতৃভাবে উপাসনা করিতে হয়, কিরূপে ভগবতীকে মা বলিয়া ডাকিতে হয়, তাহা জীবকে শিক্ষা দিবার জন্য, তিনি নিজে সাধনাবস্থায় দেখাইয়া গিয়াছেন। সে সময়ে তিনি মাতৃহারা শিশুর ন্যায় "মা আনন্দময়ী! কোথায় আছিস্ মা! দেখা দে মা!" বলিয়া রোদন করিতে করিতে ভাগীরথী-

তটে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িতেন, কোনমতেই তাঁহার মূর্চ্ছা অপনোদন হইত না। দুনয়নে ধারা প্রবাহিত হইয়া ধরাতল অভিসিক্ত করিত। এত অশ্রু নিপতিত হইত যে, তিনি যে স্থানে পতিত হইয়া থাকিতেন, সে স্থান একেবারে কর্দ্দমময় হইয়া যাইত। পরে কর্ণমূলে মা নাম বারম্বার উচ্চারণ করিলে তবে তাঁহার চৈতন্য হইত।

বেদ, পুরাণ এবং তন্ত্র বিশ্লিষ্ট করিলে বুঝা যায়, এই শাস্ত্রত্রয়ের উদ্দেশ্য একই প্রকার, কার্য্যও একই প্রকার, কেবল কার্য্যপ্রণালী বিভিন্ন প্রকার বলিয়া অবগত হওয়া যায়। কার্য্য প্রণালী গুণভেদে অবশ্যই পৃথক হইবে, তাহা লীলাময়ের অপরিবর্ত্তনীয় লীলা রহস্য।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেব এইরূপে বেদ, পুরাণ, তন্ত্রের মুখ্য উদ্দেশ্য বাহির করিয়া একীকরন করিয়া দিয়াছেন। কেবল হিন্দুশাস্ত্র কেন, কোরাণ বাইবেল এবং অন্যান্য প্রকাশ্য এবং অপ্রকাশ্য সাধন পন্থাদি আলোচনা এবং সাধন করিয়া সর্ব্বত্রে এক অদ্বিতীয় সৎ বস্তুরই সত্ত্বা দর্শন করিয়া বলিয়া গিয়াছেন, "অদ্বৈত জ্ঞান আঁচলে বাঁধিয়া যাহা ইচ্ছা তাহাই কর।"

রামকৃষ্ণদেবের উপদেশানুসারে আমরা কোন শাস্ত্রবিশেষকে শ্রেষ্ঠাসন দিতে পারি নাই। বেদ সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, পুরাণ মধ্যম এবং তন্ত্র কনিষ্ঠ. এমন কোন কথা বলিবার আমাদের অধিকার নাই। বেদ অতি প্রাচীন গ্রন্থ, পুরাণ তাহাপেক্ষা আধুনিক এবং তন্ত্র কল্যকার প্রণীত, এমন কথা বলিবার কোন হিন্দুর অধিকার নাই। শাস্ত্র বাক্য সমুদয় সত্য, অভ্রান্ত, নিত্য, রামকৃষ্ণদেব শ্রীমুখে সর্ব্বদাই এই কথা বলিতেন। অধিকারীভেদে শাস্ত্রবিশেষের উপযোগিতা হইতে পারে, তাহা বলিয়া শাস্ত্র ছোট বড় হয় না। অধিকারী ছোট বড় হইতে পারে। হিন্দুরা এইজন্য সকল শাস্ত্রই

মানিতে চাহে, সকল দেবতাকেই ভক্তি করিতে চাহে। পাশ্চত্য শিক্ষার দোষে সাম্প্রদায়িক ধর্ম্ম প্রচার দ্বারা এবং হিন্দুকুল দীর্ঘ-কাল ধর্ম্মবিরোধী রাজাদিগের শাসনাধীনে থাকিয়া কতকগুলি প্রক্ষিপ্তভাব শিক্ষা করিয়া শাস্ত্রবাক্যের সত্যাসত্যতা সম্বন্ধে বিচার করিতে আমরা শিক্ষা করিয়াছি। আমরা রামকৃষ্ণদেবের উপদেশ শ্রবণ করিয়া শাস্ত্র মর্ম্মের তাৎপর্য্য তাঁহার জীবনে দেখিয়াও তথাপি পূর্ব্বসংস্কারের হস্ত এড়াইতে পারিতেছি না, ইহা সামান্য পরিতাপের কথা নহে।

রামকৃষ্ণদেব শাস্ত্রাধ্যয়ন করিয়া কিম্বা তাহা কাহার নিকট শ্রবণ করিয়া একথা বলেন নাই। তিনি ভগবানের বাক্য দৈববাক্য বা ঋষিবাক্য বলিয়া অন্ধ বিশ্বাসের বশবর্ত্তী হন নাই। ভিন্ন ভিন্ন শাস্ত্রের ভিন্ন ভিন্ন মত ভিন্ন ভিন্ন ভাব। বৈদান্তিক শাস্ত্রানুসারে চিরসন্ন্যাস ব্রত অবশ্য প্রতিপালন করিতে হয়, পুরাণ এবং তন্ত্র মতবিশেষে তাহার প্রয়োজন হয় না। বেদান্ত মতে সত্ত্বগুণাশ্রয় করিতে হয়, পুরাণ ভাবে রজো এবং তন্ত্রে তমোভাবেও ক্ষতি হয় না। বেদান্ত মতে নির্গুণ নিরাকার ব্রহ্মোপসনা, পুরাণ এবং তন্ত্র-মতে সগুণ সাকার মূর্ত্তির উপাসনা। এইরূপ বিভিন্নতার নিদান নিরূপনার্থ তিনি কৃতসঙ্কল্প হইয়া গুরুকরণ পূর্ব্বক প্রত্যেক শাস্ত্রানুযায়ী সাধন করিয়াছিলেন এবং তিন দিনের সাধনেই তিনি সিদ্ধ মনোরথ হইতেন। একথা আমরা তাঁহার শ্রীমুখেই উপর্য্যু-পরি শ্রবণ করিয়াছি।

একথাও এক্ষণে সাধারণে প্রকাশিত আছে যে, তিনি হিন্দু শাস্ত্রোক্ত সাধনপ্রণালী ব্যতীত মুসলমান এবং খ্রীষ্টানদিগের সাধন পন্থায়ও পরিভ্রমণ করিয়াছিলেন। এরূপ ভাবের সাধন কার্য্যে

রামকৃষ্ণদেবই এক অদ্বিতীয় সাধকরূপে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। এই নিমিত্ত ধর্ম্মজগতে যদ্যপি প্রকৃত উপদেষ্টা বলিয়া কাহাকেও নির্দ্দেশ করিতে হয়, তাহা হইলে রামকৃষ্ণদেবকে বলিতে হইবে। সুতরাং বর্ত্তমান ধর্ম্মবিপ্লবকালে রামকৃষ্ণদেব ব্যতীত দ্বিতীয় উপদেষ্টা আর কেহ নাই! একথা আমি উচ্চৈঃস্বরে বলিতে পারি। রামকৃষ্ণদেব ধর্ম্মশাস্ত্র সম্বন্ধে বলিয়াছেন যে, কোন গ্রন্থই অমূলক নহে, কোন ধর্ম্মই ভ্রান্তিসঙ্কুল নহে, যে যে মতে যেভাবে ধর্ম্মানুষ্ঠান করে, সে সেই ভাবেই চরিতার্থ হইয়া থাকে। ধর্ম্মের ইতর বিশেষ নাই, ভাল মন্দ নাই। ধর্ম্ম পথ প্রশস্ত এবং সঙ্কুচিত, এরূপ কোন কথা নাই। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ কালের মহিমাপ্রভাবে এই অত্যল্প কালমধ্যেই রামকৃষ্ণদেবের ভাবের ব্যতিক্রম হইতে আরম্ভ হইয়াছে। যে ব্যক্তি তাঁহাকে কখন দর্শন করিয়াছে কিনা সন্দেহ, সে ব্যক্তিও এখন রামকৃষ্ণদেবের উপদেশের অধ্যাপকবিশেষ হইয়া দাঁড়াইয়াছে। যাঁহারা একবার তাঁহাকে দর্শন করিয়াছেন, তাঁহাদের কোন কথাই নাই। বর্ত্তমানকালে ধর্ম্মজগতে বাস্তবিক ভাববিকৃতির সময় উপস্থিত হইয়াছে। সেইজন্য হিন্দুশাস্ত্র লইয়া এত গোলযোগ লাগিয়াছে। সেইজন্য হিন্দু হইয়া হিন্দুশাস্ত্রের অমর্য্যাদা করিতে অগ্র পশ্চাৎ ভাবেন না, হিন্দুসন্তান হইয়া মাতৃভূমিকে অন্তরের সহিত ঘৃণা করিতে লজ্জা বোধ হয় না, এমন সময়ে যে রামকৃষ্ণদেবের প্রকৃতভাব বিকৃত হইবে, সে বিষয়ে সন্দেহ কি? রামকৃষ্ণদেব হিন্দু শাস্ত্রাদি সম্বন্ধে যে প্রকার অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা স্বতন্ত্রভাবে আমি ইতিপূর্ব্বে সাধ্যমত বলিয়াছি এবং অদ্যও কিঞ্চিৎ সংক্ষেপে বলিলাম। কেবল শাস্ত্রের বিচার করিলে কাহারও কোন ফল ফলিবার সম্ভাবনা নাই। আমা-

দের শাস্ত্রাদি ভাল হউক, পৃথিবীর সমুদয় ব্যক্তির ধর্ম্ম গ্রন্থ অপেক্ষা উৎকৃষ্ট হউক, তাহাতে আমাদের ক্ষতি বৃদ্ধি কি? বাক্সে রাশি রাশি ধন সঞ্চিত থাকিলে তাহাতে অন্যের দুঃখাবসান হয় না, ধোপার ঘরে রাশি রাশি বস্ত্র থাকে, ধোপার তাহাতে ক্ষতি বৃদ্ধি কি হয়? বলদে চিনির বস্তা বহন করিলে তাহার কি লাভ হইয়া থাকে? ঠাকুর বলিতেন যে, পাঁজিতে লেখা থাকে এবার বিশ আড়ি জল হইবে, পাঁজি নিংড়াইলে কি এক ফোঁটা জল নির্গত হইতে পারে? কার্য্য চাই। শাস্ত্র মর্ম্মানুসারে কার্য্য না করিলে তাহার ফল প্রাপ্ত হইবার কোন সম্ভাবনা নাই। রামকৃষ্ণদেব বলিতেন যে, সিদ্ধি সিদ্ধি বলিলে নেশা হয় না, সিদ্ধির ইতিহাস পাঠে কখন সিদ্ধির মাদকতা গুণের পরিচয় পাইবার উপায় নাই। সিদ্ধির বৃত্তান্ত কাহার মুখে শ্রবণ করিলেও তাহার গুণ বোধ হইতে পারে না, সিদ্ধি আনিতে হইবে, ঘুটিতে হইবে, কেবল মুখের ভিতর রাখিলেও হইবে না, গিলিতে হইবে। গলাধঃকরণ করিয়াই উদ্গিরণ করিলে হইবে না, পেটের ভিতরে কিয়ৎকাল থাকা চাই। পরে উহা শরীরে শোষিত হইলে তখন নেশা হয় এবং জয় কালী জয় কালী বলিয়া নৃত্য করিতে থাকে।

বাজনার বোল "লাক্ তেরাখেটা" শুনিবা মাত্র শিক্ষা করা যায় কিন্তু সে বোলটা বাদ্যযন্ত্রে বহির্গত করিতে ছয় মাস অতিবাহিত হইয়া যায়। অতএব ধর্ম্ম কেবল শিক্ষার বিষয় নহে, উহা সাধনের সামগ্রী।

ধর্ম্মোপদেষ্টার অপ্রতুল নাই। যে কেহ যে কোন শাস্ত্রের বিষয় অবগত হইতে চাহেন, সে ভাব অনায়াসে পূর্ণ হইতে পারে। আমাদের দেশে পণ্ডিতের অভাব নাই। ভাষা শিক্ষার ক্লেশও আর এখন

নাই, অধিকাংশ শাস্ত্র চলিত ভাষায় ভাষান্তরিত হইয়াছে। ইংরাজ বাহাদুরেরাও সমুদয় আর্য্যশাস্ত্র উদ্ধার এবং ভাষান্তর করিয়াছেন, যদিও সর্ব্বসময়ে ভাবরক্ষা না হউক, কিন্তু নিতান্ত বিরুদ্ধ ভাব প্রকটিত হয় নাই। ফলে এতদ্দ্বারা কি হইবে? সাধক কোথায়? ধর্ম্মজীবন কোথায়? ধর্ম্মের জ্বলন্ত আদর্শ কোথায়? ইহারই অভাব জন্মিয়াছে। সেই অভাব বিমোচনের নিমিত্ত রামকৃষ্ণদেবের অভ্যুদয় হইয়াছিল। এই নিমিত্ত তাঁহার উপদেশই এবং তাঁহার জীবনই একমাত্র শিক্ষার এবং সাধনের আদর্শবিশেষ।

কথিত হইয়াছে যে, তিনি শাস্ত্রাদি অধ্যয়ন করিয়া জ্ঞান ভক্তি লাভ করেন নাই। তাঁহাকে যখন পাঠশালায় পাঠাইবার ব্যবস্থা হয়, তিনি বলিয়াছিলেন, যে বিদ্যার ফলে চাউল কলা লাভ হয়, আমি সে বিদ্যা শিক্ষা করিব না। কিন্তু তিনি গুরুকরণ করিয়াছিলেন। গুরুকরণ তর্থাৎ কাহার নিকটে শিক্ষা করা তাঁহার প্রধান কার্য্য ছিল। গুরু ব্যতীত, শিক্ষক বিনা শিক্ষা কার্য্য হয় না, তাঁহার ধ্রুব জ্ঞান ছিল। তিনি বুঝিয়াছিলেন যে, উপদেষ্টার কখন অভাব হয় না কিন্তু প্রকৃত শিষ্যের সংখ্যা অতি অল্প। এই নিমিত্ত তিনি সর্ব্বদা বলিতেন যে, গুরু মিলে লাখ্ লাখ্, চেলা নাহি মিলে এক। শিষ্যত্ব জ্ঞান থাকিলে, শিক্ষা করিবার অধ্যবসায় থাকিলে, তৃণের নিকটেও মহান্ বিষয় শিক্ষা করা যাইতে পারে। যেমন ক্ষুৎ পিপাসান্বিত দরিদ্র ব্যক্তি পথের ধারে প্রক্ষিপ্ত অন্নব্যঞ্জন আনন্দে ভক্ষণ করিয়া থাকে। সে ভাল মন্দ বিচার করে না, পবিত্র অপবিত্র বিচার করে না, স্থানাস্থান বিচার করে না, তেমনি শিক্ষার্থী গুরুর ভালমন্দ জ্ঞানাজ্ঞান বিচার না করিয়া তদ্প্রদর্শিত পথানুসারে গমন করিয়া সময়ে গন্তব্য স্থানে নির্ব্বিঘ্নে উপনীত হইয়া

থাকে। মহাভারতে একলব্যের উপন্যাস বোধ হয় অনেকেই জানেন। একলব্য অতি নিচ কুলোদ্ভব বলিয়া দ্রোণাচার্য্য তাহাকে শরবিদ্যা শিক্ষা দেন নাই। একলব্য মৃত্তিকার দ্রোণ নির্ম্মাণ করিয়া তাঁহার প্রতি আন্তরিক শ্রদ্ধাভক্তি দ্বারা অতি অল্প দিনের মধ্যে শরবিদ্যায় সুশিক্ষিত হইয়া পড়ে। একদা দ্রোনাচার্য্য পাণ্ডবকুলশেখর মহাবীর অর্জ্জুনকে সমভিব্যাহারে লইয়া যাইতেছিলেন, পথিমধ্যে একলব্যের সহিত সাক্ষাৎ হয়। একলব্যের পরিচয় পাইয়া দ্রোণাচার্য্য তাহাকে পরীক্ষা করেন। পরীক্ষায় তাহার অসাধারণ শক্তি দেখিয়া ভাবিলেন যে, অর্জ্জুনকে পরাজয় করিতে এই এক ব্যক্তি আছে। দুর্য্যোধনের সহায়তা করিলে অর্জ্জুন কখন রণে কৃতকার্য্য হইতে পারিবে না। তিনি গুরুদক্ষিণার ভান পূর্ব্বক তাহার দক্ষিণহস্তের বৃদ্ধাঙ্গুলি ছেদন করাইয়াছিলেন। এ দৃষ্টান্তে মৃত্তিকার গুরু জড়-গুরুর দ্বারা একলব্য কৃতার্থ হইয়াছিল। গুণ কাহার? গুরুর না শিষ্যের? শিষ্যেরই অধ্যবসায়ের চূড়ান্ত পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যাইতেছে। রামকৃষ্ণদেব এই জন্যই বলিতেন যে, বর্ত্তমান কালে সকলেই গুরু হইতে চাহেন, শিষ্য হইতে কেহ চাহেন না, সুতরাং শিক্ষার সম্পূর্ণ ব্যাঘাত জন্মিতেছে। তিনি বলিতেন যে, গুরু বাছাই করিবার অবশ্যকতা কি? গুরুর পরীক্ষা লইয়া গুরু করা যারপরনাই রহস্যের কথা। পিতা বাছাই করিয়া কেহ কি জন্মগ্রহণ করে? না কস্মিন্ কালে এরূপ কথা কেহ কখন শুনিয়াছে, না কস্মিন্ কালে এরূপ ঘটনা কখন ঘটিয়াছে? গুরু নির্ণয় করাও তেমনি হাস্যজনক কথা। ক্ষুধাতুর যেমন ভোজ্য বস্তু পাইলেই ভোজন করে, দরিদ্র অর্থ পাইলেই আনন্দে গ্রহণ করে, রোগী ঔষধ পাইলেই সেবন করে, তেমনি ধর্ম্মপিপাসু ধর্ম্ম

পাইলে অঞ্জলি পাতিয়া গ্রহণ করিয়া থাকে। প্রয়োজন সকল কার্য্যের মূল। অভাবই সকল কার্য্যসাধনের একমাত্র নিদান। বাটীর সম্মুখে চিকিৎসক থাকিলে তাঁহার প্রয়োজন হয় না কিন্তু প্রয়োজন সময়ে একজন হাতুড়িয়াকেও আদর করিয়া আনয়ন করিতে হয়। রামকৃষ্ণদেবের উপদেশ এই যে, "আমার গুরু যদি শুঁড়িবাড়ী যায়। তথাপি আমার গুরু নিত্যানন্দ রায়।" গুরু যেমনই হউন, শিষ্যের তাহা দেখিবার আবশ্যক নাই। গুরু যে মন্ত্র বলিয়াছেন সেই মন্ত্র জপ, যে রূপ দেখাইয়াছেন সেই রূপ ধ্যান করিয়া যাওয়াই শিষ্যের কর্ত্তব্য। গুরু ভগবানের নাম বলিয়া দিয়া থাকেন, গুরু ভগবানের লীলারূপ দেখাইয়া দিয়া থাকেন। ভগবান্ চিন্তা, ভগবানের নাম করিলে ভগবান্ কি তাহা শুনিতে পান না, ভগবানের কর্ণে কি এ কথা পৌঁছে না, তিনি না সর্ব্ব-ব্যাপী? জ্ঞানহীন শিষ্য একথা জানুক আর নাই জানুক, সর্ব্বব্যাপী ভগবান্ কি তাহা বুঝিতে অশক্ত? তিনি না সর্ব্বজ্ঞ, একজন অজ্ঞান তাঁহাকে ডাকিতেছে, একথা সর্ব্বজ্ঞের শ্রুতিমূলে কি প্রতি-ধ্বনিত হয় না? একটী বাটীতে একজন লোক বাস করে। তাঁহার নাম ধরিয়াই হউক, আর বাটীতে কেহ আছেন কি না বলিয়া ডাকিলে, তথায় দ্বিতীয় ব্যক্তি না থাকায় সেই এক অদ্বিতীয় ব্যক্তিই প্রত্যুত্তর দিতে বাধ্য। ভগবান্ বহু নহেন, একজনই নানারূপে নানাভাবে লীলার বৈচিত্র্য সম্পন্ন করিয়া থাকেন। সুতরাং সেই লীলারসময় শ্রীহরিই সাধকের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করিবার অদ্বিতীয় কর্ত্তা। ফলাফল প্রদান করিবার শক্তি অদ্বিতীয় শক্তিধরেরই আছে। বিচার করিবার ভার একজন বিচারপতিরই হস্তে ন্যস্ত আছে। তখন তাঁহার দিকে চাহিয়া থাকিলে ভয় কিসের? চিন্তা কিসের? ভাবী-

পরিণাম লইয়া আন্দোলন করিবার আবশ্যক কি? মনের গুণে ফললাভ হয়, এ কথা কি আমরা বুঝিতে পারি নাই? রামকৃষ্ণদেব বলিতেন যে, মনই কার্য্যসাধনের একমাত্র কারণ স্বরূপ। আমরা সাক্ষাৎ সম্বন্ধে যে কোন কার্য্যই করি, মনে তাহার বিশেষ সম্বন্ধ না থাকিলে সে কার্য্যের সুফল হয় না। যদ্যপি পুস্তক খুলিয়া সমস্ত দিন বসিয়া থাকি, একটী বর্ণও হৃদয়বোধ হইবে না। মনের ভাব লইয়াই ফলাফলের তারতম্য হইয়া থাকে। আমার প্রভু বলিতেন যে,

গুরুকৃষ্ণ বৈষ্ণবের তিনের দয়া হ'ল।
একের দয়া না হ'তে জীব ছারেখারে গেল॥

'এক' অর্থে মনকে বুঝাইতেছে। গুরুর কৃপা হইলে কি হইবে, ভগবানের কৃপা হইলেই কি হইবে এবং ভক্তগণের কৃপা হইলেই কি হইবে। মন যদ্যপি গ্রহণ না করে, তাহা হইলে কাহারও দ্বারা কোন ফল ফলিতে পারে না।

মন যাহাতে বিশ্বাসী হইতে পারে, এরূপ ভাবে মনটীকে প্রস্তুত করা কর্ত্তব্য। মন অবিশ্বাসী হইয়াই সর্ব্বনাশের পথোন্মুক্ত করিয়া রাখিয়াছে। তাই রামকৃষ্ণদেব আপনি গুরুকরণ করিয়া গুরুবাক্যে বিশ্বাসী হইবার জন্য শিক্ষা দিয়া গিয়াছেন। তিনি বলিতেন যে, ভগবান্‌কে লাভ করিতে হইলে গুরুবাক্যে বিশ্বাস করা ব্যতীত দ্বিতীয় পন্থা নাই। বিশ্বাসই ঈশ্বর লাভের একমাত্র উপায়। ঠাকুর বলিয়াছেন, যেমন হস্তী বন্ধন করিতে হইলে রজ্জুর প্রয়োজন হয়, তেমনি ভগবান্ সম্বন্ধে বিশ্বাস বুঝিতে হইবে। বিশ্বাস বিনা ভগবান্‌কে লাভ করা যায় না। বিশ্বাসেই জগৎ চলিতেছে। বিশ্বাস না করিলে এক মুহূর্ত্ত কার্য্য চলে না।

কে বলিল যে, এক একটী নক্ষত্র এক একটী সৌরমণ্ডল?—বিশ্বাস। মনুষ্যকে মনুষ্য বলি কেন?—বিশ্বাস। গাভীকে অশ্ব বলি না কেন?—বিশ্বাস। যে কোন বস্তুর জ্ঞানলাভ করি বিশ্বাসই তাহার কারণ স্বরূপ। পিতাকে পিতা বলি কেন?—বিশ্বাস। মাতাকে মাতা বলি কেন?—বিশ্বাস। বিশ্বাস আছে যে, ক্ষৌরকার ঘাতক নহে, তজ্জন্য নিঃসন্দেহে গলা পাতিয়া রাখি। জলপথে গমনকালীন নৌকায় আরোহণ করি কেন?—বিশ্বাস, যে উহাতে কোন আশঙ্কা নাই। অপরের কথায় বিশ্বাস করিয়াই কার্য্য করিতে হয়। সকল সময়ে সকল বিষয়ে প্রত্যক্ষ করিয়া কার্য্যে প্রবৃত্ত হওয়া যায় না এবং অনেক সময়ে তাহা সম্পূর্ণ অসম্ভব। যেমন পিতা সম্বন্ধে প্রত্যক্ষ সিদ্ধান্ত করিতে যাইলে বাতুলতার চূড়ান্ত পরিচয় দিতে হয়। যেহেতু পিতা নিরূপণ করা মনুষ্যসাধ্যাতীত। মাতার কথায় বিশ্বাস না করিলে পিতা স্থির হয় না। অতএব বিশ্বাসই কার্য্য সিদ্ধির একমাত্র নিদান বলিয়া জ্ঞাত হওয়া উচিত। আমাদের অগণন শাস্ত্র, নানা মুনির নানা মত। যখন যে মহাত্মা আবির্ভূত হইয়াছেন, তখন সেই মহাশয়ের অভিলষিত শাস্ত্রেরই প্রাদুর্ভাব হইয়াছে। কখন বৈদিক, কখন পৌরাণিক, কখন তান্ত্রিক এবং কখন ত্রিবিধ মতের যৌগিক মত সকল প্রচলিত হইয়া বহুবিধ ভাবের শাস্ত্রাদি চলিয়া আসিতেছে। মধ্যে মধ্যে সংস্কারকগণ আপনাপন প্রিয় মতবিশেষের শ্রেষ্ঠতা দেখাইয়া সর্ব্বসাধারণকে সেই দিকে আকৃষ্ট করিতে যত্নবান হইয়া থাকেন। তাঁহাদের কথায় বিশ্বাস করিয়া অনেকেই সেইদিকে ধাবিত হইয়া পরিশেষে বিভ্রাটেও পতিত হইয়াছেন। সাম্প্রদায়িক ধর্ম্মপ্রচারকদিগের এইরূপে এক পক্ষীয় মত বিস্তার হওয়ায় আমাদের দেশে

সাধারণ ভাবে ধর্ম্মালোচনা করা আতঙ্কের বিষয় হইয়া উঠিয়াছে।

কথায় বিশ্বাস করিতে যাইলে আপনাদের চির অভ্যস্ত চির শিক্ষিত কৌলিক সংস্কার পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হইতে হয়। জাতি কুলের মস্তকে পদাঘাত করিতে হয়, আত্মীয় বন্ধুবান্ধববিহীন হইতে হয়, এই নিমিত্ত আমাদের দেশে ক্রমেই অবিশ্বাস আসিয়া সকলের অভ্যন্তরে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছে। আমাদের তিন শ্রেণীর শাস্ত্র সত্ত্বেও এইরূপ কার্য্য হইতে দেখিয়াছি। বৈদান্তিকমতের সন্ন্যাসীর একেবারে অপ্রতুল হয় নাই। মুণ্ডিত মস্তক, গৈরিক পরিচ্ছদ, কমণ্ডলু করে সহস্র সহস্র বৈদান্তিক সাধু এই রাজধানীতে দেখিতে পাওয়া যায়, পুরাণ এবং তন্ত্রাদি বিহিত কার্য্যকলাপ ঘরে ঘরে দেখিতে পাওয়া যায়; বিশুদ্ধ উপনিষদের ভাবাশ্রয় করিয়া আদি ব্রাহ্মসমাজ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। হিন্দু মুসলমান এবং খৃষ্টান ধর্ম্মের সারভাগ সংগ্রহ পূর্ব্বক ব্রাহ্মসমাজ চলিতেছে, ধর্ম্মশিক্ষা ধর্ম্মদীক্ষার একেবারে লোপ হইয়া গিয়াছে, একথা কে বলিতে চাহেন? তবে ধর্ম্মজগতে এই বিসম্বাদ কেন? কেহ কাহাকে বিশ্বাস করিতে অশক্ত কেন? বৈদান্তিক মতকে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বলিয়া পুরাণ তন্ত্রকে অবজ্ঞা করা হয় কেন? কেনই বা পুরাণকে শ্রেষ্ঠ বলিয়া পরিগণিত করা হয়, কেনই বা তান্ত্রিক কার্য্যকে কলিকালের মোক্ষ প্রাপ্তির সেতু বলা হয়? কেনই বা ব্রাহ্মেরা হিন্দুর উপাসনাকে ঘৃণা করেন, হিন্দুরা ব্রাহ্মদিগকে কি জন্য বিদ্রূপ করেন? সকলে ধর্ম্ম কথা বলিতে চাহেন, সকলে ধর্ম্ম পথে আকর্ষণ করিতে চাহেন, তাহা জানিয়া শুনিয়াও কেহ কাহাকেও বিশ্বাস করিতে চাহেন না। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, বিশ্বাস করিতে যাইলেই আপন সর্ব্বনাশ নিমন্ত্রণ করা হয়। আমাদের এই ভীষণ সময়ে আদর্শের প্রয়োজন হইয়াছে,

সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। বিশ্বাস করিব কোন্ শাস্ত্র? বিশ্বাস করিব কাহাকে? কথা অতি গুরুতর। মনুষ্যজীবনের গুরুতর কার্য্য বলিয়া যগুপি কোন কার্য্য থাকে, তাহা ধর্ম্মানুষ্ঠান। ধর্ম্মই ইহ-পরকালের একমাত্র সহায় এবং সম্বল। ধর্ম্ম স্থলে অধার্ম্মিক হইলে, ধর্ম্ম কার্য্যে মহাপাতকী হইলে, তাহার আর পরিত্রাণ নাই। অজ্ঞান কৃত পাপের প্রায়শ্চিত্ত আছে, কিন্তু জ্ঞানকৃত পাপের উপায় নাই। এইজন্য গুরু লইয়া এত গোলযোগ ঘটিয়াছে, আদর্শ লইয়া বিভ্রাট উপস্থিত হইয়াছে, শাস্ত্র লইয়া বিষম সমস্যায় পতিত হইতে হইয়াছে। আমাদের এই-রূপাবস্থায় শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেব আবির্ভূত হইয়া, আপনার জীবন সংগঠন পূর্ব্বক আদর্শ-স্থান অধিকার করিয়া বসিয়াছেন। বিশ্বাস করিতে হয় কিরূপ, বিশ্বাস করিতে হয় কাহাকে, তাহার দ্বিতীয় দৃষ্টান্ত আর নাই তিনি জীবনে দেখাইয়াছেন যে, সকলের কথায় বিশ্বাস করা উচিত। যে ব্যক্তি সরলভাবে সকলের কথা বিশ্বাস করে তাহার কখন অমঙ্গল হইতে পারে না। বিশ্বাসের কার্য্য অতি আশ্চর্য্যজনক। বিশ্বাস-প্রসূত অপূর্ব্ব ঘটনাবলী দর্শন সুখ সম্ভোগের অধিকারী বিশ্বাসীই হইয়া থাকে। বিশ্বাসের পরাক্রমে মনুষ্য মরিতে বাঁচিতে পারে। যদ্যপি কাহার বিশ্বাস থাকে যে অমুক তেঁতুল গাছে একটা পেত্নী আছে, অন্ধকার রাত্রে তথায় সহসা উপস্থিত হইয়া বৃক্ষে পক্ষী নড়িতে শুনিলে আতঙ্কে তাহার জীবন সংশয় হইয়া উঠে। বিশ্বাসের মহিমায় রোগী রোগ মুক্ত হয়. এ কথা সাধারণের বিশ্বাস। তারকনাথে হত্যা দিলে প্রত্যাদেশ হয় এবং অনেকে উৎকট ব্যাধি হইতে মুক্তিলাভও করে। তারকনাথে সকলের অন্য বিশ্বাস না থাকিলেও, মনের বিশ্বাস স্বীকার করিতে অনেকেই বাধ্য হইয়া থাকেন।

বিশ্বাসের বল কতদূর তাহা বলিয়া উঠা যায় না। যদ্যপি কাহারও

মনে বিশ্বাস জন্মাইয়া দেওয়া যায় যে, শীঘ্রই তাহার মৃত্যু হইবে, তাহার মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী। প্রসিদ্ধ বৈজ্ঞানিক ফাদার লাঁফো এ বিষয়ে একটী ঘটনা আমাদিগের নিকট বর্ণনা করিয়াছেন।

ইয়োরোপের কোন প্রদেশে দুইজন কয়েদীর প্রাণ দণ্ড হইবার আজ্ঞা হয়। তাহাদের প্রাণনাশ অপরিহার্য্য জানিয়া সেই প্রদেশস্থ বৈজ্ঞানিকেরা সংস্কারের বল কতদূর পরীক্ষা করিবার জন্য ঐ কয়েদী দুইটীকে পরীক্ষার্থে গ্রহণ করেন। দুইজনকেই লইয়া পৃথকভাবে পরীক্ষা করা হয়।

পরীক্ষা করিবার জন্য বৈজ্ঞানিকেরা অনেক কৌশল করিয়া রাখিয়াছিলেন। যখন প্রাণ বধের জন্য এক ব্যক্তিকে ফাঁসি কাষ্ঠের উপর উত্তোলন করা হয়, সেই সময়ে তাহাকে বলা হইল "দেখ! রাজা তোমার উপর কৃপা প্রকাশ করিয়া তোমার পরিমুক্তির আজ্ঞা প্রদান করিয়াছেন। তুমি গৃহে চলিয়া যাও।" সে ব্যক্তি আনন্দে বিহ্বল হইয়া গৃহাভিমুখে চলিল। বৈজ্ঞানিকেরা ষড়যন্ত্র করিয়া পথের মধ্যে মধ্যে এক একজন দাঁড়াইয়াছিলেন। যখন ঐ ব্যক্তি, প্রথম বৈজ্ঞানিকের নিকট উপস্থিত হইল, তখনি তিনি বলিয়া উঠিলেন, "কোথায় যাইতেছ, দাঁড়াও! দাঁড়াও! তোমার মুখ চোখ যে সমস্ত বিবর্ণ হইয়া গিয়াছে, তোমার যে ভয়ানক অবস্থা দেখ্ছি। দাড়াও! দাঁড়াও! কোথায় যাইতেছ!"

কয়েদী বলিল—"তা হইতে পারে। এই কিছুক্ষণ পূর্ব্বে আমার মানসিক অবস্থা অতিশয় শোচনীয় ছিল, বোধ হয় সেই জন্যই এইরূপ পরিবর্ত্তন হইয়াছে।" এই বলিয়া সে পুনর্ব্বার চলিতে আরম্ভ করিল এবং ভাবিতে লাগিল, এ কিরূপ হইল? কিছুদূর যাইতে না যাইতেই দ্বিতীয় বৈজ্ঞানিকের সহিত তাহার সাক্ষাৎ হইল। বৈজ্ঞা-

নিক কহিতে লাগিলেন, "আরে তুমি যাও কোথায়? এখনি যে পড়িয়া যাইবে। তোমার যে শরীরে ভয়ঙ্কর ব্যাধি প্রবেশ করিয়াছে।" কয়েদী একথা শুনিয়াও গৃহাভিমুখে চলিল, কিন্তু তাহার মনে মনে বিশ্বাস জন্মিল যে, তাহার শরীরের অবস্থা অতি শোচনীয় হইয়াছে। কিয়দ্দূর না অগ্রসর হইতেই, আর একজন বৈজ্ঞানিক বলিলেন, "ওহে তোমার মুখ চোখ পাংশুবর্ণ হইয়া আসিয়াছে। তুমি যে আর বাঁচিবে না। যাচ্ছ কোথায়?"

এই কথা শুনিয়াই কয়েদীর হৃদয় বিশুষ্ক হইয়া আসিল এবং কাঁপিতে কাঁপিতে তৎক্ষণাৎ মূর্চ্ছিত হইয়া ভূতলে পতিত হইল। বৈজ্ঞানিক গিয়া দেখেন যে, কয়েদী সংস্কার বলে মরিয়া গিয়াছে।

দ্বিতীয় কয়েদীকে লইয়া এইরূপ ভাবে পরীক্ষা করা হয়। বৈজ্ঞানিকেরা এই ব্যক্তিকে একটী গৃহে লইয়া যাইয়া কহিতে লাগিলেন, "দেখ, অস্ত্রাঘাতে তোমার প্রাণ নাশ করিব।" এই বলিয়া তাঁহারা বড় বড় ছোরা ইত্যাদি শাণিত অস্ত্র বাহির করিলেন। পরে বলিতে লাগিলেন, "দেখ! এই ছোরা তোমার দেহে প্রবেশ করাইয়া দিব। ছোরা প্রবেশ করাইয়া দিলেই রক্ত বহির্গত হইয়া নদীর ন্যায় বহিয়া যাইবে। তোমার তাহাতে বলক্ষয় হইবে ও তুমি কাঁপিতে কাঁপিতে মরিয়া যাইবে।" কয়েদী এই কথা শুনিয়া শিহরিয়া উঠিল। তখন তাহার বাহু পদাদি বন্ধন করা হইল। পরে বৈজ্ঞানিকেরা তাহার চক্ষু বস্ত্রাবৃত করিয়া পূর্ব্বোক্ত নানা প্রকার ভীষণ দৃশ্যের বর্ণনা করিয়া, গাত্রে একটী আলপিন ফুটাইয়া দিলেন এবং যে স্থানে আলপিন স্পর্শিত হইয়াছে, সে স্থানে কিঞ্চিৎ উষ্ণ জলও ঢালিয়া দেওয়া হইল। কয়েদী ছোরা দ্বারা আহত হইয়াছে, রক্ত পড়িতেছে ভাবিয়া কাঁপিতে কাঁপিতে পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইল।

বিশ্বাসের এমনই প্রবল প্রতাপ। সংস্কার বা বিশ্বাস বলে যদ্যপি মানুষের মৃত্যু সংঘটিত হইতে পারে, তাহা হইলে ঈশ্বরলাভের সংস্কার হৃদয়ে বদ্ধমূল হইয়া যাইলে, তাহা কার্য্যকরী না হইবে কেন?

বিশ্বাস মানসিক কার্য্য। মনের বলকে বিশ্বাস কহা যায়। সরলভাবে সকলের কথা বিশ্বাস করিলে যদিও সময়ে সময়ে বিপদের উত্তেজনা হয় কিন্তু বিশ্বাসীর বিশ্বাস বলে তাহা হইতে উত্তীর্ণ হইতে পারে। যদ্যপি একবার বিপদই হয় তাহাও স্বীকার তথাপি অবিশ্বাসী হইয়া আত্মঘাতী হওয়া উচিত নহে। কে জানে কোন্ উপায়ে হরির কৃপালাভ করা যায়! কে জানে কাহার কথা বিশ্বাস করিলে হরির চরণ লাভ করা যায়! বিশ্বাসী হইয়া পার্থিব পদার্থ বিষয়ে প্রতারিত হইলেও পারমার্থিক বস্তু সম্বন্ধে কখন প্রত্যবায় ঘটে না। কোন দেশে এক সরল প্রকৃতির ব্যক্তি বাস করিতেন। সাধু বেশধারী দেখিলেই তিনি একেবারে আনন্দে বিহ্বল হইয়া যাইতেন। এই ব্যক্তির ভক্তির জন্য সর্ব্বদাই সাধু মহাত্মারা অতিথি হইতেন। বিশ্বাসীর সরল প্রকৃতির কথা প্রচারিত হইলে জনৈক পাষণ্ড মনে করিল যে, বিনা পরিশ্রমে অভিমত ভোজ্য সামগ্রী উদর পূর্ণ করিয়া ভক্ষণ এবং প্রয়োজনমত অর্থাদি সংগ্রহ করিবার এমন সুবিধা থাকিতে আমি তাহাতে বঞ্চিত হইয়া রহিয়াছি কেন? এই ভাবিয়া সে পরদিবস সাধুর ভেকাবলম্বন পূর্ব্বক বিশ্বাসীর বাটীতে অতিথি হইল। বিশ্বাসীর আনন্দের আর পরিসীমা রহিল না। কপট সাধু ভোজনাদি পরিসমাপ্তি করিয়া নানা প্রকার বাক্যালাপ করিতে করিতে বলিল,—বাপু তোমার শ্রদ্ধা ভক্তি অতুলনীয়। তুমি আমার শিষ্য হইবার যথার্থ যোগ্যপাত্র। আমি সিদ্ধ-যোগী। মনে করিলে আমি তোমাকে রাজাধিরাজ করিয়া দিতে পারি। বিশ্বাসী

কহিলেন, আমি ধন্য যে, অদ্য আপনি দয়া করিয়া ইষ্টস্থান অধিকার করিলেন। আমি অন্য কিছু ভিক্ষা চাহি না, আশীর্ব্বাদ করুন যেন আপনার পাদপদ্মে আমার রতি মতি থাকে। কপট সাধু ঈষৎ হাসিয়া বলিল—তথাস্তু, তুমি অচিরে ভগবানের সাক্ষাৎকার লাভ করিবে। এই কথায় বিশ্বাসীর এমনি বিশ্বাস জন্মিল যে, পর দিন অতি প্রত্যুষে গাত্রোত্থান পূর্ব্বক ভগবানের আগমন প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন। এমন সময়ে লক্ষ্মীনারায়ণ গমন করিতেছিলেন। মাতা কহিতে লাগিলেন, প্রভু! সহসা আমার প্রাণ কাঁদিয়া উঠিল কেন? আমায় মা মা বলিয়া কে অস্থির করিল? আমি আর ক্ষীর ভার সহ্য করিতে পারিতেছি না। নারায়ণ কহিলেন, চল দেবী চল, আর অধিক দূর নাই, ঐ দেখ ঐ সরল বিশ্বাসী পঞ্চম বর্ষীয় শিশুর ন্যায় রোদন করিতেছে। উহার নিমিত্তই আমি আসিয়াছি। তোমায় ইতিপূর্ব্বে সকল কথাই বলিয়াছি। সে যাহা হউক, বিশ্বাসীর বিশ্বাস এবং সাধু কপটী হইলেও তাহার ভেকের মহিমা রক্ষা করা, আমার কর্ত্তব্য। সে, যে কোন উদ্দেশ্যেই হউক, যখন আমার ভক্তের ভাবাশ্রয় করিয়া আমার কথা বলিয়া গিয়াছে, তখন তাহার কথা রক্ষা আর কে করিবে! আমি সেই সাধুর বেশ ধারণ করিয়া অগ্রে উহার নিকটে গমন করি, তুমি তদনন্তর জ্যোতির্ম্ময়ীরূপে প্রকাশিত হইবে। নারায়ণ অনতিবিলম্বে কপট সাধুর আকারে উপস্থিত হইবামাত্র বিশ্বাসী কহিল, প্রভু! আপনার অপার করুণা দাসের প্রতি এত দয়া দয়াময় ব্যতীত সম্ভাবনা কোথায়! প্রভু! আমার কিছুই নাই; আমি মন্ত্র জানি না, তন্ত্র জানি না, কি বলিয়া আপনার গুণকীর্ত্তন করিব! আমার প্রাণে কত ভাব উঠিতেছে, কিন্তু প্রকাশ করিবার শক্তি নাই। অন্তর্য্যামী প্রভু! অন্তরের সমাচার আপনার অবি-

দিত নাই। বলিতে বলিতে অমনি গৃহটী আলোকমালায় পরিপূর্ণ হইয়া গেল। সেই আলোকরাশি ক্রমে ঘনীভূত হইয়া অপূর্ব্ব মূর্ত্তিতে পরিণত হইয়া যাইল। নারায়ণ মূর্ত্তি দেখাইয়া কহিলেন, ঐ দেখ, তোমার অভীষ্ট-দেবী জগৎলক্ষ্মী আবির্ভূতা হইয়াছেন! বিশ্বাসী উচ্চৈঃস্বরে যেমন মা মা বলিয়া উঠিলেন, মাতা অমনি বাহু-যুগল প্রসারণ করিয়া কহিলেন, আয় বাছা! আমার কোলে আয়! আয়! আয়! ক্ষীর ভারে আমি কাতরা হইয়াছি, আমার যন্ত্রণা দূর কর। বিশ্বাসী মাতার ক্রোড়ে শয়ন পূর্ব্বক উদর পূর্ণ করিয়া স্তন্য-সুধা পান করিয়া লইল। হায়! সে বিশ্বাস কোথায়! আমরা ছার জ্ঞান-গরিমায় অবিশ্বাসী হইয়া ভগবৎ প্রেম-সুধারসে বর্জ্জিত হইয়া, পৃথিবীর শুষ্ক তৃণগুচ্ছ লইয়া নির্ব্বিবাদে দিনযাপন করিয়া যাইতেছি। রে বিশ্বাসী! তোর পদধূলি দে ভাই! তোর ধূলি পাইলে যদ্যপি এক পরমাণুও বিশ্বাস সঞ্চার হয়, তাহা হইলেও এক সময়ে মহামায়ার ক্রোড়ে শয়ন করিতে না পারি, তাঁহার রাঙ্গা চরণ দুইখানি দর্শন করিয়া মানবজীবন সফল করিতে পারিব। রামকৃষ্ণদেব এইরূপ বিশ্বাসের ঘনীভূত মূর্ত্তি দেখাইয়া গিয়াছেন। বিশ্বাস কাহাকে বলে, বিশ্বাসীর আদর্শ কি, বিশ্বাসীর জীবন কিরূপে কাটিয়া যায়, তাহার রামকৃষ্ণই একমাত্র দৃষ্টান্তস্থল। তিনি শিশুর ন্যায় সকল কথাই মাকে বলিয়া দিতেন। তাঁহাকে কেহ কোন কথা বলিলে তিনি তৎক্ষণাৎ কালীর মন্দিরে যাইয়া সে কথাগুলি মাকে জানাইয়া আসিতেন।

এক দিন তাঁহার ভ্রাতা হলধারী বলিয়াছিলেন যে, তোমার মস্তিষ্ক বিকৃত হইয়া গিয়াছে, তজ্জন্য নানাপ্রকার ভ্রম দর্শন করিয়া থাক। আমার নিকট দুইদিন বেদান্ত শাস্ত্র শ্রবণ করিলে প্রকৃত

জ্ঞানলাভ করিবে। তখন এ প্রকার মরীচিকা দর্শন জনিত ক্লেশ পাইবে না। প্রভু এই কথা শ্রবণ করিবামাত্র রোদন করিয়া বলিতে লাগিলেন, মা! হলধারী কি বলিতেছে শুন। জগজ্জননী তদ্দণ্ডে নারীর আকারে উদয় হইয়া কহিলেন, তুমি যেমন আছ, অমনি থাক। রামকৃষ্ণদেব কটিদেশে বস্ত্রবন্ধন পূর্ব্বক ছুটিয়া আসিয়া হলধারীকে কহিলেন, আমি তোমার কথা শুনিব না। আমার মা আমায় বলিয়া দিলেন, তুমি যেমন আছ তেমনি থাক।

রামকৃষ্ণদেব সকল কথাই বিশ্বাস করিতেন। তিনি বলিয়াছেন যে, অবিশ্বাস করিব কিরূপে? সর্ব্বশক্তিমানের রাজ্যে কিছুই অসম্ভব নহে। যাঁহার কটাক্ষে সৃষ্টি স্থিতি-লয় হয়, তাঁহার ইচ্ছা-শক্তির অসাধ্য কি আছে? তাঁহাতে বিশ্বাস থাকিলে তাঁহার সৃষ্টিতে অবিশ্বাস হইবে কেন? তিনি বলিতেন যে, বেদ, পুরাণ, তন্ত্র, বাই-বেল কোরাণ প্রভৃতি পৃথিবীর সমুদয় ধর্ম্মশাস্ত্র সম্পূর্ণ সত্য। এতদ্ভিন্ন বিশ্বাসী যাহা বিশ্বাস করিবে, তাহাও সত্য। সত্যের রাজ্যে মিথ্যা নাই, মায়া নাই, ভ্রান্তি নাই, মরীচিকা নাই। মায়া ভ্রান্তি মরীচিকা প্রভৃতি মানসিক কুসংস্কার মাত্র। রামকৃষ্ণদেব নিজে বিশ্বাসী হইয়া সর্ব্বত্রে সত্যই দেখিতেন, সুতরাং অসত্য-জনিত ক্লেশানুভব করিতে তাঁহাকে হইত না। তিনি যখন মা মা বলিয়া নৃত্য করিতেন তখন তাঁহার যে প্রকার ভাবাবেশ হইত, যে প্রকার প্রেমাবেশ হইত এবং যে প্রকার মহাভাবলাভ পূর্ব্বক আনন্দিত হইতেন, অন্য ভাবে অন্য নামে অন্য রূপেও তাহাপেক্ষা কোন অংশে ন্যূনতা দেখা যায় নাই। পুরাণ তন্ত্রাদির সাকাররূপে যে সমাধি হইত, বৈদান্তিকভাবেও সমাধিকালে তদ্রূপাবস্থা লাভ করিতেন। এই নিমিত্ত প্রভু বলিতেন যে শুদ্ধ জ্ঞান এবং শুদ্ধ ভক্তির

একই উদ্দেশ্য। তিনি বার বার বলিয়া গিয়াছেন যে, কুতর্ক ছাড়িয়া দাও, কুবুদ্ধির আশ্রয় পরিত্যাগ কর, সরল বিশ্বাসী হইতে পারিলে জানিবার বুঝিবার দেখিবার আর কিছুই অবশিষ্ট থাকিবে না। তিনি বলিতেন যে, ভগবান্‌কে কে চাহে? ভগবান্ সাক্ষাৎলাভ না হওয়ায় কাহার প্রাণ ব্যাকুলিত হইয়াছে? ভগবানের নিরূপণের জন্য কে লালায়িত হইয়াছে? শুদ্ধ জ্ঞান ভক্তির প্রত্যাশায় কে কাতর হইয়াছে? এরূপ ঈশ্বরানুরাগী কি একজনও দেখা যায়। ঘরে ঘরে খুঁজিয়া আইস, পাড়ায় পাড়ায় জিজ্ঞাসা করিয়া আইস, নগরে নগরে অনুসন্ধান করিয়া দেখ, ঈশ্বর লাভের জন্য প্রকৃতপক্ষে কেহ জীবনোৎসর্গ করিয়াছে কি না? যে দিকে যাইবে, যাহাকে জিজ্ঞাসা করিবে, সেই অবিশ্বাসের পরিচয় দিবে। ইহা হইতে পারে, ইহা হইতে পারে না, এ শাস্ত্র সত্য, ও শাস্ত্র মিথ্যা, ভগবান্ এমন, ভগবান্ এমন নহেন, তাঁহার এই রূপ, এই ধর্ম্ম তাঁহার স্বরূপ, ইহা ব্যতীত তিনি অন্য কিছুই নহেন; অমুক বলিয়াছেন যে, তিনি আকারাদি বিবর্জ্জিত শুদ্ধ আত্মস্বরূপ, অমুক বলিয়াছেন, তিনি তাহা নহেন;—এইরূপ আপনাপন ক্ষুদ্র বুদ্ধি এবং ধারণার বশবর্ত্তী হইয়া সর্ব্বশক্তিমান পরমেশ্বরকে আপনাদের কেনা বেচার মধ্যে রাখিয়াছে। ফল ফলিবে কিরূপে? এই জন্য তিনি সকাতরে বলিতেন যে, তাঁহাতে বিশ্বাসী হও। বেদ, পুরাণ, তন্ত্র, বাস্তবিক ভগবান্ নহে; ভগবানের তত্ত্বকথা আছে বলিয়া তাহা বিশ্বাস করিতে হয় কিন্তু তাহাতে তাঁহার অনন্ত মহিমা কি লিপিবদ্ধ হইতে পারে! তাঁহার মহিমা কি কখন ভাষায় সীমাবদ্ধ হইতে পারে! তাঁহার কথা বলিতে ভাষা ভাসিয়া যায়, বেদ পুরাণ আকাশে মিশাইয়া যায়, বাইবেল কোরাণ অতল জলধিগর্ভে নিমগ্ন

হইয়া যায়, বলিবে কি! বিশ্বস্রষ্টা পরম বিভু চিনির পর্ব্বতবিশেষ, জ্ঞানী বিজ্ঞানী ঋষি মহর্ষি সকলে পিপীলিকা বিশেষ, শুকদেব গোস্বামী না হয় ডেয়ো পিপিলিকা। তিনি একটী বড় দানা মুখে ধরিয়া টানিয়াছেন, তাহাতে কি পাহাড় আকর্ষণ করা হইয়াছে? অনন্তদেবের অনন্ত মূর্ত্তি, অনন্তের ইয়ত্তা কখন হয় না, হইবার নহে। এই জন্য তাঁহাকে বিশ্বাস করা ব্যতীত আর দ্বিতীয় পন্থা নাই। এইজন্য বলিতেছি যে, রামকৃষ্ণদেবকে বিশ্বাসের আদর্শ করিয়া ধর্ম্ম-জগতে প্রবেশ করা একমাত্র সুপরামর্শ। রামকৃষ্ণদেব শিষ্যের আদর্শ। তিনি বলিতেন যে, গুরু মিলে লাখ লাখ, চেলা নাহি মিলে এক্। চেলা হইবার উপযুক্ত হইতে হইলে কিরূপ ভাবাশ্রয় করিতে হয়, তাহা এক রামকৃষ্ণেই প্রকাশিত আছে।

রামকৃষ্ণদেবের দৃষ্টান্তানুসারে বুঝা গেল যে, বিশ্বাসী হওয়াই শিষ্যের কর্ত্তব্য। এক্ষণে কথা হইতেছে যে, কেবল বিশ্বাসী হইলেই কি সফল মনোরথ হইবে? বিবেক বৈরাগ্যাদির কথা শুনা যায় কেন? রামকৃষ্ণের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেই এই অত্যাবশ্যকীয় প্রশ্নের প্রত্যুত্তর প্রাপ্ত হওয়া যাইবে। রামকৃষ্ণদেব প্রকাশ্যভাবে গৃহী ছিলেন। তাঁহাকে কেহ কখন গৈরিক বসন পরিধান করিতে দেখেন নাই, দণ্ড-কমণ্ডলু লইয়া দ্বারে দ্বারে ভ্রমণ করিতেন না। কেশ মুণ্ডন করিয়া স্বামী কিম্বা বাবাজী অথবা পরমহংস ইত্যাদি উপাধি সংযুক্ত হন নাই। যদিও পরমহংস শব্দটীর দ্বারা তাঁহাকে সম্বোধন করা হয়, কিন্তু তাহা তাঁহার নিজের অথবা গুরুদত্ত উপাধি নহে। পরমহংসেরা ঐ নামে তাঁহাকে ডাকিতেন বলিয়া এবং কেশব বাবু ঐ নামটী প্রচার

করায় সকলে তাহাই বলিয়া থাকে। পরমহংস সম্প্রদায়ের কোন লক্ষণই তিনি রাখেন নাই। তিনি কিয়দ্দিবস অর্থোপার্জ্জন করিয়াছিলেন, পরিণয়সূত্রে আবদ্ধ হইয়াছিলেন, মাতা ভ্রাতা, ভ্রাতুষ্পুত্র ভাগিনেয় প্রভৃতি সকলের সহিতই সম্বন্ধ রাখিয়া লীলা খেলার কাল পর্য্যন্ত কার্য্যক্ষেত্রে অবস্থিতি করিয়াছিলেন। তাঁহাকে সহসা দেখিলে কেহ সাধক বলিয়াও বুঝিতে পারিত না।

একথা প্রকাশ আছে যে,একদা কলিকাতায় কোন সম্ভ্রান্ত চিকিৎসক দক্ষিণেশ্বরের রাসমণির দেবালয় দর্শনের নিমিত্ত গমন করিয়াছিলেন। রামকৃষ্ণদেবকে উদ্যানের মালি মনে করিয়া জুঁইফুল তুলিয়া দিতে আদেশ করেন। রামকৃষ্ণদেব তৎক্ষণাৎ পুষ্প চয়ন করিয়া দিয়াছিলেন। এই চিকিৎসক প্রভুর পীড়ার সময়ে একবার দেখিতে গিয়াছিলেন, তিনি তাঁহাকে দর্শন করিবামাত্র আতঙ্কে বলিয়াছিলেন, হায় হায়, করিয়াছি কি, এই মহাপুরুষকে আমি মালি মনে করিয়াছিলাম।

রামকৃষ্ণদেবের বাহিরের ভাব দেখিলে সাধারণ গৃহীদিগের ন্যায় বলিয়া যদিও বোধ হইত, কিন্তু তিনি আমাদের ন্যায় গৃহী ছিলেন না। তাঁহার ছিল সব আবার কিছুই ছিল না। তিনি বাস্তবিক বৈরাগীর মূর্ত্তি ছিলেন, সন্ন্যাসীর আদর্শ ছিলেন, বিবেকীর চূড়ামণি ছিলেন। গৃহস্থেরা যেরূপে আত্মসম্বন্ধ দ্বারা সংসার গঠিত করে, তাঁহার সংসারে তাহা ছিল না। তিনি সমুদয় ভগবানের সম্বন্ধই জানিতেন। অর্থকে অনর্থপাতের মূল কারণ বলিয়া বুঝিতেন, এইজন্য তিনি কস্মিন্‌কালে অর্থের সংশ্রব রাখিতে পারিতেন না। অনেকে তাঁহাকে সহস্র সহস্র মুদ্রা প্রদান করিতে চাহিয়াছিল ; কিন্তু তিনি তাহা গ্রহণ করেন নাই, অথবা কাহাকেও লইতে দেন নাই। সাধারণের হিতসাধনের নিমিত্ত যেমন আমরা সর্ব্বদাই লালায়িত হইয়া বেড়াই,

তিনি সে ভাবে কার্য্য করিতেন না। আপনি কার্য্য করিয়া, জীবনে হিতসাধনের পথ দেখাইতেন। কামিনীর কর গ্রহণ করিয়াছিলেন সত্য, কিন্তু কস্মিন্‌কালে সাধারণ ব্যক্তিদিগের ন্যায় তাঁহার সহিত সম্বন্ধ স্থাপন করেন নাই। তিনি তাঁহাকে আনন্দময়ী জননী বলিতেন। তাঁহার এইরূপ সৃষ্টি-ছাড়া সম্বন্ধ দেখিয়া অনেকে অনেক কথাই বলিয়া থাকেন। যাঁহারা তাঁহার কার্য্যাদি লইয়া মতামত প্রদান করিতে অগ্রসর হন, রামকৃষ্ণকে একবার ভাল করিয়া বুঝিয়া বলিলে তাঁহাদের ভাল হয়। তিনি দৃষ্টান্তস্থল, একথা যেন কেহ বিস্মৃত না হন। ধর্ম্ম-জগতে কি প্রকার জীবন লইয়া যাইতে হয়,তাহা না দেখাইলে আমাদের অন্যত্রে দেখিবার উপায় নাই। বিবেক বৈরাগ্যের কথাই শুনি, পথে ঘাটে বৈরাগীও দেখি,কিন্তু তাঁহাদের দেখিয়া আমাদের জ্ঞানচক্ষু খুলিয়া যায় না কেন ? তাঁহারা প্রকৃত বৈরাগী নহেন। তাঁহাদের কামিনী-কাঞ্চন সম্বন্ধ যায় নাই। রামকৃষ্ণদেব ভিখারী ছিলেন না। সাধারণ বৈরাগীরা ভিখারী। রামকৃষ্ণদেব স্বোপার্জ্জিত অর্থে চিরদিন কাটাইয়া গিয়াছেন। তিনি রাসমণির বাড়ীতে যখন পূজাকার্য্যে ব্রতী ছিলেন, সেই সময়ে তাঁহার অবস্থান্তর হয়. সুতরাং তিনি আর কার্য্য করিতে পারিলেন না। কর্ত্তৃপক্ষেরা তদবধি তাঁহার ভরণপোষণের ব্যয় ঠাকুর-বাড়ী হইতেই প্রদত্ত হইবার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন।

কাঞ্চন যেমন ধর্ম্মপথের কণ্টক, কামিনী তাহাপেক্ষা সহস্র গুণে অধিক। কামিনী ত্যাগের বস্তু। এই কথা বলিতে যাইলে ভদ্রসমাজে হাস্যাস্পদ হইতে হয়। সংসারসৃষ্টির অদ্বিতীয় কারণ স্বরূপ কামিনী সৃষ্টিকর্ত্তা কর্ত্তৃক সৃজিত হইয়াছে। পুরুষ প্রকৃতি, প্রাকৃতিক নিয়মে উভয়েই সমান। তাহাদের সংযোগ ব্যতীত কি জান্তব, কি উদ্ভিদ কিছুই জন্মিতে পারে না। জন্মাদি যখন সৃষ্টিকর্ত্তার নিয়ম,

তখন তাহার কারণ উচ্ছেদ করিতে যাইলে বিশ্ববিধাতার বিরুদ্ধাচরণ করা হয়। এরূপাবস্থায় রামকৃষ্ণদেবের সহধর্ম্মিনীর প্রতি মাতৃ-ভাবের কার্য্য হওয়া অস্বাভাবিক ঘটনা বলিতে হইবে। আমরা কি তাঁহার এই আদর্শ গ্রহণ করিব? না কেহ কস্মিনকালে সেরূপ হইতে পারিবে? অথবা তদ্রূপ হওয়া সকলের কর্ত্তব্য? আদর্শ বলিলে সকল ভাবই গ্রহণ করা উচিত। তিনি বিবাহ করিয়া, বিবাহ করা মনুষ্যের উচিত, তাহা স্থির করিয়া দিয়াছেন। কিন্তু তাঁহাকে গ্রহণ না করায় এই সিদ্ধান্ত করিতে হইবে যে, যাহাকে ঈশ্বর লাভ করিতে হইবে, যাহাকে বেদান্ত শাস্ত্রাদি মতে সৎস্বরূপ মহাকারণে মিলিত হইতে হইবে, তাহাকে কামিনী ত্যাগ করিতেই হইবে। কামিনীর সহবাস সুখে একেবারে বঞ্চিত না হইলে ধ্যান ধারণা সমাধি প্রভৃতি যোগের প্রক্রিয়াদিতে কখনই কৃতকার্য্য হইতে পারিবে না। তিনি একথা বার বার বলিয়াছেন যে, যদ্যপি কেহ একহাজার বৎসর সংযমী হইয়া থাকিয়াও স্ত্রীসহবাস করা দূরে থাকুক, স্বপ্নে রেতঃ স্খলিত হয়, তাহা হইলে তাহার সমুদায় ব্রত একেবারে বিনষ্ট হইয়া যায়। তিনি সাধন দ্বারা জ্ঞান বিজ্ঞান সমুদায় অবস্থা অতিক্রম করিয়া নির্ব্বিকল্প সমাধি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। তাঁহার পক্ষে স্ত্রীসহবাস যে একেবারে নিষিদ্ধ, সে বিষয়ে দ্বিরুক্তি করিবে কে? কিন্তু ভক্তি পথে তাহাতে দোষ হয় না, এইজন্য ভক্তদিগের শিক্ষার্থ দার পরিগ্রহ করিয়াছিলেন। জ্ঞানীরা ভাবাশ্রয় করাকে মায়া বলেন কিন্তু ভাবাশ্রয় করাই ভক্তির সাধন, সুতরাং এই উভয় সাধকের সাধনপ্রণালী সম্পূর্ণ বিপরীত। সেইজন্য জ্ঞানী প্রচারকদিগের সাধনপ্রণালী ভক্তের মনোনীত হয় না এবং ভক্তের সাধনপ্রণালী জ্ঞানীর চক্ষে বিষবৎ বোধ হয়। জ্ঞান এবং ভক্তির সামঞ্জস্য এপর্য্যন্ত কোথাও হয় নাই,

কেহ জীবনে করেনও নাই। রামকৃষ্ণদেবই তাহার একমাত্র আদর্শ। জ্ঞানীরা রামকৃষ্ণকে জ্ঞানাবতার বলিয়া পরিকীর্ত্তন করিয়া থাকেন। ভক্তেরা তাঁহাকে ভক্তাবতার বলিয়া পূজা করেন। এই ভাবেই কার্য্য চলিতেছে।

রামকৃষ্ণদেব সাধারণ উপদেষ্টাদিগের ন্যায় মনুষ্যের প্রকৃতি বিচার না করিয়া উপদেশ প্রদান করিতেন না। তিনি জ্ঞান-প্রধান-প্রকৃতি-বিশিষ্ট ব্যক্তিদিগের জ্ঞানের উপদেশ প্রদান করিতেন. ভক্তি-প্রধান-প্রকৃতির ব্যক্তিদিগকে ভক্তিপথে বিচরণ করিতে বলিতেন। সত্ত্বগুণী যাঁহারা, তাঁহাদের হৃদয়ে সত্ত্ব গুণের ভাব প্রবেশ করাইয়া দিতেন, রজোগুণীকে রজোভাব এবং তমঃ প্রকৃতির ব্যক্তিকে তাহার আপনার ভাব পরিত্যাগ করিতে বলিতেন না। যে মাতাল বা লম্পট, তাহাকে মাদক দ্রব্য বা লাম্পট্য পরিত্যাগ করিতে বলিলে চলিবে কেন? রামকৃষ্ণদেব ইহাদের প্রকৃতি বুঝিতে পারিতেন ও তদনুসারে ব্যবস্থাও করিতেন। সাধারণ উপ-দেষ্টার শক্তিতে তাহা কখনই সম্ভব হইতে পারে না।

আমাদের কোনও বন্ধুর সুরাপান দোষ ছিল। তিনি প্রভুর নিকটে যাতায়াত করিতেন। লোকে অনেক কথাই বলিত বলিয়া আমরা একথা প্রভুর নিকটে উল্লেখ করিয়াছিলাম। মনে করিয়াছিলাম, প্রভু তাঁহাকে এ বিষয়ে নিষেধ করিয়া দিবেন। প্রভু, আমাদের কথা শ্রবণ করিয়া বলিয়াছিলেন, "তোমাদের অত মাথা ব্যথা কেন?" তাঁহার এই কথা শ্রবণ করিয়া আমরা নিস্তব্ধ হইয়া রহিলাম। কিছুদিন পরে আমা-দের ঐ বন্ধু সুরাপান করিতে বসেন। এক বোতল পান করিয়া ফেলিলেন, কিন্তু একটী ঢেঁকুর উঠিয়াই তাঁহার সমস্ত নেশা ছুটিয়া গেল। আর এক বোতল পান করিলেন। পুনরায় ঢেঁকুর উঠিল,

নেশাও ছুটিয়া গেল। এইরূপে ক্রমে জলে উদর পূর্ণ হইয়া গেল কিন্তু নেশা হইল না। তখন তিনি বিরক্ত হইয়া সুরাপান পরিত্যাগ করিলেন। আর এক ব্যক্তি বারাঙ্গনাসক্ত ছিল। আমরা প্রতি রবিবারেই প্রভুর নিকট যাইতাম। তিনিও আমাদের সহিত যাইতেন, কিন্তু আসক্তির দোষে মধ্যে মধ্যে অদৃশ্যও হইতেন। এক দিন ঐ ব্যক্তি প্রভুর নিকট যান নাই। আমরা সেদিন দক্ষিণেশ্বরে যাইয়া উপস্থিত হইলে পর, শুনিলাম প্রভু ভাবাবেশে বলিতেছেন— "যাক্! এখনও ভোগ বাসনা আছে।" তাঁহার কথার ভাব তখন আমরা কিছুই বুঝিতে পারি নাই। পরে ঐ ব্যক্তি পূর্ব্বের ন্যায় বারাঙ্গনার গৃহে যাইয়া সুরাপান করিতেন। সুরাপান করিতে করিতে অধিক রাত্রি হইয়া যাইলে পর তাঁহার মনের ভাব এরূপ পরিবর্ত্তিত হইয়া যাইত যে, তিনি আর বারাঙ্গনার অঙ্গ স্পর্শ করিতে পারিতেন না। এইরূপে কিছুদিন অতীত হইয়া যাইলে, তিনি বিরক্ত হইয়া বারাঙ্গনাভবনে গমন পরিত্যাগ করিলেন।

এক্ষণে সর্ব্বসাধারণের পক্ষে কর্ত্তব্য কি? রামকৃষ্ণদেবকে আদর্শ বলিয়া তাঁহার উপদেশ মতে পরিচালিত হইবেন, অথবা শাস্ত্রাদি অনুমোদিত পন্থাবিশেষ অবলম্বন করিবেন? যদ্যপি শাস্ত্রাদি মতই শ্রেষ্ঠ হয়, তাহা হইলে কোন্ শাস্ত্র হিন্দু শাস্ত্র বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে? বেদ, পুরাণ, তন্ত্র, সংহিতাদি নানাবিধ শাস্ত্র আছে। এ সমুদায় হিন্দুশাস্ত্র। বৈদিক মতাবলম্বীরা হিন্দু; আর পৌরাণিক মতাবলম্বীরা কি অহিন্দু? না তান্ত্রিক সাধকেরা অহিন্দু? শাক্তরা হিন্দু, বৈষ্ণবেরা অহিন্দু, এ কথা কে বলিবে? এখন যে সময় আসিয়াছে, তাহাতে বেদমতে সকলকে একীকরণ করিতে প্রয়াস পাওয়া বিফল প্রয়াস মাত্র। পুরাণকে সর্ব্বত্রে অদ্বিতীয় শাস্ত্র বলিয়া

কেহ সাব্যস্থ করিতে পারেন না, তন্ত্রও তদ্রূপ। এক শাস্ত্র আর এক্ষণে সর্ব্বত্রে কার্য্য করিতে পারিবে না। এইজন্য কেবল শাস্ত্রের মতামত লইয়া আন্দোলন করিতে হইলে মঙ্গলের পরিমাণাপেক্ষা অমঙ্গলের পরিমাণ অধিক হইয়া যাইবে। শাস্ত্র লইয়া গোলোযোগ সংঘটিত হইবে। সাম্প্রদায়িক ভাবের দোর্দণ্ড প্রতাপ বিস্তারিত হইবে। ফলে, সর্ব্বত্রে অশান্তির রাজ্য স্থাপিত হইয়া যাইবে। কিন্তু রামকৃষ্ণের মতে কল্যানের পরিমাণই অধিক। এক পরমাণু অকল্যানের আশঙ্কা নাই। তাঁহাকে শাস্ত্রদ্বেষী অথবা শাস্ত্রবিশেষের পক্ষপাতী বলা যায় না। শাস্ত্রের প্রকৃত ভাব মতে জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করা, জীবনে ধর্ম্মভাব প্রতিফলিত করা তাঁহার উপদেশ। তিনি কাল এবং নরনারীদিগের কালোচিত অবস্থা বিবেচনা পূর্ব্বক ভক্তিমার্গই প্রশস্ত পথ বলিয়া গিয়াছেন। জ্ঞানশূন্য ভক্তির দ্বারা যদিও ভক্তের কার্য্য সিদ্ধ হয় বটে কিন্তু বর্ত্তমান জ্ঞান-প্রধান কালে জ্ঞান-শূন্য ভক্তি সর্ব্বত্রে কার্য্যকারী হইবে না বলিয়া তিনি কালধর্ম্মের সূত্রপাত করিয়া গিয়াছেন। এই-জন্য তিনি বলিয়াছেন যে, "অদ্বৈত জ্ঞান আঁচলে বাঁধিয়া যাহা ইচ্ছা তাহাই কর।" এই জ্ঞানলাভের নিমিত্ত বেদান্ত পাঠ করিতে যাহার শক্তিতে সংকুলান হইবে, তাহার তাহা নিষেধ নাই। অনন্তকাল ধরিয়া তিনি বেদান্তচর্চ্চা করুন, অনন্তকাল ধরিয়া তিনি যোগের প্রক্রিয়ায় নিযুক্ত থাকুন, তাহাতে অন্যের কিছুমাত্র ক্ষতি বৃদ্ধি নাই। কিন্তু বেদান্তে সকলের অধিকার নাই। যে সংস্কৃত ভাষায় অজ্ঞ, তাহাকে বৃদ্ধ-দশায় পুনরায় ব্যাকরণ পড়িতে হইবে। ব্যাকরণ পড়িলেই বা কি ফল ফলিবে! রামকৃষ্ণদেব তজ্জন্য এই পৃথিবীস্থিত সামান্য বস্তুর দ্বারা বেদান্ত শাস্ত্রাদির মর্ম্ম বাহির করিয়া দিয়া গিয়াছেন। ভাষা শিক্ষা করা বেদান্ত শিক্ষার উদ্দেশ্য নহে, উহা উপায়

বিশেষ। দুগ্ধকে দধি করিয়া মন্থন করিলে নবনীত বাহির হয়। দধি নবনীত নহে। যদ্যপি আমরা নবনী প্রাপ্ত হই, দুগ্ধকে দধি করিয়া মন্থন করিবার আবশ্যকতা কি? রামকৃষ্ণদেব অদ্বৈত জ্ঞান সম্বন্ধে সেইরূপ অতি সাধারণ দৃষ্টান্ত দ্বারা এই অতি কঠিন ব্রহ্মতত্ত্ব নিরূপণ করিয়া গিয়াছেন। বেলের দৃষ্টান্তে তাহা বলিয়াছি। তিনি আরও বলিতেন, যেমন কলা গাছ খোসা ছাড়াইতে ছাড়াইতে মাঝে যাওয়া যায়। মাঝ হইতে পুনরায় খোসা পর্য্যন্ত ফিরিয়া আসিলে, খোসা এবং মাঝ এক সত্তায় সংগঠিত হইয়াছে বলিয়া বুঝা যায়। অথবা সূর্য্য এক অদ্বিতীয়, সমগ্র পৃথিবীতে এক সূর্য্যই কার্য্য করিতেছে। দেশের ভাষাভেদে সূর্য্যের নামান্তর হয়, তাহা বলিয়া বস্তুর বিপর্য্যয় হয় না। জল এক বস্তু কিন্তু উহাও ভাষান্তরে নানা শব্দে কথিত হয়। জলের বিবিধ নাম আছে বলিয়া কি জল নানা প্রকার? কখনও নহে। সেইরূপ ঈশ্বর এক অদ্বিতীয়, তাঁহার ভাব অনন্ত।

আলোক হইতে ছটা বহির্গত হয়। ছটা বহু কিন্তু আলোক এক।

কেন্দ্র হইতে অসংখ্যক সরল রেখা বাহির হইয়া পরিধি সম্পূর্ণ করিয়া থাকে। পরিধির বিন্দু সংখ্যা বহু কিন্তু কেন্দ্র এক অদ্বিতীয়। বাটীর কর্ত্তা একজন কিন্তু পরিজন বহু। এই সকল দৃষ্টান্তের মধ্যে যদ্যপি একটী দৃষ্টান্ত ধারণা হয়, তাহা হইলে তাহার বেদান্ত পাঠের ফল লাভ হইয়া যায়।

অদ্বৈত জ্ঞানই বেদান্ত শাস্ত্রের অভিপ্রায়। এইরূপে অদ্বৈত জ্ঞান লাভ করিলেই বেদান্ত পাঠের ফল লাভ হইয়া যায়। অদ্বৈত জ্ঞান লাভ পূর্ব্বক কালী বলিয়া হউক, দুর্গা বলিয়া হউক, শিব বলিয়া হউক, রাম বলিয়া হউক, কৃষ্ণ বলিয়া হউক, গৌরাঙ্গ বলিয়া হউক, বুদ্ধ বলিয়া

হউক, আল্লা বলিয়া হউক, অথবা যীশু বলিয়াই হউক, কিম্বা কোন বিশেষ নাম না বলিয়া হউক, অর্থাৎ যে ব্যক্তি যে ভাবে ভগবানের অর্চ্চনা করিবেন, তাঁহার সেই ভাবেই মনোরথ পূর্ণ হইবে। ইহাই রামকৃষ্ণদেবের উপদেশ।

রামকৃষ্ণদেব এই উপদেশ আপনার জীবনে আদর্শস্বরূপ রাখিয়া গিয়াছেন। তাঁহাতে সকল ভাবেরই পূর্ণ স্ফূর্ত্তি দেখা যায়। তিনি এক অদ্বিতীয় রামকৃষ্ণরূপে, অদ্বিতীয় রামকৃষ্ণ আকারে, বৈদান্তিক অদ্বৈত জ্ঞানের আকরবিশেষ ছিলেন। এই নিমিত্ত বৈদান্তিকেরা তাঁহাকে পরমহংস বলিতেন; তিনি লীলা রূপের অদ্বিতীয় পক্ষপাতী এবং প্রেম ভক্তির প্রস্রবণবিশেষ ছিলেন। এই নিমিত্ত ভক্তেরা তাঁহাকে অবতার বলেন। তিনি তন্ত্র সাধনার অদ্বিতীয় ব্যক্তি ছিলেন। তন্ত্রাদি, বিশেষতঃ, ঊর্দ্ধমুখ তন্ত্রের অতি ভীষণ সাধনাদি যাহা অসাধ্য, তাহাও তিনি নিজে ব্রাহ্মণীর সাহায্যে সম্পন্ন করিয়া কৌলশ্রেষ্ঠ বলিয়া তান্ত্রিক সাধকদিগের দ্বারা পরিকীর্ত্তিত হইয়াছেন। রামকৃষ্ণ নবরসের ঘনীভূত দেবতা বলিয়া নবরসিক সম্প্রদায় তাঁহাকে রসিকচূড়ামণি বলিয়াছেন। তিনি বাউলের সাঁই, বৈষ্ণবের গোঁসাই, কর্ত্তাভজার আলেখ প্রভৃতি নামে উল্লিখিত হইয়াছেন। শিখেরা নানক, মুসলমানেরা প্যাগম্বর, খ্রীষ্টানেরা যীশু, ব্রাহ্মেরা ব্রাহ্মজ্ঞানী বলিয়া তাঁহাকে বুঝিতেন। এক্ষণে কিঞ্চিৎ স্থিরচিত্তে একবার ভাবিয়া দেখিলে কি হয় না যে, অদ্বৈত জ্ঞান অঞ্চলে বাঁধিয়া যাহা ইচ্ছা তাহা কর, এই ভাবের পূর্ণ আদর্শ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ। তিনি এক অদ্বিতীয় এবং কিরূপে সমুদয় ধর্ম্মভাব তাঁহাতে বিকশিত হইয়া তাঁহাতেই পর্য্যবসিত রহিয়াছে! অতএব রামকৃষ্ণদেবই, রামকৃষ্ণদেবের জীবনই, শাস্ত্র। রামকৃষ্ণদেবের জীবনই শিক্ষা করিবার একমাত্র স্থান। হিন্দু শাস্ত্র হউক, মুসলমান শাস্ত্র

হউক, খ্রীষ্ট শাস্ত্র হউক, আর যে কোন জাতীর যে কোন প্রকার শাস্ত্র হউক, রামকৃষ্ণে তাহা সুন্দররূপে ব্যাখ্যাত হইয়া রহিয়াছে। ধর্ম্ম শাস্ত্রাধ্যয়ন করিবার পূর্ব্বে একবার রামকৃষ্ণকে অধ্যয়ন করিলে শাস্ত্র পাঠের ফল লাভ হইয়া যাইবে। রামকৃষ্ণ এক অদ্বিতীয় কিন্তু তাঁহার ভাব এক অদ্বিতীয় নহে! সুতরাং প্রত্যেক জাতির প্রত্যেক সম্প্রদায়ের প্রত্যেক ব্যক্তির নিজ নিজ কৌলিন্যভাব রামকৃষ্ণ হইতে প্রস্ফুটিত হইবার অদ্বিতীয় উপায়। হিন্দু হিন্দুই থাকিবে, মুসলমান মুসলমানই থাকিবে, খ্রীষ্টান খ্রীষ্টানই থাকিবে, তথায় একাকার হইবে না। একাকার জ্ঞানে—কার্য্যে নহে, ইহাই রামকৃষ্ণদেবের উপদেশ।

শাস্ত্র সম্বন্ধে শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবোক্ত ভাবের তাৎপর্য্য বাহির করিলে তাঁহাকেই জীবন্ত-শাস্ত্র বলিয়া জ্ঞাত হওয়া যায়। তাই বলিতেছি যে, বর্ত্তমান কালের কালোচিত ধর্ম্মশাস্ত্রই শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেব। অন্যশাস্ত্র পাঠ করিতে হইলে, তাহার ভাষা, ব্যাকরণ, দর্শন, বিজ্ঞান প্রভৃতি শিক্ষা করিতে হইবে, কিন্তু রামকৃষ্ণ-শাস্ত্রের সে বিভীষিকা নাই। আমরা যেমন দুর্ব্বল কলির জীব, আমাদের অন্নগত প্রাণ, রোগে শোকে সাংসারিক ক্লেশে অন্নকষ্টে শরীর ও মন লইয়া শাস্ত্রোক্ত ভীষণ নিয়ম প্রতিপালন করা কি আমাদের কর্ম্ম? কঠোর তপশ্চারণ করা কি আমাদের সাধ্য! মন নাই, সংসারের নানা কার্য্যে তাহা খণ্ড হইয়া গিয়াছে। স্ত্রীতে অর্দ্ধেক, সন্তানাদিতে সিকি এবং কার্য্যে সিকি, এইরূপে ষোল আনা মন ব্যয়িত হইয়া গিয়াছে, আমরা ছায়ামন লইয়া বাস করিতেছি। মন নাই, ধ্যান করিবে কে? ধারণা স্থায়ী হইবে কোথায়? আমাদের এ অবস্থায় শাস্ত্র মতে কার্য্য হইবে কিরূপে? সন্ন্যাসী হইতে পারিব না। স্ত্রী পুত্র কন্যা, পিতা মাতা ভাই ভগ্নি কোথায় ফেলিয়া দিব? ভাল বুঝিয়া হউক, আর ভ্রমে পড়িয়াই হউক,

যাহা হইয়াছে, তাহার উপায় নাই। এ অবস্থায় আমাদের সন্ন্যাসী হওয়া হইল না বলিয়া কি কোন উপায় হইবে না? কিন্তু সন্ন্যাসী না হইলে বেদান্ত শাস্ত্র পাঠের অধিকারী হওয়া যায় না, ইহা শাস্ত্রের অভিপ্রায়। কর্ম্মকাণ্ডের কোন শক্তি নাই। প্রীতি নাই, ভক্তি নাই, নিষ্ঠা নাই, প্রেম নাই, কর্ম্ম করিব কিরূপে? কলির সাধারণ নরনারীর এই অবস্থা। শাস্ত্রাদির যেরূপ উদ্দেশ্য, তাহাতে আমাদের অবস্থার ব্যক্তিদিগের কোন আশা ভরসা নাই। আমরা সত্যবাদী হইতে পারিব না, ইন্দ্রিয় সংযম করিতে পারিব না, অনশন ব্রতাদি করিতে পারিব না, শাস্ত্র আমাদের পরিত্যাগ করিল। আমরা কোথায় যাইব? আমাদের অবস্থা দেখিয়া, আমাদের অনন্যগতি দেখিয়া, আমাদের নিরুপায় দেখিয়া, করুণানিধান দীনবন্ধু দীনের দুঃখ নিবারণার্থ রামকৃষ্ণরূপে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। দীনের দুঃখে তিনি কাতর হইয়া দীনোদ্ধারের ব্যবস্থা করিয়া গিয়াছেন। কর্ম্ম না করিলে কর্ম্ম সূত্র কাটে না, ইহা শাস্ত্রের মত। শাস্ত্র বজায় রাখিবার জন্য তিনি আপনি সমুদয় কর্ম্ম করিয়া কর্ম্মফল আমাদের জন্য রাখিয়া গিয়াছেন। আমরা রামকৃষ্ণে—বকলমা দিলে তাঁহার উপার্জ্জিত কর্ম্মফলের দ্বারা আমাদের কর্ম্মসূত্র খণ্ডিত হইবে। এই নিমিত্ত রামকৃষ্ণদেব আমাদের ন্যায় দুর্ব্বল জীবের পরিত্রাতা।

সম্পূর্ণ।

গীত।

মন নীরব নিয়ত বিহার, মুদি নয়ন নিরঞ্জন নেহার ॥
তুচ্ছ কর মন, কামিনী-কাঞ্চন, মধুসূদন চরণ সার ;—
দীন হ'তে দীন, রহ কৃপাধীন, অভিমান দূর পরিহার ঃ—
লভ শান্তি বিমল অনিবার ॥

বিনা যতন রতন বাসনা।
সাধনের ধন সাধের রতন সাধ ক'রে হারায়োনা ॥
রত্নাকরে ধরে যে রতন, মেলে সে অতল জলে হ'লে নিমগন,
ঢেউ দেখে যে ভয় পাবে তার রতন দেখা হবেনা ॥
নেহারি রতন, ফুরাবে আপন, নূনের পুতুল অকূলে যেমন ;—
যায় গলে সে গেলে তায় সাগর বাড়ে কমেনা ॥

মন ত মনের মত হ'ল কই।
আপন যারা, ছ'জন তারা, নয়ত রিপু বই ॥
অসার সংসার, অশান্তি আগার, লক্ষ্যহীন ফিরি দ্বারে দ্বার,
নাহি চায় মুখপানে যেন আমি কা'র নই ॥
বাসনা বিলাস, বাড়ে অভিলাষ, বৃথা ফাঁস সোনা করি আশ,
বিনাশিতে কোন মতে অভিমানে সারা হই ॥
তত্ত্ব-পথে ধায়, অনিত্য না চায়, নত মন নিত দীনতায় ;—
সে ভাবে অভাব হেরি মরমেতে মরে রই ॥

ভুলিসনে ভুলিসনে ওমা আমি যে তোর অবোধ ছেলে।
আমি যদি থাকি ভুলে কোলে নিস্ মা ছেলে ব'লে ॥
যে বাঁধনে বাঁধা থাকি, হয়না মনে বারেক ডাকি,
দয়াময়ী দিসনে ফাঁকি ভুলিসনে মা দিন ফুরালে ॥
খেলাঘরের ধূলোখেলা, যত খেলি ততই জ্বালা,
ডাকি তোরে বিপদ বেলা চরণ দিস মা চরমকালে ॥

কে তুমি নবীন যোগী মন কেড়ে নাও জোর ক'রে।
একি সংযোগী বিরাগী দেখি সর্ব্বত্যাগী একাধারে ॥
ভেকের বিধান নাই,
দাওনা ধরা বিধিমতে সবারি গোঁসাই,
এল দলে দলে চরণতলে শিক্ষা দিলে সবারে ;—
"বাধে দল বাঁধা জলে রয় না স্রোতের মাঝারে ॥"
শত সম্প্রদায়, কত আসে যায়, তত্ত্বকথা কাতরে সুধায়,
বলে, "ডাক সবে, আপন ভাবে ইষ্ট পাবে অচিরে ;—
যে ডাকতে নারে ডাক তারে বকলমা দিক আমারে।"
"স্থূলে বহু মূলে একাকার", অভেদ প্রচার,
ঈশা মুশা হর হরি একা নির্ব্বিকার,
হেরে সে সরল প্রাণে "নাই চুরি যার ভাবের ঘরে ॥"
দেহ পরিচয়, ধর্ম্ম সমন্বয়,
বিনা ইষ্ট কে আর ইষ্ট বিলায় সাধ্য নরে নয় ;—
তুমি ইষ্টদাতা রামকৃষ্ণ তাপিত তারিবারে ॥

দীন শরণ চাহে চরণে ।
বঞ্চিত বাঞ্ছিত পদ রবে কেমনে ॥
সাধ্য নাই সাধন ভজনে,
রাখতে পায় তোমারই দায় আশ্রয় হীনে,
দয়া কর দীননাথ দীন জনে ;
তোমার নামটী নিলে হৃদয় গলে আশা হয় প্রাণে ;—
ওহে রামকৃষ্ণ রামকৃষ্ণ জানিনা তোমা বিনে ॥

দ্বিতীয় ভাগ সমাপ্ত

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পুস্তকাবলী।

১। **শ্রীরামকৃষ্ণদেবের জীবনবৃত্তান্ত।** শ্রীরামকৃষ্ণদেবের প্রিয় শিষ্য মহাত্মা রামচন্দ্র প্রণীত। তৃতীয় সংস্করণ। মূল্য এক টাকা। এই পুস্তকে অতিরঞ্জিত বা কল্পিত কিছুই নাই। শ্রীরামকৃষ্ণ প্রমুখাৎ যাহা শ্রবণ করা হইয়াছে, তাহা এবং প্রত্যক্ষ ঘটনাই লিপিবদ্ধ হইয়াছে। ইহাই প্রামাণ্য ও আদি গ্রন্থ।

২। **তত্ত্ব প্রকাশিকা বা** শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের উপদেশ। সেবক রামচন্দ্র প্রণীত। তৃতীয় সংস্করণ। মূল্য দুই টাকা। পরমহংসদেবের উপদেশ সম্বন্ধে এরূপ বৃহৎ গ্রন্থ আর নাই। এই গ্রন্থ ভক্তের অমূল্য রত্ন।

৩। **রামচন্দ্রের বক্তৃতাবলী।** প্রথম ভাগ, প্রথম হইতে নবম বক্তৃতা। ৫০২ পৃষ্ঠা। বাধান পুস্তক। মূল্য এক টাকা দুই আনা। প্রত্যেক তত্ত্ব-পিপাসুর ইহা পাঠ করা নিতান্ত বাঞ্ছনীয়।

৪। **রামচন্দ্রের বক্তৃতাবলী।** দ্বিতীয় ভাগ। দশম হইতে অষ্টাদশ বক্তৃতা। মূল্য এক টাকা। এই বক্তৃতাবলী শ্রবণে সহস্র সহস্র মানব মুগ্ধ হইয়াছিলেন।

৫। **রামচন্দ্র-মাহাত্ম্য** বা সেবক রামচন্দ্রের জীবনকাহিনী। মূল্য আট আনা। ভক্তের জীবনী পাঠে ভক্তির ভাব আপনি উদ্রেক হয়। সংসারে থাকিয়া কি ভাবে জীবনযাপন করিতে হয়, তাহার আদর্শ দেখিয়া প্রত্যেক ব্যক্তি চমৎকৃত হইবেন।